

বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

ISBN 978-81-7215-983-2 (print)
ISBN 978-93-9050-186-1 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন



প্রকাশকের নিবেদন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' রূপে ১৯২১ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে ঊনত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল পরে ১৯৬২ সালে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ রূপা অ্যান্ড কোম্পানি থেকে প্রথম 'রূপা' সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'রূপা' সংস্করণে মূল গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধ 'সন্ধ্যার উৎসব' ও 'খেলার পুতুল' বাদ দেওয়া হয় এবং নতুন একটি প্রবন্ধ 'বর্ণিকাভঙ্গম' সংযোজিত হয়। পরবর্তী 'রূপা' দ্বিতীয় সংস্করণে আরও একটি প্রবন্ধ 'রস ও রচনার ধারা' যোগ করা হয়। পঞ্চম 'রূপা' সংস্করণের 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী গ্রন্থটির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ এবং রূপা প্রকাশিত পরবর্তী সংস্করণের প্রবন্ধগুলি একত্র করে বর্তমান 'আনন্দ' সংস্করণ প্রকাশিত হল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের ঊনত্রিশটি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে মূল সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করা হয়েছে। কেবল কয়েকটি শব্দের ক্ষেত্রে আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

মূল সংস্করণে প্রবন্ধগুলিতে কোনও টীকা ছিল না। রূপা সংস্করণে গ্রন্থশেষে সব প্রবন্ধগুলির যে মিলিত গ্রন্থ-নির্দেশিকা ছিল সেগুলি বর্তমান 'আনন্দ' সংস্করণে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধের শেষে টীকা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংযোজন: আনন্দ সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ

১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তৎকালীন বিহার প্রদেশের খয়রার রাজা কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেন, তার সাহায্যে ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি নতুন অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে চারটি পদ— ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার পদগুলি—গুরুপ্রসাদ সিংহের নামে এবং ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাপনা সম্পর্কিত পদটি (The Chair of Indian Fine Arts) খয়রার রানী বাগীশ্বরী দেবীর নামে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রে পদটির নাম ইংরেজিতে স্পষ্টত Bagiswari Professor of Indian Fine Arts লেখা হলেও (দ্র. Hundred Years of the University of Calcutta, published by University of Calcutta 1957; pp. 272-74, 431) বাংলায় উল্লেখ করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে, কী কারণে জানা নেই, রানীর প্রকৃত নামের রূপান্তর ঘটিয়ে "বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদ"

লেখা হতে থাকে। এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত বক্তৃতা সংকলন "বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী" নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেন। বাংলায় খয়রার রানীর নামের এই বানান এখনও পর্যন্ত চালু আছে।

রানী বাগীশ্বরী দেবীর নামাঙ্কিত পদটি "রানী বাগীশ্বরী অধ্যাপক-পদ" এবং অনুরূপভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থটি 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে অভিহিত হওয়াই সঙ্গত বলে আমরা মনে করি। এই বিবেচনায় আনন্দ সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণে 'বাগীশ্বরী' বানানটি গৃহীত হয়েছে।

সূচিপত্র

শিল্পে অনধিকার

আজ থেকে প্রায় ১৫ বৎসর আগে আমার গুরু আর আমি দুজনে মিলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কোণে শিল্পের একটা খেলাঘর কল্পনা করেছিলেম। আজ এইখানে যাঁরা আমার গুরুজন ও নমস্য এবং যাঁরা আমার সুহৃদ এবং আদরণীয়, তাঁরা মিলে আমার কল্পনার জিনিসকে রূপ দিয়ে যথার্থই আমায় চিরদিনের মতো কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করেছেন। আমার কতকালের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে—আজ সন্ধ্যায়।

কেবল সেদিনের কল্পনার সঙ্গে আজকের সত্যিকার জিনিসটার মধ্যে একটি বিষয়ে অমিল দেখছি—সেটা এই সভায় আমার স্থান নিয়ে। সেদিন ছিলেম আমি দর্শকের মধ্যে,—প্রদর্শক কিংবা বক্তার আসনে নয়। তাই এক-একবার মনে হচ্ছে আজকেরটাই বুঝি দরিদ্রের স্বপ্নের মতো একটা ঘটনা—হঠাৎ মিলিয়ে যেতেও পারে।

কিন্তু স্বপ্নই হোক আর সত্যই হোক, এরি আনন্দ আমাকে নতুন উৎসাহে দিনের পর দিন কাজ করতে চালিয়ে নেবে—যতক্ষণ আমার কাজ করার এবং বক্তৃতা দেবার শক্তি থাকবে।

যোগ সাধন করতে হয় শুনেছি চোখ বুজে, শ্বাসপ্রশ্বাস দমন করে; কিন্তু শিল্পসাধনার প্রকার অন্য প্রকার—চোখ খুলেই রাখতে হয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জর-খোলা পাখির মতো মুক্তি দিতে হয়—কল্পনালোকে ও বাস্তবজগতে সুখে বিচরণ করতে। প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্ন-ধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে, তারপর বসে থাকা—বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে, চুপটি করে নয়—সজাগ হয়ে। এই সজাগ সাধনার গোড়ায় শ্রান্তিকে বরণ করতে হয়—"Art is not a pleasure trip, it is a battle, a mill that grinds."—MILLET.

"Art has been pursuing the chimera attempting to reconcile two opposites, the most slavish fidelity to nature and the most absolute independence, so absolute that the work of art may claim to be a creation."—BRACQUEMONT. আমাদেরও পণ্ডিতেরা artকে 'নিয়তিকৃত-নিয়মরহিতা' বলেছেন: সুতরাং এই artকে পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারখানা দেওয়ালের মধ্যে যে ধরে দিয়ে যাব, এমন আশা আমি করিনে এবং আমাকে যিনি এখানে ডেকেছেন, তিনিও করেন না। আমি ক-বছর নির্বিবাদে art সম্বন্ধে যা খুশি যখন খুশি যেমন করে খুশি যা-তা—অবিশ্যি যা জানি তা—বকে যেতে পারব এই ভরসা পেয়েছি। আমার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আমার যথেষ্ট হলেই তো হল না, আরো পাঁচজন রয়েছেন—দেশের ও দশের কি হল? এ প্রশ্ন তো উঠবে একদিন, তাই আমি এই কাজের দিকে দু পা এগোই দশ পা পিছোই, আর ভাবি এই যে এতকাল ধরে নানা ছবি আঁকলেম, ছবি আঁকতে শিখিয়ে চললেম, স্কুল বসালেম এবং বারো-তেরো বছর ধরে কত Exhibitionই দেখালেম লোকসমাজে, এই যে নবচিত্রকলাপদ্ধতি বলে একটা অদ্ভুত জিনিস, এই যে প্রাচীন ভারতচিত্র বলে একটা গুপ্তধনের সন্ধান দেওয়া গেল, আর আগেকার সাদা মাসিকপত্রগুলোকে সচিত্র করে, ছেলেদের বইগুলোকে রঙিন ছবিতে ভরিয়ে সমালোচকদের হাতে 'ন

ভূতো ন ভবিষ্যতি’ সমালোচনা গড়বার মহাস্ত্র আরো একটা বাড়িয়ে তোলা হল—এগুলো বিনা পারিশ্রমিকে দেওয়া বলেই কি যথেষ্ট হল না? বিনামূল্যে, আনন্দে একটু দেওয়া, সেই তো ভাল দেওয়া। মূল্য নিয়ে ওজন করে যা দেওয়া, সেটা দোকানদারের ফাঁকি দিয়ে ভরা হলেই যে যথেষ্ট ভাল হয় তা তো নয়! তাই বলি—আমি বলে যাব, তোমরা শুনে যাবে; আমি ছবি লিখে যাব, তোমরা দেখে আনন্দ করবে অথবা সমালোচনা করবে; কিংবা তোমরা লিখবে বলবে, আমি দেখব শুনব আনন্দ করব—আর যদি সমালোচনা করি তো মনে মনে; এর চেয়ে বেশি আপাতত নাই হল।

শিল্পের একটা মূলমন্ত্রই হচ্ছে ‘নালমতিবিস্তরেণ’। অতি-বিস্তরে যে অপর্যাপ্ত রস থাকে, তা নয়। অমৃত হয় একটি ফোঁটা, তৃপ্তি দেয় অফুরন্ত! আর ঐ অমৃতি জিলাবির বিস্তার মস্ত, কিন্তু খেলে পেটটা মস্ত হয়ে ওঠে আর বুক চেপে ধরে বিষম রকম। শিল্পরসের উপর অধিকারের দাবি আমার যে কত অল্প, তা আমি যেমন জানি, এমন তো কেউ নয়। কারণ অমৃতবন্টনের ভার নিতে আমি একেবারেই নারাজ। আমার সাধ্য যা, তাই দেবার হুকুম পেয়েছি। দিতে হবে যা আছে আমার সংগ্রহ করা,—শিল্পের ভাবনা-চিন্তা কাজ-কর্ম সমস্তই—যা আমার মনোমত ও মনোগত। কারো মনোমত করে গড়া নয়, নিজের অভিমত জিনিস গড়তেই আমি শিখেছি, —আর শিখেছি সেটাকে জোর করে কারু ঘাড়ে চাপাবার না চেষ্টা করতে। ‘আদানে ক্ষিপ্রকারিতা প্রতিদানে চিরায়ুতা’— শিল্পীর উপরে শাস্ত্রকারের এই হুকুমটার একটা মানে হচ্ছে জিনিসের কৌশল আর রস চটপট আদায় করতে হবে; কিন্তু সেটা পরিবেশন করবার বেলায় ভেবে-চিন্তে চলবে। কেউ কেউ ভয় করছেন, সুযোগ পেয়ে এইবার আমি নিজের এবং নিজের দলের শিল্পের একচোট বিজ্ঞাপন বিলি করে নেব। সেটা আমি বলছি মিথ্যে ভয়। শিল্পলোকে যাত্রীদের জন্য একটা গাইড্‌বুক পর্যন্ত রচনা করার অভিসন্ধি আমার নেই, কেননা আমিও একজন যাত্রী—যে চলেছে আপনার পথ আপনি খুঁজতে খুঁজতে। এই খোঁজাতেই শিল্পীর মজা। এই মজা থেকে কাউকে বঞ্চিত করার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই। শুধু যাঁরা এই শিল্পের পথে আমার অগ্রগামী, তাঁদেরই উপদেশ আমি সবাইকে স্মরণে রেখে চলতে বলি—“ধীরে ধীরে পথ ধরো মুসাফির, সীড়ী হৈ অধবনী!”—দুর্গম সোপান, হে যাত্রী, ধীরে পা রাখ। এ ছাড়া বিজ্ঞাপনের কথা যা শুনছি, তার উত্তরে আমি বলি—ফুল যেমন তার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে নানা বর্ণে সাজিয়ে, বসন্তঋতু লট্‌কে দিচ্ছে তার বিজ্ঞাপন আকাশ-বাতাস-পৃথিবী ছেয়ে, তেমনি করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন সব কবি, শিল্পীই; আর তাই দেখে ও শুনে কেউ করছে উহু, কেউ উঁহু, কেউ আহা, কেউ বাহা! এটা তো প্রতি পলেই দেখছি, সুতরাং শিল্পের বিজ্ঞাপন দেব আমি আজকালের নতুন প্রথায় কেন? মনের ফুল বনের ফুলের সাথী হয়ে ফুটল,—এর বেশিও তো শিল্পীর দিক থেকে চাওয়ার প্রয়োজন নেই; তবে কেন অধম শিল্পী হলেও আমি ছুটে মরব যথাতথা হ্যান্ডবিল বিলিয়ে? এ আশঙ্কার কারণ তো আমি বুঝিনে। মধুকর মধু নিয়ে তৃপ্ত হন; এতে ফুলের যতটুকু আনন্দ, তার চেয়ে শিল্পীর সজীব আত্মা সমজদার পেলে আর একটুখানি আনন্দ বেশি পায় সত্য, কিন্তু সেটা তার উপরি-পাওনা—হলেও হয়, না হলেও চলে। শিল্পীর যথার্থ আনন্দ হচ্ছে ফোটার গৌরবে। গোলাপ সৌরভ ছড়িয়ে রাঙা হয়ে ফুটল, শিমুলও ফুটল রাঙা হয়ে—খালি তুলোর বীজ ছড়াতে, কিন্তু রসিক যে, সে তো সেই দুই ফুলেরই ফোটার গৌরব দেখে খুশি হয়। এই ফোটার গৌরব দিয়ে ওস্তাদ যাঁরা, তাঁরা শিল্পীর কাজের তুলনা করে থাকেন—“দিবস চারকে সুরংগ ফুল ওহি লখ মনমে লাগল্ শূল!”—দু’ দণ্ডের জীবন ফুটল, রসিকের এই দেখেই মন বলে—মরি মরি! এইখানেই শিল্পীতে আর কারিগরে তফাত; শিল্পের মধ্যে শিল্পীর মন ফুটন্ত হয়ে

দেখা দিলে, আর কারিগরের গড়া অতি আশ্চর্য কাগজের ফুল ফুটন্ত ফুলকেও হার মানালে, কিন্তু মনের রস সেটাকে সজীব করে দিলে না। জগতে কারিগরেরই বাহবা বেশি শিল্পীর চেয়ে, কেননা কারিগর বাহবা পেতেই গড়ে, শিল্পী গড়ে চলে নিজের কাজের সঙ্গে নিজকে ফুটতে বোধ করতে-করতে। এই কারণেই শিল্পচর্চার গোড়ার পাঠ হচ্ছে শিল্পবোধ, যেমন শিশুশিক্ষার গোড়াতে হচ্ছে শিশুবোধ।

রসবোধই নেই রসশাস্ত্র পড়তে চলায় যে ফল, শিল্পবোধ না নিয়ে শিল্পচর্চায় প্রায় ততটা ফলই পাওয়া যায়। এর উল্টোটা যদি হত, তবে সব কটা অলঙ্কারশাস্ত্রের পায়েস প্রস্তুত করে পান করলেই ল্যাটা চুকে যেত। মৌচাকের গোপনতার মধ্যে কি উপায়ে ফুলের পরিমল গিয়ে পৌঁছচ্ছে তা দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু মধুর সৃষ্টি হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড রহস্যের আড়ালে। তেমনি মানুষের রসবোধ কি উপায়ে হয়, কেমন করে, অলঙ্কারশাস্ত্রে রসশাস্ত্রে তারি জল্পনা যেমন দেখি, তেমনি এও তো দেখি যে রসশাস্ত্র নিংড়ে পান করেও কমই রসিক দেখা দিচ্ছে। এই যে আলো-মাখা রামধনুকের রঙে বিচিত্র বিশ্বচরাচরের অফুরন্ত রস, এ তো মাটি থেকে প্রস্তুত রঙের বাক্সয় ধরা পড়ে না, কালির দোয়াতেও নয়, বীণার খোলটার মধ্যেও নয়। এ বাঁধা পড়ে মনে; এই হল সমস্ত রসশাস্ত্রের প্রথম ও শেষ পাঠ। মৌচাক আর বোলতার চাক—সমান কৌশলে আশ্চর্যভাবে দুটোই গড়া। গড়নের জন্যে বোলতায় আর মৌমাছিতে পার্থক্য করা হয় না; কিংবা মৌমাছিকে মধুকরও নাম দেওয়া হয় না—অতি চমৎকার তার চাকটার জন্যে। মৌচাকের আদর, তাতে মধু ধরা থাকে বলেই তো! তেমনি শিল্পী আর কারিগর দুয়েরই গড়া সামগ্রী, নিপুণতার হিসেবে কারিগরেরটা হয়তো বা বেশি চমৎকার হল কিন্তু রসিক দেখেন শুধু তো গড়নটা নয়, গড়নের মধ্যে রস ধরা পড়ল কি না। এই বিচারেই তাঁরা জয়মাল্য দেন শিল্পীকে, বাহবা দেন কারিগরকে। শিল্পীর কাজকে এইজন্যে বলা হয় নির্মিতি অর্থাৎ রসের দিক দিয়ে যেটি মিত হলেও অপরিমিত। আর কারিগরের কাজকে বলা হয় নির্মাণ অর্থাৎ নিঃশেষভাবে পরিমাণের মধ্যে সেটি ধরা। একটা নির্মাণের মতো ঠিক আর একটি নির্মাণ-সম্ভব কিন্তু শিল্পীর নির্মিতিকে কৌশলের কলে ফেলে বাইরের ধাঁচাটা নকল করে নিলেও ভিতরের রসের অভাব কিংবা তারের বৈষম্য থাকবেই। এইজন্যেই শিল্পীর শিল্পকে বলা হয়েছে ‘অনন্যপরতন্ত্রা’। আমার শিল্প এক, আর তোমার শিল্প আর-এক, আমার দেশের শিল্প এক, তোমার দেশের অন্য,—এ না হলে মানুষের শিল্পে বিচিত্রতা থাকত না; জগতে এক শিল্পী একটা-কিছু গড়ত, একটা-কিছু বলত বা গাইত আর সবাই তার নকলই নিয়ে চলত। রোমক শিল্প নকল নিয়েই চলেছিল—গ্রিক দেবতার মূর্তিগুলির কারিগরিটার। রোম ভেবেছিল গ্রিক শিল্পের সঙ্গে সমান হয়ে উঠবে এই সোজা রাস্তা ধরে, কিন্তু যেদিন একটি গ্রিক শিল্পীর নির্মিতি মানুষের চোখে পড়ল, সেই দিনই ধরা পড়ে গেল অত বড় রোমক শিল্পের ভিতরকার সমস্ত শুষ্কতা ও অসারতা। সপ্তম সর্গ, অষ্টম সর্গ, সাত কাণ্ড, অষ্টাদশ পর্বগুলোর ছাঁচের মধ্যে নিজের লেখাকে ঢেলে ফেলতে পারলেই কিংবা নিজের কারিগরি কি কারদানিটাকে হিন্দু বা মোগল অথবা ইউরোপীয় এমনি কোনো একটা যুগের ও জাতির ছাঁচের মধ্যে ধরে ফেলতে পারলেই আমাদের ঘরে শিল্প পুনর্জীবন লাভ করে কলাবৌটি সেজে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াবে এই যে ধারণা এইটেই হচ্ছে সব শিল্পীর যাত্রাপথের আরম্ভে একটুখানি অথচ অতি ভয়ানক, অতি পুরাতন চোরাবালি। এর মধ্যে একটা চমৎকার, চকচকে সাধুভাষায় যাকে বলে, লোষ্ট্র পড়ে আছে, যার নাম Tradition বা প্রথা। অনন্তকালের সঞ্চিত ধনের মতো এর মোহ; একে অতিক্রম করে যাবার কৌশল জানা হলে তবে শিল্পলোকের হাওয়া এসে মনের পাল ভরে তোলে, ডোববার আর ভয় থাকে না। শিল্পলোকের যাত্রাপথে এই

যে একটা মোহপাশ রয়েছে—চিরাগত প্রথার অনুসরণপ্রিয়তা, সেটাকে কাটিয়ে যাবার শিল্পশাস্ত্র বৈদিক ঋষিরা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন—"মানুষের নির্মিত এই সমস্ত খেলানার সামগ্রী, এই হস্তী, কাংস, বস্ত্র, হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি যে শিল্প সমস্তই দেবশিল্পের অনুকরণমাত্র—একে শিল্প বলা চলে না, এ তো দেবশিল্পীর দ্বারায় করা হয়ে গেছে, মানুষের কৃতিত্ব এর মধ্যে কোথায়? এ তো শুধু প্রতিকৃতি (নকল) করা হল মাত্র! হে যজমান শিল্পী, দেবশিল্পীর পরে এলেম আমরা, সুতরাং আমাদের করাটা নামে মাত্র অনুকৃতি বলে ধরা যায়, কিন্তু আমাদের কাজে সৃষ্টির কৃতিত্ব যেখানে, সেখানে মানুষের শিল্পের সঙ্গে দেবশিল্পের রচনার উপায়ের মধ্যে পার্থক্য কোথাও নেই; শুধু সেটি পরে করা হয়েছে—অনুকৃত হয়েছে মাত্র—এই রহস্য জানো! এ যে জানে সকল শিল্পই তার অধিকারে আসে, শিল্প তার আত্মার সংস্কার সাধন করে, এই যে শিল্প এমন যে শিল্পশাস্ত্র, কেবল তারি দ্বারায় যজমান নিজের আত্মাকে ছন্দোময় করে যথার্থ যে সংস্কৃতি তাই লাভ করে এবং প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সহিত মনকে, শ্রোত্রের সহিত আত্মাকে মিলিত করে।"

যতদিন মানুষ জানেনি তার নিজের মধ্যে কি চমৎকারিণী শক্তি রয়েছে সৃষ্টি করবার, ততদিন সে তার চারিদিকের অরণ্যানীকে ভয় করে চলছিল, পর্বতশিখরকে ভাবছিল দুরারোহ, ভীষণ; বিশ্বরাজ্যের উপরে কোনো প্রভুত্বই সে আশা করতে পারছিল না; তার কাছে সমস্তই বিরাট রহস্যের মতো ঠেকছিল; সে চুপচাপ বসে ছিল। কিন্তু যেদিন শিল্পকে সে জানলে, সেই মুহূর্তেই তার মন ছন্দোময় বেদময় হয়ে উঠল, রহস্যের দ্বারে গিয়ে সে ধাক্কা দিলে—সবলে। শুধু এই নয়, ভয় দূরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার এই দু-দিনের খেলাঘরে অতি আশ্চর্য খেলা—কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করে দিলে। আগুনকে সে বরণ করে নিয়ে এল নিজের ঘরে ঘুমন্ত দেশের রাজকন্যার মতো সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তুলে! অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে বেজে উঠল লোহার তার আশ্চর্য সুরে, মাটির প্রদীপ জ্বেলে দিলে নতুনতর তারার মালা; মানুষ সমস্ত জড়তার মধ্যে ডানা দিয়ে ছেড়ে দিলে;—আকাশ দিয়ে বাতাস কেটে উড়ে চলল, সমুদ্রের পরপারে পাড়ি দিয়ে চলল—মানুষের মনোরথ, মনতরী—তার স্বপ্ন তার সৃষ্টির পসরা বয়ে। এই শিল্পকে জানা, মানুষের সবচেয়ে যে বড় শক্তি—সৃষ্টি-করার কৃতিত্ব, তাকেই জানা। এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে এতটুকু মানুষ কেমন করে বেঁচে থাকত যদি এই শিল্পকে সে লাভ না করত! শিল্পই তো তার অভেদ্য বর্ম, এই তো তার সমস্ত নগ্নতার উপরে অপূর্ব রাজবেশ! আত্মার গৌরবে আপনি সেজে নিজের প্রস্তুত-করা পথে সে চলল— স্বরচিত রচনার অর্ঘ্য বয়ে—মানুষ নিজেই যাঁর রচনা তাঁর দিকে! মানুষের গড়া আনন্দ সব তো এতেই শেষ! সে জানাতে পারলে আমি তোমার কৃতী সন্তান! শিল্পের সাধনা মানুষ করেই চলল পৃথিবীতে এসে অবধি, তবেই তো সে নানা কৌশলে নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করলে; সাত-সমুদ্র তের-নদী, এমনকি চন্দ্রলোক সূর্যলোকের ঊর্ধ্বেও তার শরীর ও মনের গতি, চলার সব বাধাকে অতিক্রম করে, কতক সমাধা হল, কতক বা সমাধা হবার মতো হল। সূর্যের মধ্যে ঝড় বইল, মানুষের গড়া যন্ত্রে তার খবর সঙ্গে-সঙ্গে এসে পৌঁছল, নীহারিকার কোলে একটি নতুন তারা জন্ম নিলে ঘরে বসে মানুষ সেটা চোখে দেখলে! এর চেয়ে অদ্ভুত সৃষ্টি হল—মানুষ তার আত্মাকে রূপ, রং, ছন্দ, সুর, গতি, মুক্তি সব দিয়ে ছড়িয়ে দিলে বিশ্বরাজ্যে। এমন যে শিল্প, এত বড় যে শিল্প, তারই অধিকার ঋষিরা বলেছেন নাও; আর আমরা বলছি না, না, ও পাগলামি-খেয়াল থাক, চাকরির চেষ্টা করা যাক। ওইটুকু হলেই আমরা খুশি। ঋষিরা বললেন—একি, একি তুচ্ছ চাওয়া?—নাল্পে সুখমস্তি! আমরা বললুম—অল্পেই আমি খুশি। কিন্তু আমাদের পূর্বতন যাঁরা, তাঁদের চাওয়া তো আমাদের মতো যা-তা যেমন-তেমন নয়।

শিল্পলক্ষ্মীর কাছে তাঁদের চাওয়া বাদশার মতো চাওয়া—একেবারে ঢাকাই মস্‌লিন, তাজমহলের ফরমাশ; জগতের মধ্যে দুর্লভ যা, তারই আবদার! বৌদ্ধ ভিক্ষু, তাঁরা থাকবেন; শুধু পাহাড়ের গুহা মনঃপূত হল না, তাঁদের জন্য রচনা হয়ে গেল অজন্তা-বিহার—শিল্পের এক অদ্ভুত সৃষ্টি—ভিক্ষুরা যেখানে জন্তুর মতো গুহাবাস করবেন না, নরদেবের মতো বিহার করবেন!

রমণীর শিরোমণি তাজ, দুনিয়ার মালিক সাহাজাহান তার স্বামী, সোহাগ-সম্পদ সে কি না পেয়েছিল, কিন্তু তাতেও তো সে তৃপ্ত হল না, সাহাজাহানের অন্তরে ছিল যে শিল্প, তারই শেষ-দান সে চেয়ে নিলে—দুজনের জন্যে একটি মাত্র কবর, যার মধ্যে দুজনে বেঁচে থাকবে এমন কবর যার জোড়া ত্রিভুবনে নেই। একেই বলে চাওয়ার মতো চাওয়া, দেওয়ার মতো দেওয়া। কোনো শিল্প নেই, কোনো রস নেই—এটা সেকালের লোক কল্পনা করতে পারেনি, তাদের শিল্পসামগ্রীগুলোই তার প্রমাণ। কিন্তু আজকালের-আমরা কি পেরেছি, এখনও পারছি, আমাদের ঘর-বার চারিদিক তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। শিল্পে অধিকার আমরা কি মুখের বক্তৃতায় পাব? মনের মধ্যে যে রয়েছে আমাদের— যেন-তেন-প্রকারেণ পয়সা, কোনো-রকমে যা-তা করে লীলা সাঙ্গ করা। এভাবে চললে হাতের মুঠোয় কেউ শিল্পকে ধরে দিলেও তো আমরা সেটা পাবনা। খোঁজই নেই শিল্পের জন্যে, কোথা থেকে পাব সেটা!

কি দিয়ে ঘর সাজালেম, কি ভাবেই বা নিজে সাজলেম, আমোদেই বা হল কেমন, পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বছরের জীবনটা কাটলই বা কেমন করে—এ খোঁজের তো প্রয়োজনই আছে বলে মনে করি না; মনের মধ্যে যে লুকিয়ে রয়েছে যেমন-তেমন ভাব,—অল্পেই মন ভরে গেল যেমন-তেমনে! শুধু অল্প হলে তো কথা ছিল না; সেটা বিশ্রী হবে কেন? মাসে বার-পঁচিশ বায়স্কোপ-রঙ্গমঞ্চের রঙ্গ এবং ফুটবলের ভিড়, ঘোড়দৌড়ের জুয়ো এবং দু'চারটে স্মৃতিসভার বার্ষিক অধিবেশন ও যতটা পারা যায় বক্তৃতা—এই হলেই কি চুকে গেল সব ক্ষুধা, সব তৃষ্ণা? ধর, ক্ষুধা মেটানো গেল—সোনালি গিল্টি-করা মার্বেল-মোড়া বৈদ্যুতিক আলোতে ঝকমক হোটেলের খানা-কামরায়, এবং তৃষ্ণাও মেটালেম মদের বোতলে; কিন্তু তারপর কি? মনের খোরাক যে মধু, মনকে তা দেওয়া হল না—পেয়ালা ভরে। মন রইল উপবাসে। দিনে-দিনে মন হতবল, হতশ্রী হল, স্ফূর্তি হারালে। তারপর একদিন দেখলেম, আনন্দময়ের দান আনন্দ দেবার ক্ষমতা, আনন্দ পাবার ইচ্ছা—সবই হারিয়েছি; সৌন্দর্যবোধ, আনন্দবোধ—সবই আমাদের চলে গেছে। বাতাস যে কি বলছে তা বুঝতে পারছিনে, ফুলন্ত পৃথিবী কি সাজে যে সেজে দাঁড়াচ্ছে ঘরের সামনে তাও দেখতে পাচ্ছিনে। আকাশে আলো নেই, অন্তরে তেজ নেই, আশা নেই, আনন্দ নেই, শুকনো জীবন ঝুঁকে রয়েছে রসাতলের দিকে! এটা যে আমি কেবল অযথা বাগ্‌জাল বিস্তার করে ভয় দেখাচ্ছি তা নয়; এই ভয় সত্যিই আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায় করতেই হবে,—শিল্পীর অধিকার আমাদের পেতেই হবে, না হলে কিছুই পাবনা আমরা। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার, শিল্পভাণ্ডার অতুল ঐশ্বর্যে কালে-কালে ভর্তি হল সত্যি, কিন্তু আজকের আমাদের হালচাল দেখে কেউ কি বলবে আমরাই সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের যথার্থ উত্তরাধিকারী? এই হতশ্রী, নিরানন্দ, অত্যন্ত অশোভনভাবে নিঃস্ব, কেবলি হাত-পাতা আর হাত-জোড়া ছাড়া হাতের সমস্ত কাজ যারা ভুলে বসেছি, সূর্যের কণা দিয়ে গড়া কোণার্ক মন্দির, প্রেমের স্বপন দিয়ে ধরা তাজ—এগুলো কি আমাদেরই? ভারতবাসী বলেই কি এগুলো আমাদের হল? তা তো হতে পারে না। এইসব শিল্পের নির্মিতি, এদের নিজের বলবার অধিকার অর্জন করব শুধু সেই দিন, যেদিন শিল্পকে আমরা লাভ করব, তার পূর্বে তো

নয়। শিল্প যেদিন আমাদের হবে, সেদিন জগৎ বলবে এসবই তো তোমাদের!— আমাদের শিল্পও তোমাদের। আমাদের দেশের রসিকরা বলেছেন শিল্পকে 'অনন্যপরতন্ত্রা।' শিল্পের সাধনা যে করে, কি দেশের কি বিদেশের প্রাচীন নতুন সব শিল্পের ভোগ তারই কপালে ঘটে। আমার দেশ বলে ডাক দিলে দেশটা হয়তো বা আমার হতেও পারে কিন্তু দেশের শিল্পের উপরে আমার দাবি যে গ্রাহ্য হবে না, সেটা ঠিক। তা যদি হত তবে কালাপাহাড় থাকলে, সেও আজ আমাদের সঙ্গে ভারতশিল্পের চূড়া থেকে প্রত্যেক পাথরটির উপরে সমান দাবি দিতে পারত; কেননা কালাপাহাড় ছিল ভারতবাসী এবং আমাদেরই মতো ভাঙতে পটু, গড়তে একেবারেই অক্ষম; শুধু কালাপাহাড় ভেঙে গেছে রাগে আর আমরা ভাঙছি বিরাগে—এই মাত্র তফাত। কাব্যকলা, শিল্পকলা, গীতকলা,—এ সবাইকে 'রস-রুচিরা' বলে কবিরা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হ্লাদৈকময়ী —আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন; আর তিনি অনন্যপরতন্ত্রা—যেমন-তেমন যার-তার কাছে তো তিনি বাঁধা পড়েন না; রসিক, কবি—এদেরই তিনি বরণ করেন এবং এদেরই তিনি সহচরী সঙ্গিনী সবই। আমরা যারা এক আফিসের কাজ এবং শেয়ারের কাজ ও তথাকথিত দেশের কাজ প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পাইনে, রস পাইনে, পাবার চেষ্টাও করিনে, তাদের কাছ থেকে শিল্প দূরে থাকবেন, এতে আশ্চর্য কি? "অলসস্স কুতো শিল্পং অসিপ্পস্স কুতো ধনং!"

নিজের শিল্প থেকে ভারতবাসী হলেও আমরা কতখানি দূরে সরে পড়েছি এবং বিদেশী হলেও তারা ভারতশিল্পের রত্নবেদীর কতখানি নিকটে পৌঁছে গেছে তার দুটো-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। জাপানের শ্রীমৎ ওকাকুরা শেষ বার এদেশে এলেন, শঙ্কট রোগে শরীর ভগ্ন কিন্তু শিল্পচর্চা, রসালাপের তাঁর বিরাম নেই। সেই বিদেশী ভারতবর্ষের একটি তীর্থ দেখতে এসেছেন—দূর প্রবাস থেকে নিজের ঘরের মৃত্যুশয্যায় আশ্রয় নেবার পূর্বে একবার জগন্নাথের মন্দিরের ভিতরটা কেমন শিল্পকার্য দিয়ে সাজানো দেখে যাবেন এই তাঁর ইচ্ছা, আর সেই কোণার্ক মন্দির যার প্রত্যেক পাথর শিল্পীর মনের আনন্দ আর আলো পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেটাও ঐ সঙ্গে দেখে নেবার তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ দেখলেম। জগন্নাথের ডাক পড়েছে আমার বিদেশী শিল্পী-ভাইকে; কিন্তু জগন্নাথ ডাকেন তো ছড়িবরদার ছাড়ে না, ভারতের বড়লাটকে পর্যন্ত বাধা দেয় এত বড় ক্ষমতা সে ধরে! তাকে কিভাবে এড়ানো যায়? শিল্পীতে-শিল্পীতে মন্ত্রণা বসে গেল। চুপি-চুপি পরামর্শটা হল বটে কিন্তু বন্ধু গেলেন জগবন্ধু দর্শন করতে দিনের আলোতে রাজার মতো। এইটেই ছিল বিশ্বশিল্পীর মনোগত;—শিল্পী বিদেশী হলেও তার যেন গতিরোধ না হয় দর্শনের দিনে। দ্বার খুলে গেল, প্রহরী সসম্মানে একপাশ হল, জাপানের শিল্পী দেখে এলেন ভারতের শিল্পীর হাতে-গড়া দেবমন্দির, বৈকুণ্ঠ, আনন্দবাজার, মায় দেবতাকে পর্যন্ত। এই গরমানন্দের প্রসাদ পেয়ে বন্ধু দেশে চললেন অক্ষত শরীরে। তাঁর বিদায়ের দিনের শেষ-কথা আমার এখনও মনে আছে—ধন্য হলেম, আনন্দের অবধি পেলেম, এইবার পরপারে সুখে যাত্রা করি। এই তো গেল শিল্পের যথার্থ অনুরাগী অথচ বিদেশীর ইতিহাস। এইবার স্বদেশী অথচ বিরাগীর কথাটা বলি। ঐ জগন্নাথের মাসির বাড়ির জীর্ণ সংস্কার করতে হবে। একটা কমিটি করে খানিকটা টাকা তোলা হয়েছে; এস্টিমেট বক্তৃতা ইত্যাদি হয়ে ঠিক হয়েছে—অনেক কালের পুরোনো বনগাঁবাসী মাসির ঘরের বেশ কারুকার্য-করা পাথরের বড় বারান্ডা, কাল যেটাতে বেশ একটুখানি চমৎকার গাঢ় বর্ণের প্রলেপ দিয়েছে, আর যার নানা ফাটলের শূন্যতাগুলো মনোরম হয়ে উঠেছে বনলতার সবুজে আর সোনায়, সেই পুরোনোটাকে আরো পুরোনো—আরো মনোরম হতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি সেটার এবং সেই সঙ্গে মন্দিরের মধ্যেকার

কতকালের লেখা শঙ্খলতার পাড় হংসমিথুনের ছবি ইত্যাদি নানা আল্‌পনা নক্সাখোদকারী কারিগরি দেওয়াল হতে কড়ি বরগার যত দাগা ও আঁটা ছিল সবগুলোর একসঙ্গে গঙ্গাযাত্রা করা। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলেম মন্দির সংস্কার হচ্ছে, মাসির বাড়িতে প্রাচীন মূর্তির শিলাবৃষ্টি হয়ে গেছে, হরির লুটের বাতাসার মতো যত পার কুড়িয়ে নিলেই হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি-চুপি সেখানে গিয়ে দেখি একটা যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে, চুড়োর সিংহি উল্টে পড়েছে ভুঁয়ে, পাতালের মধ্যে যে ভিত শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়েছিল এতকাল, সে শুয়ে পড়েছে মাটির উপরে; সব ওলট-পালট, তছনছ! কেমন একটা ত্রাস উপস্থিত হল। চরকে শুধালেম— এইসব পাথরের কাজ ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে যেমন ছিল তেমনি করে তুলে দেওয়া হবে তো সংস্কারের সময়? চরের কথার ভাবে বুঝলেম এইসব জগদ্দল পাথর ওঠায় যেখানকার সেখানে—এমন লোক নেই। বুঝলেম এ সংস্কার নয়, সৎকার। ভাঙা মন্দিরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে একজোড়া প্রকাণ্ড নীল হরিণ চার চোখে প্রকাণ্ড একটা বিস্ময় নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। কতকালের পোষা হরিণ, এই মন্দিরের বাগানে জন্ম নিয়ে এতটুকু থেকে এত বড়টি হয়েছে,—এদের কি হবে? শুধিয়ে জানলেম এদের বিক্রী করা হবে, আর এদের সঙ্গে-সঙ্গে যে বাগিচা বড় হতে-হতে প্রায় বন হয়ে উঠেছে—বনস্পতি যেখানে গভীর ছায়া দিচ্ছে পাখি যেখানে গাইছে হরিণ যেখানে খেলছে সেই বনফুলের পরিমলেভরা পুরোনো বাগিচাটা চষে ফেলে যাত্রীদের জন্যে রন্ধনশালা বসানো হবে। আমার যন্ত্রণাভোগের তখনও শেষ হয়নি—তাই ডবল তালা-দেওয়া ঘর দেখিয়ে বললেম—এটাতে কি? পাণ্ডা আস্তে আস্তে ঘরটা খুললে, দেখলেম মিন্টন আর বরন কোম্পানির টালি দিয়ে অত বড় ঘরখানা বোঝাই করা। ভাঙার মধ্যে—ধ্বংসের স্তূপে, রস আর রহস্য, নীল দুটি হরিণের মতো বাসা বেঁধে ছিল,—সেই যে শোভা, সেই শান্তি মনে ধরল না আমাদের ঠেকল দু'খানা চকচকে রাঙা মাটির টালি।

শিল্পে অধিকার জন্মাল না, চুপ করে বসে থাকা গেল—ঘেঁটে-ঘুঁটে যা পেলেম তাই নিয়ে, সে ভাল। কিন্তু হঠাৎ মনে হল শিল্প-সংস্কার করতে হবে, কিংবা দ্বিতীয় একটা অজন্তা-বিহার কিংবা তাজমহলেরই একটা inspiration-এর চোটে অম্বলশূলের বেদনার মতো বুকের ভিতরটা জ্বলে উঠলো, অমনি লাটিমের মতো ঘুরতে লেগে গেলেম বোঁ-বোঁ-শব্দে শিল্প-সংস্কার, শিল্পের foundation stone স্থাপনের কাজে—এ হলেই মুশকিল! যে ঘোরে তার ততটা নয়, কিন্তু শিল্প যেটা অনাদরে পড়ে রয়েছে এবং মানুষ যারা চুপচাপ রয়েছে নিজের ঘরে, তাদেরই ভয় আর মুশকিল তখন! Inspiration অমন হঠাৎ আসে না! মনাগুনের জ্বালায়, অম্বলশূলের জ্বালায় ভেদ আছে। শিল্পজ্ঞানের প্রদীপ হঠাৎ inspiration পেয়ে অমন রোগের জ্বালার মতো জ্বলে না, কাউকে জ্বালায়ও না, আগুন ধরিয়ে দিতে হয় সাবধানে—স্নেহভরা প্রদীপে, তবেই আলো হয় দপ্‌ করে। একেই বলে inspiration।

Inspiration কি অমনি আসে? অর্জন করলেম না, শিল্প-inspiration আপনি এল ভিক্ষুকের কাছে রাজত্বের স্বপ্নের মতে, এ হবার যো নেই। আমাকে প্রত্যয় না হয় তো এখনকার ইউরোপের মহাশিল্পী রোদাঁ কি বলেছেন দেখ—

"Inspiration! ah! that is a romantic old idea void of all sense. Inspiration will, it is supposed, enable a boy of twenty to carve a statue straight out of the marble block in the delirium of his imagination; it will drive him one night to make a masterpiece straight off

because it is generally at night that these things occur. I do not know why..Craftsmanship is everything; craftsmanship shows thoughtful work; all that does not sound as well as inspiration, it is less effective, it is nevertheless the whole basis of art!"

কিন্তু অর্জন নেই, inspiration এল—গড়তে গেলেম তাজ, হয়ে উঠল গম্বুজ; গড়তে গেলেম মন্দির, হয়ে পড়ল ইস্টিশান বা সৃষ্টিছাড়া বেয়াড়া বেখাপ্পা কিছু! Inspiration-এর খেয়াল ছোট বয়সে শোভা পায় আর শোভা পায় পাগলে।

শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয় তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না। কেননা শিল্প হল 'নিয়তিকৃত-নিয়মরহিতা'; বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না।

চুলোয় যাকগে inspiration! সাধনা, অর্জনা ওসবে কি দরকার? টাকা ঢাললে বাঘের দুধও মেলে, শিল্প মিলবে না? কেনো ছবি, মূর্তি, বসাও মিউজিয়াম; খুলে দাও জাতীয় শিল্পের চেয়ার; সেখান থেকে তাপমান-যন্ত্রে প্রত্যেকের রসের উত্তাপের ডিগ্রী মেপে দেওয়া হোক ডিপ্লোমা; Library হোক রসশাস্ত্রের; স্কুল হোক—সেখানে বসুক ছেলেরা চিত্রকারি, খোদকারি, নানা কারিগরি শিখতে; লিখতে লেগে যাক বড় বড় 'থিসিস' শিল্পের উপরে; ছাপা হয়ে চলে যাক সেগুলো ইংরাজিতে বিদেশে। আকাশের চাঁদকে পর্যন্ত ধরা যায় এমন বিরাট আয়োজন করে বসা যাক, শিল্প সুড়-সড় করে আপনি আসবে। হায়, যে শিল্প বাতাসের ফাঁদ পেতে আকাশের চাঁদকে সত্যিই ধরে এনে খেলতে দিচ্ছে মানুষকে, তাকে তলব দেব এমনি করে? হুজুরের তলব মজুরের উপরে? আর সে এসে হাজির হবে দুয়োরের বাহিরে জুতো রেখে দুহাতে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে?

আমেরিকা তার কুবের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে পৃথিবীর শিল্পসামগ্রী নূতন পুরাতন সমস্তই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল নিজের বাসায়। সেখানে সংগ্রহের বিরাট আয়োজন, চর্চারও বিরাট বিরাট বন্দোবস্ত, হাঁকডাকও বিরাট; কিন্তু সেখানে কল হল, কারখানা হল, আকাশ-প্রমাণ সব বাড়ি, যোজন-প্রমাণ সব সেতু আর বাঁধ উঠে বেঁধে ফেললে নায়াগ্রা নির্ঝর; কিন্তু সেই আয়োজনের পাহাড় এত উঁচু যে তার ওপারে কোথাও যে শিল্পীর আনন্দের নির্ঝর ঝরছে তা জানাই মুশকিল হয়েছে তাদের—যারা আয়োজন করলে এত করে শিল্পকে জানতে! একথা আমার এক আমেরিকান বন্ধু জানিয়ে গেছেন—আমি বলছিনে।

আমি যখন আমার মনকে শুধোই—এই এত আয়োজন, এই ছবি, মূর্তির সংগ্রহ, এই লেক্‌চার হল্, শেখবার studio, পড়বার লাইব্রেরি, এর প্রয়োজন কোনখানটায়? কেনই বা এসব? মন আমার এক উত্তরই দেয়—হয়তো কোথাও একটি আর্টিস্ট পরমানন্দের একটি কণা নিয়ে আমাদের মধ্যে বসে আছে, অথবা আসছে, কি আসবে কোনোদিন— সুন্দর যেভাবে এসে অতিথি হয় বিচিত্র রস, বিচিত্র রূপ আর গান নিয়ে, ষড়্ঋতুর মধ্য দিয়ে—তারি জন্যে এই আয়োজন, এত চেষ্টা।

যুগের পর যুগ ধরে আকাশ ঘনঘটার আয়োজন করেই চলল—কবে মেঘের কবি আসবেন তারই আশায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী লন্ডন শহরের উপরে কুহেলিকার মায়াজাল জমা হতেই রইল—কবে এক হুইস্‌লার এসে তার মধ্য থেকে আনন্দ পাবেন বলে। পাথর জমা রইল পাহাড়ে পাহাড়ে—এক ফিডিয়াস্, এক মাইলোস্, এক রোদাঁ, এক মেস্ট্রোভিফ ব্রেজেস্কা, এমনি জানা এবং দেশের বিদেশের অজানা artistদের জন্য। মোগলবাদশার রত্নভাণ্ডারে তিন পুরুষ ধরে জমা হতে লাগল মণিমাণিক্য সোনারূপা— এক রাজশিল্পীর

ময়ূর-সিংহাসন আর তাজের স্বপ্নকে নির্মিতি দেবে বলে। তেমনি যে আমরাও আয়োজন করছি, চেষ্টা করছি, শিল্পের পাঠশালা, শিল্পের হাট, কারুছত্র, কলাভবন—এটা-ওটা বসাচ্ছি সব সেই একটি আর্টিস্টের একটি রসিকের জন্য—সে হয়তো এসেছে কিংবা হয়তো আসবে।

শিল্পে অধিকার

শিল্পলাভের পক্ষে আয়োজন কতটা দরকার, কেমন আয়োজনই বা দরকার, তার একটা আন্দাজ করে দেখা যাক। রোমের তুলনায় গ্রিস এতটুকু; শিল্পের দিক দিয়েও গ্রিস রোমের চেয়ে খুব যে বড় করে আয়োজন করেছিল তাও নয়; শুধু গ্রিসের যতটুকু আয়োজন, সবটাই প্রায় শিল্পলাভের অনুকূল, আর রোমক শিল্পের জন্য যে প্রকাণ্ড আয়োজনটা করা হয়েছিল তা অনেকটা আজকালের আমাদের আয়োজনের মতো—বিরাটভাবে শিল্পলাভের প্রতিকূল। গ্রিস রোমের কথা ছেড়েই দিই, আজকালের ইউরোপও কি আয়োজন করে বসেছে তাও দেখার দরকার নেই, আমাদের দেশেই যে এতবড় শিল্প এককালে ছিল, এখনও তার কিছু চর্চা অবশিষ্ট আছে, সেখানে কি আয়োজন নিয়ে কাজ চলেছে দেখব। এদেশে প্রায় সব তীর্থস্থানগুলোর লাগাও রকম রকম কারিগরের এক-একটা পাড়া আছে। এই শহরের মধ্যেই এখনো তেমন সব পাড়া খুঁজলে পাওয়া যায়—কাঁসারিপাড়া, পোটোতলা, কুমোরটুলি, বাক্সপটি ইত্যাদি। এইসব জায়গায় শিল্পী কারিগর দু রকমেরই লোক আছে, যারা ওস্তাদ এক-এক বিষয়ে। ওস্তাদরা ঘরে বসে কাজ করছে, চেলারা যাচ্ছে সেখানে কাজ শিখতে—ঐসব পাড়ার ছোট-বড় নানা ছেলে! সেখানে ক্লাসরুম, টেবিল, চেয়ার, লাইব্রেরি, লেকচার হল্ কিছুই নেই, অথচ দেখা যায় সেখান থেকে পাকা-পাকা কারিগর বেরিয়ে আসছে—পুরুষানুক্রমে আজ পর্যন্ত! ছোটবেলা থেকে ছেলেগুলো সেখানে দেখছি কেউ পাথর, কেউ রং-তুলি, কেউ বাটালি, কেউ হাতুড়ি এমনি সব জিনিস নিয়ে কেমন নিজেদের অজ্ঞাতসারে খেলতে খেলতে artist, artisan কারিগর শিল্পী হয়ে উঠেছে যেন মন্ত্রবলে। খেলতে-খেলতে শিল্পের সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে তার সঙ্গে পরিণয়—এই তো ঠিক! পড়তে-পড়তে খাটতে-খাটতে ভাবতে-ভাবতে যেটা হয় সেটা নীরস জ্ঞান,—শুধু শিল্পের ইতিহাস, তত্ত্ব, প্রবন্ধ কিংবা পোস্টার ও পোস্টেজ দেবার কাজে আসে। এই যে এক ভাবের শিল্পজ্ঞান একে লাভ করতে হলে নিশ্চয়ই তোড়জোড় ঢের দরকার। লেকচার হল্ থেকে লেকচারের ম্যাজিক লণ্ঠনটা পর্যন্ত না হলে চলবে না সেখানে। কিন্তু শিল্পজ্ঞান তো শুধু এই বহিরঙ্গীন চর্চা ও প্রয়োগবিদ্যার দখল নয়; রস, রসের স্ফূর্তি—এসবের আয়োজন যে স্বতন্ত্র। 'অনন্যপরতন্ত্রা' শিল্প পাখিপড়ানোর খাঁচা, কসরতের আখড়ার দিকেও তো সে এগোয় না, রসপরতন্ত্রতাই হল তাকে আকর্ষণের প্রধান আয়োজন আর একমাত্র আয়োজন। শুধু এই নয়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মানুষ, মনও তাদের রকম-রকম। রসও বিচিত্র ধরনের। আয়োজনও হল প্রত্যেকের জন্যে স্বতন্ত্র প্রকারের। একজনের individuality, personality যে আয়োজন করলে, আর একজন সেই আয়োজনের অনুকরণে চললেই যে অনন্যপরতন্ত্রা এসে তাকে ধরা দেবেন, তা নয়; তাঁর নিজের জন্যে তাঁকে স্বতন্ত্র প্রকারের আয়োজন করতে হবে। জাপানের শিল্প আয়োজন, আমাদের শিল্প আয়োজন, ইউরোপের শিল্প আয়োজন—সবগুলো দিয়ে খিচুড়ি রাঁধলে একরকম রস সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু সেটাতে শিল্পরসের আশা করাই ভুল। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে মনের পাত্রে শিল্পরসকে ধরবার যে আয়োজন করে নিলে সেইটেই হল ঠিক আয়োজন,

তাতেই ঠিক জিনিসটি পাওয়া যায়; এছাড়া অনেকের জন্য একই প্রকারের বিরাট আয়োজন করে পাওয়া যায় সুকৌশলে প্রস্তুত-করা সামগ্রী বা প্রকাণ্ড ছাঁচে ঢালাই-করা কোনো একটা আসল জিনিসের নকল মাত্র। Artist-এর অন্তর্নিহিত অপরিমিতি (বা infinity), artist-এর স্বতন্ত্রতা (individuality)—এই সমস্তর নির্মিতি নিয়ে যেটি এল সেইটেই Art। অন্যের নির্মিতির ছাপ, এমনকি বিধাতারও নির্মিতির ছাঁচে ঢালাই হয়ে যা বার হল তা আসলের নকল বই আর তো কিছুই হল না। ভাল, মন্দ, অদ্ভুত বা অত্যাশ্চর্য এক রসের সৃষ্টি তো সেটি হল না। এইটুকুই যথার্থ পার্থক্য Artএ ও না-Artএ। কিন্তু এ যে ভয়ানক পার্থক্য—স্বর্গের সঙ্গে রসাতলের, আলোর সঙ্গে না-আলোর চেয়ে বেশি পার্থক্য। স্বর্গের ঐশ্বর্য আছে, রসাতলের গাম্ভীর্য আছে, রহস্য আছে, আলোর তেজ, অন্ধকারের স্নিগ্ধতা আছে, কিন্তু Artএ ও না-Artএ তফাত হচ্ছে—একটায় সব রস সব প্রাণ রয়েছে, আর একটায় কিছুই নেই!

Art-এর একটা লক্ষণ আড়ম্বরশূন্যতা—Simplicity। অনাবশ্যক রং-তুলির কলকারখানা, দোয়াত-কলম, বাজনা-বাদ্যি সে মোটেই সয় না। এক তুলি, এক কাগজ, একটু জল, একটি কাজললতা—এই আয়োজন করেই পুবের বড় বড় চিত্রকর অমর হয়ে গেলেন। কবীর এর চেয়ে কমে চলে গেলেন। কাগজ আর কলম, কিংবা তাও নয়— একতারা কি বাঁশি, অথবা তাও যাক,—শুধু গলার সুর। সহজকে ধরার সহজ ফাঁদ, এই ফাঁদ নিয়েই সবাই তাঁরা চললেন—কেউ সোনার মৃগ, কেউ সোনার পদ্মের সন্ধানে। এ যেন রূপকথার রাজপুত্রের যাত্রা—স্বপ্নপুরীর রাজকুমারীর দিকে; সাজ নেই, সরঞ্জাম নেই, সাথী সহচর কেউ নেই। একা গিয়ে দাঁড়ালেম অপরিমিত রস-সাগরের ধারে, মনের পাল সুবাতাসে ভরে উঠল তো ঠিকানা পেয়ে গেলেম! রূপকথার সব রাজপুত্রের ইতিহাস চর্চা কর তো দেখবে—কেউ তাজি ঘোড়ায় চড়ে সন্ধানে বার হয়নি, এই যেমন-তেমন একটা ঘোড়া হলেই তারা খুশি। এও তো এক আশ্চর্য ব্যাপার শিল্পের— এই যেমন-তেমনের উপরে সওয়ার হয়ে যেমনটি জগতে নেই, তাই গিয়ে আবিষ্কার করা! মাটির ঢেলা, পাথরের টুকরো, সিঁদুর, কাজল—এরাই হয়ে উঠল অসীম রস আর রহস্যের আধার!

রসের তৃষ্ণা শিল্পের ইচ্ছা যার জাগবে, সে তো কোনো আয়োজনের অপেক্ষা করবে না;—যেমন করে থোক সে নিজের উপায় নিজে করে নেবে; এ ছাড়া অন্য কথা নেই। একদিন কবীর দেখলেন একটা লোক কেবলই নদী থেকে জল আমদানি করছে শহরের মধ্যে চামড়ার থলি ভরে-ভরে! সে লোকটার ভয় হয়েছে নদী কোন দিক দিয়ে শুকিয়ে যাবে! মস্ত বড় এই পৃথিবী নীরস হয়ে উঠেছে, তাই সে রস বেলাবার মতলব করছে। কবীর লোকটাকে কাছে ডেকে উপদেশ দিলেন—

> "পানি পিয়াওত ক্যা ফিরো
> ঘর ঘর সায়র বারি।
> তৃষ্ণাবংত যো হোয়গা
> পীবৈগা ঝকমারি।"

এ আয়োজন কেন, ঘরে ঘরে যখন রসের সাগর রয়েছে? তেষ্টা জাগুক, ওরা আপনিই সেটা মেটাবার উপায় করে নেবে দায়ে ঠেকে।

মূলকথা হচ্ছে রসের তৃষ্ণা; শিল্পের ইচ্ছা হল কি না, উপযুক্ত আয়োজন হল কি না— শিল্পের জন্যে বা রসের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে—এটা একেবারেই ভাববার বিষয় নয়। বিশ্ব জুড়ে তৃষ্ণা মেটাবার শিল্পকার্য, তার

প্রয়োগবিদ্যা, তার খুঁটিনাটি উপদেশ আইন-কানুন সমস্তই এমন অপর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত রয়েছে যে কোনো মানুষের সাধ্য নেই তেমন আয়োজন করে তোলে। শিল্পকে, রসকে পাওয়ার জন্যে আয়োজনের এতটুকু অভাব যে আছে তা খুব একেবারে আদিম অবস্থাতে—আর সব দিক দিয়ে অসহায় অবস্থাতেও—মানুষ বলেনি; উল্টে বরং প্রয়োজন হলে আয়োজনের অভাব ঘটে না কোনোদিন—এইটেই তারা হরিণের শিং, মাছের কাঁটার বাটালি, একটুখানি পাথরের ছুরি, এক টুকরো গেরি মাটি এইসব দিয়ে নানা কারুকার্য নানা শিল্প রচনা করে দিয়ে সপ্রমাণ করে গেছে। এ না হলে হবে না, ও না হলে চলে না—শিল্পের দিক দিয়ে একথা বলে শুধু সে, যার শিল্প না হলেও জীবনটা চলছে কোনো রকমে। আদিম শিল্পীর সামনে শুধু তো বিশ্বজোড়া এই রসভাণ্ডার খোলা ছিল, চেয়ারও ছিল না, টেবিলও ছিল না, ডিগ্রীও নয়, ডিপ্লোমাও নয়, এমনকি তার জাতীয় শিল্পের গ্যালারী পর্যন্ত নয়—কি উপায়ে তবে সে শিল্পকে অধিকার করলে? আমি অঙ্কন করছি, আমার নাতিটি পাশের ঘরে বসে অঙ্ক কষছে—এইভাবে চলছে, হঠাৎ একদিন নাতি এসে বললেন— দাদামশায়, বেরাল না থাকলে তোমার মুশকিল হত, বেরালের রোঁয়ার তুলি হত না তোমার ছবিও হত না। তর্ক শুরু হল। ঘোড়ার লেজ কেটে তুলি হত। ঘোড়া যদি না থাকত? পাখির পালক ছিঁড়ে নিতেম। পাখি না পেলে? নিজের মাথার চুল ছিঁড়তেম। টাক পড়ে গেছে? নাতির গালে আঙুলের ডগার খোঁচা দিয়ে বললেম—দশটা আঙুলের এই একটা নিয়ে। নাতি রাবণবধের উপক্রম করেন দেখে বললেম—তা হয় না, দেখছো এই ভোঁতা তুলি! বলে আমিও ঘুঁষি ওঠালেম। দাদামশায়ের আয়োজন দেখে নাতি হার মেনে সরে পড়লেন।

কাজের ঘানিতে জোতা রয়েছি, ঘানি পিষছি, কিন্তু স্নেহরস যা বার করছি, একফোঁটাও তো আমার কাছে আসছে না। রসালাপের অবসরটুকু নেই, রসের তৃষ্ণা মেটানো, শিল্পলাভ—এসব তো পরের কথা।

কাজের জগতের মোটা-মোটা লোহার শিক দেওয়া ভয়ঙ্কর অথচ সত্যিকার এই বেড়াজাল শুধু আমাদের ধরে চাপন দিচ্ছে না, সব মানুষই এতে বাঁধা। আখের ছড় বলে এর শিকগুলোতে ভুল করে দাঁত বসানো তো চলে না। কাজের মধ্যে যদি ধরা না দিই তো সংসার চলে না, আবার কাজেই গা ঢেলে দি তো রস পাওয়া থাকে দুরে। এর উপায় কিছু আছে?

রস পেতে চাই,—তবে কি রসের মধ্যে নিজেকে, নিজের সঙ্গে কাজকর্ম সংসারটা ভাসিয়ে দেব? ফলের গন্ধে মাতোয়ারা মন, তবে কি ফুলের বাগিচায় গিয়ে বাস করব?—ধানের ক্ষেত, ধনের চিন্তা সব ছেড়ে? কবীর বললেন, পাগল নাকি!

"বাগো না জায়ে নাজা,
তেরে কায়া মে গুলজার।"

'ও বাগে যেও না বন্ধু, পুষ্পবন তোমার অন্তরেই বিদ্যমান!' কায়ার মধ্যে প্রাণ যে ধরা রয়েছে, বাইরে থাক না কাজের জঞ্জাল। খাঁচার মধ্যে থেকেই পাখি কি গান গায় না? তাকে কি ফুলের বনে যেতে হয় গান গাইতে? যে ওস্তাদ সে ঘানি চলার তালে তালেই গায়, নাই হল আর কোনো সংগত-সুযোগ।

"মৃগা পাশ কস্তুরী বাস।
আপন খোজৈ খোজৈ ঘাস।"

কিন্তু কস্তুরীর ব্যাবসা করতে গিয়ে দানা-পানির উপায় ছাড়লে জীবনটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন কি করা যাবে? কোথায় থাকবে তখন রস, কোথায় থাকবে তখন শিল্প? রস না থাক, জীবনটা তো রয়েছে অনেকখানি।

আগে জীবন—সব রসের মূল যেটা, সেটা তো রক্ষা করা চাই। এর উপর আর কথা চলে না। কিন্তু এই কালে শহরের বুকে দাঁড়িয়ে ঐ ফুটপাতের পাথরের চাপনে বাঁধা পড়ে শিরীষগাছ, সেও যদি ফুল ফোটাতে পারে, তো মানুষ পারবে না তেমন করে ফুটতে—এও কি কখনো সম্ভব? চেরি ফুল যখন ফোটে তখন সারা জাপানের লোকের মন—সে ফুটে উঠে, ছুটি নিয়ে ছুট দেয় সেদিকে সব কাজ ফেলে। কই তাতে তো কেউ তাদের অকেজো বলতে সাহস করছে না? পেটও তো তাদের যথেষ্ট ভরছে। আমাদেরও তো আগে বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল, সে জন্যে সেকালে কাজেরও কামাই হয়নি, জীবনেরও কমতি ছিল না,—শিল্পেরও নয়, শিল্পীরও নয়, রসেরও নয় রসিকেরও নয়। "অলসস্য কুতো শিল্পং?" নিশ্চয় আমাদের এখনকার জীবনযাত্রায় কোথাও একটা কল বিগড়েছে যাতে করে জীবনটা বিশ্রী রকম খুঁড়িয়ে চলছে, শরীর খেটে মরছে কিন্তু মনটা পড়ে আছে অবশ, অলস! ম্যালেরিয়ার মশার সঙ্গে লক্ষ্মী পেঁচার ঝাঁক এসে যদি আমাদের ঘরে বাসা বাঁধত, তবে শিল্পী হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হত কি না এ প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করা আমার শোভা পায় না— পেঁচার পালকের গদির উপর বসে। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য তো মানতে হয়। শিল্পী 'যা ছুঁয়ে দেয় তাই সোনা হয়ে যায়' অথচ সোনা দিয়ে বেচারা ছেলেমেয়ের গা কোনোদিন ভরে দিতে পারলে না! তাজের পাথর যারা পালিশ করলে—আয়নার মতো ঝকঝকে, দুধের মতো সাদা করে, মুক্তোর চেয়েও লাবণ্য দিয়ে তার গম্বুজটা গড়ে গেল যারা, দেওয়ালের গায়ে অমর দেশের পারিজাত লতা চড়িয়ে দিয়ে গেল যে নিপুণ সব মালি, তারা রোজ-মজুরি কত পেয়েছিল? তাছাড়া পুরো খেতে পায়নি বলে তাদের শিল্প কোথায় ম্লান হয়েছিল বলতে পারো? দশ-এগার বছর লেগেছিল তাজটা শেষ করতে; সবচেয়ে বেশি মাইনা যা দেওয়া হয়েছিল ওস্তাদদের, তা মাসে হাজার টাকার বেশি নয়; এই থেকে বাদশাহী আমলের উপরওয়ালাদের পেট ভরিয়ে কারিগরেরা রোজ পেয়েছিল কত, কষে দেখলেই ধরা পড়বে শিল্পীর সঙ্গে ও শিল্পের সঙ্গে সম্পদের যোগাযোগটা। শিল্পী হওয়া-না হওয়ার সঙ্গে ম্যালেরিয়া হওয়ার বেশি যোগ, চাকরি হওয়া-না-হওয়ার চেয়ে—আমি এইটেই দেখতে পাচ্ছি। জীবন রক্ষা করতে যেটা দরকার, জীবন সেটা ঘাড় ধরে আমাদের করিয়ে নেবেই, ছাড়বে না,—নিদারুণ তার পেষণ-পীড়ন। অতএব আফিস আদালত ছেড়ে সকলে রূপ ও রসের রাজত্বের দিকে সন্ন্যাস নিয়ে চটপট বেরিয়ে পড়ার কুপরামর্শ তো কাউকে দেওয়া চলে না; অথচ দেখি এই কলে-পড়া জীবনযাত্রার মধ্যে একটুখানি রস একটু শিল্প-সৌন্দর্য না ঢোকাতে পারলেও তো বাঁচিনে। শুধু যে প্রাণ যায় তা নয়, শিল্পী বলে ভারতবাসীর যে মান ছিল তাও যায়। শিল্পী নীচ জাত হলেও সে শিল্পের পাণিগ্রহণ করেছে, সেই কারণে সকল সময়ে শিল্পী বিশুদ্ধ এই কথা ভারতবর্ষের ঋষিরা বলে গেছেন; কিন্তু যেখানে এই শিল্পী আজকালের কলের মানুষ আমাদের পরশ পাচ্ছে সেইখানেই সে মলিন হচ্ছে—ফুল যেমন চটকে যায় বেরসিকের হাতে পড়ে। এর উপায় কি?

রসের সঙ্গে কাজের বন্দীর পরিচয় পরিণয় ঘটাবার কি আশা নেই? কেন থাকবে না? কাজকর্ম আমাদেরই বেঁধে পীড়া দিচ্ছে এবং কবি, শিল্পী, রসিক—এঁরা সব এই কাজের জগতের বাইরে একটা কোন নতুন জগতে এসে বিচরণ করছেন তা তো নয়? কিংবা জীবনযাত্রার আখমাড়া কলটার কাছ থেকে চটপট পালাবার উৎসাহ তো কবি শিল্পী এঁদের কারু বড় একটা দেখা যাচ্ছে না! তাঁরা তবে কি করে বেঁচে রয়েছেন? কবীরের কাজ ছিল সারাদিন তাঁত-বোনা, আফিসে বসে কলম পেশার কিংবা পাঠশালে বসে পড়া মুখস্থর সঙ্গে তার কমই তফাত। তাঁত-বোনা মাকু-ঠেলার কাজ ছাড়লে কবীরের পেট চলা দায় হত। আমাদের সংসার চালাতে হচ্ছে কলম

ঠেলে। রসের সম্পর্ক মাকু-ঠেলার সঙ্গে যত, কলম-ঠেলার সঙ্গেও তত, শুধু কবীর স্বাধীন জীবিকার দ্বারা অর্জন করতেন টাকা, ইচ্ছাসুখে ঠেলতেন মাকু, আনন্দের সঙ্গে কাজ বাজিয়ে চলতেন, আর এখনকার আমরা কাজ বাজিয়ে বাজিয়ে কুঁজো হয়ে পড়লেম তবু কাজী বলছে ঘাড়ে ধরে বাজা, বাজা, আরো কাজ বাজা, না হলে বরখাস্ত। কবীরের তাঁত কবীরকে 'বরখাস্ত' একথা বলতে পারেনি। ঐ যে কবীরের ইচ্ছাসুখে তাঁত-বোনার রাস্তা তারি ধারে তাঁক কল্পবৃক্ষ ফুল ফুটিয়েছিল। এই ইচ্ছাসুখটুকুর মুক্তি কবি, শিল্পী, গাইয়ে, গুণী সবাইকে বাঁচিয়ে রাখে—পয়সার সুখ নয়, কিংবা কাজ ছেড়ে ভরপুর আরামও নয়।

কাজের-কলের বন্দী আমাদের সব দিক দিয়ে এই ইচ্ছাসুখের পথে যেখানে বাধা সেখানে নরকযন্ত্রণা ভোগ করি, উপায় কি? কিন্তু মন—সে তো এ বাধা মানবার পাত্রই নয়। জেলখানার দরজা মন্ত্রবলে খুলে সে তো বেরিয়ে যেতে পারে একেবারে নীল আকাশের ওপারে! সে তো মৃত্যুর কবলে পড়েও রচনা করতে পারে অমৃতলোক! তবে কোথায় নিরাশা, কোথায় বাধা? বিক্রমাদিত্যের দরবারে কবি কালিদাসকেও নিয়মিত হাজ্‌রে লেখাতে হত, কিন্তু এতে করে মেঘরাজ্যের তপোবনে তাঁর বিচরণের কোনো বাধাই তো হয়নি! কবি শিল্পী কেউ কাজের জগৎ ছেড়ে রসকলির তিলক টেনে অথবা জটাজুটে ছাই-ভস্মে একেবারে রসগঙ্গাধর সেজে কেবলি বৃন্দাবন আর গঙ্গাসাগরের দিকে পালিয়ে চলেছেন, তা তো কোনো ইতিহাস বলে না। মৃত্যু দিয়ে গড়া এই আমি-রসের পেয়ালা, শুকনো চামড়ার কার্বা, যার মধ্যে ধরা হয়েছে গোলাপজল, কাজের সুতোয় গাঁথা পারিজাত ফুল—এইগুলোকে তাঁরা জীবনে অস্বীকার করে চলতে চেষ্টা করেননি, উল্টে বরং যারা কাজে নারাজ হয়ে একেবারেই বয়ে যাবার জন্য বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে তাদের ধমক দিয়ে বলেছেন, 'জ্যোঁ কা ত্যোঁ ঠহরো'—আরে অবুঝ, ঠিক যেমন আছ, তেমনি স্থির থাক। কথাই রয়েছে—কারুকার্য। কাজের জটিলতার শ্রম, শ্রান্তি সমস্তই মেনে নিলে তবে তো সে শিল্পী। এই শহরের মধ্যে দাঁড়িয়েই কি আমরা বলতে পারি, রস কোথায়—তাকে খুঁজে পাচ্ছিনে, শিল্প কোথায়—তাকে দেখতে পাচ্ছিনে? ইন্দ্রনীল মণির ঢাকনা দিয়ে ঢাকা এই প্রকাণ্ড রসের পেয়ালা, কালো-সাদা, বাঁকা-সোজা, রং-বেরং কারুকার্য দিয়ে নিবিড় করে সাজানো, এটি ধরা রয়েছে— তোমারো সামনে, তারও সামনে, আমারো সামনে, ওরও সামনে—বিশেষ করে কারু জন্যে তো এটা নয়—জায়গা বুঝেও তো এটা রাখা হয়নি—তবে দুঃখ কোনখানে? ঢাকা খোলার বাধা কি? কত শক্ত শক্ত কাজে আমরা এগিয়ে যাই, এই কাজটাই কি খুব কঠিন আর দুঃসাধ্য হল? ঢাকা খোলার অবসর পেলেম না, এইটেই হল কি আসল কথা? ধর, অবসর পেলেম—পূর্বপুরুষ খেটেখুটে টাকা জমিয়ে গেল, পেটের ভাবনাও ভাবতে হল না,—মেয়ের বিয়েও নয়, চাকরিও নয়, কিংবা আফিস আদালত ইস্কুলগুলোর সঙ্গে একদম আড়ি ঘোষণা করে লম্বা ছুটি পাওয়া গেল—রসের পেয়ালাটার তলানি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবার। কিন্তু এত করে হল কি? লাড্ডুর খদ্দের এত বেড়ে চলল যে দিল্লীর বাদশার মেঠাইওয়ালাও ফতুর হবার জোগাড় হল। অতএব বলতেই হয়, অবসর ও অর্থের মাত্রার তারতম্যে রস পাওয়া-না-পাওয়ার কম-বেশ ঘটছে না, আমার ইচ্ছে-না-ইচ্ছে, কি ইচ্ছে, কেমন ইচ্ছে—এরই উপরে সব নির্ভর করছে, এই ইচ্ছেটাই যা পেতে চাই তাই পাওয়ায়, পথ দেখায় এই ইচ্ছে। নজর বিগড়ে গেছে আমাদের, না হলে শিল্পের আগাগোড়া —তার পাবার শুলুক-সন্ধান সমস্তই চোখে পড়ত আমাদের। কি চোখে চাইলেম, কিসের পানে চাইলেম, চোখ কি দেখলে এবং মন কি চাইলে, চোখ কেমন করে দেখলে, মন কেমন ভাবে চাইলে, চোখ দেখলেই কি না, মন চাইলেই কি না—এরি উপরে পাওয়া-না-পাওয়া, কি পাওয়া, কেমন পাওয়া, সবই নির্ভর করছে।

কাজের উপরে জাতক্রোধ রক্তচক্ষু নিয়ে নয়, সহজ চোখ, সহজ দৃষ্টি—এবং সেটি নিজের,— সহজ ইচ্ছা এবং আন্তরিক ইচ্ছা—এই নিয়ে 'নিয়তিকৃত-নিয়মরহিতা,' হ্লাদৈকময়ী, অনন্যপরতন্ত্রা, নবরসরুচিরা যিনি, তাঁর সঙ্গে শুভদৃষ্টি করতে হয় সহজে। রসের পেয়ালার যদি নাগাল পাওয়া গেল তখন আর কিসের অপেক্ষা? যতটুকু অবসর হোক না কেন তাই ভরিয়ে নিলেম রসে, যেমনি কাজ হোক না কেন তাই করে গেলেম— সুন্দর করে আনন্দের সঙ্গে; যা বললেম, কইলেম, লিখলেম, পড়লেম, শুনলেম, শোনালেম—সবার মধ্যে রস এল, সৌরভ এল, সুষমা দেখা দিলে;—শিল্প ও রস শুকসারীর মতো বক্ষপিঞ্জরে চিরকালের মতো এসে বাসা বাঁধল। কি কবি, কি শিল্পী, কিবা তুমি, কিবা আমি এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে যেদিন অতিথি হলেম, রসের পূর্ণপাত্র তো কারু সঙ্গে ছিল না; একেবারে খালি পাত্রই নিয়ে এলেম, এল কেবল সঙ্গের সাথী হয়ে একটুখানি পিপাসা। আমরা না জানতে মাতৃস্নেহে ভরে গেল আসবাবপত্র—সেই এতটুকু পেয়ালা আমাদের, তারপর থেকে সেই আমাদের ছোট পেয়ালা—তাকে ভরে দিতে কালে-কালে পলে-পলে দিনে-রাতে, এক ঋতু থেকে আর এক ঋতু রসের ধারা ঝরেই চলল, তার তো বিরাম দেখা গেল না;—শুধু কেউ ভরিয়ে নিয়ে বসে রইলেম নিজের পেয়ালা বেশ কাজের সামগ্রী দিয়ে নিরেট করে, কেউ বা ভরলেম পরে সেটা নব-নব রসে প্রত্যেক বারেই পেয়ালাটাকে খালি করে-করে। এই কারণে আমরা মনে করি সৃষ্টিকর্তা কোনো মানুষকে করে পাঠালেন রসের সম্পূর্ণ অধিকারী, কাউকে পাঠালেন একেবারে নিঃস্ব করে। একি কখনো হতে পারে? "রসো বৈ সঃ" বলে যাঁকে ঋষিরা ডাকলেন, তিনি কি বঞ্চক? রাজার মতো কাউকে দিলেন ক্ষমতা, কাউকে রাখলেন অক্ষম করে, শিল্পীর সেরা যিনি তাঁর কি এমন অনাসৃষ্টি কারখানা হবে? কেউ পাবে সৃষ্টির রস, সৃষ্টির শিল্পের অধিকার, আর একজন কিছুই পাবে না? এত বড় ভুল কেবল সেই মানুষই করে যে নিজের দোষে নিজে বঞ্চিত হয়ে বিধাতাকে দেয় গঞ্জনা। সেইজন্য কবীরের কাছে যখন একজন গিয়ে বললে—প্রাণ গেল রস পাচ্ছিনে, কোথা যাই? কি করি? কোন দিকের আকাশে সূর্য আলো দেয় সবচেয়ে বেশি, কোন সাগরের জল সবচেয়ে নীল পরিষ্কার অনিন্দ্যসুন্দর—সে কোন বনে বাসা বেঁধেছে, রস কোন পাতালে লুকিয়ে আছে, বলে দিন—কি উপায় করি? কবীর অবাক হয়ে বললেন—

"পানী বিচ মীন পিয়াসী।
মোহিঁ সুন সুন আওত হাঁসি।"

এক-একবার ঘরের মধ্যে থেকেও হঠাৎ ঘুমের ঘোরে মনে হয় দরজাটা কোথায় হারিয়ে গেছে—উত্তরে কি দক্ষিণে কোথাও ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না। রসের মধ্যে ডুবে থেকে আমাদের রসের সন্ধান, আর শিল্পের হাটে বসে শিল্পলাভের উপায় নির্ধারণ, এও কতকটা ঐরূপ।

পাথরের রেখায় বাঁধা রূপ, ছবির রঙে বাঁধা রেখা, ছন্দে বাঁধা বাণী, সুরে বাঁধা কথা, শিল্পের এসবই তো যে রস ঝরছে দিনরাত তারই নির্মিতি ধরে প্রকাশ পাচ্ছে; অখণ্ড রসের খণ্ড খণ্ড টুকরো তো এরা—একটি আলো থেকে জ্বালানো হাজার প্রদীপ, এক শিল্পের বিচিত্র প্রকাশ! এর অধিকার পাওয়ার জন্য কোনো আয়োজন, কোনো শাস্ত্রচর্চাই দরকার করে না। কাজের জগতের মাঝেই রস ঝরছে—আনন্দের ঝরনা, আলোর ঝোরা; তার গতি ছন্দ সুর রূপ রং ভাব অনন্ত; আর কোথায় যাব—শিল্প শিখতে শিল্পকে জানতে? নীল আর সবুজ এমনি সাত রঙের সাতখানি পাতা তারি মধ্যে ধরা রয়েছে রসশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সঙ্গীত, কবিতা—সমস্তেরই মূলসূত্র ব্যাখ্যা সমস্তই! এমন চিত্রশালা যার ছবির শেষ নেই, এমন বাণীমন্দির যেখানে কবিতার অবিশ্রান্ত

পাগলাঝোরা ঝরছেই, এমন সঙ্গীতশালা যেখানে সুরের নদী সমুদ্র বয়ে চলেছে অবিরাম, এর উপরে রসকে পাবার, শিল্পকে লাভ করবার, আর কী আয়োজন মাটির দেওয়ালের ঘরে করতে পারি? এর উপরে কিবা অভাব আমাদের জানাতে পারি? Artist-এর সেরা, সেরা কারিগরের সেরা—বিঁশ্বকর্মার এই অযাচিত দান, এই নিয়েই তো বসে থাকা চলে,—দেখ আর লেখ, শোন আর বসে থাক।

আর তো কিছুর জন্যে চেষ্টা হয় না, ইচ্ছেও হয় না। এই অপ্রার্থিত অপর্যাপ্ত সৃষ্টি আর রস—একেই বুক পেতে নিয়ে সৃষ্টির যা কিছু—মানুষ থেকে সবাই—চুপচাপ বসে রইল ঘাড় হেঁট করে রসের মধ্যে ডুবে, সেরা শিল্পীর এই কি হল রচনার পরিপূর্ণতা— মুখবন্ধেই হল রচনার শেষ? শিল্পীর রাজা যিনি শুধু একটা জগৎ-জোড়া চলায়মান বায়স্কোপের রচনা করেই খুশি হলেন, জীবজগৎটাকে সোনালি রূপালি মাছের মতো একটা আশ্চর্য গোলকের মধ্যে ছেড়ে দেওয়াতেই তাঁর শিল্প ইচ্ছার শেষ হয়ে গেল? চিত্রকর মানুষ তার টানা রূপগুলির টানে টানে যেমন চিত্রকরের ঋণ স্বীকার করে চলার সঙ্গে-সঙ্গেই চিত্রকরকেই আনন্দ দিতে দিতে আপনাদের সমস্ত ঋণ শোধ করে চলে, তেমনি ভাবেই তো এই বিরাট শিল্পরচনার সৃষ্টি হল, তাই তো এর নাম হল অনাসৃষ্টি নয়,—সৃষ্টি। সৃষ্ট যা, সৃষ্টিকর্তার কাছে ঋণী হয়ে বসে রইল না, এইখানেই সেরা শিল্পীর গুণপনা—মহাশিল্পের মহিমা—প্রকাশ পেলে। শিল্পী দিলেন সৃষ্টিকে রূপ; সৃষ্টি দিয়ে চলল এদিকের সুর ওদিকে, অপূর্ব এক ছন্দ উঠল জগৎ জুড়ে! আমাদের এই শুকনো পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম বর্ষার প্লাবন বুক পেতে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বললে—রসিক, সবই তোমার কাছ থেকে আসবে, আমার কাছ থেকে তোমার দিকে কি কিছুই যাবে না? সবুজ শোভার ঢেউ একেবারে আকাশের বুকে গিয়ে ঠেকল; ফুলের পরিমল, ভিজে মাটির সৌরভ বাতাসকে মাতাল করে ছেড়ে দিলে; পাতার ঘরের এতটুকু পাখি, সকাল-সন্ধ্যা আলোর দিকে চেয়ে সেও বললে—আলো পেলেম তোমার, সুর নাও আমার—নতুন নতুন আলোর ফুলকি দিকে-দিকে সকলে যুগ-যুগান্তর আগে থেকে এই কথা বলে চলল,—তারপর একদিন মানুষ এল; সে বললে—কেবলই নেব, কিছু দেব না? দেব এমন জিনিস যা নিয়তির নিয়মের বাইরের সামগ্রী: তোমার রস আমার শিল্প এই দুই ফুলে গাঁথা নবরসের নির্মিত নির্মাল্য ধর, এই বলে মানুষ নিয়মের বাইরে যে, তার পাশে দাঁড়িয়ে শিল্পের জয় ঘোষণা করলে—

> "নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
> নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধাতি ভারতীকবের্জয়তি ॥"[১]

নিয়মের মধ্যে ধরা মানুষের চেষ্টা, নতুন বর্ণে, নতুন নতুন ছন্দে বয়ে চলল নিয়মের সীমা ছাড়িয়ে ঠিক-ঠিকানার বাইরে। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু দিতে পেরেছে সে তার এই নির্মিতি—যেটা পরিমিতির মধ্যে ধরা ছিল তাকে অপরিমিতি দিয়ে ছেড়ে দিলে অপরিমিত রসের তরঙ্গে।

টীকা

১. ১।১ কাব্যপ্রকাশ—মম্মটভট্ট (অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত)

দৃষ্টি ও সৃষ্টি

"Those organs which guide an animal are under man's guidance and control."—GOETHE.

লক্ষ্য করবার জন্যেই হল চোখ, শব্দ ধরবার জন্যেই হল কান, হাত পা রসনা সব কটাই হল রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ ধরে বিশ্বের চারিদিককে বুঝে নেবার জন্যে। সজীব সব মানুষেরই বুদ্ধির চারিদিকে ইন্দ্রিয় সকল নানা শক্তিশেল নিয়ে খবরদারি কাজে দিনরাত ব্যস্ত রইল, এই হল স্বাভাবিক ব্যাপার; অথচ অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, কিংবা দশরথের শব্দভেদ এমনি নানা রকম ভেদবিদ্যার কৌশল শিক্‌রে পাখি থেকে আরম্ভ করে শিকারী মানুষে যখন লাভ করল, দেখলেম তখন সেই জীব অথবা মানুষ নিজের চোখ কান হাত পা ইত্যাদিকে অস্বাভাবিক রকমে অসাধারণ শক্তিমান করে তুললে;— এই কথাই বলতে হয় আমাদের। ছেলেকে অক্ষর চিনতে শেখালে, বই পড়তে শেখালে তবে সে আস্তে আস্তে চোখে দেখতে পায় কি লেখা আছে, বুঝতে পারে পড়াগুলো, এবং ক্রমে নিজেই রচনা করার শক্তি পায় একদিন হয়তো-বা। যে মানুষ কেবল অক্ষর পরিচয় করে চলল আর যে অক্ষরগুলোর মধ্যে মানে দেখতে লাগল, আবার যে রচনার নির্মাণ-কৌশল ও রস পর্যন্ত ধরতে লাগল এদের তিন জনের দেখা শোনার মধ্যে অনেকখানি করে পার্থক্য যে আছে তা কে না বলবে! কাজেই দেখি—শিল্পই বলো আর যাই বলো কোনো কিছুতে কুশল হয় না চোখ হাত কান ইত্যাদি, যতক্ষণ এদের স্বাভাবিক কার্যকরী চেষ্টাকে নতুন করে সুশিক্ষিত করে তোলা না যায় বিশেষ বিশেষ দিকে—বিশেষ বিশেষ উপায় আর শিক্ষার রাস্তা ধরে। এই শিক্ষার তারতম্য নিয়ে আমাদের সচরাচর মোটামুটি দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদির সঙ্গে শিল্পীর ও গুণীর দেখাশোনার পার্থক্য ঘটে। ছবি কবিতা সুর-সার প্রভৃতি অনেক সময়ে যে আমাদের কাছে হেঁয়ালির মতো ঠেকে তা দুই দলের মধ্যে এই পরখ ও পরশের পার্থক্যবশতই হয়। কথাই আছে—'কবিতারসমাধুর্য্যম্ কবির্বেত্তি'; ঠিক সুরে সুর মেলা চাই, না হলে যন্ত্র বললে 'গা', কণ্ঠ বলে উঠল 'ধা'।

জেগে দেখার দৃষ্টি ধ্যানে দেখার দৃষ্টির সঙ্গে মিলতে তো পারে না, যতক্ষণ না ধ্যানশক্তি লাভ করাই নিজেকে। এইজন্যেই কবিতা সঙ্গীত ছবি এসবকে বুঝতে হলে আমাদের চোখ কানের সাধারণ দেখাশোনার চালচলনের বিপর্যয় কতকটা অভ্যাস ও শিক্ষার দ্বারায় ঘটাতে হয়, না হলে উপায় নেই। মানুষের সৃষ্টি বুঝতে যদি এই নিয়ম হল তবে সৃষ্টিকর্তার রচনাকে পুরো রকম বুঝে-সুঝে উপভোগ করার ক্ষমতা অনেকখানি সাধনার যে অপেক্ষা রাখে তা বলাই বাহুল্য। "The scene which the light brings before our eyes is inexpressively great, but our seeing has not been as great as the scene presented to us; we have not fully seen! We have seen mere happen- ings, but not the deeper truth which is measureless joy."—RABINDRANATH.

মোটামুটি দৃষ্টি,—তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি—এর মধ্যে মোটামুটি রকমের কার্যকরী দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি সমস্ত জীবেরই থাকে; তার উপরে উঠতে হলেই শিক্ষা ও অভ্যাস দিয়ে চক্ষুকর্ণের সাধারণ দেখাশোনার মধ্যে অদল-বদল কিছু-না-কিছু ঘটাতেই হয়। শিক্‌রে পাখি কতবার তার শিকার হারায় তবে তার চোখ এবং ঠোঁট আর আঙুলের নখরগুলো সুশিক্ষিত হয়ে ওঠে মেঘের উপর লক্ষ্যভেদ করতে,—একেই বলে ধরার কায়দা, দেখার কায়দা। এই কায়দা ইন্দ্রিয়সকল লাভ করে অনেক দিনের শিক্ষা ও অভ্যাসে। চা খাবার সময় রুটির টুকরো যখন ফেলে দেওয়া যায়, তখন দেখি কাকগুলো সবাই একই কায়দায় সেগুলো এসে ধরে—মাটিতে রুটি পড়েছে যখন, তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ঠোঁটে করে সেটা টপ করে তুলে নেওয়াই দেখি সব কাকেরই দস্তুর; কিন্তু চিলগুলো সাঁ করে উড়ে এসে মাটিতে রুটি পৌঁছোতে-না-পৌঁছোতে লুফে নিয়ে পালায়। এই নতুন কায়দা আমার সামনে একটা কাককে দিনে দিনে অভ্যাস করে নিতে এই সেদিন দেখলেম এবং লক্ষ্যভেদ বিদ্যার দখলের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কাকের দেখাশোনা চালচলন সমস্তই উল্টেপাল্টে গেল তাও দেখলেম। শুধু ঐ একটুখানি শিক্ষা আর অভ্যাসের দরুন কাকের মোটা দৃষ্টি বা স্বাভাবিক দৃষ্টি ও চালচলনের ওলট-পালট যদি কাকটা না ঘটাত, তবে সব কাকদের মধ্যে সে অর্জুন হয়ে উঠতে পারত না, কিংবা সময়ে সময়ে চিলটিকেও সে হারিয়ে দিতে পারত না রুটির লক্ষ্যভেদের সভায় আন্দাজের পরীক্ষায়। কুরু-পাণ্ডবে মিলে একশো পাঁচ ভাই, দ্রোণাচার্য যখন তাদের আন্দাজের পরীক্ষা নিলেন তখন দেখা গেল একশো চার ভায়ের শুধু চোখই আছে,— দৃষ্টি আছে কেবল একমাত্র অর্জুনের! দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের দিন লক্ষ্যভেদের সময় অর্জুনের এই দৃষ্টিরহস্যের হিসেব আরো পরিষ্কাররূপে পরীক্ষা হয়েছিল। পৃথিবীর ধনুর্ধর একত্র হল স্বয়ংবরে—কৃপ কর্ণ নানা বীর, কিন্তু লক্ষ্যভেদের বেলায় কারো চোখ দ্রৌপদীর রূপের প্রভা দেখলে, কারো দৃষ্টি নিজের গলার মণিহারের চমক লক্ষ্য করলে, কিন্তু লক্ষ্যভেদের যা আসল সামগ্রী সেটা জলের তলায় ঘূর্ণ্যমান সুদর্শনচক্রের প্রতিবিম্বের আড়ালে একটি বিন্দুর আকারে প্রকাশ পাচ্ছিল। সেটার বিষয়ে একেবারেই রাজারা অন্ধ রইলেন, একা অর্জুনের দৃষ্টি সেটা লক্ষ্য করলে ও বিঁধলে। অস্থির হয়ে ভ্রমণ করছে এই দুটি মাত্র আমাদের চোখের দৃষ্টি, একটু অন্ধকারে ঝাপসা দেখে, বেশি আলো পেলেও ঝলসে যাবার মতো হয়, দূরবীন না হলে খুব দূরের জিনিস দেখাই হয় না আমাদের! আবার যখন তিলকে দেখি তখন তালকে দেখি না, তাল দেখতে গেলে তিল বাদ পড়ে যায়। তা ছাড়া দৃষ্টি আমাদের সামনেই চলে, পিঠের দিকে যা ঘটছে একেবারেই দেখা সম্ভব হয় না যে-চোখ এখন আছে তার দ্বারা। ঘড়ি যেমন শুধু ঘণ্টা প্রহর গুণে গুণে আমাদের জানিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারে না, গ্রীষ্মের দিন কি শীতের, অথবা দিন দুই প্রহর কি রাত দুই প্রহর, এটা জানাবার সাধ্যই হয় না যেমন ঘড়ির— যতক্ষণ না ঘড়ির মধ্যে কোনো একটা বিপর্যয় শক্তি সঞ্চার করে দেওয়া হচ্ছে, তেমনি এই চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটু অদল-বদল না ঘটাতে পারলে চোখ আমাদের ওঠা-বসা চলা-ফেরা এমনি কতকগুলো নির্দিষ্ট কাজের সহায় হয়ে যান্ত্রিকভাবে খবরদারি করতেই নিযুক্ত থাকে। নিত্য চলাচলের পক্ষে যতখানি দরকার শুধু ততটুকু দেখাই, দিনরাতের মধ্যে বস্তু ও ঘটনাগুলোর মোটামুটি খবর পৌঁছে দেওয়াই হয় এদের কাজ; এই লোক অমুক, ও অমুক, নকিবের মতো এইটুকু ফুকরে যায় চোখ—অমুকের সম্বন্ধে তন্ন-তন্ন খবর নেবার অথবা দেবার সময় নেই। একটা গাড়ি এল, চোখ কান চট করে সেটা ধরলে—মোটামুটি গাড়ির শব্দ, আর একটা আবছায়া, খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই। গলির মোড়ে একটা ভিড় জমেছে—তার মাঝে পাহারাওলার লাল পাগড়ির লাল রঙের ঝাঁজটা মাত্র লক্ষ্য

করেই চোখ—মায় যার চোখ তাকে নিয়ে—কোন গলি-ঘুঁজি দিয়ে কেমন করে যে একেবারে গড়ের মাঠে হাজির হয় তার কোনো হিসেব দিতে পারে না! খুব বাঁধা ও খুব প্রয়োজনীয় কাজের ভার নিয়ে দরোয়ান ব্যস্ত থাকে; অভ্যাগত লোককে দেউড়ি ছেড়ে দেবার সময় শুধু মানুষটা চেনা কি অচেনা, ছোকরা কি বুড়ো এমনি মোটামুটিভাবেই দেখে নিয়েই তার কাজ শেষ। ঘুমোচ্ছি এমন সময় ঘরে খট করে শব্দ হল, কি গায়ে কিছু স্পর্শ করলে, অমনি কান হাত পা ইত্যাদি চট করে বুদ্ধিকে গিয়ে খবর দিলে—যন্ত্রের মতো সময় অসময় জ্ঞান নেই! ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে নিমেষে নিমেষে চোখ দেউড়ির ঝাঁপ খুলে বাইরেটা উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে আর নোট দিচ্ছে মানুষকে—এ হল তা হল, এ গেল সে গেল, এটা দেখা যাচ্ছে, ওটার খবর এখনো আসেনি! নিত্য নৈমিত্তিক কাজের অনেকখানি এইরকম মোটামুটি যান্ত্রিক রকমের দৃষ্টি দিয়েই চোখ আমাদের সম্পন্ন করে যাচ্ছে, এ ছাড়া অনেকখানি কাজ একেবারে চোখে না দেখে হাত পা ও গায়ের পরশ এবং পরখ দিয়ে একটু, আর সব ইন্দ্রিয়ের পরখের অনেকখানি মিলিয়ে করে চলেছি আমরা। জুতো পরায় জামা পরায়, চোখের পরখের চেয়ে গায়ের পরশ বেশি সাহায্য করে—কোনটা আমার জুতো বা জামা চিনিয়ে দিতে। মানুষের নিত্য জীবনযাত্রার মধ্যে নিবিষ্টভাবে রয়ে-বসে দেখা এত অস্বাভাবিক আর বিরল যে কাজের মধ্যে হঠাৎ থমকে দাঁড়ানো, নয়নভরে কিছু দেখে নেওয়া, স্থির হয়ে কিছু উপভোগ করার সময় পায় না বললেই হয় সাড়ে-পনেরো আনা লোকের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি,— এটা অত্যন্ত অদ্ভুত কিন্তু অত্যন্ত সত্য ঘটনা। এমন ছাত্র নেই যে প্রতি সন্ধ্যায় গোলদীঘির ধারে জমায়েত হয়ে দু-চার ঘন্টা না কাটায়, কিন্তু তাদের প্রশ্ন করো—গোলদীঘিটা গোল না চৌকা? হঠাৎ কেউ উত্তর দিতে পারবে না, গোলদীঘির লোহার রেলিঙ ত্রিশূলের আকার না বর্শার ধরন? একশোর মধ্যে একজন ছাত্র চট করে বলতে পারে কিনা সন্দেহ। একটা রেলিঙ আছে এইটুকুই টুকে আসছে চোখ মনের নোট বইখাতায় যন্ত্রের মতো, রেলিঙের কারুকার্য গড়ন-পেটন নিবিষ্ট হয়ে দেখার প্রয়োজন এবং অবসরের দরকারই বোধ করেনি চোখ। খুব ছোট থেকে খুব বড় বয়সেও আমাদের বুদ্ধির কোঠায় দর্শন স্পর্শন শ্রবণ এরা অহোরাত্র খবর পাঠাচ্ছে; বাইরের ঘটনা বাইরের বস্তুর পরিষ্কার একটি-একটি চুম্বক রিপোর্ট চটপট বুদ্ধির ঘরে টেলিগ্রাম করাই এদের সাধারণ কাজ। রাত পোহাল চোখ ঝাঁপ খুলেই দেখলে আলো হয়েছে, এমনি সঙ্গে সঙ্গে তার গেল বুদ্ধির কাছে—"রাতি পোহাইল, উঠ প্রিয় ধন, কাক ডাকিতেছে কররে শ্রবণ।" সকাল, এই বুদ্ধি অমনি জাগল মানুষের, দ্বিপ্রহরের রোদ চনচনে হয়ে উঠল অমনি স্পর্শন বুদ্ধির কাছে তার পাঠালে "ভানুতাপে তাপিত ধরণী", মধ্যাহ্ন, বুদ্ধি উদয় হল মানুষের। এমনি অষ্টপ্রহর বুদ্ধির তাঁবেদারি করতেই কাটছে দিন দর্শনের স্পর্শনের শ্রবণের! একেবারে ঘড়িধরা এদের কাজ একটু এদিক-ওদিক হলেই মুশকিল—কুয়াশা বেশি হলে, বাদলা ঘন হলে এই প্রহরীরা অনেক সময়ে ঠিক ঠাউরে উঠতে পারে না সকাল কি সন্ধ্যে, টেলিগ্রামে ভুল থেকে যায়, বিছানা ছাড়তে বেলা হয়, ভাত চড়তে তিনটে বাজে, এমনি নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নিত্য কাজে। তখন বার-বার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখতে হয়, নয় তো জানলা খুলে বাইরে উঁকি দিতে হয় ক্রমান্বয়ে। শুনে দেখি, চেয়ে দেখি অথবা পরশ করেই দেখি, সাধারণ মানুষের জীবনে এই তিন দেখার সম্পর্ক হচ্ছে বস্তুজগতের যেগুলো সচরাচর ঘটনা এবং বাইরের যে মোটামুটি খবর তারি সঙ্গে। প্রহরীর কাজ খবরদারির কাজ; এর বেশি কাজ এদের দেওয়ার দরকারই হয় না জীবনে ইতর জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত কারু, অতএব বলতেই হল চোখ কান হাত এমনি সবার স্বাভাবিক কাজ ও অবস্থা হয় চটপট দেখা শোনা ছোঁয়া ও জানা যান্ত্রিকভাবে। চোখে দেখলেম বাইরের পদার্থ তার রূপ রং

ইত্যাদি, পাঁচ আঙুলের পরশ করে দেখলেম সেগুলো; শুনে দেখলেম বাইরের খবরাখবর, এইভাবে জগতের বস্তু ও ঘটনার বুদ্ধিটা বেড়ে চলল মানুষ থেকে ইতর জীব তাবতেরই। মুখ চোখ কান হাত পা সব দিয়ে জীব যেন পড়ে চলল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ—বড় গাছ, লাল ফুল, ছোট পাতা, কিংবা জল পড়ে, হাত নাড়ে, খেলা করে, অথবা নূতন ঘটি, পুরান বাটি, কাল পাথর, সাদা কাপড়—শুধু চোখের পড়া; কিংবা যেমন মেঘ ডাকে, অথবা কাক ডাকিতেছে, বাঁশি বাজিতেছে, বেড়াল কাঁদিতেছে, মা বকিতেছে—শুধু শোনার পড়া; অথবা যেমন—শীতল জল, তপ্ত দুধ, নরম গদি, শক্ত লোহা—শুধু পরশ করার পাঠ। ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে এই উপায়ে সবাই পড়ে চলেছে শিশুশিক্ষা থেকে বোধোদয় পর্যন্ত, এর বেশি পড়া সাড়ে-পনেরো আনা মানুষ দরকারই বোধ করে না সারা জীবনে। বস্তু ও ঘটনার মোটামুটি বুদ্ধি হলেই চলে যায় সুখে স্বচ্ছন্দে প্রায় সকলেরই সাধারণ জীবনযাত্রা এবং এই মোটামুটি বুদ্ধির উদ্রেক করে দেওয়ার কাজে লেগে থাকতে থাকতে দর্শন স্পর্শন ও শ্রবণের শক্তিও এমন ভোঁতা হয়ে যায় যে কোনো কিছুর সূক্ষ্ম দিকে বা গভীর দিকে যেতেই চায় না তারা। শিল্পকার্য সঙ্গীত, এবং কোনো বিষয়ে পটুতা হয় না হতে পারে না ততক্ষণ, যতক্ষণ নানা ইন্দ্রিয়ের নিত্য এবং স্বাভাবিক ক্রিয়ার কতকটা অদলবদল ঘটিয়ে না তোলা যায়। এমন কল সব আজকাল তৈরি হয়েছে যা চোখ যেমন করে দেখে ঠিক তেমনি করেই দেখে ও ধরে নেয় সৃষ্টির সামগ্রী চট করে নিমেষ ফেলতে! স্পর্শ করে কল, স্পর্শ করে শিউরে ওঠে, দুলে ওঠে, গরম ঠাণ্ডার ওজন-মাপে এবং পরশের তন্ন-তন্ন হিসেব লিখে চলে; বাদলা হবে কি ঝড় উঠবে তা বাতাসের পরশ পেয়েই বলে দেয় কল; উত্তর মেরুতে ভূমিকম্প হলে তার হিসেব রাখে দক্ষিণ সাগরের পরপারে বসে কল; আবার কল সে শুনছে, যা শুনছে তা লিখছে, যা লিখছে তা শুনিয়ে দিচ্ছে সুর করে বক্তৃতা দিয়ে আবৃত্তি অভিনয় করে পর্যন্ত। কাপড় কাচ্ছে কল, কাপড় ভাঁজ করে কাঁথা সেলাই করছে কল, দ্রুত দৌড়চ্ছে কল, আকাশে উড়ছে কল! এতে করে মনে হয় এই সমস্ত কল মিলিয়ে একটা কলের পুতুল যদি কোনো দিন ছবি মূর্তি গান ইত্যাদি নানা জিনিসের সমালোচনা করতে এসে উপস্থিত হয় আমাদের মধ্যে তবে খুবই অদ্ভুত হবে সে ঘটনা, কিন্তু আরো অদ্ভুত হবে কলের পুতুলের ছবি মূর্তি গান কবিতা ইত্যাদির সমালোচনা। বস্তুতন্ত্রতা সেই কলের পুতুলে এত অভ্রান্ত রকমে থাকবে যে ছবি যদি প্রতিচ্ছবি, মূর্তি যদি প্রতিমূর্তি, গান যদি হরবোলার বুলি না হয় তো সে তখনি তার নিন্দা ও কঠিন সমালোচনা করে বসবে, কবিতা কল্পনা এসবকে সে বলবে পাগলামি এবং ঠিক এখন সাধারণ মানুষ আমরা যেমন শিল্পশালায়, সঙ্গীতশালায় বা অভিনয়ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে শিল্পকার্য যতটা মেলে ততটা তার বাহবা দিই, একটু বাস্তবিকতার ভ্রান্তি উৎপাদনের ব্যাঘাত হলে বলে বসি ‘দূর ছাই’, কলের পুতুলটিও ঠিক সেই ব্যবহারই করবে। সাধারণত শরীর-যন্ত্রগুলো আমাদের প্রবল বস্তুপরাণয়তা নিয়ে দেখতে শুনতে পরশ এবং পরখ করতেই পাকা হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। সারাজীবন বারে-বারে একই জিনিস দেখে শুনে, পরশ করে পরখ করতে করতে কাজের দক্ষতা এমন বেড়ে যায় হাত পা চোখ কানের, যে মেকি টাকা, ভেজাল ঘি, পাকা ও কাঁচা, সরেস ও নিরেস ছোঁয়া মাত্র দেখা মাত্র শোনা মাত্রই তারা ধরে দিতে পারে; কিন্তু এটুকু হয় শুধু আশপাশের বস্তুগুলোর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়বশত। শরীর-যন্ত্র, নিত্য ব্যবহারের নিত্য কাজের বস্তু ও ঘটনাগুলোর সম্বন্ধে এই অভ্রান্ত বস্তু-পরিচয়ের পাঠ সাঙ্গ করেই থেমে রইল, এই হল সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা দর্শন স্পর্শন শ্রবণ দিয়ে যতটা এগোতে পারি তার চরম পরিণতি। মানুষের দেখা শোনা ছোঁয়া সমস্তই কাজ ও বস্তু এবং বাস্তবিকতার

সঙ্গে লিপ্ত হয়ে রইল, নিখুঁত করে চিনে নিতে পারলে, অভ্রান্তভাবে ধরতে পারলে বাইরের এটা ওটা সেটা, এ ও তা, এমন তেমন ইত্যাদি বস্তু ও ঘটনা—এই যে জ্ঞান একে বলা যেতে পারে বস্তুবুদ্ধি বা বাস্তববুদ্ধি—কিন্তু কিছুতেই একে বলা চলে না বস্তুর রসবোধ শিল্পবোধ সৌন্দর্যবোধ অথবা অর্থবোধ। মানুষের এই বস্তুগত দৃষ্টি চিরদিন তার স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গেই জড়ানো থাকে। নিত্য জীবনযাত্রার সঙ্গে আশপাশ থেকে যারা এসে মিলছে তাদেরই খবর আমরা দিন রাত অভ্রান্তভাবে নিয়ে চললেম এই বস্তুগত দৃষ্টি দিয়ে। ময়রা যেন চমৎকার মিঠাই গড়ে চলল মিঠাইয়ের রসবোধ করার কোনো অপেক্ষা না রেখেও! কিংবা জহুরী রত্ন-পরীক্ষায় এমন পাকা হয়ে উঠল যে হাতে নিয়েই বলতে পারলে সামগ্রীটা কাচ কি হীরে, সরেস কি নিরেস; অথবা শব্দে কান এত পরিষ্কার হল যে কোথা কোমল কোথা বা অতি-কোমল পর্দায় ঘা পড়ছে তা শোনামাত্র ধরে দিলে মানুষ। কিন্তু এই হলেই ময়রার জহুরীর ও কালোয়াতের রসবোধ সৌন্দর্য ও সুষমাবোধ সম্পূর্ণ হয়েছে তা জোর করে বলা চলে না। বস্তু-জগতের সঙ্গে পরিচয় বুদ্ধির দিক দিয়ে ঘটিয়ে দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মানুষকে খুব দক্ষতা চাতুর্য বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা দিয়ে পাকা মানুষ কাজের মানুষ করে দেয় এটা যেমন সত্যি, আবার শুধু গুণগুলি নিয়েই মানুষ গুণী, কবি ও শিল্পী হয় না এটাও তেমনি সত্যি। সুরে কান হলেই যে মানুষ গান রচনা করতে পারে তা নয়, জহরত চিনলেই যে সবাই চমৎকার অলঙ্কার রচনা করতে পারে অথবা ভাল রসকরা গড়ে চললেই সে যে সৃষ্টির রসের রসিক হয়ে ওঠে তাও নয়। বহির্বাটির রাস্তা ঘাট নিয়ম-কানুন সমস্তই যেমন অন্দরমহলের সঙ্গে স্বতন্ত্র তেমনি বুদ্ধির প্রেরণা আর রসবত্তা বিকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। সদর দুয়ার দিয়ে বুদ্ধির কাছে পৌঁছোচ্ছে সৃষ্টির খবরাখবর, চলাচল কোলাহল করে, অবিরাম অস্থিরগতিতে সমস্তই সেখানে যাচ্ছে আসছে—কারো সঙ্গে দু-দণ্ড রসালাপ করার সময় সেখানে অল্পই মেলে! নিত্য দেখা শোনা দ্বারায় ভাল করে মুখচেনা ঘটলেও কিছুর সঙ্গে অবসর মতো রয়ে-বসে রসের সম্পর্ক পাতানো সদর রাস্তা এবং সদর বাড়িতে ক্বচিৎ সম্ভব হয়; এই কারণেই মানুষের ঘর, কাছারি ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘর, বৈঠকখানা, আফিস ঘর এমনি নানা কুঠরিতে ভাগ করা থাকে। অন্দরে অথবা বৈঠকখানার গানের ও নাচের মজলিসে প্রবেশ করতে হলে যেমন আফিসের চোগা চাপকান ছেড়ে উপস্থিত হতে হয়, কাজের দৃষ্টি কাজের কথা মায় কাজকে পর্যন্ত কড়া পাহারায় বাইরে আটকে, তেমনি রসবোধের রাজত্বে ঢোকবার কালে নিত্যকার দর্শন স্পর্শন শ্রবণের অনেকখানি পরিবর্তন করে চলে মানুষ—এটা কেবল মানুষেই পারে, ইতর জীব পারে না। কাজের সংস্পর্শ থেকে কিছুকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চেয়ে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুয়ে-দেখার অভ্যাস চোখ কান ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে দেওয়ার ক্ষমতা অনেকখানি সাধনার অপেক্ষা রাখে, তবে মানুষের শিল্পজ্ঞান রসবোধ জন্মায়। মানুষ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে কখন? প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, শ্রোত্রের সঙ্গে আত্মাকে যখন সে মিলিত করে। মানুষের শরীর-যন্ত্রটাকে জীবনযাত্রার পথে নানা বিঘ্নবিপত্তি থেকে রক্ষা করে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নেবার কাজেই দক্ষ হয়ে উঠল মানুষের ইন্দ্রিয়-কটা নিজের-নিজের পরিপূর্ণ শক্তি অনুসারে; দেখা শোনা ছোঁয়া ইত্যাদি নানা উপায়ে এইটুকুই হল। আর কাজভোলা দৃষ্টি সে হল অনন্যসাধারণ অস্বাভাবিক দৃষ্টি, শিশুকালের তরুণ দৃষ্টি কবির দৃষ্টি শিল্পীর দৃষ্টি। নিত্য কাজের ব্যাপার সরিয়ে একটা জিনিসে গিয়ে মানুষের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ নিবিষ্ট হল নিবিড়ভাবে যখন, তখনই মন পড়ল জিনিসে, এবং মনে ধরা-না-ধরার কথা তখনই উঠল। চোখ কান সমস্তকে কেবলি— পাতা পড়ে জল নড়ে ইত্যাদি কাজের পড়া থেকে ছুটি দিয়ে সৃষ্টির জিনিসের ও ঘটনার দিকে ছেড়ে দেওয়া গেল, এতে মানুষের পরশ ও পরখ করার একটা কৌতূহল দেখা দিলে। কাজের জগতের

বাঁধাবাঁধি নিয়মে দেখা শোনা করতে অপটু থাকে শিশুকালে সব মানুষ স্বভাবতই, বাপ মাকে তারা কাজে খাটায় নিজের ইন্দ্রিয়গুলোর চেয়ে, কাজেই সামান্য সামান্য জিনিসকেও বড় মানুষের চেয়ে বেশি কৌতূহলের সঙ্গে শিশুরা দেখবার শোনবার অবসর পায়, মন তাদের আকৃষ্ট হয় বস্তুর উপর ঘটনার দিকে অনেকখানি এবং মন তাদের খেলেও অনেকখানি অনেক জিনিসের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অগাধ কৌতূহলে। শিশুকালের এই কৌতূহল দৃষ্টির কিছু কিছু রেশ মানুষের বয়সকালেও নানা জিনিস ও ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেখা যায়—চন্দ্রোদয় সূর্যোদয় শুকতারা ফোটা ফুল মেঘের ঘটা বিদ্যুৎ কিংবা এক টুকরো হীরে অদ্ভুত গড়নের ঢেলা অথবা বিচিত্র গড়নের অলঙ্কার কি কিছু অথবা অদ্ভুত একটা সমুদ্রের ঝিনুক ইত্যাদি নানা টুকিটাকি নিয়ে খুব বয়সেও মানুষ অনেক সময়ে নাড়াচাড়া করছে কৌতূহলের বশে দেখা যায়। দক্ষিণাবর্ত শাঁখকে লক্ষ্মীকে ধরে রাখতে খুব কাজের জিনিস বলে দেখা আর কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্মীপেঁচার একটা পালকের চিত্র-বিচিত্র নক্সা দেখা অথবা লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা বোনা কিংবা ঘড়ির ঘণ্টা শোনা ও নুপূরের ধ্বনি শোনায় প্রভেদ হচ্ছে ঐ কৌতূহলটি নিয়ে। তরুণ দৃষ্টিতে সৃষ্টির সামগ্রী কৌতুকে রহস্যে ভরা দেখায়, কাজের সংস্পর্শে বড় হতে হতে মানুষ যতই এগোতে থাকে ততই এই দৃষ্টির তারুণ্য সে হারাতে থাকে এবং শেষে এই সমস্ত বিশ্ব তারি সংসারের কাজে লাগবার জন্যে রয়েছে এমনো একটা বিশ্বাস সে করে ফেলে, বিশ্বে যেটাকে কাজের জিনিস বলে সে নিজে বোধ করে না সেটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চায় না, আর ছবি কবিতা প্রায় সবই বাজের কোঠায় ফেলে দিয়ে চলে মানুষ! স্ত্রী-পুত্র পরিবার পাড়াপ্রতিবেশী এমনকি টেবিল চেয়ারগুলোকেও খালি প্রয়োজনের দেখা প্রয়োজনের সম্পর্ক নিয়ে উপভোগ করে চলেছে এমন শক্ত মানুষ বড় অল্প নেই একথা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু সকালে খবরের কাগজ পড়ার সময় কানের কাছে ছেলেগুলো শুধু-শুধু হৈ চৈ বাধিয়ে দিলে, কিংবা ডিক্সনারির পাতাটা ছিঁড়ে নৌকা বানিয়ে বর্ষার দিনে জলে ভাসালে, অথবা দস্তুর মাফিক সাড়ে-দশটায় ঘড়ির কাঁটা পৌঁছলেই ছেলে ইস্কুলের জন্য তৈরি না হয়ে বিছানায় গিয়ে সটান শুয়ে পড়লে, ছেলে কাজের ব্যাঘাত করলে অকেজো হয়ে রইল কাজের জিনিস নষ্ট করলে এমনি শিশুচরিত্রকে কাজের চশমা দিয়ে উল্টো বুঝে নিজের চোখ কান লাল করে না তোলে এমন মানুষ কমই দেখি। কাজের জগতে চলাচল করতে করতে এই অত্যন্ত কাজের পরকলা এত শক্ত হয়ে আমাদের চোখে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখার উপরে বসে যায় যে মনে হয় চিরদিন এইভাবে দেখে চলাই বুঝি সব মানুষেরই কাজ; কিন্তু অত্যন্ত ছেলেমানুষ যারা তারা আমাদের এই ধারণা উল্টে দিয়ে যায়, কবিরা উল্টে দিয়ে যায়, শিল্পীরা উল্টে দিয়ে যায়, আর ঠিক সেই মানুষগুলিকেই আমরা বালক পাগল নির্বুদ্ধি বলে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার দাবি সপ্রমাণ করে করে চলি। কিন্তু সৌন্দর্যে ভরা, রসে ভরা, রঙে ভরা, রূপে ভরা, ভাব লাবণ্য সব দিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর করে রচনা করা এই সৃষ্টির মাঝে মানুষ কেবল বুদ্ধিমত্তার সত্তা নিয়ে বর্তে থাকবে নয়নভরে কিছু দেখে নিতে চাইবে না, প্রাণভরে মন দিয়ে কিছু শুনে যেতে চাইবে না, পরশ করে পুলকিত হতে চাইবে না, মানুষ সমস্ত বিশ্বের রস, এ যিনি মানুষকে মন দিয়ে সৃষ্টি করলেন তাঁর ইচ্ছে কখনো হতে পারে না। এবং এই কথাই সপ্রমাণ করতে প্রথমেই এল কাজ-ভোলা কাজ-ভোলানো শিশু খুব কাজের জগতে অফুরন্ত কৌতূহল অকারণ হাসি কান্না ইত্যাদি নিয়ে। সেই শিশু, দিন রাত কাজে-কর্মে ভরা মানুষের ঘরের মধ্যে এসে তার কৌতুক কৌতূহল যারা জাগাল—মাটির ঢেলা, কাঠের টুকরো—তাদের নিয়ে নিরিবিলি আপনার খেলাঘর বাঁধলে—কল্পনা পক্ষিরাজের অতি অপূর্ব আস্তানা, সেখানে কাজ হয়ে গেল একেবারে

খেলা, খেলাই হয়ে উঠল মস্ত কাজ! কিন্তু কাজের জগৎ সেই শিশুর উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, শিশুকাল যেমন শেষ হতে থাকল অমনি কাজও কোনো কোনো শিশুকে আস্তে আস্তে আপনার ঘরের দিকে টেনে নিতে লাগল, একটু একটু করে খেলাঘর ভেঙে গেল এবং কচি ছেলেকে কাজের যন্ত্রতন্ত্রগুলো দাঁতে চিবিয়ে ছোবড়া বানিয়ে ছেড়ে দিলে। আবার কোনো ছেলেকে কাজ তেমন করে জোরে ধরতে পারলে না, কিংবা কোনো ছেলেটা কাজে পড়েও বাজের সাধনা অনেকখানি করে চলল, তারাই কাজের চাবুক এড়িয়ে গিয়ে কিংবা সরে গিয়ে হয়ে উঠল ভাবুক, অদ্ভুত কৌশলে তারা তাদের চোখে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখা ইত্যাদি যে অত্যন্ত কাজের আফিস জোড়া তাদের পিঠে পক্ষিরাজের ডানা জুড়ে দিয়ে কাজ বাজাতে না গিয়ে, বাঁশি বাজাতে বেরিয়ে পড়ল জগতে। শিশুকালের হারানো চমৎকারি কাচ অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে সেইটে বার করে সাদাসিধে কাজের চোখে-দেখা শুনে-দেখা ছুঁয়ে-দেখার উপরে যেমনি বেশ করে এঁটে দিলে মানুষ, অমনি স্বর্গ মর্ত পাতাল আবার তার কাছে তরুণ হয়ে দেখা দিলে, কৌতুকে কৌতূহলে ভরে উঠল সৃষ্টির সামগ্রী! যেসব ইন্দ্রিয় কেবলি হিসেবের কাজে, পাহারার কাজে লেগেছিল তারা হয়ে উঠল কৌতূহলপরায়ণ এবং সন্ধানী, দিনের পর দিন বস্তুকে নিয়ে ঘটনাকে নিয়ে উল্টে-পাল্টে খেলতে আর দেখতে অথবা শুনতে লেগে গেল; শুধু 'জল নড়ে ফল পড়ে' এ পড়ায় আর রুচি হল না, কেমন করে জল চলছে, কেমন করে ফুল ফুটছে ঝরছে, কিবা সুরে পাখি গাইছে, আকাশের তারা কেমন করে চাইছে ইত্যাদি কেমন তা জানার আগ্রহ এবং চেষ্টা জেগে উঠল। সাদাসিধে রকমের বুদ্ধির চাষ করে চলাতেই চোখে-দেখা শুনে-দেখা ছুঁয়ে-দেখা বদ্ধ রইল না। চঞ্চল দৃষ্টি এ-ফুলে ও-ফুলে এখনো উড়ে পড়তে লাগল বটে, কিন্তু হঠাৎ দৃষ্টির চঞ্চলতার মধ্যে এক একটা সম্ আর ফাঁক পড়তে লাগল, প্রজাপতি যেন হঠাৎ ডানা দুখানা স্থির করে আলোর পরশ, ফুলের পাপড়ির রং এবং ফুলের ভিতরকার কথা ধরবার চেষ্টা করতে থাকল! দর্শন স্পর্শন শ্রবণের যান্ত্রিকতা কতকটা দূর হয়ে তাদের মধ্যে আন্তরিকতা একটু যেন বিকশিত হল। যেসব শরীর-যন্ত্রের কাজই ছিল বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাইরের প্রেরণায় চটপট সাড়া দেওয়া নির্বিচারে, অন্তরের সঙ্গে মানুষ যেমনি তাদের মুক্ত করে দিলে অমনি ভিতরকার প্রেরণায় তারা ধীরে সুস্থে একটুখানি যত্নের সঙ্গে একটু কৌতূহল নিয়ে যেন আত্মীয়তা পাতাতে চলল বাইরের এটা ওটা সেটার সঙ্গে, একটু দরদ পৌঁছল দেখা শোনা ছোঁয়ার মধ্যে। এ একটা মস্ত ওলট-পালট ঘটল হাত পা চক্ষু কর্ণের কাজের স্বাভাবিক ও যান্ত্রিক ধারায়—উজান টান ধরল যমুনায়। ফুলের পাতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সাড়া ধরার জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্রের যে যন্ত্রটা, সেটা থেকে থেকে আনমনে যদি ফুলের এবং পাতার শোভা নিরীক্ষণ করতে আরম্ভ করে কাজ ভুলে, তবে নিশ্চয়ই সবাই বলবে যন্ত্রটা বিগড়েছে—যেভাবে দেখা যেভাবে শোনা যন্ত্রটার উচিত ছিল তা করছেনা। কিন্তু যন্ত্রের ঐরূপ ব্যবহার দেখে একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর বিপর্যয় শক্তি যে যন্ত্রটা লাভ করেছে তা কারু অগোচর থাকবে না। তেমনি ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ ক্রিয়ার মধ্যে নিরূপণ-ইচ্ছা নিবিষ্ট হবার চেষ্টা যারা ঘটায় অভ্যাস শিক্ষা ও সাধনার দ্বারায়, বলতেই হবে সেইসব মানুষের দেখা শোনা সমস্তই অনন্যসাধারণ বা অসামান্য রকমের একটা শক্তি পেয়েছে। এই যে কৌতূহল-প্রবণতা, দরদ দিয়ে সব জিনিস দেখার অভ্যাস, কাজের দেখার প্রায় বিপরীত উপায়ে সৃষ্টির জিনিসকে আলিঙ্গন করে পরখ করা, ছেলেবেলাকার হারিয়ে-যাওয়া খেলাঘরের কাজ-ভোলা দৃষ্টি—একে ফিরে পাওয়া দরকার কি না, এ নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদ দেখা যায় কিন্তু একদিনও মানুষ একটিবার সেই ছেলেবেলার দেখা শোনা খেলাধুলোর মধ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছা করলে না এমন ঘটনা মানুষে বিরল। চেষ্টা

করলেই ছেলেবেলার সেই কাজ-ভোলা হারানো দৃষ্টি যে ফিরে পাওয়া যায় তা নয়। নাসার ডগায় দৃষ্টি স্থির করলেও, চাঁদ তারা মেঘ অথবা সূর্যের দিকে উদয়াস্ত হাঁ করে চেয়ে থাকলেও অথবা খাঁচায় কোকিল পুষে তার গান দিন রাত শুনে এবং দক্ষিণ বাতাসকে চাদর উড়িয়ে ছুঁয়েও যোগীর এবং ভাবুকের দৃষ্টি পাচ্ছে না কত যে লোক তার ঠিকানা নেই। শখ করে নানা শৌখিন জিনিসের সাজসজ্জার দিকে অথবা বিচিত্রা এই বিশ্বপ্রকৃতির শোভা সৌন্দর্যের দিকে চাওয়া হল বিলাসীর চাওয়া। বেতাল পঁচিশের ভোজনবিলাসী শয্যাবিলাসী এরা সাতপুরু গদির তলায় একগাছি চুল, রাজভোগ চালে শবগন্ধ অতি সহজেই ধরতে পারত, কিন্তু বিলাসীর দেখা প্রকাণ্ড রকম স্বার্থ নিয়ে দেখা, অত্যধিক মাত্রায় কাজের দেখা এ দৃষ্টি ভাবুকের দৃষ্টি কিংবা কাজ-ভোলা শিশুর সরল দৃষ্টি একেবারেই নয়, অতিমাত্রায় বস্তুগত দৃষ্টিই এটা! এই ইন্দ্রিয়পরায়ণ দৃষ্টি নিয়ে শয়নবিলাসী ভোজনবিলাসী দুটোতে মিলে বাসকসজ্জার কবিতা লিখতে চেষ্টা করলে যা হত তা এই—

"সুন্দরীর সহচরী ভাল জানে চর্য্যা।
রতন মন্দিরে করে মনোহর শয্যা॥
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুই ধারি।
ডৌল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকন মশারি॥
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা জাতি মণ্ডা মনোহরা।
সরভাজা নিখতি বাতাসা রসকরা॥
অপূর্ব সন্দেশ নামে এলাইচ্‌দানা।
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা॥"

চিনির পানা কপূর চন্দন কালাগুরু বিছানা-বালিশ লেপ-তোশক ইত্যাদি দিয়ে যে ত্রিপদী চৌপদী, সেগুলো কবিতা কিংবা ভাবের তিন পায়া চার পায়া টেবিল চৌকি বললেও বলা চলে। বিলাসীর দৃষ্টির সঙ্গে ভাবুকের দৃষ্টির কোনখানে যে তফাত তা স্পষ্ট ধরা যাবে দুই ভাবুকের লেখা বাসকসজ্জার বর্ণন দিয়ে; যথা—

"অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, ধনী সাজয়ে
পুনঃ পুনঃ উঠয়ে চকিত॥"

ধুয়োতেই, ভাব-সচকিত চাহনি নিভৃত নিকুঞ্জের অপরূপ শোভা মনকে দুলিয়ে দিলে; আবার যেমন—

"আজ রচয়ে বাসক শেজ,
মুনিগণ চিত হেরি মুরছিত
কন্দর্পের ভাঙ্গে তেজ।
ফুলের অচির, ফুলের প্রাচীর
ফুলেতে ছাইল ঘর,
ফুলের বালিশ আলিস কারণ
প্রতি ফুলে ফুলশর॥"

বিলাসীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ল ভাল ভাল কাজের সাজ-সরঞ্জাম যা টপ করে গিলে খেতে ইচ্ছে হয় তাই, আর ভাবুকের দৃষ্টিতে ধরা গেল সেইগুলো যাদের দিকে নয়নভরে দুদণ্ড চেয়ে দেখতে সাধ হয়। বিলাসীর দৃষ্টি

স্বার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে সৃষ্টির যথার্থ শোভা সৌন্দর্য ও রসের বিষয়ে মানুষটাকে বাস্তবিকই অন্ধ করে রাখে অনেকখানি, আর ভাবুকের দৃষ্টি কাজ-ভোলা ছেলেবেলার দৃষ্টি সৃষ্টির অপরূপ রহস্যের খুব গভীর দিকটায় নিয়ে চলে মানুষকে। কাজেই ভাবুকের শোনা-দেখা বলা-কওয়ার মধ্যে শিশুসুলভ এমনতরো সরলতা ও কল্পনার প্রসার থাকে। ভাবুকদৃষ্টি এত অপরূপ অসাধারণভাবে দেখে-শোনে, দেখায়-শোনায়, যে কাজের মানুষের দেখা-শোনা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে ভাবুকের চোখে দেখা ছবি কবিতা সমস্তই হেঁয়ালি বা ছেলেমান্‌ষির মতোই লাগে। কাজের দৃষ্টি নিয়ে মানুষের মন কোনখানে কি ভাবেই বা খেলা করছে, আর ভাবুকের দৃষ্টি নিয়েই বা মন কোথায় কি খেলছে কেমন করে, দেখলেই দুয়ের তফাত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমে কাজের কাজীর দেখা দিয়ে লেখা মনের খেলাঘরের দৃশ্য—

"মন খেলাওরে দাণ্ডা গুলি
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল,
চম্পাকলী ধুলা ধুলী।"

এইবার ভাবুকের দৃষ্টি কবির মনটিকে কোন কাজ-ভোলা জগতের খেলাঘরের ছুটির মাঝে ছেড়ে দিয়ে গেল তারি দুটি গান—

"আকাশে আজ কোন চরণের আসা-যাওয়া,
বাতাসে আজ কোন পরশের লাগে হাওয়া,
অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল-বাণী,
আজ উদাসীর বাঁশীর সুরে কে দেয় আনি,
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া।

কোন ফাগুনে যে ফুল ফোটা হল সারা,
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা,
বকুল তলায় কাজ-ভোলা সেই কোন্ দুপুরে,
যে সব কথা ভাসিয়েছিলেম গানের সুরে,
ব্যথায় ভরে ফিরে আসে সে গান গাওয়া।"

কাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাঝে মনের মরুভূমির উপরে যেন হঠাৎ আকাশ থেকে শ্যামল ছায়া নামল, জল ভরে এল চোখের কোণে, কান শুনলে বাঁশীর সুর উন্মনা হয়ে, কাজ-ভোলা মন বকুলতলার নিবিড় ছায়ায় খুঁজতে লাগল ছেলেবেলার হারানো খেলার সাথীকে, আর গাইতে লাগল ক্ষণে-ক্ষণে—

"শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা।
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।"

এমনিতরো ভাবুক দৃষ্টি দিয়ে সব মানুষের শিশুকাল সৃষ্টির যা কিছু—আকাশের তারা থেকে মাটির ঢেলাটাকে পর্যন্ত—একদিন দেখে চলেছিল, কিন্তু অবোলা শিশুকাল আমাদের কেমন দেখলে কেমন শুনলে সেটা খুলে বলতে পারলে না, এঁকে দেখাতে পারলে না! কবিতা ছবি ইত্যাদি লেখার কৌশল, ভাষার খুঁটিনাটি,

ছন্দের হিসেব না জানার দরুন শিশুকাল আমাদের কবির ভাষায় ছবির ভাষায় আপনাকে ব্যক্ত করতে পারলে না। শিশুর তরুণ দৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টির সামগ্রীকে সখীভাবে খেলাবার সাথী বলে চেয়ে দেখবার শুনে দেখবার ছুঁয়ে দেখবার একটা আগ্রহ থাকে, সেই একাগ্রতা দিয়ে দেখা শোনা ছোঁয়ার রসটা ছেলেমেয়েরা উপভোগ করে মহানন্দে, কিন্তু সে আনন্দ ব্যক্ত করে কেবল অভিনয় ছাড়া আর কিছু দিয়ে এমন সাধ্য শিশুর পুঁজি নিয়ে হয় না। শিশু যখন একটা কিছু বর্ণনা করে তখন তার মুখ চোখ হাত পা সমস্তই যেন ঘটনাটাকে মূর্তি দিয়ে বাইরে হাজির করবার জন্যে আকুলি ব্যাকুলি করছে দেখা যায়, যেটা বড় হয়ে আমরা কবিতায় অথবা ছবিতে ব্যক্ত করি সেটা অভিনয় করে ব্যক্ত করা ছাড়া শিশুকাল আর কিছুই করতে পারে না; এমন বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে কেঁদে নেচে, কখন গলা জড়িয়ে, কখন ধুলায় লুটিয়ে, আধ-আধ কথায় অতি মনোহর অতি চমৎকার একটা নিজের অদ্ভুত রকমে সৃষ্টি-করা ভাষায় শিশু আপনার দেখা শোনা সমস্তই ব্যক্ত করে চলে যে, বড় হয়ে যারা আপনাদের দৃষ্টি শ্রবণ স্পর্শনের উপরে অত্যন্ত কাজের চশমা এঁটে দিয়েছে তাদের বোঝাই মুশকিল হয় শিশুকাল অনাসৃষ্টি কি দেখছে, কিবা দেখাতে চাচ্ছে, কি শুনছে কিবা শোনাচ্ছে! শিশুর হৃদয় যেভাবে গিয়ে স্পর্শ এবং পরখ করে নেয় বিশ্বচরাচরকে, একমাত্র ভাবুক মানুষই সেইভাবে বিশ্বের হৃদয়ে আপনার হৃদয় লাগিয়ে দেখতে পারেন শুনতে পারেন, এবং অবোলা শিশু যেটা বলে যেতে পারলে না সেইটেই বলে যান ভাবুক কবিতায় ছবিতে,—রেখার ছন্দে লেখার ছন্দে সুরের ছন্দে অবোলা শিশুর বোল, হারানো দিনগুলির ছবি। অফুরন্ত আনন্দ আর খেলা দিয়ে ভরা শিশুকালের দিন-রাতগুলোর জন্যে সব মানুষেরই মনে যে একটা বেদনা আছে, সেই বেদনা ভরা রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে চলেন মানুষের মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক—যাঁরা শিশুর মতো তরুণ চোখ ফিরে পেয়েছেন। খুব খানিকটা ন্যাকামোর ভিতর দিয়ে নিজেকে এবং নিজের বলা-কওয়াগুলোকে চালিয়ে নিয়ে গেলেই আমাদের সৃষ্টির ও দৃষ্টির মধ্যে তারুণ্য ফিরে পাওয়া সহজেই যাবে এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা—শিশুকাল ন্যাকামি দিয়ে আপনাকে ব্যক্ত করে না, সে যথার্থই ভাবুক এবং আপনার চারিদিকে সে সত্যই হৃদয় দিয়ে ধরতে চায় বুঝতে চায় এবং বোঝাতে চায় ও ধরে দিতে চায়। শুধু সে যা দেখে শোনে সেটা ব্যক্ত করার সম্বল তার এত অল্প যে, সে খানিকটা বোঝায় নানা ভঙ্গি দিয়ে, খানিক বোঝাতে চায় নানা আঁচড়-পোঁচড় নয় তো ভাঙা-ভাঙা রেখা লেখা ও কথা দিয়ে,—এইখানে কবির সঙ্গে ভাবুকের সঙ্গে পাকা অভিনেতার সঙ্গে শিশুর তফাত। দৃষ্টি দুজনেরই তরুণ কেবল একজন সৃষ্টি করার কৌশল একেবারেই শেখেনি, আর একজন সৃষ্টির কৌশলে এমন সুপটু যে কি কৌশলে যে তাঁরা কবিতা ও ছবির মধ্যে শিশুর তরুণ দৃষ্টি আর অস্ফুট ভাষাকে ফুটিয়ে তোলেন তা পর্যন্ত ধরা যায় না।

ন্যাকামো দিয়ে শিশুর আবোল-তাবোল আধ-ভাঙা কতকগুলো বুলি সংগ্রহ করে, অথবা শিশুর হাতের অপরিপক্ক ভাঙাচোরা টানটোন আঁচড়-পোঁচড় চুরি করে বসে বসে কেবলি শিশু-কবিতা শিশু-ছবি লিখে চললেই মানুষ কবি শিল্পী ভাবুক বলাতে পারে নিজেকে এবং কাজগুলোও তার মন-ভোলানো হয়, এ ভুল যারা করে চলে তারা হয়তো নিজেকে ভোলাতে পারে কিন্তু শিশুকেও ভোলায় না, শিশুর বাপ-মাকেও নয়। ছেলে-ভুলানো ছড়া একেবারেই ছেলেমান্‌ষি নয়, তরুণ দৃষ্টিতে দেখা শোনার ছবি ও ছাপ সেগুলি—

> "ও পারেতে কাল রং, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্
> এ পারেতে লঙ্কা গাছ রাঙা টুক্ টুক্ করে
> গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে!"

অজানা কবির গান ছেলেমানুষি মোটেই নয়, এতে ছেলে বুড়ো সবার মন ভুলিয়ে নেয়। আমাদের খুব জানা কবি এই সুরেই সুর মিলিয়ে বাঁধলেন এরি মতো সরল সুন্দর ভাষায় ও ছন্দে আপনার কথা—

“ওই যে রাতের তারা
জানিস্ কি মা কারা?
সারাটি-খন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমন ধারা।
আমার যেমন নেইক ডানা
আকাশেতে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,
তেমনি ওদের পা নেই বলে
পারে না যে আসতে চলে
এই পৃথিবীর পরে।”

আমাদের তরুণ-চোখের নয়নতারা একদিন আকাশের তারার দিকে চেয়ে সেসব কথা ভেবেছিল, কিন্তু যে ভাবনা ব্যক্ত করতে পারেনি আমাদের শিশুকাল, এতকাল পরে সেই ভাবনা ফুটে উঠল কবির ভাষায়।

কাজের চশমা পরানো দৃষ্টি যেটা বড় হয়ে অবধি মানুষ দর্শন স্পর্শন শ্রবণের উপরে লাগিয়ে চলাফেরা করছে, সেটার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিয়ে চললে তারাগুলো মিটমিটে আলোর কিংবা খুব মস্ত মস্ত পৃথিবীর মতোও দেখায়, কিন্তু আকাশের তারার মাটিতে নেমে আসা দেখা অথবা আকাশে বসে তারাগুলো যে কথা ভাবছে সেটা শুনিয়ে দেওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না উক্ত চশমা দিয়ে দেখে। ভাবুক যাঁরা, সচরাচর যান্ত্রিক দৃষ্টি যাঁদের নয়, তাঁদেরই পক্ষে সহজ হয় শিশুদের মতো হৃদয় দিয়ে আত্মীয়ভাবে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে বিশ্বের গোপন কথা বলা, আর গদ্যময় কাজের সাধারণ চশমা দিয়েই দেখলেম অথচ দেখতে চাইলেম ভাবুকের মতো গাঁথতে চাইলেম পদ্য—কিন্তু পদ্য কেন, ভাল একটা গদ্যও রচা গেল না সেই যান্ত্রিক দৃষ্টি নিয়ে—কল্পনা ভাবুকতা এ সবের বদলে সাধারণ কথা এবং কাজের কথাই সেখানে বিকট ছাঁদে আমাদের সামনে হাজির হল; যথা—

“মন্ত্রী রূপে চারিদিকে যত তারাগণ
ঘেরিয়াছে নলিনীরে শৈবাল যেমন।
শশী আর তারাবৃন্দ গগনে শোভিত
দেখিলেই মনোপথ হয় প্রফুল্লিত॥’

চাঁদকে ঘিরে তারাগুলো যখন সারারাত কি যেন মন্ত্রণা করছিল, নিশ্চয়ই এই কবিতার কবি সেই সময় লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছিলেন, নয় তো খুব কাজের চশমা পরে মকদ্দমার নথি পড়ছিলেন। সুতরাং ‘মনোপথ’ যাতে ‘প্রফুল্লিত’ হয় এমন একটা সামগ্রী তিনি দিয়ে যেতে পারলেন না, কিন্তু ধরতেই পারলেন না চোখ কান হাত পা কিছু দিয়েই।

‘ভোলা’ ‘বাঁকা’ হিন্দুস্থানীতে এ দুটোর অর্থ সুশ্রী, আবার কুবজাও বাঁকা শ্যামও বাঁকা, একজন সুন্দর বাঁকা একজন যকুচ্ছিত বাঁকা; তেমনি একথা যদি কেউ বোঝেন যে, সব জিনিসকে সোজাসুজি সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে না দেখে বাঁকা রকম করে দেখলেই কিংবা উল্টো-পাল্টা করে দেখালেই নিজের দৃষ্টির মধ্যে এবং নিজের বলা কওয়া লেখা ইত্যাদির মধ্যে ভাবুকতা রস সৌন্দর্য প্রভৃতি ভরে উঠবে কানায় কানায়, তবে তার মতো ভুল আর কিছু হবে না।

ভাবুকের কাজ-ভোলা দৃষ্টি অত্যন্ত কাজের সামগ্রী। ধানক্ষেতটা ঠিক কাজের মানুষ হিসেবে না দেখলেও ক্ষেত ও মাঠের সৌন্দর্য যে নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে তার কাছে ধরা পড়ে এবং সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখা মাঠের বর্ণনা ও ছবি খুব কাজের চশমা দিয়ে দেখা ও দেখানো মাঠের রূপটার চেয়ে মনোরম পরিষ্কার হয়ে যে ফুটে ওঠে ভাবুকের লেখায় বর্ণে বর্ণে, তা এই কাজের চশমা আর ভাবের চশমা দিয়ে দেখা ক্ষেত আর মাঠের দুটির বর্ণনা থেকে পরিষ্কার ধরা যাবে।

প্রথম কাজের চশমা দিয়ে মাঠ বর্ণন, মাস্টারমশায় যেন উপদেশ দিলেন শিশুকে— যে মাঠে ছুটাছুটিই করতে চায় তাকে—

“হে বালক! মাঠে গিয়ে দেখে এস তুমি
কত কষ্টে চাষা লোক চষিতেছে ভূমি॥
পরিপাটি করে মাটি হ’য়ে সাবধান
তবে তায় শস্য হয়—ছোলা মুগ ধান॥”

এই কাজের দৃষ্টি দিয়ে মাঠকে তো দেখাই গেল না, শস্য কেমন করে হয়, মাটি পরিপাটি হয় কিসে, তাও দেখলেম না; মাটি পরিপাটিরূপে বর্ণন ও দর্শন কি করে হয় তা জানতে কাজেই ভাবুকের কাছে দৌড়োতেই হল আমাদের। সেখানে গিয়ে শস্যক্ষেত্রের এক অপরূপ রূপ দেখলেম—

“নবপ্রবালোদগমশস্যরম্যঃ প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্কশালিঃ বিলীনপদ্ম প্রপতত্তুষারঃ”[১] কিংবা যেমন—

“পরিণত-বহুশালি-ব্যাকুল-গ্রাম-সীমা
সততমতিমানজ্ঞক্রৌঞ্চনাদোপগীতঃ॥”[২]

নিছক কাজের দৃষ্টি দিয়ে কাজের মানুষের কাছে মাঠখানা কৃতিত্বের ও নীতিশাস্ত্রের বইয়ের পাতার মতোই দেখাল, মাঠের সবুজ প্রসার কেমন করে গ্রামের কোন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তা দেখলে ভাবুক। কাজের দৃষ্টি দেখলে মুগ মুসুরী ছোলা কলা ধান ফলানো হচ্ছে মাঠের পাট করে, কিন্তু ধান পেকে কোথায় সোনার মতো ঝকছে, লোধ্র গাছ গ্রামের ধারে কোথায় ফুল ফুটিয়েছে, রাঙা সবুজ নানা বর্ণের শস্য, শিশিরে নুয়ে পড়া পদ্মফুল এসব কিছু ধরতে পারলে না অত্যন্ত কাজের কাজী দৃষ্টিটা, অথচ মাঠের ছবি যথার্থ যদি দিতে হয় কি দেখতে হয় মাঠ কেমন করে চষা হয় এটা দেখানোর চেয়ে মাঠে কোথায় কি রঙ লেগেছে কি ফুল ফুটেছে ইত্যাদি নানা হিসেব না নিলে তো চলে না, সে হিসেবে ভাবক দৃষ্টি ঠিক দেখার মতো দেখাই দেখলে বলতে হবে।

কাজের দৃষ্টি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে দৃষ্টির জিনিসকে জড়িয়ে দেখে, আর ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিঃস্বার্থভাবে সৃষ্টির সামগ্রী স্পর্শ করে। কাজের মানুষের দেখে কেম্বিসটা পর্দা কি ব্যাগ অথবা জাহাজের পাল প্রস্তুতের বেশ উপযুক্ত, কিন্তু ভাবুক অমন মজবুত কাপড়টা একটা ছবি দিয়ে ভরে দেবারই ঠিক উপযোগী

ঠাউরে নেয়। সাদা পাথর, কাজের দৃষ্টি বলে সেটা পুড়িয়ে চুন করে ফেল, ভাবুক দৃষ্টি বলে সেটাতে মূর্তি বানিয়ে নেওয়াই ঠিক। নির্মম স্বার্থদৃষ্টি, কাজের চোখ নিয়েই সাধারণ মানুষ নিজের মুঠোয় ফুটন্ত ফুলগুলোর গলা চেপে ধরে বলির পাঁঠার মতো, সেগুলোকে বাগানের বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পুজোর ঘরের দিকে চলে, আর ভাবুক যে দৃষ্টি নিয়ে ফুলের দিকে চায় তাতে স্বার্থের ভার এত অল্প যে প্রজাপতি কি মৌমাছির পাতলা ডানার অত্যন্ত লঘু অতি কোমল পরশও তার কাছে হার মানে। অতিমাত্রায় সাধারণ অত্যন্ত কাজের দৃষ্টি সেটা ফুলের গুচ্ছকে পরকালের পথ পরিষ্কারের ঝাঁটা বলেই দেখছে, ছেলেবেলার কৌতূহল-দৃষ্টি সেটা রাঙা ফুলের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে ডাকাতের মতো বাগান থেকে বাগানের শোভাকে লুটে নিয়ে খেলতে চাচ্ছে। কিংবা বিলাসের দৃষ্টি যেটা ফুলগুলোর বুকে সূঁচ বিঁধে বিঁধে ফুলের ফুলশয্যা রচনা করে তার উপরে লুণ্ঠন বিলুণ্ঠন করে ফুলের শোভা মলিন করে দিয়ে যাচ্ছে। এদের চেয়ে ভাবুকের দৃষ্টি কতখানি নিঃস্বার্থ নির্মল অথচ আশ্চর্যরকম ঘনিষ্ঠভাবে ফুলকে দেখলে, ভাবুকের লেখাতেই ধরা রয়েছে—

"চল চলরে ভঁবরা কঁবল পাস
তেরা কঁবল গাবৈ অতি উদাস।
খোঁজ করত বহ বার বার
তন বন ফুল্যৌ ভার ভার॥"
—কবীর।

কবি কালিদাস এই দৃষ্টি দিয়েই দুষ্মন্ত রাজাকে দেখালেন শকুন্তলার রূপ—

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মনং কররুহৈ....মধুনবমনাস্বাদিতরসম্!"[৩] কিন্তু রাজার বিদূষকের ইন্দ্রিয়পরায়ণ দৃষ্টি অত্যন্ত মোটা পেটের মতোই মোটা ছিল, কাজেই রাজার কাছে শকুন্তলার বর্ণন শুনে সে পিণ্ডি খেজুর আর তেঁতুলের উপমা রাজাকে শোনাতে বসে গেল। রাজা বিদূষককে ধমকে বললেন—

"অনবাপ্তচক্ষুঃফলোহসি যেন ত্বয়া দ্রষ্টব্যানাং পরং ন দৃষ্টম॥"[৪]

তুমি দর্শনীয় বস্তুর যেটি দেখবার যোগ্য সেইটি যখন দেখতে পেলে না তখন তুমি বিফলই চক্ষু পেয়েছে।

রাবণটার চেয়ে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখা সমস্তই রামের দেখার চেয়ে দশ গুণ বেশি ছিল—

"কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটা বদন।
রাক্ষসের রাজা সেই লঙ্কার রাবণ।
ত্রিভুবন তাহার ভয়েতে কম্পবান
মনুষ্য রামেরে সেটা করে কীটজ্ঞান।"

রাবণের দশটা মাথার মধ্যে কি ভয়ঙ্কর রকম বস্তুগত বুদ্ধিই দিনরাত প্রবেশ করত তার দশ দিকে বিস্তৃত দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদির রাস্তা ধরে, ভাবলেও অবাক হতে হয়। কিন্তু সীতার পণ ভাঙা সুসাধ্য হল বালক রামের—কুড়ি-হাত রাবণের নয়। কেননা ধনুকভঙ্গের সময় রামের মনটি রামের হাতের পরশে গিয়ে যুক্ত হয়েছিল, আর রাবণের মন নিশ্চয়ই সীতার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়েছিল, ধনুক তোলা ধনুক ভাঙা যে ক'টা আঙুলে হতে পারে তাদের ডগাতেও পৌঁছোয়নি সময়মতো।

দিনরাতের মধ্যে যেসব ঘটনা হঠাৎ ঘটে কিংবা আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় প্রতিদিনের বাঁধা চালের মধ্যে সেগুলোকে মানুষ খুব কাজে ব্যস্ত থাকলেও অন্তত এক পলের জন্যেও মন দিয়ে না দেখে থাকতে পারে না। হঠাৎ পুব কি পশ্চিম আকাশ রঙে রাঙা হয়ে উঠল; দৃষ্টির সঙ্গে মন তখনি যুক্ত হয়ে দেখে কি হল; পাড়ায় ট্রামের ঘণ্টার টুংটাংএর উপরে হঠাৎ কোন সকালে বাঁশির সুর বাজলে মন বলে ওঠে, কি শুনি? হঠাৎ দক্ষিণ বাতাস ঘরের ঝাঁপটা নাড়িয়ে দিলে, মন যেন ঘুম ভেঙে চমকে বলে, শীত গেল নাকি দেখি! পাড়ার যে ছেলেটা প্রতিদিন বাড়ির সামনে দিয়ে ইস্কুলে যায় তাকে দু'-একদিনেই চিনে নিয়ে চোখ ছেলেটার দিকে ফেরা থেকে ক্ষান্ত থাকে; কিন্তু সেই ছেলেটা হঠাৎ বাঁশি বাজিয়ে বর সেজে দুয়োর গোড়া দিয়ে শোভাযাত্রা করে যখন চলে তখন নয়ন মন শ্রবণ সবাই দৌড়ে দেখতে চলে—আর সেই দেখাটাই মনের মধ্যে লুকোনো রস জাগিয়ে দেয় হঠাৎ। তাং রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিস্তো, নার্য্যোন জম্মুর্ব্বিষয়ান্তরাণি তথাপি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরৈব প্রবিষ্টা।[৫] —যা হঠাৎ এল তার দিকে, সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের আকৃষ্ট হবার একটা চেষ্টা থেকে থেকে জাগে আমাদের সকলেরই। কিন্তু বাইরে থেকে প্রেরণাসাপেক্ষ চোখ কান ইত্যাদির এই কৌতূহল সব সময়ে জাগিয়ে রাখতে পারেন কেবল ভাবুকেরাই। বিশ্বজগৎ একটা নিত্য উৎসবের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন রসের সরঞ্জাম নিয়ে ভাবুকের কাছে দেখা দেয় এবং সেই দেখা ধরা থাকে ভাবুকের রেখার টানে, লেখার ছাঁদে, বর্ণে ও বর্ণনে, কাজেই বলা চলে বুদ্ধির নাকে চড়ানো চলতি চশমার ঠিক উল্টো এবং তার চেয়ে ঢের শক্তিমান চশমা হল মনের সঙ্গে যুক্ত ভাবের চশমাখানি।

এমন মানুষ নেই যার শ্রবণের সঙ্গে ছুটির ঘণ্টা আর কাজে যাবার ঘণ্টার ছেলেবেলা থেকেই বিশেষ যোগাযোগ আছে; কিন্তু সচরাচর এত কাজের ভিড়ে মানুষকে ঘিরে তাকে যে ভাবুক, মন দিয়ে এই ঘণ্টা শুনে যতক্ষণ না বলে দেন ঘণ্টা দুটো কি বলে ততক্ষণ ঘণ্টাটা শোনাই আমাদের হয়নি—যথার্থভাবে একথা বলা যায়। সবারই কানে আসে সন্ধ্যাপুজোর শঙ্খধ্বনি, সন্ধ্যায় আঁধার-করা ছবি চোখে পড়ে সবারই, কিন্তু সেই শঙ্খধ্বনি সন্ধ্যারাগের সঙ্গে মিলিয়ে সুর দিয়ে ছন্দ দিয়ে একটি অপরূপ রূপ ধরিয়ে যখন ভাবুক মানুষ আমাদের শুনিয়ে দিলেন দেখিয়ে দিলেন কেবল তখনই তো সন্ধ্যা, সন্ধ্যাপূজা এমন কি সন্ধ্যাকালের এই পৃথিবীকে যথার্থভাবে দেখতে শুনতে পেলেম আমরা—

"সন্ধ্যা হল গো—
ওমা সন্ধ্যা হল বুকে ধর
অতল কালো স্নেহের মাঝে
ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর॥
ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো
সব যে কোথায় হারিয়েছে গো
ছড়ানো এই জীবন, তোমার
আঁধার মাঝে হোক্ না জড়॥
আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা
তোমার রাতে মিলাক আমার

জীবন-সাঁঝের রশ্মিরেখা॥
আমায় ঘিরি' আমায় চুমি'
কেবল তুমি, কেবল তুমি।
আমার বলে যাহা আছে, মা
তোমার করে সকল হর॥"

বুক সন্ধ্যার বুকের স্পন্দন অনুভব করলে, নয়নের দৃষ্টি অতল কালোর স্নেহভরা পরশ নিবিড় করে উপভোগ করলে, ফিরে এল নতুন করে তরুণ দৃষ্টির করুণ চাহনি, নতুন করে জাগাল প্রাণভরে শুনে নেবার, গেয়ে ওঠবার ইচ্ছা, সারা সংসারে ছড়ানো জীবনের দিনগুলো সাঁঝের আঁধারের মধ্যে দিয়ে মিলল এসে একেবারে।

সন্ধ্যাতারার কোলের কাছটিতে রহস্য নিকেতনে, আলো আর কালোর ছন্দে প্রাণকে দুলিয়ে দিলে, রাতের সুরে গিয়ে মিলল দিনের সুর, আঁধারে গিয়ে মিশল—আলো। একেবারে ঢেলে দেওয়া গেল সব স্বার্থে জলঞ্জলি দিয়ে নিজকে গভীর রিক্ততার প্রশান্ত আলিঙ্গনে। সন্ধ্যা, কতদিন ধরে যার সঙ্গে দেখা-শোনা হয়ে আসছে তাকে এমন করে দেখা ক'জন দেখলে? নিত্য সন্ধ্যার হাওয়াটা গড়ের মাঠে গিয়ে খেয়ে এসে এবং পুজোবাড়িতে গিয়ে শাঁখ-ঘন্টা শুনে এসে আমরা পুঁথিগত ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্রগুলোর চেয়ে একটুও অধিক দেখতে শুনতে পেলেম না। কিন্তু কবীর দু'ছত্রে সমস্ত সন্ধ্যার প্রাণটি একমুহূর্তে টেনে আনলেন আমাদের দিকে—

"সাঁঝ পড়ে দিন বীতরে
চকরী দীন্হা রোয়।
চল চকরা বা দেশকো
জঁহা রৈন ন হোয়॥"

এ কোন অগম্য দেশের খবর এসে পৌঁছল! রাত্রির পরপারে যুগল তারার রাজত্বে যাবার সকরুণ ডাক, ভীরু পাখির গলার সুর ধরে এ কোন চির-মিলনের বাণী অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছল যারা দেখেও দেখছে না, শুনেও শুনছে না, ধরেও ধরতে পারছে না তাদের কাছে!

যে চোখের দেখায় সন্ধ্যার অন্ধকার রাত্রির কালিমা শুধু আমাদের শঙ্কা আর সংশয়বুদ্ধিই জাগিয়ে তোলে, ভাবুকের দেখা কি সেই চলতি চোখ দিয়ে দেখা, না তেমন শোনা দিয়ে, তেমন পরখ দিয়ে চেয়ে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখা? এ সে ভাবুকের কবির শিল্পীর সেই দিব্য দৃষ্টি, যা অন্ধকারে আলো দেখলে, দুঃখের পরশেও আনন্দ পেল, অসীম স্তব্ধতার ভিতরে সন্ধান পেয়ে গেল সুরের—

"তিঁবির সাঁঝকা গহিরা আবৈ
ছাবৈ প্রেম মন অসেঁ
পশ্চিম দিগকী খিড়কী খোলো
ডুবহু প্রেম গগন মেঁ
চেত-সংবল-দল রস পিয়োরে
লহর লেহ যা তনমেঁ॥
সংখ ঘন্টা সহ নাই বাজে
শোভা-সিন্ধু মহল মেঁ॥"

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, আঁধারের প্রেম তনু মনকে আবৃত করলে, আলো যে দিকে অস্ত যাচ্ছে সেই দুয়ার খোলো, এই সন্ধ্যাকাশের মতো বিস্তৃত অন্ধকারের প্রেমে নিমগ্ন হও, চিত্ত-শতদল পান করুক রাত্রির রস, মনে লাগুক, মনে ধরুক অতল কালোর প্রেমলহরী, সীমাহীন গভীরে বাজতে থাকুক আরতির শঙ্খঘন্টা, মিলনের বাঁশি,—আঁধার-সমুদ্রে ফুটে উঠুক অপরূপ রূপা।

এ যে হৃদয়ে এসে মিলতে চাইল নতুনতরো দেখা শোনা ছোঁয়া দিয়ে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে। আগে আসছিল মানুষের বাইরেটা তার বুদ্ধির গোচরে ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় যন্ত্রে ধরা, এখন চলল মানুষের অন্তরটা বাইরের সঙ্গে মিলতে হাতে-হাতে চোখে-চোখে গলায়-গলায়—বাইরের আসা এবং বেরিয়ে যাওয়া এরি ছন্দ আবিষ্কৃত হল ভাবুক মানুষের জীবনে। অভিনিবেশ করে বস্তুতে ঘটনাতে নিবিষ্ট হবার শিক্ষা ও সাধনায় আপনার কার্যকরী ইন্দ্রিয়শক্তি সকলকে নতুনতরো শক্তিমান করে তুললেন যে মুহূর্তে ভাবুক—সৌন্দর্যে অর্থে সম্পদে সৃষ্টির জিনিস ভরে উঠল, জগৎ এক অপরূপ বেশে সেজে দাঁড়াল মানুষের মনের দুয়ারে; বারমহল ছেড়ে অভ্যাগত এল যেন অন্দরের ভিতর ভালবাসার রাজত্বে। রসের স্বাদ অনুভব করলে মানুষ, যেটা সে কিছুতে পেতে পারত না যদি সে ইন্দ্রিয় সমস্তকে কেবলি প্রহরী ও মন্ত্রীর কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখত বুদ্ধির কোঠার দেউড়িতে। এই নতুন শিক্ষা, নতুন সাধনা যখন মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো লাভ করলে, তখন মানুষের কণ্ঠ শুধু বলা-কওয়া হাঁক-ডাক করেই বসে রইল না; সে গেয়ে উঠল। হাতের আঙুলগুলো নানা জিনিস স্পর্শ করে নরম গরম কঠিন কি মৃদু ইত্যাদির পরখ করেই ক্ষান্ত হল না, তারা সংযত হয়ে তুলি বাটালি সূঁচ হাতুড়ি এমনি নানা জিনিসকে চালাতে শিখে নিলে, বীণাযন্ত্রের উপরে সুর ধরতে লাগল হাত আঙুলের আগা, শুধু লোহার তারকে তার মাত্র জেনেই ক্ষান্ত হল না, সুরের তার পেয়ে যন্ত্রের পর্দায় পর্দায় বিচরণ করতে থাকল আঙুলের পরশ গুন্ গুন্ স্বরে ফুলের উপরে ভ্রমরের মতো, কোলের বীণার সঙ্গে যেন প্রেম করে চলল হাত, কান শুনতে লাগল প্রেমিকের মতো কোলের বীণার প্রেমালাপ। সরু সূঁচের, সোনার সুতোর, রঙে-ভরা তুলির সজীব ছন্দ ধরে তালে তালে চলল আঙুল, হাতুড়ি বাটালির ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য করতে শিক্ষা নিলে শিল্পীর হাত—কাজের ভিড় থেকে মানুষের চোখ ও হাত, সেই সঙ্গে মনও ছুটি পেয়ে খেলবার ও ডানা মেলবার অবসর পেয়ে গেল।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে এই অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি—এইটুকুই ভাবুকের সাধনার চরম হল তা তো নয়, সৃষ্টির বাইরে যা তাকেও ধরবার জন্যে ভাবুক আরো এক নতুন নেত্র খুললেন—খুবই প্রখর দৃষ্টি যার এমন যে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র তাকেও হার মানালে মানুষের এই মানস-নেত্র, চোখের দৃষ্টি যেখানে চলে না,—দূরবীক্ষণের দূরদৃষ্টিরও অগম্য যে স্থান। মানুষ এই আর-এক নতুন দৃষ্টির সাধনায় বলীয়ান হয়ে নিজের মনের দেখা নিয়ে বিশ্বরাজ্যের পরপারেও সন্ধানে বেরিয়ে গেল—সেই রাজত্বে যেখানে সৃষ্টির অবগুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করে স্রষ্টা রয়েছেন গোপনে—

> "যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে যথাপ্স্যুৎপরিব
> তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।"[৬]

এই ব্রহ্মলোক যেখানে ছায়াতপে সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে, গন্ধর্বলোক যেখানে রূপ ও সুর উভয়ে জলের উপরে যেন তরঙ্গিত হচ্ছে, এবং আত্মার মধ্যে যেখানে নিখিলের সমস্তই দর্পণের মতো প্রতিবিম্বিত দেখা যাচ্ছে, সমস্তই দিব্য দৃষ্টিতে পরশ ও পরখ করে নিলে মানুষ। দর্শকের ও শ্রোতার জায়গায় বসে মানুষ দেখবার মতো করে দেখলে, শোনবার মতো করে শুনে নিলে নিখিলের এই রূপের লীলা সুরের খেলা, এবং এরও ওপরে যে লীলাময় মানুষকে সমস্ত পদার্থ সমস্ত বস্তুর সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে একই নাট্যশালায় নাচিয়ে গাইয়ে চলেছেন তাঁকে পর্যন্ত ছুঁয়ে এল মানুষ নেপথ্য সরিয়ে। দেখা শোনা পরশ করার চরম হয়ে গেল, তারপর এল দেখানোর পালা। মানুষ এবারে আর এক নতুন অদ্ভুত অনিয়ন্ত্রিত অভূতপূর্ব সৃষ্টি সাধন করে গুণী শিল্পী হয়ে বসল। এই দৃষ্টিবলে আপনার কল্পনালোকের মনোরাজ্যের গোপনতা থেকে মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি বার করে আনতে লাগল। যে এতদিন দর্শক ছিল সে হল প্রদর্শক, দ্রষ্টা হয়ে বসল দ্বিতীয় স্রষ্টা। অরূপকে রূপ দিয়ে, অসুন্দরকে সুন্দর করে, অবোলাকে সুর দিয়ে, ছবিকে প্রাণ, রঙহীনকে রং দিয়ে চলল মানুষ—

“প্রেমের করুণ কোমলতা।
ফুটিল তা’
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।”

টীকা

১. ৪।১ হেমন্তবর্ণন, ঋতুসংহারম্ (কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত)
২. ৪।১৮ ঋতুসংহারম্ ঐ
৩. ২।৪৭ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ (কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ)
৪. ২য় অঙ্ক, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্
৫. ৭।১২ রঘুবংশম্ (কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ)
৬. ২।৬।৫ কঠোপনিষৎ

শিল্প ও ভাষা

"বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে॥"

বাঙ্গলা ভাষা যে বোঝে সেই এ শ্লোকটা শুনলেই বলবে—'বুঝলেম', কিন্তু 'ভারতী' কাগজের মলাটের নিচে থেকে টেনে বার করে আজকালের একখানা ছবি সবার সামনে যদি ধরে দিই, সাড়ে-পনেরো আনার চেয়ে বেশি লোক বলবে, 'বুঝলেম না মশায়!' এই শেষের ঘটনা ঘটতে পারে, হয় যে ছবিটা লিখেছে সেই আর্টিস্টের ছবির ভাষায় বিশেষ জ্ঞান না থাকায়, অথবা যে ছবি দেখেছে চিত্রের ভাষায় দৃষ্টিটা তার যদি মোটেই না থাকে। ভারতীর বন্দনাটা যে ভাষায় সেই ভাষাটা আমাদের সুপরিচিত আর ভারতী'র ছবিখানা যে ভাষায় রচা সে ভাষাটা একেবারেই আমাদের অপরিচিত; সেইজন্য চিত্র-পরিচয় পড়েও ওটা বুঝলেম না এমনটা হতে বাধা কোনখানে? চীনেম্যানের কানের কাছে খুব চেঁচিয়ে সরস্বতীর স্তোত্র পাঠ করলেও সে বুঝবে না, কিন্তু ছবির ভাষার বেলায় সে অনেকখানি বুঝবে, কেননা ছবির ভাষা অনেকটা সার্বজনীন ভাষা। 'আবর্' কথাটা ফরাসিকে বললে সে গাছ বুঝবে, আবার 'আবর্' শব্দ হিন্দুস্থানীর কাছে মেঘরূপে দেখা দেবে, ইংরেজ সে শব্দটার কোনরূপ অর্থ আবিষ্কার করতে পারবে না, কিন্তু আঁকার ভাষায় 'আবর্' হয় গাছ নয় অভ্রস্বরূপ হয়ে দেখা দেয়; কথিত ভাষার মতো কৃত্রিম উপায়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া রূপ নিয়ে নয়। সুতরাং ছবির ভাষার মধ্যে, বলতেই হয়, অপরিচয়ের প্রাচীর এত কম উঁচু যে সবাই এমনকি ছেলেতেও সেটা উল্লঙ্ঘন সহজেই করতে পারে, কিন্তু ঐ একটু চেষ্টা যার নেই তার কাছে ঐ একহাত প্রাচীর দেখায় একশো হাত দুর্গপ্রাকার,—ছবি ঠেকে সমস্যা। কবির ভাষা চলেছে শব্দ চলাচলের পথ কানের রাস্তা ধরে মনের দিকে, ছবির ভাষা অভিনেতার ভাষা এরা চলেছে রূপ চলাচলের পথ আর চোখের দেখা অবলম্বন করে ইঙ্গিত করতে করতে, আবার এই কথিত ভাষা যেটা আসলে কানের বিষয় এখন সেটা ছাপার অক্ষরের মূর্তিকে চোখ দিয়েই যাচ্ছে সোজা মনের মধ্যে; 'নবঘনশ্যাম' এই কথাটা-ছাপা দেখলেই রূপ ও রঙ দুটোর উদ্রেক করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে!

নাটক যখন পড়া হয় কিংবা গ্রামোফোনের মধ্য দিয়ে শুনি তখন কান শোনে আর মন সঙ্গে-সঙ্গেই নটনটীদের অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি মায় দৃশ্যপটগুলো পর্যন্ত চোখের কোনো সাহায্য না নিয়েই কল্পনায় দেখে চলে, ছবির বেলায় এর বিপরীত কাণ্ড ঘটে,—চোখ দেখলে রূপের ছাপগুলো, মন শুনে চলল কানের শোনার অপেক্ষা না রেখে ছবি যা বলছে তা; বায়স্কোপের ধরা ছবি, চোখে দেখি শুধু তার চলাফেরা, ছবি কিন্তু যা বললে সেটা মন শুনে নেয়।

কবির মাতৃভাষা যদি বাঙ্গলা হয় তবে বাঙ্গলা খুব ভাল করে না শিখলে ইংরেজ সেটি বোঝে না; তেমনি ছবির ভাষা অভিনয়ের ভাষা এসবেও দ্রষ্টার চোখ দোরস্ত না হলে মুশকিল। মুখের কথা একটা-না-একটা রূপ ধরে আসে, কাগ্ বগ্ বললেই কালো সাদা দুটো পাখি সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির! শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হল উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখার রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে— রূপ-কথা, অভিনেতার ভাষাকেও তেমনি বলতে পারো রূপের চলা-বলা নিয়ে চলন্তি ভাষা! কবিতার ছবির অভিনয়ের ভাষার মতো সুর আর রূপ দিয়ে বাক্যসমূহকে যথোপযুক্ত স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মতো সাজিয়ে-গুজিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে ছেড়ে দিলে তবেই যাত্রা শুরু করে দিলে বাক্যগুলো, চলল ছন্দ ধরে যথা—

"করিবর—রাজহংস-গতি-গামিনী
চললিহঁ সঙ্গেত—গেহা,
অমল তড়িত দণ্ড হেম মঞ্জরী
জিনি অপরূপ সুন্দর দেহা॥"

কিন্তু বাক্যগুলোকে ভাষার সূত্রে নটনটী সূত্রধার এদের মতো বাঁধা হল না, তখন কেবলি বাক্য সকল শব্দ করলে—ও, এ, হে, হৈ, ঐ কিংবা খানিক নেচে চলল পুতুলের মতো কিন্তু কোনো দৃশ্য দেখালে না বা কিছু কথাও বললে না, কোলাহল চলাচল হল খানিক, বলাবলি হল না, যেমন—

"হল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন মতি
হয় শান্ত কি ক্ষান্ত কৃতান্ত গতি
করি গঞ্জিত গুঞ্জিত ভৃঙ্গ সবে
ত্যজি মৃত্যু কি চিত্ত কি নিত্য রবে?"

শোলোক্‌টা কি যেন বলতে চাইলে কিন্তু খাপছাড়াভাবে, এ যেন কেউ তুরকি, আরবি পড়ে ফরাসি মিশালে! কিন্তু কথাকে কবি কথা বললেন ভাষা দিয়ে, চালিয়ে দিলেন ছন্দ দিয়ে, কথাগুলো তবে সজাগ সজীব অভিনেতার মতো নেচে গেয়ে বাঁশি বাজিয়ে চলল পরিষ্কার।

"'চলিগো, চলিগো, যাইগো চলে'
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগনতলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।"

ছবির বেলাতেও এমনি, সুর-সার কথাবার্তা এসবের সূত্রে রূপকে না বেঁধে, আঁকা রূপগুলো অমনি যদি ছেড়ে দেওয়া যায় পটের উপরে, তবে তারা একটা একটা বিশেষ্যের মতো নিজের নিজের রূপের তালিকা দ্রষ্টার চোখের সামনে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, বলে না চলে না—পিদুম, ফুল, ফুলদানি, বাবু, রাজা,

পণ্ডিত, সাহেব কিংবা অমুক অমুক অমুক এর বেশি নয়; কিন্তু প্রদীপ আঁকলেম, তার কাছে ফেলে দিলেম পোড়া সল্‌তে, ঢেলে দিলেম তেলটা পটের উপর—ছবি কথা কয়ে উঠল,— "নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্।"

ছবিকে ইঙ্গিতের ভাষা দিয়ে বলানো গেল, চলানো গেল। নাট্যকলা প্রধানত ইঙ্গিতেরই ভাষা বটে কিন্তু তার সঙ্গেও কথিত ভাষার সঙ্কেত অনেকখানি না জুড়লে নাটকাভিনয় করা চলে না—এই 'লেকচার' লিখছি সামনে এতটুকু 'টোটো' ছেলেটা বোবা নটের মতো নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে চলল, ভেবেই পাইনে তার অর্থ! হঠাৎ অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে শিশু নট বাক্য আর সুর জুড়ে দিলে অং অং ভুস্ ভুস্, বোঁ বন্ বন্, সোঁ শন শন্, হিং টিং ছট্ ফট্, আয় চট্ পট্, লাগ লাগ ভোজবাজি, চোর বেটাদের কারসাজি, ঠিক দুপুরে রদ্দুরে, তাল পুকুরে উত্তুরে, কার আজ্ঞে? না, কথিত ভাষার আজ্ঞে পেয়ে বোবা ইঙ্গিত জাদু-মন্ত্র কথা কয়ে ফেললে, যেন ঘুড়ি উড়িয়ে চলল ঘুরে ফিরে।

ছবির ভাষা, কথার ভাষা, অভিনয়ের ভাষা ও সঙ্গীতের ভাষা এই রকম নানা ভাষা এ পর্যন্ত মানুষ কাজে খাটিয়ে আসছে। এর মধ্যে সঙ্গীত শুধু যা বলতে চায়, কিংবা যখন কাঁদতে চায় বা হাসাতে চায়, কাকুতি-মিনতি জানাতে চায় তখন ছবির ভাষা ও কথার ভাষাকে অবলম্বন না করেও নিজের স্বতন্ত্র ভাষার মীড় মূর্ছনা ইত্যাদি দিয়ে সুব্যক্ত হয়ে উঠতে পারে। রঙের ভাষারও এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আছে—আকাশের রূপ নেই কিন্তু রঙের আভাস দিয়ে সে কথা বলে। কিন্তু আর-সব ভাষা কথিত চিত্রিত অভিনীত সমস্তই এ ওর আশ্রয় অপেক্ষা করে। সুর আর রূপ, বলা ও দেখা, এরা সব কেমন মিলে জুলে কাজ করে দু-একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। মধুর বাক্যগুলো কানের জিনিস হলেও মাধবীলতার মতো চোখের দেখা সহকারকে আশ্রয় না করে পারে না। দৃশ্য বা ছবিকে আশ্রয় না করে কিছু বলা-কওয়া একেবারেই চলে না তা নয়, যেমন—

"কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর।
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে
এতদিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে।"

এখানে মনোভাব বাচন হল, কোনো রূপ কোনো ভঙ্গি ছবি বা অভিনয়ের সাহায্য না নিয়েও। বাচনের বেলায় বাক্য স্বাধীন কিন্তু বর্ণনের বেলায় একেবারে পরাধীন, যেমন—

"একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন।"

নব যৌবন আর বৃন্দাবনের বসন্ত শোভার ছবি বাক্যগুলোর মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমকাচ্ছে!

"আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল।"

বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল কালো যমুনা তার ধারে কদমতলা, তার ছায়ায় সহচরী সহিত রাধিকা—

"আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্ধন।"

রাধিকার রত্ন অলঙ্কারের ঝিকমিকি থেকে দূরের কালো পাহাড়ের ছবি গিয়ে Landscapeটা সম্পূর্ণ হল, ছবি মিলে গেল কথার সঙ্গে, কান চোখ দুয়ের রাস্তা একত্র হয়ে সোজা চলল মনোরাজ্যে! এর পর আর ছবি নেই

বর্ণনা নেই শুধু কথা দিয়ে বাচন—

"এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী
এমন ব্যথিত নাহি শুনএ কাহিনী।"

এ বারে কথিত ভাষার ছবির সাক্ষাদ্দর্শন—

"জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়—
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল
নিমিষে নিমিখ নাহি রয়।
সই দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে!"

একেবারে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছবি-দেখা কথার ভাষা দিয়ে! এইবার অঙ্গভঙ্গি আর চলার সঙ্গে কথার যোগাযোগ পরিষ্কার দেখাব—

"চলিতে না পারে রসের ভরে
আলস নয়ানে অলস ঝরে
ঘন ঘন সে যে বাহিরে যায়
আন ছলে কত কথা বুঝায়।"

চোখের সামনে চলাফেরা শুরু করে দিলে কথার ভাষা অভিনয় করে নানা ভঙ্গিতে।

চিত্রিত ভাষা কথিত ভাষা অভিনীত ভাষা, এসব যদি এ ওর কাছে লেনা দেনা করে চলল তবে কথিত ভাষার ব্যাকরণ অলঙ্কারের সূত্র আইন কানুন ইত্যাদির সঙ্গে আর দুটো ভাষার ব্যাকরণাদির মিল থাকতে বাধ্য। কথার ব্যাকরণে যাকে বলে 'ধাতু', ছবির ব্যাকরণে তার নাম 'কাঠামো' (form)। ধারণ করে রাখে বলেই তাকে বলি ধাতু। ধাতু ও প্রত্যয় একত্র না হলে কথিত ভাষায় শব্দরূপ পাই না, ছবির ভাষাতেও ঠিক ঐ নিয়ম— মাথা হাত পা ইত্যাদি রেখে দিয়ে একটা কাঠামো বা ফর্মা বাঁধা গেল। কিন্তু সেটা বানর না নর এ প্রত্যয় বা বিশ্বাস কিসে হবে যদি না ছবিতে নর বানরের বিশেষ প্রত্যয় দিই! শুধু এই নয়, বিভক্তি যিনি ভাগ করেন ভঙ্গি দেন, তাঁর চিহ্ন ইত্যাদি নানা ভঙ্গিতে কাঠামোয় জুড়ে দেওয়া চাই। বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে নানা বস্তুর সঙ্গে নানা বস্তুতে সন্ধি সমাস করার সূত্র আছে, ছবির ব্যাকরণে, বচন ক্রিয়া বিশেষ্য বিশেষণ সার্বনাম অব্যয় এমনকি মুগ্ধবোধের সবখানি অলঙ্কারশাস্ত্রের সবখানির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া চলে ছবির ব্যাকরণ আর অলঙ্কারের ধারাগুলো। কথিত ভাষার বেলায় 'ভৃ' ধাতু গক্ প্রত্যয় করে যেমন 'ভৃঙ্গ', ছবির ভাষায় কালো ফোঁটার উপরে দুটো রেফ যোগ করলেই হয় 'দ্বিরেফ ভৃঙ্গ' আবার ভৃঙ্গের কালো ফোঁটায় রেফ না দিয়ে শুণ্ড প্রত্যয় দিলে হয় 'ভৃঙ্গার' যেমন 'ভৃ' ধাতুতে 'গিক' প্রত্যয় জুড়লে হয় 'ভৃঙ্গি'।

ছবি লেখার উৎসাহ নেই কিন্তু ছবির ব্যাকরণ লেখার আস্থা আছে এমন ছাত্র যদি পাই তো চিত্রকরে আর বৈয়াকরণে মিলে এইভাবে আমরা ছবি দেওয়া একটা ব্যাকরণ রচনা করতে পারি, কিন্তু এ কাজে নামতে আমার সাহস নেই কেননা ব্যাকরণ বলে জিনিসটা আমার সঙ্গে কি কথিত ভাষা কি চিত্রিত ভাষা দুয়ের দিক দিয়েই চিরকাল ঝগড়া করে বসে আছে। সংকীর্তিত ভাষা যেমন, তেমনি সংচিত্রিত ভাষাও একটা ভাষা, ব্যাকরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে এইটে যদি সাব্যস্ত হল তবে এও ঠিক হল যে ছবি দেখা শুধু চোখ নিয়ে চলে

না ভাষাজ্ঞানও থাকা চাই দ্রষ্টার, ছবি-স্রষ্টার পক্ষেও ঐ একই কথা। 'রসগোল্লা খেতে মিষ্টি, টাপুর টুপুর পড়ে বৃষ্টি', এটা বুঝতে পারে না পাঠশালায় না গিয়েও এমন ছেলে কমই আছে, কিন্তু শিশুবোধের পাঠ থেকে ভাষাজ্ঞান বেশ একটু না এগোলে—

"মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বন-মাঝে!"

এটা বোঝা সম্ভব হয় না চট করে বালকের। শুধু অক্ষর কিংবা কথা অথবা পদ কিংবা ছত্রের পর ছত্র লিখতে পারলে অথবা চিনে চিনে পড়তে পারলেই সুন্দর ভাষায় গল্প কবিতা ইত্যাদির লেখক বা পাঠক হয়ে ওঠা যায় একথা কেউ বলে না, ছবি অভিনয় নর্তন গান ইত্যাদির বেলায় তবে সে কথা খাটবে কেন! যেমন চিঠি লিখতে পারে অনেকে তেমনি ছবিও লিখতে পারে একটু শিখলে প্রায় সবাই, কিন্তু লেখার মতো লেখার ভাষা, আঁকার মতো আঁকার ভাষার উপর দখল ক'জনে পায়? কাজেই বলি যে-ভাষাই হোক তাতে স্রষ্টাও যেমন অল্প তেমনি দ্রষ্টাও ক্বচিৎ মেলে। ভাষাজ্ঞানের অভাববশত ফুলকে দেখারূপে আঁকা এক ফুলের ভাষা শুনে নিজের ভাষায় ফুলকে বর্ণনা করায় তফাত আছে কে না বলবে!

বাঙ্গলা দেশে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষা, কিন্তু সেই অপ্রচলিত ভাষা চলিত বাঙ্গলার সঙ্গে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত ভাষা হয়ে প্রচলিত যেমনি হল, অমনি বাঙ্গলার পণ্ডিতসমাজে খুব চলন হল সেই ভাষার, সবাই লিখলে কইলে বুঝলে বুঝালে সেই মিশ্র ভাষায়, চলিত বাঙ্গলায় খাঁটি বাঙ্গলায় লেখা অপ্রচলিত হয়ে পড়ল, ফল হল— এককালের চলতি ভাষা সহজ কথা সমস্তই দুর্বোধ্য হয়ে পড়ল, এমনকি কথার অক্ষর মূর্তিটা চোখে স্পষ্ট দেখলেও কথাটার ভাব-অর্থ ইত্যাদি বোঝা শক্ত হয়ে পড়ল। বাঙ্গলা অথচ অপ্রচলিত কথাগুলোর বেলায় যদি এটা খাটে তবে ছবির ভাষার বেলায় সেটা খাটবে না কেন? ছবির মূর্তির অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা বোঝাও দুঃসাধ্য হয়ে যে পড়ে তার প্রমাণ দেশের ইতিহাসে ধরা থাকে, আর সেইগুলোর নাম হয় অন্ধযুগ, এই অন্ধতার মধ্য দিয়ে আমাদের মতো পৃথিবীর অনেকেই চলেছে সময় সময়! চোখে দেখামাত্রই সবখানি বোঝা না গেল সে ছবি ছবিই নয় একথা না হয় শিল্পীর উপরে জবরদস্তিতে চালানো গেল, কিন্তু আমাদের নিজ বাঙ্গলার মুখের কথা আমরা অনেক সময়ে নিজেরাই বুঝিনে বোঝাতেও পারিনে ভাষাতে পণ্ডিতেরা না বুঝিয়ে দিলে, তবে কি বলব বাঙ্গলা ভাষা বলে বস্তুটা বস্তুই নয়?— 'ছীয়াল', 'ছিমনী', 'ছোলঙ্গ' এই তিনটেই বাঙ্গলা কথা, কিন্তু বুঝলে কিছু? ফরিদপুরের ছেলে 'ছোলঙ্গ' বলতেই বোঝে, বহরমপুরের লোক বোঝে না, বাঙ্গলা শব্দকোষ না আয়ত্ত হলে ওয়েবস্টারের জ্ঞান নিয়েও বুঝতে পারে না 'ছোলঙ্গ' হচ্ছে বাতাবি লেবু, লারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর। 'ছিয়াল', 'ছিমনী' এ দুটোও বাঙ্গলা কিন্তু বাঙ্গলার সাধুভাষা বলে কৃত্রিম ভাষা নিয়ে যাঁরা ঘরকান্না করছেন তাঁরা এর একটাকে শৃগালের অপভ্রংশ আর-একটাকে ইংরাজি চিম্‌নি কথার বাঙ্গলা বলেই ধরবেন কিন্তু এ দুটোই তা নয়—ছীয়াল মানে শ্রীল বা শ্রীমান ও শ্রীমতী, আর ছিম্‌নি মানে পাথর-কাটা 'ছেনী', শৃগালও নয় চিমনিও নয়। দুশো বছর আগে যে ভাষা চলিত ভাষা ছিল, পট ও পাটার ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির ভাষাও অপ্রচলিত হয়ে গেছে; সুতরাং যে শোলোক্‌টা এবারে বলব তা বাঙ্গলা হলেও আমাদের কাছে চীনের ভাষারই মতো দুর্বোধ্য—

"ঘাত বাত হাত ঘর জোহি অয়লাহু
ন ভেতল চোলে আরে সবে অকলাহু।"

পরিচিত বাঙ্গলায় আন্দাজে আন্দাজে এর যতটা ধরা গেল তার তর্জমা করলেম, তবে অনেকটা বোধগম্য হল ভাবার্থটা—

ঘাট বাট হাট ঘর করিনু সন্ধান
চোরে না পাইয়া মোরা হইনু হয়রান।

দুই-তিন শত বছরের আগেকার বাঙ্গালী যে চলিত ভাষায় কথা কইতো তাই দিয়েই উপরের কবিতাটা লেখা, আজকের আমরা সে ভাষা দখল করিনি অথবা ভুলে গেছি, কবিতা দুর্বোধ্য হল সেইজন্য, ভাষার দোষেও নয় কবির দোষেও নয়।

কথিত ভাষার হিসেব পণ্ডিতেরা এইরূপ দিয়েছেন—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, মিশ্র অথবা সংস্কৃত, ভাষা আর বিভাষা। আর্টের ভাষাতেও এই ভাগ, যথা—শাস্ত্রীয় শিল্প (Academic art), লোকশিল্প, (Folk art), পরশিল্প (Foreign art), মিশ্রশিল্প (Adapted art)।লোকশিল্পের ভাষা হল—পটপাটা গহনাগাটি ঘটিবাটি কাপড়চোপড় এমনি যেসব art শাস্ত্রের লক্ষণের সঙ্গে না মিললেও মন হরণ করে। শাস্ত্র ব্যাকরণ ইত্যাদি 'পণ্ডিতানাম্ মতম্' যে art-এর সঙ্গে যোগ দেয়নি কিন্তু 'যত্র লগ্নং হি হৃৎ' হৃদয় যার সঙ্গে যুক্ত আছে, শুক্রাচার্যের মতে তাই হল লোকশিল্পের ভাষার রূপ। আর যা 'পণ্ডিতানাম্ মতম্' যেমন দেবমূর্তি-রচনা শিল্পশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত অথবা রাজা বা পণ্ডিতগণের অভিমত শিল্প সেই হল শিল্পের সংস্কৃত ভাষা—কোথাও লোকশিল্পের চলিত ভাষাকে মেজে ঘষে সেটা প্রস্তুত, কোথাও প্রাচীন লুপ্ত ভাষাকে চলিতের সঙ্গে মিলিয়ে নব কলেবর দিয়েও সাধু ভাষারূপে সেটা প্রস্তুত করা হয়। পরশিল্প হল যেমন গান্ধারের শিল্প, একালের অয়েল পেন্টিং। মিশ্রশিল্প চীনের বৌদ্ধশিল্প, জাপানের নারা মন্দিরের শিল্প, এশিয়ার ছাঁচে ঢালা এখনকার ইউরোপীয় শিল্প, গ্রিসের ছাঁচে ঢালা স্থানবিশেষের বৌদ্ধশিল্প এবং এখনকার বাঙ্গলার নব চিত্রকলা পদ্ধতি! সুতরাং সব ছেড়ে দিয়ে বাঙ্গলার নব চিত্রকলাকেই ধরে দেখা যাক—ছবিগুলো সমস্যা হয়ে উঠলে তো বড় বিপদ! ছবির ছবিত্ব চুলোয় গেল, সেগুলো হয়ে উঠল ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব এবং বর-ঠকানো কূট প্রশ্ন! নব চিত্রকলায় এ ঘটনা যে ঘটেনি তা অস্বীকার করবার যো নেই যখন সবাই বলছে, কিন্তু ছবিটা যে সমস্যার মতো ঠেকে সেটা ছবির বা ছবি-লিখিয়ের দোষে অথবা ছবি-দেখিয়ের দোষে সেটা তো বিচার করা চাই! "বায়বা যাহি দর্শতে মে সোমা অরং কৃতাঃ তেষাং পাহি শ্রুধী হবং!"[১] সব অন্ধকার ছবির সমস্যার চেয়ে ঘোরতর সমস্যা আমাদের মতো অজ্ঞানের কাছে, কিন্তু বেদের পণ্ডিতের কাছে এটা একেবারেই সমস্যা নয়! ছবি যেমন তেমনি রাজাও রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ, সৈন্য-সামন্ত, ধুমধাম, হাঁকডাক, দ্বারপাল, দুর্গ ইত্যাদির দুর্গমতা নিয়ে একটা মস্ত সমস্যার মতো ঠেকেন প্রজার কাছে, কিন্তু উপযুক্ত মানুষ বলে রাজার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে—সেখানে রাজা হন রাজামহাশয়—দুর্গম সমস্যা নয়, তেমনি ছবি মূর্তির সত্তা হল সুন্দর ছবি বা সুন্দর মূর্তি বা শুধু ছবি শুধু মূর্তিতে। রাজাকে উপযুক্ত মানুষের সত্তার দিক দিয়ে দেখার পক্ষেও যেমন দুর্গদ্বার ইত্যাদির বাধা আছে এবং কারো কারো কাছে নেইও বটে, ছবি মূর্তির সত্তার বোধের বেলাতেও ঠিক একই কথা। ছবিকে মূর্তিকে শুধু ছবি মূর্তির দিক দিয়ে বুঝতে পারলে আর সব দিক সহজ হয়ে যায় কিন্তু এ কাজটাও যে সবাই সহজে দখল করতে পারে—হঠাৎ ছবি মূর্তি দেখেই তাদের সত্তার দিক দিয়ে তাদের ধরা চট করে যে হয়—তা নয়, সেই ঘুরে-ফিরে আসে পরিচয়ের কথা।

সুরের ভাষা যে না বোঝে সঙ্গীত তার কাছে প্রকাণ্ড প্রহেলিকা, দুর্বোধ শব্দ মাত্র! সুতরাং এটা ঠিক যে মানুষ কথা কয়েই বলুক অথবা সুর গেয়ে বা ছবি রচে কিংবা হাতপায়ের ইশারা দিয়েই বলুক সেটা বুঝতে হলে যে বোঝাতে চলেছে তারও তেমন ভাষা ইত্যাদির জটিলতা ভেদ করা চাই।

কথায় যেমন ছবি ইত্যাদিতেও তেমনি যখন কিছু বাচন করা হল তখন সবাই সেটা সহজে বুঝলে, না হলে বাচন ব্যর্থ হল। 'হুঁকো নিয়ে এস', এটা ব্যাকরণ আড়ম্বর অলঙ্কার ইত্যাদি না দিয়ে বললেম, তবে হুঁকোবরদার বুঝলে পরিষ্কার, দরজার দিকে আঙুল হেলিয়ে বললেম, 'যাও', বেরিয়ে গেল হুঁকোবরদার, একটা মটর-কারের ছবি এঁকে দোকানের দরজার উপর ঝুলিয়ে দিলে সবাই বুঝলে এখানে মটর-কার পাওয়া যায় কিন্তু বর্ণনের বেলায় ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ইত্যাদির অবগুণ্ঠন আর আবরণ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া গেল কথা ছবি সুর-সার সমস্ত, কেমন করে সে বোঝে ভাষার গতিবিধির সঙ্গে যার মোটেই পরিচয় হয়নি!

দেবমাতা অদিতি তিনি স্বর্গেই থাকেন সুতরাং দেবভাষাতেই তাঁর অধিকার হল। একদিন তিনি শুনলেন জল সব চলেছে কি যেন বলতে বলতে! দেবমাতা বামদেবকে শুধালেন, "ঋষি! অ-ল-লা এইরূপ শব্দ করিতে করিতে জলবতী নদীগণ আনন্দ-ধ্বনি করতঃ গমন করিতেছে, তুমি উহাদের জিজ্ঞাসা কর, উহারা কি বলিতেছে?" অদিতির মতো, ঋষিরও যদি জলের ভাষাজ্ঞান জলের মতো না হতো, তবে তিনিও শুধু অ-ল-লাই শুনতেন, কিন্তু ঋষি আপনার প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা নিয়ে বিশ্বের ভাষা বুঝে নিয়েছিলেন, জল কি বলে, মেঘ কি বলে, নদী সমুদ্র কি বলে, সমস্তই তিনি অবগত ছিলেন, কাজেই মেঘ থেকে ঝরে-পড়া জলের সেদিনের কথাটি দেবভাষাতে তর্জমা করে অদিতিকে জানানো তাঁর সুসাধ্য হল, যথা—"জলবতী নদীগণ ইহাই বলিতেছে, মেঘসকলকে ভেদ করে জলসমূহের এমন শক্তি কোথায়? ইন্দ্র মেঘকে বিনাশ করতঃ জলসমূহ মুক্ত করেন, মেঘের আবরণ ইন্দ্রই ভেদ করেন।"

অ-র-ণ্য এই কটা অক্ষর জুড়ে দিলেই মূর্তিমান অরণ্যটা আমাদের চোখ দিয়ে সাঁ করে গিয়ে আজকাল প্রবেশ করে মনে, কিন্তু ভাষা যখন অক্ষরমূর্তি ধরেনি, শব্দমূর্তি দৃশ্যমূর্তিতে চলেছে তখন দেখি শুধু অরণ্য এইটে বাচন মাত্র করে দিয়েই ঋষির ভাষা স্তব্ধ হচ্ছে না, কিন্তু ছন্দে সুরে, অরণ্যের ভাষা শব্দ আর নানা রহস্য ধরে ধরে তবে অরণ্যের সত্তা আবিষ্কার করতে করতে চলেছে ঋষির ভাষা জিজ্ঞাসা আর বিস্ময়ের ভিতর দিয়ে—"অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি, কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি নত্বা ভীরিব বিন্দতি॥ বৃষারাবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ। আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে॥ উতগাব ইবাদস্তুত বেশ্মেব দৃশ্যতে। উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সর্জতি॥ গামং গৈষ আ-হ্বয়তি দার্বং গৈষ অপাবধীৎ। বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষাদিতি মন্যতে॥ ন বা অরণ্যানির্হংত্যন্যশ্চেন্নাভি গচ্ছতি। স্বাদো ফলস্য জন্ধায় যথাকামং নি পদ্যতে॥ আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নাসকৃষিবলাম্। প্রাহং মৃগানাং মাতরমর্যানি মশংসিষং॥"[২] ১৪৬ দেবমুনি ঋক্‌বেদ।

"হে অরণ্যানি! হে অরণ্যানি! তুমি যেন দেখিতে দেখিতে লুপ্ত হও (কত দূরেই তুমি চলিয়াছ)! অরণ্যানি, তুমি গ্রামের বার্তাই লও না, তোমার ভয় নাই এমনি ভাবে একাকী আছ।

"জন্তুরা বৃষের ধ্বনিতে কি যেন বলিতেছে, উত্তর সাধক পক্ষীরা চিচ্চিক স্বরে যেন তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছে। এ যেন বীণার ঘাটে ঘাটে ঝনৎকার দিয়া কাহারা অরণ্যানীর মহিমা কীর্তন করিতেছে। বোধ হয় অরণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী সকল বিচরণ করিতেছে, কোথাও অট্টালিকার মতো কি দৃশ্যমান, ছায়ালোকে মণ্ডিত সায়ংকালের অরণ্য যেন কত শত শকট ওখান হইতে বাহির করিয়া দিতেছে! কে ও! গাভী

সকলকে ফিরিয়া ডাকিতেছে, ও কে! কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে, অরণ্যের মধ্যে যে লোক বাস করে সেই লোক বোধ করে সন্ধ্যাকালে যেন কোথায় কে চিৎকার করিয়া উঠিল। বাস্তবিক কিছু অরণ্যানী কাহারো প্রাণবধ করে না, অন্যান্য শ্বাপদ জন্তু না আসিলে ওখানে কোন আশঙ্কা নাই। নানা স্বাদু ফল আহার করিয়া অরণ্যে সুখে দিন যাপন করা যায়, মৃগনাভি গন্ধে সুরভিত অরণ্য সেখানে কৃষিগণ নাই, অথচ বিনা কর্ষণেই প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হয়। মৃগগণের জননীস্বরূপা এমন যে অরণ্যানী তাঁহাকে এইরূপে আমি বর্ণন করিলাম।"

এখন উপরের এই অরণ্য বর্ণনার একটা তর্জমা বাঙ্গলায় না করে ছবির ভাষায় করলে অনেকের পক্ষে বোঝা সহজ হতো সবাই বলবে। ভাল কথা—বর্ণনাটা ছবিতে ধরতে আর্ট স্কুলের পরীক্ষার দিনে কাঁচা আধপাকা পাকা সব আর্টিস্টদের হাতে দেওয়া গেল, ফল কি হল দেখ। কচি আর্টিস্ট যে ছবি দিয়ে শুধু বাচন করতেই জানে সে অরণ্যানী এইটুকু মাত্র একটা বনের দৃশ্যে বাচন মাত্র করে হাত গুটিয়ে বসল—আর তো বাচন করবার কিছু পায় না। পক্ষীর চিক্ চিক্ বৃষের রব বীণার ঝনৎকার, এসব তো ছবিতে ধরা যায় না, বাকি সমস্তটা মরীচিকার মতো এই দেখতে এই নেই। এদের স্থিরতা দিয়ে ছবিতে ধরলে সমস্তটা মাটি। কিন্তু আধপাকা আর্টিস্ট little learning বা স্বল্প শিক্ষা যাকে ভীষণ সমস্ত পরীক্ষায় ভুলিয়ে নিয়ে চলে, সে 'অরণ্য' কথাটি মাত্র ছবিতে বাচন করে খুশি হল না; সে নির্বাচন করতে বসে গেল—যেন যা হচ্ছে, যেন যা দেখা যাচ্ছে এমনি নব ছায়ারূপ মায় কস্তুরীগন্ধী সোনার মৃগটাকে পর্যন্ত রং রেখার ফাঁদে ধরতে চলল মহা উৎসাহে। প্রজাপতিকে যেমন ছেলেরা কুঁড়োজালিতে ধরে সেইভাবে সব ধরলে ছবিতে চিত্রভাষায় নীতি-পরিপক আর্টিস্ট, কিন্তু দেখা গেল ধরামাত্র সব চিত্র পুত্তলিকার মতো কাঠ হয়ে রইল, ঋষির গতিশীল বর্ণনা দুর্গতিগ্রস্ত হয়ে গিলটির ফ্রেমের ফাঁস গলায় দিয়ে অপঘাত মৃত্যু লাভ করলে। তারপর এল পাকা শিল্পীর পালা। সে ঋক্‌বেদের সূক্তটা হাতে পেয়েই তার সমস্ত রসটা মন দিয়ে পান করে ফেললে, তারপর ছবির সাদা কাগজে মোটা মোটা করে লিখলে—ছবি মানে Book illustration নয়, একমাত্র stage craft এই বর্ণনার illustration চিত্র শব্দ আলো ছায়া এবং নানা গতিবিধি ইত্যাদি দিয়ে ফুটিয়ে দিতে পারে নিখুঁতভাবে, আমি stage manager নই, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করবেন। কথাগুলো অরণ্যের সত্তাকে একদিক দিয়ে বোঝালে, ছবির ভাষা অন্য দিক দিয়ে তাকে বোঝাবে এই জানি, illustration চান, না ছবি চান সেটা জানলে এই পরীক্ষায় অগ্রসর হব ইতি—

পুঃ—ঋষিরা এক জায়গায় বলেছেন 'অন্যের রচনার সাহায্যে তোমরা স্তুতি করিও না' সুতরাং আমার নিজের মনোমতো রচনা দিয়ে আমি ঘরে গিয়ে অরণ্যের স্তুতি ছবি দিয়ে লিখে পাঠাব মনে করেছি; বিদায়—।

যে ছেলেটা সবচেয়ে জ্যেঠা, পরীক্ষক যদি পাকা হন তো জ্যেঠা হিসেবে তাকেই দেবেন ফুল মার্ক, আর কাঁচা যার পক্ষে ignorance bliss তাকে দেবেন পাস্ মার্ক, আর মাঝামাঝি ছেলেটিকে দেবেন শূন্য, এটা নিশ্চয়ই বলতে পারি। ছবি, কথা, ইঙ্গিত, সুর-সার ইত্যাদি যদিও এরা ভাষা—কিন্তু ব্যক্ত করার উপায় ও ক্ষেত্র এদের সবারই একটু একটু বিভিন্ন, এরা মেলেও বটে, না মেলেও বটে, এরা একই ভাষা-পরিবারভুক্ত কিন্তু একই নয়—"Language is a system of signs, of Ideas and of relation between Ideas. These signs may be spoken sounds as in ordinary speech or purely visual (নাট্য-চিত্র) or as the Egyptian Hieroglyphs (অক্ষর মূর্তি বা নিরূপিত বাক্য) or as construction of movements as in the finger language used by deaf mutes (ইঙ্গিত)."—F. RYLAND.

মানুষের ভাষা সব প্রথম শব্দকে ধরে আরম্ভ হল কি বিচিত্র রূপকে ধরে তা বলা শক্ত, তবে স্বভাবের নিয়মে দেখি জন্মাবধি শিশু শব্দ শোনা, শব্দ করা, আলো ছায়া এবং নানা পদার্থের রূপ রং ইত্যাদি দুটোই একসঙ্গে ধরে বুঝতে এবং বোঝাতে চলেছে! ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মানুষ যে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং চোখের তারা ফিরিয়েছে বা যে হাত বাড়িয়েছে মায়ের দিকে, তারি থেকে কথিত চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার একই দিনে সৃষ্টি হয়েছে বললে ভুল হবে না।

পুরাকালেরও প্রাক্কালে মানুষ যেসব শব্দ করে এ ওকে ডাকত, সে তাকে আদর করে কিছু শোনাত কি জানাত, যে বাক্য তারা বলত তার সুর-সার ইঙ্গিত আভাষ কোন কালের আকাশে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু সেইসব দিনের মানুষের চিত্রিত যে বাক্য সকল তা এখনো যে গুহায় তারা থাকত তার দেওয়ালে বিচিত্র বর্ণ আর মূর্তি নিয়ে বর্তমান আছে; ইউরোপে এশিয়ার নানা স্থানে কত কি যে ছবি তার ঠিকানা নেই—গরু, মহিষ, শৃগাল, হস্তী, অশ্ব, মৃগযূথ দলে দলে জলের মাছ যুদ্ধ-বিগ্রহ অস্ত্র-শস্ত্র কত কি! চিত্রের ভাষা দিয়ে তারা কি বোঝাতে চেয়েছিল তা এখনো ধরতে পাচ্ছি—দিনের খবর, রাতের খবর, জলের খবর, বনের পশুর খবর, এমনকি হরিণের চোখটা কেমন তার খবরটা পর্যন্ত! সেইসব ইতিহাসের বাইরে ও-যুগের মানুষ এবং সাধক পুরুষেরা নিজেদের তপস্যালব্ধ চিত্রভাষার সাহায্যে মনোভাবগুলো লিখে গেছে, সুতরাং ছবিকেও খুব আদিকালে ভাষা হিসেবেই মানুষ যে দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। শব্দের দ্বারায় বাক্যের দ্বারায় যেমন, আঁকা ও উৎকীর্ণ রূপের দ্বারাও তেমনি, পরিচিত সব জিনিসকে চিহ্নিত নিরূপিত নির্বাচিত করে চলেছে মানুষ—এই হল গোড়ার কথা। যারা জীবন্ত কিংবা যারা গতিশীল কেবল তাদেরই আদি যুগের মানুষেরা চিত্রের ভাষায় ধরতে চেয়েছে গাছ, পাথর, আকাশ যারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, শব্দ করে না, চলে না, বলেও না, আলোতে অরণ্যানীর মতো হঠাৎ দেখা দেয় আবার অন্ধকারে হঠাৎ মিলিয়ে যায়, ছবির ভাষায় তাদের ধরা তখন সম্ভব বোধ করেনি মানুষ, হয়তো বা কথিত ভাষাতেও এসব বর্ণন করেনি তখনকার মানুষ, কেন যে তা এক প্রকাণ্ড রহস্য! ধরতে গেলে, বিদ্যুৎগতিতে দৌড়চ্ছে যে হরিণ কি মাছ তাদের ছবিতে ধরার চেয়ে, পাথর গাছ কি ফুল যারা স্থির রয়েছে চিরকাল ধরে, আঁকা দিয়ে তাদেরই ধরা সহজ ছিল, কিন্তু তা হয়নি। গাছপালা, পাহাড়, পর্বত, এরা বাদ পড়ে গেল, আর যাদের শব্দ অঙ্গভঙ্গি এইসব আছে—এককথায় যাদের ভাষা আছে—পুরাতন মানুষের ছবির ভাষা আগে গিয়ে মিলল তাদেরই সঙ্গে! এ যেন মানুষের সঙ্গে চারিদিকের যারা এসে কথা কইল তাদেরই পরিচয় আগে লিখতে বসল মানুষ; জলকে মানুষ জিজ্ঞাসা করলে—জল, তুমি কেমন করে চল? জল স্রোতের রেখা ও গতিভঙ্গি দিয়ে এঁকে ইঙ্গিত করে শব্দ করে যেন জানিয়ে দিলে—এমনি করে ঢেউ খেলিয়ে এঁকে-বেঁকে চলি। হরিণ, তুমি কেমন করে দৌড়ে যাও? হরিণ সেটা স্পষ্ট দেখিয়ে গেল। কিন্তু গাছকে পাথরকে শুধিয়ে মানুষ পরিষ্কার সাড়া পেলে না। গাছ, তুমি নড় কেন? এর উত্তর গাছ মর্মরধ্বনি করে দিলে—এই এমনিই নড়ি থেকে থেকে, জানিনে কেন! গাছের কথাই বোঝা গেল না, ছবিতেও তার রূপ ধরলে না মানুষ। পাহাড়, দাঁড়িয়ে কেন? আকাশ দিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি ফিরে এল, কেন! ছবির ভাষায় এদের কথা লেখা হলই না, শুধু এদের বোঝাতে মানুষ গাছ বলতে গোটাকতক দাঁড়ি কসি, পাহাড় বলতে একটা ত্রিকোণচিহ্ন দিয়ে গেল কখনো কখনো কতকটা চীনে অক্ষরের মতো,—রূপাভাস, কিন্তু পুরো রূপচিত্র নয়। ব্রতধারী মানুষ কামনা ব্যক্ত করবার সময় পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে কথা ছবি, সুর, নাট্য

ইত্যাদি মিশ্রিত ভাষা প্রয়োগ করে চলেছে তার রীতি আমাদের এখনো ধরে থাকতে হয়েছে—শুধু এককালের অস্ফুট শিশুভাষা স্ফুটতর হয়ে উঠেছে, পুরাকালের ব্রতধারীর ভাষার সঙ্গে এখনকার ভাষার।

যে মানুষ ছবি কথা কিংবা কিছু দিয়েই এককালে জননী পৃথিবীকে ধারণার মধ্যে আনতে পারেনি, স্ফুট ভাষার সাহায্যে সেই মানুষ আস্তে আস্তে একদিন পৃথিবীকে নিরূপিত করলে—আলপনার পদ্মপত্রের উপর একটি বুদ্বুদের আকারে; স্তোত্রের উদাত্ত অনুদাত্ত সুরে ধরা পড়ল বসুন্ধরা—"হে বিচিত্র গমনশালিনী পৃথিবী! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্রদ্বারায় তোমার স্তব করেন।" জীবন্ত হরিণ যে দ্রুত চলেছে তাকে ব্যক্ত করতে হল যেমন গমনশীল রেখা, তেমনি গমনশীল বাক্য ও সুর বর্ণনা করে চলল আকাশে ভ্রাম্যমাণা পৃথিবীকে। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ, অকার থেকে ক্ষ ইত্যাদি শব্দ এই মিলিয়ে হল কথিত ভাষা, আর আকার থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রাকার ও তার বিন্দুটি পর্যন্ত নানা রেখা বর্ণ ও চিহ্ন মিলিয়ে হল চিত্র-বিচিত্র ছবির ভাষা, এবং হাতপায়ের নানা সংকেত ও ভঙ্গি নিয়ে হল অঙ্কের পর অঙ্ক ধরে গতিশীল নাটকের চলতি ভাষা। এই হল ভাষার আদি ত্রিমূর্তি এর পার্শ্বদেবতা হল দুটি—'বাচন' ও 'বর্ণন', এই মূর্তি নিয়ে ভাষা এগোলেন মানুষের কাছে। ঋষি বলেছেন—"হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্বপ্রথম বস্তুর নামমাত্র বাচন করিতে পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান—নামরূপ হল গোড়ার পাঠ।" এর পরে এল বন্দনা থেকে আরম্ভ করে বর্ণনা পর্যন্ত, আবৃত্তি থেকে শুরু করে বিবৃতি পর্যন্ত—"বালকদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল তাহা বাগ্‌দেবীর করুণায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইল।"—ভাষা, বোধোদয় বস্তু-পরিচয় ইত্যাদি ছাড়িয়ে অনেকখানি এগোল। তারপর এল ভাষার মহিমা সৌন্দর্য ইত্যাদি—"যেমন চালনীর দ্বারায় শক্তুকে পরিষ্কার করা হয় সেইভাবে বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিস্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। (সেই ভাষাকে প্রাপ্ত হইলে পর) যাহাদিগের চক্ষু আছে কর্ণ আছে এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হইয়া উঠিলেন... সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব অর্থাৎ বিস্তর উপকার লাভ করেন,...ঋষিদিগের বচন রচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী স্থাপিত আছেন...বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন...ঋষিদিগের অন্তঃকরণের মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন, সেই ভাষা আহরণপূর্বক নানা স্থানে বিস্তার করিলেন, সপ্ত ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে...।" বিশ্বরাজ্যের প্রকট রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ সমস্তই পাচ্ছিল মানুষ ভাষাকে পাবার আগে থেকে, কিন্তু মনের মধ্যে তবুও মানুষের একটা বেদনা জাগছিল—মনের কথাকে খুলে বলবার বেদনা, মানসকে সুন্দররূপে প্রকট করার বাসনা, সুপরিষ্কৃত ভাষাকে পাবার জন্যে বেদনা মনে জাগছিল। মানুষের সবচেয়ে যে প্রাচীন ভাষা তাই দিয়ে রচা বেদ এই বেদনের সুরে ছত্রে ছত্রে পদে পদে ভরা দেখি; "আমার কর্ণ, আমার হৃদয়, আমার চক্ষুর্নিহিত জ্যোতি সমস্তই তোমাকে নিরূপণ করিতে অবগত হইতে ধাবিত হইতেছে...দুরস্থবিষয়ক চিন্তাব্যাপৃত আমার হৃদয় ধাবিত হইতেছে...আমি এই বৈশ্বানর স্বরূপকে কিরূপে বর্ণন করি কিরূপেই বা হৃদয়ে ধারণ করি!" কিংবা যেমন— "কিরূপ সুন্দর স্তুতি ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিবে।" হৃদয়ের বেদনার অন্ত নেই, দেখতে চেয়ে শুনতে চেয়ে প্রাণ ব্যথিত হচ্ছে ধাবিত হচ্ছে। অতি মহৎ জিজ্ঞাসার উত্তর পাচ্ছে মানুষ অতি বৃহৎ পরম সুন্দর, কিন্তু তার প্রত্যুত্তরের মতো মহাসুন্দর ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না!—"যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদিগের স্তব শুনিয়া থাকেন, সেই বিশ্বদেবতাসকলের মধ্যে কাহার স্তব কি উপায়ে উত্তমরূপে রচনা করি।" মনের নিবেদন সুন্দর করে উত্তম করে জানাবার জন্য বেদনা আর প্রার্থনা। কোনো রকমে খবরটা বাৎলে দিয়ে খুশি হচ্ছে না মানুষের মন, সুন্দর উপায়সকল উত্তম

উত্তম সুর-সার কথা গাথা ইঙ্গিতাদি খুঁজছে মানুষ এবং তারি জন্যে সাধ্য-সাধনা চলেছে—"হে বৃহস্পতি! আমাদিগের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলিয়া দাও, যাহা অস্পষ্টতাদোষে দুষিত না হয় এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়।" ছবি দিয়ে যে কিছু রচনা করতে চায় সেও এই প্রার্থনাই করে—রং রেখা ভাব লাবণ্য অভিপ্রায়, সমস্তই যেন উজ্জ্বল এবং সুন্দর হয়ে ফোটে। ধরিত্রীকে বর্ণন করতে ঋষি গতিশীল স্তোত্র আর ভাষা চাইলেন। ভাষার পথে গতি পৌঁছয় কোথা থেকে? মানুষের মনের গতির সঙ্গে ভাষাও বদলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি—বাঙ্গলার পক্ষে সংস্কৃতমূলক সাধুভাষা হল অচল ভাষা, কেননা সে শব্দকোষ ব্যাকরণ ইত্যাদির মধ্যে একেবারে বাঁধা, মনের চেয়ে পুঁথির সঙ্গে তার যোগ বেশি। বাঙ্গালীর মন বাঙ্গলায় জুড়ে আছে, সুতরাং চলতি বাঙ্গলা চলেছে ও চলবে চিরকাল বাঙ্গালীর মনের গতির সঙ্গে নানা দিক থেকে নানা জিনিসে যুক্ত হতে হতে, ঠিক জলের ধারা যেমন চলে দেশ-বিদেশের মধ্যে দিয়ে। ছবির দিক দিয়েও এই বাঙ্গলার একটা চলতি ভাষা সৃষ্ট হয়ে ওঠা চাই, না হলে কোন কালের অজন্তার ছবির ভাষায় কি মোগলের ভাষায় অথবা খালি বিদেশের ভাষায় আটকে থাকা চলবে না। ঋষিরা ভাষাকে বৃষ্টিধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন—"হে ইন্দ্র, হে অগ্নি! মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় এই স্তোতা হইতে প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হইল।" বৃষ্টির জল ঝরনা দিয়ে নদী হয়ে বহমান হল, তবেই সে কাজের হল, আর জল আঁটি হয়ে হিমালয়ের চূড়ায় বসে রইল—গললও না চললও না, গলালেও না, চালালেও না, জলের থাকা না-থাকা সমান হল। বাঁধা বস্তুর বা style-এর মধ্যে এক এক সময়ে একটা একটা ভাষা ধরা পড়ে যায়। কথিত ভাষা চিত্রিত বা ইঙ্গিত করার ভাষা সবারি এই গতিক! যেমনি style বেঁধে গেল অমনি সেটা জনে-জনে কালে কালে একই ভাবে বর্তমান রয়ে গেল—নদী যেন বাঁধা পড়ল নিজের টেনে আনা বালির বাঁধে! নতুন কবি নতুন আর্টিস্ট এঁরা এসে নিজের মনের গতি ভাষার স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন তখন style উল্টে-পাল্টে ভাষা আবার চলতি রাস্তায় চলতে থাকে। এ যদি না হত তবে বেদের ভাষাই এখনো বলতেম, অজন্তার বা মোগলের ছবি এখনো লিখতেম এবং যাত্রা করেই বসে থাকতেম সবাই! ভাষা সকল গোলক-ধাঁধার মধ্যেই ঘুরে বেড়াত অথচ দেখে মনে হত ভাষা যেন কতই চলেছে!

টীকা

১. ঋক্‌বেদসংহিতা, ১ম মণ্ডল, ২য় সূক্ত, ১ম ঋক্

২. অরণ্যানী সূক্ত, ঋক্‌বেদসংহিতা, ১০ম মণ্ডল, ১৪৬ সূক্ত, ১—৬ ঋক্

শিল্পের সচলতা ও অচলতা

ছবি কবিতা অভিনয় যাই বলো সেটা চলল কি না এই নিয়ে কথা। যে বীজের মধ্যে মাটি ঠেলে ওঠবার শক্তি না পৌঁছল সে বীজ ফল থেকে বেড়ে চলতে চলতে গাছ হতে চলল না, কবির ভাষা ছবির ভাষা গায়ক নর্তক অভিনেতা এদের ভাষার পক্ষেও ঐ কথা। যে ভাষা প্রয়োগ করছে সেই দেখছে মন দিয়ে লেখা তীরের মতো সোজাসুজি চলে, কিন্তু অভিধান ইত্যাদি দিয়ে লেখা যতই ভারি করা যায়, শক্ত করা যায় ততই সে কচ্ছপের মতো আস্তে আস্তে চলে। অন্তরের শক্তি বীজকে ঠেলে নিয়ে চলে আলোর অভিমুখে রসাতল ভেদ করে, ভাষাকেও গতি দেয় পরিপুষ্টতার দিকে মানুষের অন্তর বা মনের গুণ। দু-একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি, মনের গুণ ভাষাতে গিয়ে পৌঁছয় এবং কাজও করে কতকটা—মনে যেখানে ছবি কি ছাপ পরিষ্কার নেই সেখানে ছবির রেখাপাত বর্ণবিন্যাস সমস্তের মধ্যে একটা আবল্য আলস্য অস্ফুটতা আমরা দেখতে পাই, কবিতার বেলায়ও এটা দেখি কথার মধ্যে যেন ঝোঁক নেই ঝিমিয়ে আছে আবোল-তাবোল বকে চলেছে ভাষা। —প্রথম উদাহরণ—

“ছার রিপু হলেতে নাশ গো শীঘ্র শিবা
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মাগো কিবা।
ছল ছল চক্ষু ছাড়ি ফাটেগো বন্ধনে
ছট ফট করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে।”

ভাষায় ত্বরা নেই ঝিমিয়ে চলেছে কেননা কবির মন এখানে ‘ছ’ অক্ষরের ফাঁকিটা লিখতে ছ-প্রমুখ বাক্যগুলোকে পটের সেপাইয়ের মতো খালি প্রতি ছত্রের গোড়াতে স্থিরভাবে দাঁড়াতে হুকুম করলেন, কাজেই কথাগুলো নড়াচড়া কিছুই করলে না, কাঠের সেপাই কাঠ হয়ে ভাষার চলার পথ আগলে রইল। খুব খানিক ঝোঁক দিয়ে এটা পড়ে যেতে চেষ্টা করলেই বুঝবে কতটা অচল এটা। অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত রসের দেবতা হলেন ব্রহ্মা, তাঁর পুরী বর্ণন হচ্ছে—

“কিবা মনোহর দেখিতে সুন্দর
শোভে ব্রহ্মপুর সবার উপর।
কনক রচিত মৃত্তিকা শোভিত
পীযুষ পূরিত স্থির সরোবর॥
কল্পতরু তায় কিবা শোভা পায়
ফল ধরে যায় ধর্ম মোক্ষ আদি।
পত্র পুষ্প তার ভক্তি তত্ত্ব সার
কেহ নাহি আর তাহাতে বিবাদি॥”

মনের সমস্ত স্পর্শ ও সুরের সঙ্গে বিবাদ করে যেখানে বিবাদ-বিসংবাদ নেই এমন ব্রহ্মলোক বর্ণন হল—যেন সাত পুকুরের বাগান বাড়ির ফটোগ্রাফ, তাও আবার অনেকখানি ঝাপসা, একটু অদ্ভুত রস পাওয়া যায় শুধু যেখানে কল্পবৃক্ষ গাছের ডালে ধর্ম মোক্ষ আর ভক্তিতত্ত্বের আম কাঁঠাল পেকে পেকে ঝুলছে। ভাষা চোস্ত হলে কি হয়, কথাগুলোকে তীরের মতো চালিয়ে দেবে যে গুণ তারি পরশ ঘটল না মোটেই কবিতাটায়।

খালি চোস্ত ভাষার দু-একটা রূপ বর্ণন শুনিয়ে দিই, দেখ দেখি মনে গিয়ে পৌঁছয় কি না—

"ভবজ অনুজরথ, তা তলে বিনতা সুত
কোরে কুমুদ বন্ধু সাজে
হরি হরি সন্নিধানে অলি রস পূরে বাণে
রমণী মুনির মন বান্ধে।
খগেন্দ্র নিকটে বসি রাজেন্দ্র বাজায় বাঁশি
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মূরছায়
কুন্তীর নন্দন মূলে কশ্যপ নন্দন দোলে
মনমথ মনমথ তায়—"

মনে গিয়ে বাজল না? আচ্ছা দেখি একটু মন দিয়ে—

"কিশোর বয়স মণি কাঞ্চনে আভরণ
ভালে চুড়া চিকন বনান
হেরইতে রূপ, সায়রে মন ডুবল,
বহু ভাগ্যে রহল পরাণ।"

মনে ধরেও ধরছে না? শব্দভেদী বাণে কিছু হল না, ব্রহ্মাস্ত্রেও নয়, আচ্ছা এইবার উপরো-উপরি গোটা তিনেক শক্তিশেল ছাড়ি, দেখি মনে পৌঁছয় কি না?—

"জিমুনা গো মুঞি জিমুনা—"

মন যে হরিণের মতো এগিয়ে আসছে! তাহলে সুর সন্ধান করা যাক মন দিয়ে এইবারে—

"মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা
শুণ শুণ পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ সে
তাহা বিনু আর কারু নই।"

এইবার মন কি বলছে শুনতে পাচ্ছ কি?

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।"

এইবার নিজের মনকে ফিরে ডাক, এই উত্তর পাও কি না বল—

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল

যউবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ।”

মুখে বলে যাওয়া আর মনের সঙ্গে বলে যাওয়া কথায় লেখায় চলায় ফেরায় অনেকখানি ধরন-ধারণ সমস্ত দিক দিয়েই যে তফাত হয় তা কে না বলবে! মন যে রচনাকে ফাঁকি দিয়ে গেল, তাকে খুব সব জমকালো বাক্য মন্ত্র মধ্যম তার স্বর অথবা বং চং ঢং ঢং শব্দকোষ অলঙ্কার ব্যাকরণ ইত্যাদির কৃত্রিম উপায়গুলো দিয়ে খানিক চালানো যেতে পারে না যে তা নয়, কিন্তু রঙিন কাগজে প্রস্তুত খেলনা প্রজাপতির মতো খানিক উড়েই ঝুপ করে পড়ে যায়। এই যে কবিতাটা হচ্ছে ‘করুণাময়ীর গালবাদ্য’, নাম শুনেই মনে হয় এতে অনেকখানি সুর তাল ইত্যাদি পাওয়া যাবে; কবিতাটা আরম্ভ হল ঐভাবে—‘গালবাদ্য ঘন ঘন’ কিন্তু এইটুকু বলেই কবি আন্‌মন হলেন, বাক্যশক্তি হারালেন, সুরের তার যেন পটাং করে ছিঁড়ে গেল, শোন,—“গালবাদ্য ঘন ঘন সজল-লোচন।” কোথায় বাদ্য কোথায় কান্না অকারণে! তারপর পতন ভূমিতে হঠাৎ— ‘গালবাদ্য ঘন ঘন, সজল-লোচন, প্রণাম যেমন বিধি’—এমন গালবাদ্য কবিতা এইভাবে মনের সঙ্গে বিযুক্ত, শুধু কথার মারপেঁচ অভিধান অলঙ্কার নিয়ে কতটা কৃত্রিমভাবে গড়ে উঠল দেখ—

“গালবাদ্য ঘন ঘন সজল লোচন
প্রণাম যেমন বিধি
অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রসীদ শঙ্কর বেদবিদাম্বর
কৃপাময় গুণনিধি!”

এইবার সব ছেড়ে মনকে দিলেন কবি খালি শব্দ দিয়ে কিছু রচনা করতে, চমৎকার শব্দ দিলে ভাষা—

“মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে
লটাপট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা
ছলচ্ছল টলটল কলকলতরঙ্গা।”

মনকে কবি চলতি ভাষার বাহনে চড়িয়ে ছেড়ে দিলেন, ভাষা ঝড় বইয়ে চলল এবারেও—

“দশদিক অন্ধকার করিল মেঘগণ
দুটো হয়ে বহে উনোপঞ্চাশ পবন।”

পঞ্চাশ এই শব্দটা বাতাস ধুলো কাঁকর আর বৃষ্টির একটা ঝাপটা দিয়ে গেল, উনো দুনো শব্দ দুটো থেকে থেকে বাতাসের সুর শুনিয়ে গেল, তারপরে একে একে ঝম ঝম বৃষ্টি নামল চেপে—

“ঝনঝনার ঝনঝনি বিদ্যুৎ চকমকি
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি
ঝড় ঝড়ি ঝড়ের জলের ঝরঝরি।”

যদি আর্টিস্টের মনের হাতে পড়ে, চলতি ভাষাও সাধু ভাষার বিনা সাহায্যেই এমন সুন্দরভাবে চলতে পারে, তবে কালীঘাটের পটের ভাষাকে চলতি বলে তুচ্ছ করা তো যায় না। আর্টিস্টের হাতে এই পটের ভাষা যে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না, তা কেমন করে বলা যায়! জাপানের প্রসিদ্ধ চিত্রকর হকুসাই এই পটের ভাষাতে

যে চমৎকার চিত্র সব লিখে গেছেন তা আজকের ইউরোপ দেখে অবাক হচ্ছে। তাই বলি যে-ভাষাই ব্যবহার করি না কেন, মনের হাতে তার লাগাম না তুলে দিয়ে তাকে চালিয়ে যাওয়া শক্ত। শব্দ সুর ছন্দ বাক্য রূপ ইঙ্গিত-ভঙ্গি—এরা ভাষাকে চালাবার মনকে বেঁধবার মহাস্ত্র বটে কিন্তু মনের হাতে এগুলো তুলে দেওয়া তো চাই। ধর ক্ষুরধার ছেনী ও গুরুভার হাতুড়ি নিয়ে বসা গেল পাষাণের অক্ষরে লিখতে, কিন্তু তার পূর্বে মন এঁচে নেয়নি কিছুই—বাটালি তেজে চলল, হাতুড়ি মহাশব্দে দিলে আঘাত; ফল হল, একটু পরে পাথর চূর্ণ-বিচূর্ণ হল, নয়তো পাথর থেকে বেরিয়ে এল মনের অনির্দিষ্টতা ও শূন্যতা।

বায়ু, যাঁর রূপ একেবারেই নেই ধ্বনি আছে, পদ নেই কিন্তু পদক্ষেপের চিহ্ন যিনি রেখে যান, অঙ্গ যাঁর দেখি না কিন্তু স্পর্শ করেন যিনি শীতল বা উষ্ণ, এই বায়ুকে রূপ দিয়ে নিরূপিত করা অন্যমনস্কভাবে তো যায় না। খালি ক্রিয়াপদ দিয়ে কখন পদ্য লেখা যায় না। কিন্তু এই ক্রিয়াপদ ছবিতে মূর্তিতে অভিনয়ে ঢের বেশি কাজ করে, কিন্তু এর সদ্ব্যবহার খুব পাকা আর্টিস্টের দ্বারাই সম্ভব। রাফেল-প্রমুখ পুরোনো ইতালীর আর্টিস্টরা ছবিতে বায়ু বইছে দেখাতে হলে আগে আগে ছবির আকাশপটে গোটাকতক গালফুলো ছেলে ফুঁ দিয়ে ঝাঁটার মতো খানিক ঝড় কি দক্ষিণ হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে এইটে আঁকতো, কিন্তু বায়ুর যথার্থ রূপ এমন চালাকি দিয়ে ধরানা-ধরা সমান, ওটা ছেলেমান্ষি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভারত-শিল্পের বায়ু দেবতার মূর্তি—তাও আমাদের ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের মতোই ছেলেমান্ষি পুতুল মাত্র। একই মূর্তি, একই হাবভাব, ভাবনার তারতম্য নেই। দেবমূর্তিগুলো তেত্রিশ কোটি হলেও একই ছাঁচে একই ভঙ্গিতে প্রায়শঃ গড়া, তারতম্য হচ্ছে শুধু বাহন মুদ্রা ইত্যাদির। একই বিষ্ণু যখন গরুড়ের উপরে তখন হলেন বিষ্ণু, সাতটা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে হলেন সূর্য! একই দেবীমূর্তি, মকরে চড়া হলেই হলেন তিনি গঙ্গা, কচ্ছপে বসে হলেন যমুনা! বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের রূপকল্পনার মধ্যে যে রকম-রকম ভাবনার ও মহিমার পার্থক্য, গ্রিক মূর্তি আপোলো, ভিনাস, জুপিটার, জুনো ইত্যাদির মূর্তির মধ্যে যে ভাবনাগত তারতম্য তা ভারতের লক্ষণাক্রান্ত মূর্তিসমূহে অল্পই দেখা যায়। একই মূর্তিকে একটু আসবাব রং চং আসন বাহন বদলে রকম রকম দেবতার রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। বায়ু আর বরুণ, জল আর বাতাস দুটো এক নয়, দুয়ের ভাষা ও ভাবনা এক হতে পারে না। এ পর্যন্ত একজন গ্রিক ভাস্কর ছাড়া আর কেউ বায়ুকে সুন্দর করে, পাথরের রেখায় ধরেছে বলে আমার জানা নেই। এ মূর্তির একটা ছাঁচ আচার্য জগদীশচন্দ্রের ওখানে দেখেছি—গ্রিক দেবীর পাথরের কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ভূমধ্য সাগরের বাতাস খেলছে চলছে শব্দ করছে—ছবি দেখে বুঝবে না, মূর্তিটা স্বচক্ষে দেখে এসো। এই যাঁর রূপ নেই অথচ ক্রিয়া আছে কথার ভাষায় সেই বায়ুকে দেবতাকে ক্রিয়া দিয়ে রূপ দিতে চেয়ে ঋষির মন যেমনি উদ্যত হল বুক ফুলিয়ে, বাতাসের দুর্দমনীয় গতি পৌঁছল অমনি ভাষায়; সে কতখানি তা ঋষির ভাষার অত্যন্ত বিশ্রী তর্জমাতেও ধরা পড়ে—"রথের ন্যায় যে বায়ু বেগে ধাবিত হন তাঁহাকে আমি বর্ণন করি, বজ্রধ্বনির ন্যায় ইঁহার ধ্বনি, আবার ইনি বৃক্ষসমূহ ভগ্ন করিতে আসেন, ইনি দিক্ বিদিক্ রক্তবর্ণ করিতে করিতে শূন্যপথে গমনাগমন করেন, ধরণীর ধূলি বিকীর্ণ করিতে-করিতে চলিয়া যান, পর্বতাদি যে কিছু স্থির পদার্থ তাহারা বায়ুর গতিবশে কম্পমান হইতে থাকে এবং ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায় তদ্রূপ এই বায়ুর প্রতি অভিগমন করে।" যুদ্ধের ঘোড়ার গতি নিয়ে কালিদাসেরও মনের ভাষা বার হয়েছিল বর্ষা-বর্ণনে—

"সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িৎপতাকোহশনিশব্দমর্দলঃ।

সমাগতো রাজবদুদ্ধততির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে॥"[১]

এই মনের উদ্দাম গতি বাঙ্গলা ভাষাকেও তেজে চালিয়ে নিলে—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে,
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর সরসা॥"

সারথির মানস রাশের মধ্য দিয়ে যেমন ঘোড়াতে গিয়ে পৌঁছয় তেমনি মনের ভাবনার সামান্য ইঙ্গিতও ভাষার মধ্যে দিয়ে চলাচল করে, তা সে ছবির ভাষা কবির ভাষা বা অভিনেতার কি গায়কের বা নর্তকের ভাষা, যে ভাষাই হোক। "The art of painting (নিরূপণ ও বর্ণনা-শিল্প সমস্তই) is perhaps the most indiscreet of all arts"—বাচন করা চলে ঢেকে ঢুকে আসল মনোভাব গোপন রেখে, কিন্তু বর্ণন করা চলে না সে ভাবে, যেমন, মেয়েটি কালো কিন্তু তার ঘটকালীটারও লোভ আছে বলে কন্যাকে 'শ্যামাঙ্গী' বলে বাচন করা গেল, কিন্তু তুলনায় বর্ণন করতে হলে মনের ভাব গোপন থাকা শক্ত, ধরা পড়ে যায় ঘটক। কথার যেটুকু বা বাচন করবার ফাঁক আছে ছবির তাও নেই; হুবহু বর্ণন, নয় মিথ্যা বর্ণন, দুই রাস্তা ছাড়া ছবির গতি নেই। ফটোগ্রাফ মেয়ের কালো রঙটার বেলায় ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারে, ছবি কিন্তু পারে না। সত্যি বলতেই হয় মনকে ছবিতে ধরবার বেলায়, এইজন্যই বলা হল—"It is an unimpeachable witness to the moral state of the painter at the moment when he held the brush (শতং বদ মা লিখ) all the shades of his nature even to the lapses of his sensibility all this is told by the painter's work as clearly as if he were telling it in our ears."— FROMENTIN.

হাওয়া যেখানে নেই সেখানে শব্দ হয় না, জ্বাললেও আগুন ধরে না, আলো যেখানে নেই রূপ সেখানে থেকেও নেই, তেমনি মন যেখানে নেই কথা সেখানে থেকেও নেই, মনে বেদন এল, নিবেদন হল তবে ছবিতে কবিতায় নাট্যে। মন কার নেই? কিন্তু মনের কথা গুছিয়ে বলার ক্ষমতা যার তার নেই এটা ঠিক। ছাত্র পরীক্ষার দিনে খুব মনের আবেগ ও মনঃসংযোগ দিয়ে লিখছে; সে মন এক, আর সেই ছাত্রই দেশে গিয়ে যাত্রা জুড়েছে, কি মাঠে বসে মন দিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে, সে মন অন্য প্রকার। তেমনই সাধারণ মন আর রসায়িত মন, কবির মন আর্টিস্টের মন আর তাদের হুঁকোবরদারের মন ও মনের আবেগে তফাত আছে। খুব খানিক মনের আবেগ নিয়ে লিখে কিংবা বলে কয়ে চললেই কবি চিত্রকর অভিনেতা হয় তা নয়। অভিনেতা যদি মনের আবেগে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো রুদ্র মূর্তিতে বেরিয়ে সত্যই দ্বিতীয় অভিনেত্রীর গলা কেটে বসে তবে তাকে নট বলবে, না পাগল, মূর্খ এসব সম্বোধন করবে দর্শকরা! কিংবা রঙ্গমঞ্চের নাচে দর্শকদের মধ্যে কেউ যদি মনের আবেগে মুগ্ধ হয়ে হঠাৎ কোমর বেঁধে নানা অঙ্গভঙ্গি শুরু করে দেয় তবে তাকে নটরাজ বলে ডাকে কেউ! অভিনেত্রী বেশ তাল লয় সুর দিয়ে কেঁদে চলেছে, হঠাৎ উপরের বক্স থেকে আবেগভরে ছেলে-কাঁদা ও ঘুম-পাড়ানো শুরু হল, তার বেলায় শ্রোতারা ধমকে ওঠে কেন ছেলেকে ও ছেলের মাকে? মনের আবেগ তো যথেষ্ট সেখানে ভাষায় প্রকাশ হচ্ছিল কিন্তু বলে তো চলল না সেটা! তবেই দেখ শিল্পের অনুকূল আর প্রতিকূল এই দুই রকম মনের পরশ রয়েছে। মালি যেমন বেছে বেছে ফুল নেয়, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুলের তোড়া ফুলের হার গাঁথে, শিল্পীর মনের পরশ ঠিক সেইভাবে কাজ করে যায় বাক্য রং রেখা ভঙ্গি ইত্যাদিকে

ভাবের সূত্রে ধরে ধরে। নিছক আবেগের উচ্ছৃঙ্খলতা আছে, সংযম নির্বাচন এসব নেই। ছেলে কাঁদার ঠিক উল্টো যে পাকা নটীর কান্নার সুর কৃত্রিম সুরে হলেও সেটা মনোরম হয় শিল্পীর বর্ণন ভঙ্গি নির্বাচন ইত্যাদি নিয়ে। বাপ্পের মতো শুধু খানিক আবেগের সঞ্চয় নিয়ে ছবি বলো আর লেখাই বলো শিল্প বলে যে চলে না তার নমুনা এই—

"কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে,
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে!
শ্যাম কেশ পক্ক হবে,
ক্রমে সব দন্ত যাবে,
গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছুদিনে;
লোল চর্ম কদাকার।
কফ কাশ দুনির্বার,
হস্ত পদ শিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণে-ক্ষণে।"

এর জুড়ি মূর্তি কতকটা সেই গান্ধারের কঙ্কালসার বুদ্ধ। জীবনকে কুশ্রী আর দীনতা দিয়ে যে শিল্পী নয় কবিও নয় তার ভাবা বিকট রকমে বীভৎসরূপে দেখাল। যাকে বলে inartistic reality তাই, এইবার যিনি কবি তিনি কি সুন্দর করে বললেন ঐ কথাটাই দেখ, এও reality কিন্তু কুশ্রী নয়, artistic reality যাকে বলে তাই—

"মন তুমি কি রঙ্গে আছ, ভোলা মন, রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ,
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ঘোরা ফেরা, দুঃখে রোদন সুখে নাচ।
রঙের বেলা রঙের কড়ি, সোনার দরে তাও কিনেছ
দুখের বেলা রতন মাণিক মাটির দরে তাও বেচেছ।
সুখের ঘরে রূপের বাসা, সে রূপে মন মজে আছ।
যখন সে রূপ হইবে বিরূপ, সে রূপের কি রূপ ভেবেছ!"

"...There is true and false realisation, there is a realisation which seeks to impress the vital essence of the subject and there is a realisation which bases its success upon its power to present a deceptive illusion."—R. G. HATTON.

কাঁচা অভিনেতা realism-এর পথে গেয়ে নাটকের বিষয়টাকে তর্জন গর্জন করে যেন দর্শকের নাকের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চলে, আর পাকা অভিনেতা শিল্পীর সংযম নিয়ে সেই বিষয়টাই দিয়ে যায় অথচ ফল হয় তাতে বেশি দর্শকের উপরে। এইজন্যই ঋষিরা বলেছেন, বাক্যকে মনের সঙ্গে যুক্ত করো—'কায়েন মনসা বাচা' ছবি লেখো কথা বলো অভিনয় করো, সাফল্যলাভ করতে বিলম্ব হবে না। কথা তো বলতে পারে সবাই, চলেও সবাই রঙ্গে ভঙ্গে, ছবিও লেখে অনেকে, কিন্তু ভাষাকে পায় না সবাই,—"যেমন প্রেম-পরিপূর্ণা সুন্দর-পরিচ্ছদধারিণী ভার্যা আপন স্বামীর নিকট নিজ দেহ প্রকাশ করেন তদ্রূপ বাগ্‌দেবী কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হয়েন।" বাগ্‌দেবীর দেহ মন অতি বিচিত্র ভাষা সমস্ত নিয়ে যার কাছে অপ্রকাশিত রইল হাজারখানা nude studyতে তার কি ফল হবে? লজ্জার আবরণ ছেড়ে দিয়ে আধুনিক nude ছবির যে ভাষা, আর পাথরের অন্তঃপুর ছেড়ে নিরাবরণ নিরাভরণ বেরিয়ে এসেছিল গ্রিক ও ভারত শিল্পীর যে দেবীর মতো অনবগুণ্ঠিতা

সুন্দরী তার যে ভাষা, দুয়ের কতখানি তফাত রয়েছে reality আর ideality নিয়ে বুঝে দেখ। ছবিকে কেবলি দেখা ও ভোগ করার রাজত্ব থেকে কথা ও ভাষার কোঠায় টেনে আনার সম্বন্ধে সবার মত হবে না। তাঁরা বলেন—কথা বললা কবিতা বলো উপকথা বলো তার তো স্বতন্ত্র রাস্তা; আর্ট বর্ণমালার পুস্তক, নীতিশাস্ত্র কিংবা কথামালা হতে বাধ্য নয়, একে সৌন্দর্য ও তার অনুভূতির রাস্তাতে চালানোই ঠিক। একথা মানতেম যদি রূপের জগতে এমন বিশেষ পদার্থ একটা থাকত যে নির্বাক নিশ্চল। বিন্দু, সে বলে আমি চোখের জল, শিশিরফোঁটা, কত কি! মৃত্যু, সেও বলে আমি চলেছি আর ফিরব না, গভীর সান্ত্বনা আমি, নিদারুণ আমি, সকরুণ আমি। ফুলের সঙ্গে ফুলদানিটাও যদি কথা না কইত তবে কি তারা মানুষের মনে ধরত? নির্বাক যে সেও ইঙ্গিতে বলে—আমি বলতে পারছিনে মন কি করছে! অবোধ যারা তারাই কেবল বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক অদ্ভুত আর্টের কল্পনাজাল বুনে-বুনে নিজেকে ও নিজের শিল্পকে গুটির মধ্যে গুটিপোকার মতো বদ্ধ করে রাখতে চায়। শিল্প যে আনন্দ দেয় সেই আনন্দই তার ভাষা—আনন্দকাকলী আনন্দের দোলা—

"কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ!
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ।"

মহাশূন্য, তার নিজের বাক্য দিয়ে সেও পরিপূর্ণ রয়েছে! বাক্যকে ছেড়ে চলতে পারে কি! বেদের বাগ্‌দেবীর উক্তি কি মহিমা নিয়ে অভ্রভেদী একটি মূর্তির মতো আপনাকে প্রকাশ করেছে দেখো—"আদিত্যগণ বিশ্বদেবতাগণ রুদ্রগণ এবং বসুগণের সহিত আমি বিচরণ করিতেছি। মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বীদ্বয়কে আমি ধারণ করি। প্রস্তরাঘাত হইতে উৎপন্ন যে সোমরস তাহাকে তষ্টাকে পূষণকে ভাগকে আমি ধারণ করি। ...যজ্ঞোপযোগী উপকরণসমূহের মধ্যে প্রথমা আমি। ...এতাদৃশা আমাকে দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, অপরিমেয় আমার আশ্রয়স্থানে তাবৎ প্রাণিগণের মধ্যে আমি আবিষ্ট আছি। ...যিনি দর্শন করেন প্রাণ ধারণ করেন কথা শ্রবণ করেন তিনি আমারই সহায়তাতে সেইসকল কার্য করেন...আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি...আমি আকাশকে প্রসব করিয়াছি...সমুদ্রের জলের মধ্যে আমার স্থান, সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি। আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা বৃহৎ হইয়া দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে...॥"

বিরাট এই বিশ্বচরাচর, যার প্রাণী বিশাল, অতি বৃহৎ যার রূপ, তার এই মূর্তি! অতি পুরাতন ঈজিপ্টের ভাস্কর কঠিন প্রস্তরে যে বিরাটত্ব আর বিশালত্ব দিয়ে আপনার দেবদেবীর মহিমা কীর্তন করেছে তারি তুল্যমূল্য শিল্প এই স্তোত্র-রচনার ভাস্কর ভাষা দিয়ে ধরে রেখেছে। এর পাশে রঙিন রাংতা জড়ানো পাকাটির বীণাহাতে আমাদের এখনকার খেলার সরস্বতীর মূর্তিটি ধরে দেখ কিংবা একটি তুলসীমঞ্চের উপরে সাজানো শ্বেত পাথরের এতটুকু ভিনাস মূর্তিকেও ধরে দেখো, মূর্তিশিল্পের ভাষা হিমালয়ের ঊর্ধ্ব থেকে উইঢিবিতে এসে পড়ে কি না! চটক এবং চাকচিক্যময় ক্ষণিক পদার্থটার উপভোগের অনিত্যতার উপরে, কিংবা ক্ষণিক শ্রুতিসুখ দৃষ্টিসুখ ইত্যাদির উপরে শিল্পরচনার ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করলে বাণীকে নামিয়ে দেওয়া হয় আকাশ থেকে রসাতলে, যেমন—

"... ... ... রূপ নিরুপম সোহিনী
শারদ পার্বণ—বিধুবরানন, পঙ্কজ কানন মেদিনী।

কুঞ্জর-গামিনী-কুঞ্জ-বিলাসিনী, লোচন খঞ্জন-গঞ্জিনী।
কোকিল-নাদিনী, গীঃ পরিবাদিনী, হ্রীঃ পরিবাদ-বিধায়িনী।
ভারত-মানস মানস-সরস, বাস বিনোদ বিধায়িনী।”

এর থেকে আর একটুখানি নামলেই কেবল সুর সার বাক্য রেখা রং ইত্যাদি দিয়ে মনের চোখে কানে সুড়সুড়ি দেওয়া—

“নাহি তালবোধ ভাল, নিত্য ধ্বংস কারক।
চিত্ত মর্ম, ধর্মকর্ম, মর্ম বোধ জারক।”

চতুরশীতি লক্ষ জন্মের তপস্যালব্ধ জীবনটা নিয়েই মানুষ যখন ছিনিমিনি খেলে বেড়াচ্ছে, তখন যুগ-যুগান্তরের তপস্যা দিয়ে কত মহৎ জীবনের ব্যর্থতার দুঃখ থেকে সার্থকতার আনন্দ দিয়ে লাভ করা ভাষাসমূহকে নিয়ে মানুষ যে নয়-ছয় করে খেলা করবে তার বাধা কি? শিল্পীরূপিণী সুন্দরী ভাষাকে পেতে তপস্যার দুঃখ আছে— "art interprets the mightier speech of nature. It is a poetical language for it is an utterance of the imaginated addressed to the imaginated and to rouse emotion".— GILBERT.

অনাহতের ধ্বনি ব্যক্ত করে যে ভাষা, অরূপের ইঙ্গিত ও রূপ দর্শন করার যে ভাষা, নিশ্চল নির্বাক পাষাণকে চলায় বলায় যে ভাষা, তাকে বিনা সাধনায় মনে করলেই কি কেউ পেয়ে থাকে! ভাষা যখন তপোবনের ঋষিদের তপস্যার সামগ্রী, তখন তাঁরা যে কোন দুর্ভেদ্যতার দুর্গ থেকে বাণীকে জয় করে এনেছিলেন তা তাঁরা জানিয়ে গেছেন— “সোমরস নিপীড়ন করিতে করিতে এই প্রস্তর সকল কথা কহুক, আমরাও কথা কহি, ইহারা কথা বলিতেছে, ইহাদের কথায় কথা কও...ইহারা শব্দ করিতেছে...ইহাদের শব্দে পৃথিবী ধ্বনিত হইতেছে...ইহাদের শব্দ শুনিয়া জ্ঞান হয় যেন পক্ষীরা আকাশে কলরব করিতেছে... তৃণভূমিতে কৃষ্ণসার হরিণেরা যেন চলাচল করিয়া নৃত্য করিতেছে...সোমরস নিপীড়ন-কালে প্রস্তরেরা শব্দ করিতেছে, যেন ক্রীড়াভূমিতে ক্রীড়াসক্ত শিশুরা জননীকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া কোলাহল করিতেছে।” ভাষার তপস্যায় বলীয়ান্ মানুষ পাথরের কারাগার থেকে বার করে নিয়ে এল যে ভাষাকে, চিরসুধাময়ী রসের নির্ঝরিণী তারি চতুঃষষ্টি ধারা হল—কথা, ছবি, মূর্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি কলাবিদ্যা।

টীকা

১. ২য় সর্গ, ঋতুসংহারম্ (কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ)

সৌন্দর্যের সন্ধান

সুন্দরের সঙ্গে তাবৎ জীবেরই মনে ধরার সম্পর্ক, আর অসুন্দরের সঙ্গে হল মনে না ধরার ঝগড়া। ইমারতে ঘেরা বন্দিশালার মতো এই যে শহরের মধ্যে এখানে ওখানে একটুখানি বাগান, অনেকখানিই যার মরা এবং শ্রীহীন, এদের পাখি প্রজাপতির মনে ধরেছে তবেই না এরা এইসব বাগানে বাসা বেঁধে এই ধুলোমাখা রোদে সকাল সন্ধ্যে ডানা মেলে সুরে ছন্দে ভরে তুলছে শহরের বুকের আবদ্ধ অফুলন্ত স্থানটুকু! আর এইসব বাগানের ধারেই রাস্তায় বসে খেলছে ছেলেরা———শিশুপ্রাণ তাদের মনে ধরেছে বাগানের ফুলকে ছেড়ে রাস্তার ধুলো মাটি, তাই তো খেলছে ওরা ধুলোকে নিয়ে ধুলোখেলা! রথের দিনে রথো সামগ্রী ——সোলার ফুল পাতার বাঁশি——তার সুর আর রং আর পরিমল ছড়িয়ে পড়েছে বাদলার দিনে—— রথতলার আর খেলাঘরের ছেলে বুড়োর মেলায়, তাই না আজ দেখছি নিজেদের ঘর সাজাচ্ছে মানুষ সোলার ফুলে মাটির খেলনায়! তেমনি সে আমার নিজের কোণটি, দেওয়ালের ফাঁকে ভাঙা কাচের মতো একখণ্ড আকাশ—— ময়লা ঝাপ্‌সা প্রাচীরে ঘেরা চারটিখানি ঘাস চোরকাঁটা আর দোপাটি ফুলের খেলাঘর, সবই মনে ধরেছে আমার, তাই না কোণের দিকে মন থেকে থেকে দৌড় দিচ্ছে, চোরকাঁটার বনে লুকোচুরি খেলছে, নয়তো দোপাটি ফুলের রঙের ছাপ নিয়ে লিখছে ছবি, স্বপন দেখছে রকম রকম, আর থেকে থেকে ঠিক নাকের সামনে মাড়োয়ারিদের আকাশ বাতাস আড়াল——করা চৌতলা পাঁচতলা বাড়িগুলোর সঙ্গে আড়ি দিয়ে বলে চলেছে বিশ্রী বিশী বিশ্রী! মাড়োয়ারি গৃহস্থরা কিন্তু ওদের পায়রার খোপগুলোকে সুন্দর বাসা বলেই বোধ করছে এবং তাদের নাকের সামনে আমাদের সেকেলে বাড়ি আর ভাঙাচোরা বাগানকে অসুন্দর বলছে! কাজেই বলতে হবে আয়নাতে যেমন নিজের নিজের চেহারা তেমনি মনের দর্পণেও আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মনোমতোকে সুন্দরই দেখি। কারু কাছ থেকে ধার-করা আয়না এনে যে আমরা সুন্দরকে দেখতে পাব তার উপায় নেই। সুন্দরকে ধরবার জন্যে নানা মুনি নানা মতো আরশি আমাদের জন্যে সৃজন করে গেছেন, সেগুলো দিয়ে সুন্দরকে দেখার যদি একটুও সুবিধে হত তো মানুষ কোন কালে এইসব আয়নার কাচ গালিয়ে মস্ত একটা আতশী কাচের চশমা বানিয়ে চোখে পরে বসে থাকত, সুন্দরের খোঁজে কেউ চলত না; কিন্তু সুন্দরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরকন্না তাই সেখানে অন্যের মনোমতোকে নিয়ে থাকাই চলে না, খুঁজে পেতে আনতে হয় নিজের মনোমতোটি।

জীবের মনস্তত্ত্ব যেমন জটিল যেমন অপার, সুন্দরও তেমনি বিচিত্র তেমনি অপরিমেয়। কেউ কাজকে দেখছে সুন্দর সে দিনরাত কাজের ধান্ধায় ছুটছে, কেউ দেখছে অকাজকে সুন্দর সে সেই দিকেই চলেছে, কিন্তু মনে রয়েছে দু-জনেরই সুন্দর কাজ অথবা সুন্দর রকমের অকাজ! ধনী খুঁজে ফিরছে তার সর্বস্ব আগ্‌লাবার সুন্দর চাবিকাঠি, বিশ্রী তালাচাবি কেউ খোঁজে না——আর দেখো চোর সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সন্ধি কাটবার সুন্দর সিঁদ! ভক্ত খুঁজছেন ভক্তিকে, শাক্ত খুঁজছেন শক্তিকে আর নর খোঁজে গাড়িজুড়ি, বি. এ. পাসের পরেই বিয়েতে

সোনার ঘড়ি এবং তার কিছু পরেই চাকরি এবং এমন সুন্দর একটা বাসাবাড়ি যেখানে সব জিনিস সুন্দর করে উপভোগ করা যায়। হা-হুতাশ কচ্ছেন কবি কল্পনালক্ষ্মীর জন্যে এবং ছবি-লিখিয়ের হা-হুতাশ হচ্ছে কলালক্ষ্মীর জন্যে, ধরতে গেলে সব হা-হুতাশ যা চাই সেটা সুন্দরভাবে পাই এইজন্যে, অসুন্দরের জন্যে একেবারেই নয়। সুন্দরের রূপ ও তার লক্ষণাদি সম্বন্ধে জনে-জনে মতভেদ কিন্তু সুন্দরের আকর্ষণ যে প্রকাণ্ড আকর্ষণ এবং তা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়ানো সে বিষয়ে দুই মত নেই।

যেভাবেই হোক যা কিছু বা যারই সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি তার দুটো দিক আছে— একটা মনে ধরার দিক যেটাকে বলা যায় বস্তুর ও ভাবের সুন্দর দিক, আর একটা মনে না ধরার দিক যেটাকে বলা চলে অসুন্দর দিক, আমাদের জনে-জনে মনেরও ঐ দু রকম দৃষ্টি—যাকে বলা যায় শুভ আর অশুভ বা সু আর কু দৃষ্টি। কাজেই দেখি, যে দেখছে তার মন আর যাকে দেখছে তার মন—এই দুই মন ভিতরে ভিতরে মিলল তো সুন্দরের স্বাদ পাওয়া গেল, না হলেই গোল। রাধিকা কৃষ্ণকে সুরূপ শ্যামসুন্দর দেখেছিলেন, তারপর অনঙ্গভীমদেব এবং তারপর থেকে আমাদের সবার কাছে রূপকসুন্দরভাবে কৃষ্ণ এলেন, এই দুই মূর্তিই আমাদের শিল্পে ধরা হয়েছে, এখন কোন সমালোচকের সৌন্দর্য সমালোচনার উপর নির্ভর করে এই দুই মূর্তির বিচার করব? আ-কা-শ এই তিনটে অক্ষরে আকাশ-জ্ঞানটাই রূপকের দল বলবে ভাল, কিন্তু রূপের সেবক তারা বলবে 'নব-নীরদ-শ্যাম' যা দেখে চোখ ভুলল মন ঝুরল, যার মোহন ছায়া তমাল গাছে যমুনার জলে এসে পড়ল সেই সুন্দর। সুন্দর-অসুন্দর সম্বন্ধে শেষ কথা যদি কেউ বলতে পারে তো আমাদের নিজের নিজের মন। পণ্ডিতের কাজই হচ্ছে বিচার করা এবং বিচার করে দেখতে হলেই বিষয়কে বিশ্লেষ করে দেখতে হয়, সুতরাং সুন্দরকেও নানা মুনি নানা ভাবে বিশ্লেষ করে দেখেছেন, তার ফলে তিল তিল সৌন্দর্য নিয়ে তিলোত্তমা গড়ে তোলবার একটা পরীক্ষা আমাদের দেশে এবং গ্রিসে হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষের মন সেই প্রথাকে সুন্দর বলে স্বীকার করেনি এবং সেই প্রথায় গড়া মূর্তিকেই সৌন্দর্যসৃষ্টির শেষ বলেও গ্রাহ্য করেনি। বিশেষ বিশেষ আর্টের পক্ষপাতী পণ্ডিতেরা ছাড়া কোনো আর্টিস্ট বলেনি অন্য সুন্দর নেই, ঐটেই সুন্দর। আমাদের দেশ যখন বললে—সুন্দর গড়ো কিন্তু সুন্দর মানুষ গোড়ো না, সুন্দর করে দেবমূর্তি গড়ো সেই ভাল, ঠিক সেই সময় গ্রিস বললে—না, মানুষকে করে তোল সুন্দর দেবতার প্রায় কিংবা দেবতাকে করে তোল প্রায় মানুষ! আবার চীন বললে—খবরদার, দেবভাবাপন্ন মানুষকে গড়ো তো দৈহিক এবং ঐহিক সৌন্দর্যকে একটুও প্রশ্রয় দিও না চিত্রে বা মূর্তিতে। নিগ্রোদের আর্ট, যার আদর এখন ইউরোপের প্রত্যেক আর্টিস্ট করছে তার মধ্যে আশ্চর্য রং-রেখার খেলা এবং ভাস্কর্য দিয়ে আমরা যাকে বলি বেঢপ বেয়াড়া তাকেই সুন্দরভাবে দেখানো হচ্ছে।

সুতরাং সুন্দরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শ আর্টিস্টের নিজের নিজের মনে ছাড়া বাইরে নেই, কোনো কালে ছিল না, কোনো কালে থাকবেও না এটা একেবারে নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে। সুন্দর যদি খিচুড়ি হত তবে এতদিনে সৌন্দর্যের তিল ও তাল মিলিয়ে কোনো-এক বেরসিক পরম সুন্দর করে সেটা প্রস্তুত করে যেত তথাকথিত কলারসিকদের জন্য, কিন্তু একমাত্র যাঁকে মানুষ বললে 'রসো বৈ সঃ' তিনিও সুন্দরের পরিপূর্ণ আদর্শ জনে-জনে মনে-মনে ছাড়া আপনার সৃষ্টিতে একত্র ও সম্পূর্ণভাবে কোথাও রাখেননি। তাঁর সৃষ্টি, এটি সুন্দর অসুন্দর দুই-ই, এবং সব দিক দিয়ে অপূর্ণও নয় পরিপূর্ণও নয় এই কথাই তিনি স্পষ্ট করে যে জানতে চায় তাকেই জানিয়েছেন। শান্তিতে-অশান্তিতে সুখে-দুঃখে সুন্দরে-অসুন্দরে মিলিয়ে হল ছোট এই নীড়, তারি

মধ্যে এসে মানুষের জীবনকণা পরম সুন্দরের আলো পেয়ে ক্ষণিকের শিশিরবিন্দুর মতো নতুন নতুন সুন্দর প্রভা সুন্দর স্বপ্ন রচনা করে চলল। এই হল প্রথম শিল্পীর মানস কল্পনা ও এই বিশ্বরচনার নিয়ম, এ নিয়ম অতিক্রম করে কোনো কিছুতে পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে পারে এমন আর্টও নেই আর্টিস্টও নেই। যা বিশ্বের মানুষের মনে বিচিত্র পদার্থের মধ্য দিয়ে বিচিত্র হয়ে ফুটতে চাচ্ছে সেই পরম সুন্দরের স্পৃহা জেগেই রইল, মিটল না। যদি পরম সুন্দরের প্রত্যক্ষ উপমান পেয়ে সত্যই কোনো দিন মিটে যায় মানুষের এই স্পৃহা, তবে ফুলের ফুটে ওঠার, নদীর ভরে ওঠার, পাতার ঘন সবুজ হয়ে ওঠার, আগুনের জ্বলে ওঠার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও ছবি আঁকা মূর্তি গড়া কবিতা লেখা গান গাওয়া ইত্যাদির স্পৃহা আর থাকে না। চাঁদ একটুখানি চাঁচ্নী থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠবার দিকে গেলেও যেমন শেষে একটুখানি অপরিণতি তার গোলটার মধ্যে থেকেই যায়, তেমনি মানুষের আর্টও কোথাও কখনো পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠে না। মানুষ জানে সে নিজে অপূর্ণ, তাই পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা তার এতখানি। গ্রিস ভারত চীন ঈজিপ্ট সবাই দেখি পরম সুন্দরের দিকে চলেছে, কিন্তু সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা কেউ পায়নি, কেবল পেতে চাওয়ার দিকেই চলেছে। আজ যেখানে মনে হল আর্ট দিয়ে বুঝি যতটা সুন্দর হতে পারে তাই হল, কাল দেখি সেইখানেই এক শিল্পী দাঁড়িয়ে বলছে, হয়নি, আরো এগোতে হবে কিংবা পিছিয়ে অন্য পন্থা ধরতে হবে। পরম সুন্দরের দিকে মানুষের মন ও সঙ্গে সঙ্গে তার আর্টের গতি ঠিক এইভাবেই চলেছে—গতি থেকে গতিতে পৌঁছোচ্ছে আর্ট, এবং একটা গতি আর-একটা গতি সৃষ্টি করছে, ঢেউ উঠলো ঠেলে, মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে পেয়েছি অমনি আর-এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, চলো, আরো বাকি আছে। এইভাবে সামনে আশেপাশে নানা দিক থেকে পরম সুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতি তার আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্র রূপ ধরে আসছে—চিরযৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন নতুন।

মানুষ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনে মনে ভাবে, সুন্দর! ঠিক সেই সময় আর একটি সুন্দর মুখের ছায়া আয়নায় পড়ে; যে ভাবছিল সে অবাক হয়ে বলে, তুমি যে আমার চেয়ে সুন্দর, অমনি স্বপ্নের মতো সুন্দর ছায়া হেসে বলে, আমার চোখে তুমি সুন্দর! এইভাবে এক আর্টে আর এক আর্টে, এক সুন্দরে আর এক সুন্দরে পরিচয়ের খেলা চলেছে, জগৎ-জুড়ে সুন্দর মনের সুন্দরের সঙ্গে মনে মনে খেলা। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে আর্ট দিয়ে ধরতে পারলে এ খেলা কোন কালে শেষ হয়ে যেত। যে মাছ ধরে তার ছিপে যদি মৎস্য-অবতার উঠে আসত তবে সে মানুষ কোনো দিন আর মাছ ধরাধরি খেলা করত না, সে তখনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে কলম হাতে মাছ বিক্রির হিসেব পরীক্ষা করতে বসত, আর যদি তখনও খেলার আশা তার কিছু থাকত তো এমন জায়গায় গিয়ে বসত যেখানে ছিপে মাছ ধরাই দিতে আসে না, ধরি-ধরি করতে করতে পালায়! পরম সুন্দর যিনি তিনি লুকোচুরি খেলতে জানেন, তাই নিজে লুকিয়ে থেকে বাতাসের মধ্য দিয়ে তাঁর একটু রূপের পরিমল, আলোর মধ্য দিয়ে চকিতের মতো দেখা ইত্যাদি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি আর্টিস্টদের খেলিয়ে নিয়ে বেড়ান, আর্টিস্টের মনও সেইজন্যে এই খেলাতে সাড়া দেয়, খেলা চলেও সেই জন্যে। এক-একটা ছেলে আছে খেলতে জানে না খেলার আরম্ভেই হঠাৎ কোণ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ধরা পড়ে রস-ভঙ্গ করে দেয় আর সব ছেলেগুলো তার সঙ্গে আড়ি দিয়ে বসে। তেমনি পরম সুন্দরও যদি আর্টিস্টদের সামনে হঠাৎ বেরিয়ে এসে রসভঙ্গ করতে বসেন তবে আর্টিস্টরা তাঁকে নিয়ে বড় গোলে পড়ে যায় নিশ্চয়ই। আর্টিস্টরা ভক্তেরা কবিরা

—পরম সুন্দরের সঙ্গে সুন্দর-সুন্দর খেলা খেলেন কিন্তু পণ্ডিতেরা পরম সুন্দরকে অণুবীক্ষণের উপরে চড়িয়ে তাঁর হাড়হদ্দের সঠিক হিসেব নিতে বসেন। কাজেই দেখি যারা খেলে আর যারা খেলে না সৌন্দর্য সম্বন্ধে এ দুয়ের ধারণা এবং উক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। পণ্ডিতেরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট কথা লিখে ছাপিয়ে গেছেন, সেগুলো পড়ে নেওয়া সহজ কিন্তু পড়ে তার মধ্য থেকে সৌন্দর্যের আবিষ্কার করাই শক্ত। আর্টিস্ট তারা সুন্দরকে নিয়ে খেলা করে সুন্দরকে ধরে আনে চোখের সামনে মনের সামনে অথচ সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলতে গেলে সব আগেই তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায় দেখতে পাই। ‘সুন্দর কাকে বলো’ এই প্রশ্নের জবাবে আর্টিস্ট ডুরার বললেন, ‘আমি ওসব জানিনে বাপু’ অথচ তাঁর তুলির আগায় সুন্দর বাসা বেঁধেছিল। লিয়োনার্ডো দ্য ভিন্‌চি যাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর্ট থেকে আরম্ভ করে বিচিত্র জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে গেছে, তিনি বলেছেন—পরম সুন্দর ও চমৎকার অসুন্দর দুই-ই দুর্লভ, পাঁচপাঁচিই জগতে প্রচুর।

এক সময়ে আর্টিস্টদের মনে জায়গা জায়গা থেকে তিল-তিল করে বস্তুর খণ্ড খণ্ড সুন্দর অংশ নিয়ে একটা পরিপূর্ণ সুন্দর মূর্তি রচনা করার মতলব জেগেছিল। গ্রিসে এক কারিগর এইভাবে হেলেনের চিত্র পাঁচ জন গ্রিক সুন্দরীর পঞ্চাশ টুকরো থেকে রচনা করে সমস্ত গ্রিসকে চমকে দিয়েছিল। কিছুদিন ধরে ঐ মূর্তিরই জল্পনা চলল বটে কিন্তু চিরদিন নয়, শেষে এমনও দিন এল যে ঐভাবে তিলোত্তমা গড়ার চেষ্টা ভারি মূর্খতা একথাও আর্টিস্টরা বলে বসল! আমাদের দেশেও ঐ একই ঘটনা—শাস্ত্রসম্মত মূর্তিকেই রম্য বলে পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করলেন, সে শাস্ত্র আর কিছু নয় কতকগুলো মাপজোখ এবং পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিলফুল, শুকচঞ্চু, কদলীকাণ্ড, কুক্কুটাণ্ড, নিম্বপত্র এইসব মিলিয়ে সৌন্দর্যের এবং আধ্যাত্মিকতার একটা পেটেন্ট খাদ্যসামগ্রী! মনের খোরাক এভাবে প্রস্তুত হয় না, কাজেই আমাদের শাস্ত্রসম্মত সুতরাং বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক যে artificiality তা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগলেও সেখানেই আর্ট শেষ হল না একথা খাটল না। একেষাং মতম্‌ বলে একটা জিনিস সে বলে উঠল ‘তদ্‌ রম্যং যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ’, মানে যার যা ধরল সেই হল সুন্দর। এখন তর্ক ওঠে—মনে ধরা না-ধরার উপরে সুন্দর-অসুন্দরের বিচার যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে কিছু সুন্দর কিছুই অসুন্দর থাকে না সবই সুন্দর সবই অসুন্দর প্রতিপন্ন হয়ে যায়, কোনো কিছুর একটা আদর্শ থাকে না। ভক্ত বলেন ভক্তিরসই সুন্দর আর সব অসুন্দর, যেমন শ্রীচৈতন্য বললেন—

“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥”[১]

আর্টিস্ট বললেন,—কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে ইত্যাদি।[২] যার মন যেটাতে টানল তার কাছে সেইটেই হল সুন্দর অন্য সবার চেয়ে। এখন সহজেই আমাদের মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয়—কোন দিকে যাই, ভক্তের ফুলের সাজিতে গিয়ে উঠি, না আর্টিস্টের বাঁশিতে গিয়ে বাজি? কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায়, ঘোরতর বৈরাগী এবং ঘোরতর অনুরাগী দুই জনেই চাইছেন একই জিনিস—ভক্ত ধন চাইছেন না কিন্তু সব ধনের যা সার তাই চাইছেন, জন চাইছেন না কিন্তু সবার যে আপনজন তাকেই চাইছেন, সুন্দরী চান না কিন্তু চান ভক্তি, কবিতা নয় কিন্তু যিনি কবি যিনি স্রষ্টা—সুন্দরের যিনি সুন্দর—তাঁর প্রতি অচলা যে সুন্দরী ভক্তি তার কামনা করেন। আর্টিস্ট ও ভক্ত উভয়ে শেষে গিয়ে মিলেছেন যা চান সেটা সুন্দর করে পেতে চান এই কথাই বলে। মুখে সুন্দরী চাইনে বললে হবে কেন, মন টানছে বৈরাগীর ও অনুরাগীর মতোই সমান তেজে যেটা সুন্দর সেটার দিকে। মানুষের অন্তর-বাহির দুয়ের উপরেই সুন্দরের যে বিপুল

আকর্ষণ রয়েছে তা সহজেই ধরা যাচ্ছে—শুনতে চাই আমরা সুন্দর, বলতে চাই সুন্দর, উঠতে চাই, বসতে চাই, চলতে চাই সুন্দর, সুন্দরের কথা প্রত্যেক পদে পদে আমরা স্মরণ করে চলেছি। পাই না-পাই, পারি না-পারি, সুন্দর বৌ ঘরে আনবার ইচ্ছা নেই এমন লোক কম আছে। যা কিছু ভাল তারি সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে দেখা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। আমরা কথায়-কথায় বলি—গাড়িখানি সুন্দর চলেছে, বাড়িখানি সুন্দর বানিয়েছে, ওযুধ সুন্দর কাজ করছে; এমনকি পরীক্ষার প্রশ্ন আর উত্তরগুলো সুন্দর হয়েছে একথাও বলি। এমনি সব ভালর সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে থাকতে যখন আমরা দেখছি তখন এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে সুন্দরের আকর্ষণ আমাদের মনকে ভালর দিকেই নিয়ে চলে, আর যাকে বলি অসুন্দর তারও তো একটা আকর্ষণ আছে, সেও তো যার মন টানে আমার কাছে অসুন্দর হয়েও তার কাছে সুন্দর বলেই ঠেকে, তবে মনে-ধরা এবং মন-টানার দিক থেকে সুন্দরে-অসুন্দরে ভেদ করি কেমন করে? কাজেই সুন্দর-অসুন্দর দুই মিলে চুম্বক পাথরের মতো শক্তিমান একটি জিনিস বলেই আমার কাছে ঠেকছে। সুন্দরের দিকটা হল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক এবং অসুন্দরের দিকও হল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক। এখন এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে চুম্বক যেমন ঘড়ির কাঁটাকে দক্ষিণ থেকে পরে পরে সম্পূর্ণ উত্তরে নিয়ে যায় তেমনি সুন্দরের টান মানুষের মনকে ক্ষণিক ঐহিক নৈতিক এমনি নানা সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে মহাসুন্দরের দিকেই নিয়ে চলে, আর অসুন্দরের প্রভাব সেও মানুষের মনকে আর-এক ভাবে টানতে টানতে নিয়ে চলে কদর্যতার দিকেই। কিন্তু সত্যিকার একটা কাঁটা আর চুম্বক নিয়ে যদি এই সত্যটা পরীক্ষা করতে বসা যায় তবে দেখব সুন্দরের একটা চিহ্ন দিয়ে তারি কাছে যদি চুম্বকের টানের মুখ রাখা যায় তবে কাঁটা সোজা সুন্দরে গিয়ে ঠেকবে নিজের ঘর থেকে, আবার ঐ চুম্বকের মুখ যদি অসুন্দর চিহ্ন দিয়ে সেখানে রাখা যায় তবে ও কাঁটা উল্টো রাস্তা ধরেই ঠিক অসুন্দরে গিয়ে না ঠেকে পারে না। কিন্তু এমন তো হয় যে, আমি যদি মনে করি তবে অসুন্দরের গ্রাস থেকেও কাঁটাকে আরো খানিক টেনে সুন্দরের কাছে পৌঁছে দিতে পারি কিংবা সুন্দরের দিক থেকে অসুন্দরে নামিয়ে দিতে পারি! সুতরাং সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যে কোনটাতে আমাদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি সমুদয় গিয়ে দাঁড়াবে তার নির্দেশকর্তা হচ্ছে আমাদের মন ও মনের ইচ্ছা। মনে হল তো সুন্দরে গিয়ে লাগলেম, মনে হল তো অসুন্দরে গিয়ে পড়লেম কিংবা সুন্দর থেকে অসুন্দর, অসুন্দর থেকে সুন্দরে দৌড় দিলেম, মন ও মনের শক্তি হল এ বিষয়ে নিয়ন্তা। টানে ধরলে যে চুম্বক ধরেছে তার মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রয়োজন না রেখেই কাঁটা আপনিই তার চরম গতি পায়, কিন্তু এই গতিকে সংযত করে অধোগতি থেকে ঊর্ধ্ব বা ঊর্ধ্ব থেকে অধোভাবের দিকে আনতে হলে আমাদের মনের একটা ইচ্ছাশক্তি একান্ত দরকার। বিল্বমঙ্গল বারবনিতার প্রেমোন্মাদ থেকে বিভুর প্রেমোন্মাদে গিয়ে ঠেকলেন সে শুধু তাঁর মনটি শক্তিমান ছিল বলেই। নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্ট, অসুন্দর থেকে সুন্দরে যেতে সেই পারে যার মন উৎকৃষ্ট ও সুন্দর, যার মন অসুন্দর সেও এইভাবে চলে ভাল থেকে মন্দে। আর্টিস্ট কবি ভক্ত এঁদের মন এমনিই শক্তিমান যে অসুন্দরের মধ্য দিয়ে সুন্দরের আবিষ্কার তাঁদের পক্ষে সহজ। ভক্ত কবি আর্টিস্ট সবাই এক ধরনের মানুষ; সবাই আর্টিস্ট, আর্টিস্টের কাছে ভেদ নেই পণ্ডিতের কাছে যেমন সেটা আছে। আর্টিস্টের কাছে রসের ভেদ আছে, মনের অবস্থাভেদে সু হয় কু, কু হয় সু এও আছে, তাছাড়া রূপভেদও আছে; কিন্তু সু কু-এর যে নির্দিষ্ট সীমা পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে অপণ্ডিত পর্যন্ত টেনে দিচ্ছে, এ রূপ সে রূপের মাঝে সেই পাকাপোক্ত পাঁচিল নেই আর্টিস্টের কাছে। নীরসেরও স্বাদ পেয়ে আর্টিস্টের মন রসায়িত হয়, এইটুকুই তফাত আর্টিস্টের আর সাধারণের মনে। তুমি আমি যখন খরার দিনে পাখা আর বরফ বলে হাঁক দিচ্ছি আর্টিস্ট তখন

সুন্দর করে খরার দিন মনে ধরে কবিতা লিখলে—'কাল বৈশাখী আগুন ঝরে, কাল বৈশাখী রোদে পোড়ে! গঙ্গা শুকু-শুকু আকাশে ছাই!' রসের প্রেরণা সুন্দর-অসুন্দরের ধারণাকে মুক্তি দিলে, আর্টিস্টের মধ্যে সুন্দর-অসুন্দরে মিলিয়ে এক রসরূপ সে দেখে চলল। আর্টিস্ট রূপমাত্রকে নির্বিচারে গ্রহণ করলে—কেন সুন্দর কেন অসুন্দর এ প্রশ্ন আর্টিস্ট করলে না, শুধু রসরূপে যখন বস্তুটিকে দেখলে তখন সে সাধারণ মানুষের মতো আহা ওহো বলে ক্ষান্ত থাকল না, দেখার সঙ্গে আর্টিস্টের মন আপনার সৌন্দর্যের অনুভূতিটা প্রত্যক্ষ করবার জন্য সুন্দর উপায় নির্বাচন করতে লাগল সুন্দর রং চং সুন্দর ছন্দোবন্ধ এমনি নানা সরঞ্জাম নিয়ে আর্টিস্টের সমস্ত মানসিক বৃত্তি ধাবিত হল সুন্দরের স্মৃতিটিকে একটি বাহ্যিক রূপ দিতে, কিংবা সুন্দরের স্মৃতিটিকে নতুন নতুন কল্পনার মধ্যে মিশিয়ে নতুন রচনা প্রকাশ করতে। সুন্দর বা তথাকথিত অসুন্দর দুয়েরই যেমন মনকে আকর্ষণ করবার শক্তি আছে, তেমনি মনের মধ্যে গভীরভাবে নিজের স্মৃতিটি মুদ্রিত করবারও শক্তি আছে—সুতরাং সুন্দরে-অসুন্দরে এখানেও এক। সুন্দরকেও যেমন ভোলবার জো নেই অসুন্দরকেও তেমনি টেনে ফেলবার উপায় নেই। দুই স্মৃতির মধ্যে শুধু তফাত এই, সুন্দরের স্মৃতিতে আনন্দ, অসুন্দরের স্পর্শে মন ব্যথিত হয়, সুখও যেমন দুঃখও তেমনি মনের একস্থানে গিয়ে সঞ্চিত হয়, শুধু দুঃখকে মানুষ ভোলবারই চেষ্টা করে আর সুখের স্মৃতিকে লতার মতো মানুষের মন জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতেই চায় দিনরাত। সাধারণ মানুষের মনেও যেমন, আর্টিস্ট মানুষের মনেও তেমনি সহজভাবেই সুন্দর-অসুন্দরের ক্রিয়া হয়, শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিস্টের তফাত হচ্ছে মনের অনুভূতিকে প্রকাশের ক্ষমতা বা অক্ষমতা নিয়ে। দুঃখ পেলে সাধারণ মানুষ বেজায় রকম কান্নাকাটি শুরু করে, আর্টিস্টও যে কাঁদে না তা নয়, কিন্তু তার মনের কাঁদন আর্টের মধ্যে দিয়ে একটি অপরূপ সুন্দর ছন্দে বেরিয়ে আসে। অসুন্দরের মধ্যে, অ-সুখের মধ্যে আর্টিস্টের কাছ থেকে রস আসে বলেই আর্ট মাত্রকে সুন্দরের প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়, এবং সেই কারণে আর্টের চর্চায় ক্রমে সুন্দরের অনুভূতি আমাদের যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন সৌন্দর্য সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক পড়ে কিংবা শুনে হয় না। আসলে যা সুন্দর তা কখনও বলে না, আমি এইজন্যে সুন্দর; আমাদের মনেও ঠিক সেইজন্যে সুন্দরকে গ্রহণ করবার বেলায় এ প্রশ্ন ওঠে না যে, কেন এ সুন্দর! আসলে যে সুন্দর নয় সেই কেবল আমাদের সামনে রঙ মেখে অলঙ্কার পরে হাব-ভাব করে এসে বলে আমি এই কারণে সুন্দর, মনও আমাদের তখনি বিচার করে বুঝে নেয় এ রঙের দ্বারা অথবা অলঙ্কারে বা আর কিছুর দ্বারায় সুন্দর দেখাচ্ছে কি না! আসলে যা সুন্দর তাকে নিয়ে আর্টিস্ট কিংবা সাধারণ মানুষের মন বিচার করতে বসে না, সবাই বলে সুন্দর ঠেকছে, কেন তা জানি না। কিন্তু সুন্দরের সাজে যে অসুন্দর আসে তাকে নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং আর্টিস্টের মনের তর্কের উদয় হয়। কিন্তু পণ্ডিতের মন দার্শনিকের মনের ঠিক বিপরীত উপায়ে চলে, অসুন্দরের বিচার সেখানে নেই, সব বিচার বিতর্ক সুন্দরকে নিয়ে। যা সুন্দর আমরা দেখেছি তা নিজের সুন্দরতা প্রমাণের কোনো দলিল নিয়ে এল না কিন্তু আমাদের মন সহজেই তাতে রত হল, কিন্তু পণ্ডিতের সামনে এসে সুন্দর দায়গ্রস্ত হল—প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠল সুন্দরকে নিয়ে—তুমি কেন সুন্দর, কিসে সুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি! সুন্দর, সে সুন্দর বলেই সুন্দর, মনে ধরল। বলেই সুন্দর, এ সহজ কথা সেখানে খাটল না। পণ্ডিত সেই সুন্দরকে বিশ্লেষণ করে। দেখবার চেষ্টা করছেন—কি নিয়ে সুন্দরের সৌন্দর্য? সেই বিশ্লেষণের একটা মোটামুটি হিসেব করলে এই দাঁড়ায়—(১) সুখদ বলেই ইনি সুন্দর, (২) কাজের বলেই সুন্দর, (৩) উদ্দেশ্য এবং উপায় দুয়ের সঙ্গতি দেন বলেই সুন্দর, (৪) অপরিমিত বলেই সুন্দর, (৫) সুশৃঙ্খল বলেই সুন্দর, (৬) সুসংহত বলেই সুন্দর, (৭) বিচিত্র-অবিচিত্র সম

বিষম দুই দিয়ে ইনি সুন্দর। —এইসব প্রাচীন এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের মতামত নিয়ে সৌন্দর্যের সার ধরবার জন্যে সুন্দর একটি জাল বুনে নেওয়া যে চলে না তা নয়, কিন্তু তাতে করে সুন্দরকে ঠিক যে ধরা যায় তার আশা দিতে সাহস করি না; তবে আমি এইটুকু বলি— অন্যের কাছে সুন্দর কি বলে আপনাকে সপ্রমাণিত করছে তা আমাদের দেখায় লাভ কি? আমাদের নিজের নিজের কাছে সুন্দর কি বলে আসছে তাই আমি দেখব। আমি জানি সুন্দর সব সময়ে সুখও দেয় না কাজও দেয় না—বিদ্যুৎশিখার মতো বিশৃঙ্খল অসংযত উদ্দেশ্যহীন বিদ্রুত বিষম এবং বিচিত্র আবির্ভাব সুন্দরের! সুন্দর, এই কথাই তো বলছে আমাদের— আমি এ নই তা নই, এজন্যে সুন্দর ওজন্যে সুন্দর নই, আমি সুন্দর তাই আমি সুন্দর। আর্টের মধ্যে রীতিনীতি, চক্ষু-জোড়ানো মন-ওড়ানো প্রাণ-ভোলানো ও কাঁদানো গুণ, কিংবা এর যে-কোনো একটা যেমন আর্ট নয়, আর্ট বলেই যেমন সে আর্ট, সুন্দরও তেমনি সুন্দর বলেই সুন্দর। সুন্দর নিত্য ও অমূর্ত, নানা বস্তু নানা ভাবের মধ্যে তার অধিষ্ঠান ও আরোপ হলে তবে মনোরসনা তার স্বাদ অনুভব করে—এমন সুন্দর তেমন সুন্দর সুখদ সুন্দর সুপরিমিত সুন্দর সুশৃঙ্খলিত সুন্দর! আমাদের জিব যেমন চাখে মেঠাই সন্দেশ সরবৎ ইত্যাদি পৃথক পৃথক জিনিসের মধ্য দিয়ে মিষ্টতাকে—ঠিক সেইভাবেই জীব বা জীবাত্মা মনোরসনার সাহায্যে আপনার মধ্যে সুন্দরের জন্য যে প্রকাণ্ড পিপাসা রয়েছে সেটা নানা বস্তু ধরে মেটাতে চলে। অতএব বলতে হয়, মন যার যেমনটা চায় সেইভাবে সুন্দরকে পাওয়াই হল পাওয়া, আর কারু কথা মতো কিংবা অন্য কারু মনের মতো সুন্দরকে পাওয়ার মানে—না-পাওয়াই। মা-বাপের মনের মতো হলেই বৌ সুন্দর হল একথা যে ছেলের একটু মাত্র সৌন্দর্যজ্ঞান হয়েছে সে মনে করে না। বৌ কাজের, বৌ সংসারী, বৌ বেশ সংস্থানসম্পন্না, এবং হয়তো বা ডাকসাইটে সুন্দরীও হতে পারে অন্য সবার কাছে, কিন্তু ছেলের নিজের মনের মধ্যে কাজ কর্ম সংসার সুরূপ কুরূপ ইত্যাদির একটা যে ধারণা তার সঙ্গে অন্যের পছন্দ-করা বৌ মিললো তো গোল নেই, না-হলেই মুশকিল। হিন্দিতে প্রবাদ আছে 'আপ্‌রুচি খানা—পররুচি পহেরনা', খাবারের স্বাদ আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্রভাবে নিতে হয় সুতরাং সেখানে আমাদের স্বরাজ, কিন্তু পরনের বেলায় পরে যেটা দেখে সুন্দর বলে সেইটেই মেনে চলতে হয়, না-হলে নিন্দে; সুতরাং সেখানে কেউ জোর করে বলতে পারে না এইটেই পরি পাঁচজনে যা বলে বলুক, আমরা নিজের বুদ্ধিকেও সেখানে প্রাধান্য দিতে পারিনে, দেশ কাল যে সুন্দর পরিচ্ছদের সম্মান করে তাকেই মেনে নিতে হয়। একটা কথা কিন্তু মনে রাখা চাই, সাজগোজ পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছু ওলট পালট সময়ে সময়ে যে হয়ে আসছে তা ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচি থেকেই আসছে। সুতরাং সব দিক দিয়ে সুন্দর-অসুন্দরের বোঝা-পড়া আমাদের ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে। যদি সত্যই এই জগৎ অসুন্দরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, নিছক সুন্দর জিনিস দিয়ে গড়া পরিপূর্ণ সুখদ সুশৃঙ্খল ও সর্বগুণান্বিত একটা কিছু হত তবে এর মধ্যে এসে সুন্দর অসুন্দরের কোনো প্রশ্নই আমাদের মনে উদয় হত না। আমরা এই জগৎ সংসার চিরসুন্দরের প্রকাশ ইত্যাদি কথা মুখে বললেও চোখে তা দেখিনে অনেক সময় মনেও সেটা ধরতে পারিনে, কাজেই অতৃপ্ত মন সুন্দরের বাসনায় নানা দিকে ধাবিত হয় এবং সুন্দরের একটা সাক্ষাৎ আদর্শ খাড়া করে, দেখার চেষ্টা করে এবং সুন্দরকে অসুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে আমাদের সৌন্দর্যজগৎ যে খণ্ড ও খর্ব হয়ে পড়ে তা আর মনেই থাকে না। সুরূপ কুরূপ দুয়ে মিলে সুন্দরের অখণ্ড মূর্তির ধারণা করা শক্ত কিন্তু একেবারে যে অসম্ভব মানুষের পক্ষে তা বলা যায় না। ভক্ত কবি এবং আর্টিস্ট এদের কাছে সুন্দর-অসুন্দর বলে দুটো জিনিস নেই, সব জিনিসের ও ভাবের মধ্যে যে নিত্য বস্তুটি সেটিই

সুন্দর বলে তাঁরা ধরেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু তা অনিত্য, তার সুখ শৃঙ্খলা মান পরিমাণ সমস্তই অনিত্য, সুতরাং সুন্দর যা নিত্য, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তার সঙ্গে মেলা মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলা যেতে পারে। আমাদের মনই কেবল গ্রহণ করতে পারে সুন্দরের আস্বাদ— সুতরাং মনোরসনা রোগ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার মতো ভীষণ বিপত্তি মানুষের হতে পারে না। আর্টের দিক দিয়ে যৌবনই সুন্দর বার্ধক্য সুন্দর নয়, আলোই সুন্দর অন্ধকার নয়, সুখই সুন্দর দুঃখ নয়, পরিষ্কার দিন বাদলা নয়, বর্ষার নদী শরতের নয়, পূর্ণচন্দ্রই চন্দ্রকলা নয়—কেউ একথা বলতে পারে না। যে একেবারেই আর্টিস্ট নয় শুধু তারি পক্ষে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড ভাবের একটা আদর্শ সৌন্দর্যকে কল্পনা করে নেওয়া সম্ভব। কবীর ছিলেন আর্টিস্ট তাই তিনি বলেছিলেন —"সবহি মূরত বীচ অমূরত, মূরতকী বলিহারী।" যে সেরা আর্টিস্ট তারি গড়া যা কিছু তারি মধ্যে এইটে লক্ষ্য করছি—ভালমন্দ সব মূর্তির মধ্যে অমূর্তি বিরাজ করছেন! "ঐসা লো নহিঁ' তৈসা লো, মৈঁ কেহি বিধি কথোঁ গম্ভীরা লো"—সুন্দর যে অসুন্দরের মধ্যেও আছে এ গভীর কথা বুঝিয়ে বলা শক্ত তাই কবীর এককথায় সব তর্ক শেষ করলেন "বিছুড়ি নহিঁ মিলিহো"—বিচ্ছিন্নভাবে তাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু এই যে সুন্দরের অখণ্ড ধারণা কবীর পেলেন তার মূলে কি ভাবের সাধনা ছিল জানতে মন সহজেই উৎসুক হয়; এর উত্তর কবীর যা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে সব আর্টিস্টের এক ছাড়া দুই মত নেই দেখা যায়— "সংতো সহজ সমাধ ভলী, সাঁঈসে মিলন ভয়ো জা দিনতে সুরত না অন্তি চলি॥ আঁখ ন মূদুঁ কান ন রূংধু, কায়া কষ্ট ন ধাঁরূঁ। খুলে নয়ন মৈ হঁস হঁস দেখুঁ সুন্দর রূপ নিহারুঁ॥" সহজ সমাধিই ভাল, হেসে চাও দেখবে সব সুন্দর, যার মনে হাসি নেই তার চোখে সুন্দরও নেই। যার প্রাণে সুর আছে বিশ্বের সুর বেসুর বিবাদী সংবাদী সবই সুন্দর গান হয়ে মেলে তারি মনে। আর যার কাছে শুধু পুঁথির সুরসপ্তক স্বরলিপি ও তাল-বেতালের বোল মাত্রই আছে, তার বুকের কাছে বিশ্বের সুর এসে তুলোট কাগজের খড়মড়ে শব্দে হঠাৎ পরিণত হয়।

এখন মানুষের ব্যক্তিগত রুচির উপরে সুন্দর-অসুন্দরের বিচারের শেষ নিষ্পত্তিটা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে সুন্দর-অসুন্দরের যাচাই করবার আদর্শ কোনখানে পাওয়া যাবে এই আশঙ্কা সবারই মনে উদয় হয়। সুন্দরকে বাহ্যিক উপমান ধরে যাচাই করে নেবার জন্যে এ ব্যস্ততার কারণ আমি খুঁজে পাইনে। ধর, সুন্দরের একটা বাঁধাবাঁধি প্রত্যক্ষ আদর্শ রইল না, প্রত্যেকে আমরা নিজের নিজের মনের কষ্টিপাথরেই বিশ্বটাকে পরীক্ষা করে চললেম—খুব আদিকালে মানুষ আর্টিস্ট যেভাবে সুন্দরকে দেখে চলেছিল—এতে করে মানুষের সৌন্দর্য উপভোগ সৌন্দর্য সৃষ্টির ধারা কি একদিনের জন্যে বন্ধ হল জগতে? বরং আর্টের ইতিহাসে এইটেই দেখতে পাই যে যেমনি কোনো জাতি বা দল আর্টের দিক দিয়ে কিছুকে আদর্শ করে নিয়ে ধরে বসলো পুরুষ-পরম্পরায় অমনি সেখানে রসের ব্যাঘাত হতে আরম্ভ হল, আর্টও ক্রমে অধঃ থেকে অধোগতি পেতে থাকল। আমাদের সঙ্গীতে সেই তানসেন ও আকব্বরী চাল, ছবিতে দিল্লীর চাল বা বিলিতি চাল যে কুকাণ্ড ঘটাতে পারে, এবং সেই আদর্শকে উল্টে ফেলে চললেও যা হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণসমস্ত আমাদের সামনেই ধরা রয়েছে, সুতরাং আমার মনে হয় সুন্দরের একটা আদর্শের অভাব হলে তত ভাবনা নেই, যত ভাবনা আদর্শটা বড় হয়ে আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও অনুভবশক্তির বিলুপ্তি যদি ঘটায়। কালিদাসের আমলে 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' ছিল সুন্দরীর আদর্শ। অজন্তার এবং তার পুর্বের যুগ থেকেও হয়তো এই আদর্শই চলে আসছিল, মোগলানী এসে এবং অবশেষে আরমানি থেকে আরম্ভ করে ফিরিঙ্গিনী পর্যন্ত এসে সে আদর্শ উল্টে দিলে এবং হয়তো কোন দিন বা চীনই এসে সেটা আবার উল্টে দেয় তারও ঠিক নেই। আদর্শটা এমনিই অস্থায়ী জিনিস

যে তাকে নিয়ে চিরকাল কারবার করা মুশকিল। রুচি বদলায় আদর্শও বদলায়, যেটা ছিল এককালের চাল সেটা হয় অন্যকালের বেচাল, ছিল টিকি এল টাই, ছিল খড়ম এল বুট, এমনি কত কি! গাছগুলো অনেককাল ধরে এক অবস্থায় রয়েছে—সেইজন্যে এইগুলোকেই আদর্শ গাছ ইত্যাদি বলে আমাদের মনে হয় কিন্তু পৃথিবীর পুরাকালের গাছ পাতা ফল ফুলের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা—অথচ তারাও তো ছিল সুন্দর!—সুতরাং পরিবর্তনশীল বাইরেটার মধ্যে সুন্দর আদর্শভাবে থাকে না। শিশু গাছ বড় গাছ এবং বুড়ো গাছ প্রত্যেকেরই মধ্যে যে সুন্দরের ধারা চলছে, পরম সুন্দর হয়ে দেখা দেবার নিত্য এবং বিচিত্র চেষ্টা সেই প্রাণের স্রোত নিয়ে হচ্ছে গাছ সুন্দর। এমনি আমাদের মনে বা বস্তু ও ভাবের অন্তরে যে নিত্য এবং সুন্দর প্রাণের স্রোত গোপনে চলেছে তাকেই সুন্দরের আদর্শ বলে ধরতে পারি, আর কিছুকে নয়, এবং সেই আদর্শই সুন্দরকে যাচাই করার যে নিত্য আদর্শ নয় তা জোর করে কে বলতে পারে! সমস্ত পদার্থের সৌন্দর্যের পরিমাপ হল তাদের মধ্যে, অনিত্য রস যা তা নিয়ে বাইরের রঙ রূপ বদলে চলে কিন্তু নিত্য যা তার অদল-বদল নেই। সব শিল্পকে যাচাই করে নেবার জন্যে আমাদের প্রত্যেকের মনে নিত্য সুন্দরের যে একটি আদর্শ ধরা আছে তার চেয়ে বড় আদর্শ কোথায় আর পাব? যেভাবেই হোক যে বস্তুই হোক যখন সে নিত্য তার আস্বাদ দিয়ে আমাদের মনে পরম-সুন্দরের স্বল্পাধিক স্পর্শ অনুভব করিয়ে গেল সে সুন্দর বলে আমাদের কাছে নিজেকে প্রমাণ করলে। আমার কাছে কতকগুলো জিনিস কতকগুলো ভাব সুন্দর ঠেকে কতক ঠেকে অসুন্দর, এই ঠেকল সুন্দর এই অসুন্দর, তোমার কাছেও তাই, আমার মনের সঙ্গে মেলে না তোমারটি তোমার সঙ্গে মেলে না আমারটি। সুন্দরের অসুন্দরের অবিচলিত আদর্শ চলায়মান জীবনে কোথাও নেই, সুতরাং যেদিক দিয়েই চল সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে বিতর্ক মেটবার নয়, কাজেই এই অতৃপ্তিকেই—এই সুখ-দুঃখে আলো-আঁধারে সুন্দর, অসুন্দরে মেলা খণ্ড-বিখণ্ড সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলকে— সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়ে যে চলতে পারে, সেই সুন্দরকে এক ও বিচিত্রভাবে অনুভব করবার সুবিধে পায়। জগৎ যার কাছে তার ছোট লোহার সিন্দুকটিতেই ধরা আর জগৎ যার কাছে লোহার সিন্দুকের বাইরেও অনেকখানি বিস্তৃত ধুলোর মধ্যে কাদার মধ্যে আকাশের মধ্যে বাতাসের মধ্যে, তাদের দুজনের কাছে সুন্দর ছোট বড় হয়ে দেখা যে দেয় তার সন্দেহ নেই! সিন্দুক খালি হলে যার সিন্দুক তার কাছে কিছুই আর সুন্দর ঠেকে না, কিন্তু যার মন সিন্দুকের বাইরের জগৎকে যথার্থভাবে বরণ করলে তার চোখে সুন্দরের দিকে চলবার অশেষ রাস্তা খুলে গেল, চলে গেল সে সোজা নির্বিচারে নির্ভয়ে। যখন দেখি নৌকা চলেছে ভয়ে ভয়ে, পদে পদে নোঙ্গর আর খোঁটার আদর্শে ঠেকতে ঠেকতে, তখন বলি, নৌকা সুন্দর চলল না, আর যখন দেখলেম নৌকা উল্টো স্রোতের বাধা উল্টো বাতাসের ঠেলাকে স্বীকার করেও গন্তব্য পথে সোজা বেরিয়ে গেল ঘাটের ধারের খোঁটা ছেড়ে নোঙ্গর তুলে নিয়ে, তখন বলি, সুন্দর চলে গেল!

সুন্দর অসুন্দর—জীবন-নদীর এই দুই টান—একে মেনে নিয়ে যে চলল সেই সুন্দর চলল আর যে এটা মেনে নিতে পারলে না সে রইল যে-কোনো একটা খোঁটায় বাঁধা। ঘাটের ধারে বাঁশের খোঁটা, তাকে অতিক্রম করে চলে যায় নদীর স্রোত নানা ছন্দে একে বেঁকে,—আর্টের স্রোতও চলেছে চিরকাল ঠিক এইভাবেই চিরসুন্দরের দিকে। সুন্দর করে বাঁধা আদর্শের খোঁটাগুলো আর্টের ধাক্কায় এদিক-ওদিক দোলে, তারপর একদিন যখন বান ডাকে খোঁটা সেদিন নিজে এবং নিজের সঙ্গে বাঁধা নৌকাটাকেও নিয়ে ভেসে যায়। আর্ট এবং আর্টিস্ট এদের মনের গতি এমনি করে পণ্ডিতদের বাঁধা এবং মূর্খদের আঁকড়ে ধরা তথাকথিত দড়ি খোঁটা

অতিক্রম করে উপড়ে ফেলে চলে যায়। বড় আর্টিস্টরা সুন্দরের আদর্শ গড়তে আসেন না, যেগুলো কালে কালে সুন্দরের বাঁধাবাঁধি আদর্শ হয়ে দাঁড়াবার জোগাড় করে, সেইগুলোকেই ভেঙে দিতে আসেন, ভাসিয়ে দিতে আসেন সুন্দর-অসুন্দরে মিলে যে চলন্ত নদী তারি স্রোতে। যে পারে সে ভেসে চলে মনোমতো স্থানে মনতরী ভেড়াতে ভেড়াতে সুন্দর সূর্যাস্তের মুখে, আর সেটা যে পারে সে পরের মনোমতো সুন্দর করে বাঁধা ঘাটে আটকা থেকে আদর্শ খোঁটায় মাথা ঠুকে-ঠুকেই মরে, সুন্দর-অসুন্দরের জোয়ার-ভাঁটা তাকে বৃথাই দুলিয়ে যায় সকাল সন্ধ্যে!

বাঁধা নৌকা সে এক ভাবে সুন্দর, ছাড়া নৌকা সে আর-এক ভাবে সুন্দর; তেমনি কোনো একটা কিছু সকরুণ সুন্দর, কেউ নিষ্করুণ সুন্দর, কেউ ভীষণ সুন্দর, আবার কেউ বা এত বড় সুন্দর কি এতটুকু সুন্দর—আর্টিস্টের চোখে এইভাবে বিশ্বজগৎ সুন্দরের বিচিত্র সমাবেশ বলেই ঠেকে; আর্টিস্টের কাছে শুধু তর্ক জিনিসটাই অসুন্দর, কিন্তু তর্কের সভায় যখন ঘাড় নড়ছে হাত নড়ছে ঝড় বইছে তার বীভৎস ছন্দটা সুন্দর। সুতরাং যে আলোয় দোলে অন্ধকারে দোলে কথায় দোলে সুরে দোলে ফুলে দোলে ফলে দোলে। বাতাসে দোলে পাতায় দোলে—সে শুকনোই হোক তাজাই হোক সুন্দর হোক অসুন্দর হোক সে যদি মন দোলাল তো সুন্দর হল এইটেই বোধহয় চরম কথা সুন্দর-অসুন্দরের সম্বন্ধে যা আর্টিস্ট বলতে পারেন নিঃসঙ্কোচে। আদর্শকে ভাঙতে বড় বড় আর্টিস্টরা যা আজ রচনা করে গেলেন, আস্তে আস্তে মানুষ সেইগুলোকেই যে আদর্শ ঠাউরে নেয় তার কারণ আর-কিছু নয়, আমাদের সবার মন সত্যিই যে সুন্দর তার স্বাদ পেতে ব্যাকুল থাকে—যে রচনার মধ্যে যে জীবনের মধ্যে তার আস্বাদ পায় তাকেই অন্য সবার চেয়ে বড় করে না বোধ করে সে থাকতে পারে না। এইভাবে একজন, ক্রমে দশজন। এবং এমনো হয়, সৌন্দর্য সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত নেই অথচ চেষ্টা রয়েছে সুন্দরকে কাছাকাছি চারিদিকে পেতে, সে, অথবা সুন্দরের কোনো ধারণা সম্ভব নয় শুধু সৌন্দর্যবোধের ভান করছে, সেও, আর্ট বিশেষকে আস্তে আস্তে আদর্শ হবার দিকে ঠেলে তুলে ধরে,—ঠিক যেভাবে বিশেষ বিশেষ জাতি আপনার আপনার এক-একটা জাতীয় পতাকা ধরে তারি নীচে সমবেত হয়; সে পতাকা তখনকার মতো সুন্দর হলেও একদিন তার জায়গায় নতুন মানুষ তোলে নতুন সজ্জায় সাজানো নিজের Standard বা সৌন্দর্যবোধের চিহ্ন। এইভাবে একের পর আর এসে নতুন নতুন ভাবে সুন্দরের আদর্শ ভাঙা গড়া হতে হতে চলেছে পরিপূর্ণতার দিকে, কিন্তু পূর্ণ সুন্দর বলে নিজেকে বলাতে পারছে না কেউ। আর্টিস্টের সৌন্দর্যের ধারণা পাকা ফলের পরিণতির রেখাটির মতো সুডৌল ও সুগোল কিন্তু জ্যামিতির গোলের মতো একেবারে নিশ্চল গোল নয়, সচল ঢলঢলে গোল যার একটু খুঁত আছে, পূর্ণচন্দ্রের মতো পরিপূর্ণ কিন্তু সম্পূর্ণ নয়; সেই কারণে অনেক সময় বড় আর্টিস্টের রচনা সাধারণের কাছে ঠেকে যাচ্ছেতাই—কেননা সাধারণ মন জ্যামিতিক গোলের মতো আদর্শ একটা-না-একটা ধরে থাকেই, কাজেই সে সত্য কথাই বলে যখন বলে যাচ্ছেতাই, অর্থাৎ তার ইচ্ছের সঙ্গে মিলছে না আর্টিস্টের ইচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছেতাই শব্দটি বড় চমৎকার, এটিতে বোঝায়—যা ইচ্ছে তাই, সাধুভাষায় বললে বলি, যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ বা যথাভিরুচি, এই যা ইচ্ছে তাই—যা মন চাচ্ছে তাই, সুতরাং রসিক ও আর্টিস্ট এই শব্দটির যথার্থ অর্থ সুন্দর অর্থ ধরেই চিরকাল চলেছে। মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে সুন্দরকে মনের টানের উপরে ছেড়ে যা ইচ্ছে তাই বলে পণ্ডিতানাম্ মতম্-এর বাইরে বেরিয়ে পড়েছে; খোঁটা-ছাড়া নৌকা বাঁধনমুক্ত-প্রাণ! তাই দেখছি সুন্দর-

অসুন্দরের বাছ-বিচার পরিত্যাগ করে তারি সঙ্গে গিয়ে লাগবার স্বাধীনতা আর্টিস্টের মনকে বড় কম প্রসার দেয় না।

বড় মন বড় সুন্দরকে ধরতে চাইছে যখন, বড় স্বাধীনতার মুক্তি তার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু মন যেখানে ছোট সেখানে আর্টের দিক দিয়ে এই বড় স্বাধীনতা দেওয়ার মানে ছেলের হাতে আগুনের মশালটা ধরে দেওয়া—সে লঙ্কাকাণ্ড করে বসবেই, নিজের সঙ্গে আর্টের মুখ পুড়িয়ে কিংবা ভরাডুবি করে স্রোতের মাঝে। বড় মন সে জানে বড় সুন্দরকে পেতে হলে কতটা সংযম আর বাঁধাবাঁধির মধ্য দিয়ে নিজেকে ও নিজের আর্টকে চালিয়ে নিতে হয়। ছোট সে তো বোঝে না যে পরের অনুসরণে সুন্দরের দিকে চলাতেও আলো থেকে আলোতেই গিয়ে পৌঁছোয় মন; আর নিজের ইচ্ছামতো চলতে চলতে ভুলে হঠাৎ সে অসুন্দরের নেশা ও টানে পড়ে যায়, তখন তার কোনো কারিগরিই তাকে সুন্দরের বিষয়ে প্রকাণ্ড অন্ধতা এবং আর্ট বিষয়ে সংসার-জোড়া সর্বনাশ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পণ্ডিতরা আর কিছু না হোন পণ্ডিত তো বটে, সৌন্দর্যের এবং আর্টের লক্ষণ নিয়ম ইত্যাদি বেঁধে দিতে তাঁরা যে চেয়েছেন তা এই ছোট মনের উৎপাত থেকে আর্টকে এবং সেই সঙ্গে আর্টিস্টকেও বাঁচাতে। যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ—একথা যাঁরা শিল্পবিষয়ে পণ্ডিত তাঁরা স্বীকার করে নিলেও এই যা-ইচ্ছে-তাই শিল্পের উপরে খুব জোর দিয়ে কিছু বললেন না। কেননা তাঁরা জানতেন হৃদয় সবার সমান নয় মহৎ নয় সুন্দর নয়, হৃদয়ে যা ধরে তারও ভেদাভেদ আছে, হৃদয় আমাদের অনেক জিনিসে গিয়ে লগ্ন হয় যা অসুন্দর এবং একেবারেই আর্ট নয়, এবং এও দেখা যায় পরম সুন্দর এবং অপূর্ব আর্ট তাতেও গিয়ে হৃদয় লাগল না, মধুকরের মতো উড়ে পড়ল না ফুলের দিকে, কাদাখোঁচার মতো নদীর ধারে-ধারেই খোঁচা দিয়ে বেড়াতে লাগল পাঁকে।

যখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয় গিয়ে লগ্ন হচ্ছে কুব্জার লাবণ্যে, আর একে পড়েছে চন্দ্রাবলীর প্রেমে অন্য রাধে রাধে বলেই পাগল, তখন এই তিনে মিলে ঝগড়া চলবেই। এইসব তর্কের ঘূর্ণাজলে আর্টকে না ফেলে সৌন্দর্য ও আর্টের ধারাকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত রকমে চালাতে হয় পুরুষ-পরম্পরায়, তবে পণ্ডিত ও রসিকদের কথিত সমস্ত রসের রূপের ধারার সাহায্য না নিলে কেমন করে খণ্ড-বিখণ্ডতা থেকে আর্টে একত্ব দেওয়া যাবে। আমার নিজের মুখে কি ভাল লাগল না-লাগল তা নিয়ে দু'-চার সমরুচি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা চলে কিন্তু বিশ্বজোড়া উৎসবের মধ্যে শিল্পের স্থান দিতে হলে নিজের মধ্যে যে ছোট সুন্দর বা অসুন্দর তাকে বড় করে সবার করে দেবার উপায় নিছক নিজত্বটুকু নয়; সেখানে individuality-কে universality দিয়ে যদি না ভাঙতে পারা যায়, তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট তার পুরো সুরেই তান মারতে থাকলে কিংবা অন্য সুরের সঙ্গে মিলতে চেয়ে মন্দ্র মধ্যম হওয়াকে অস্বীকার করলে সঙ্গীতে যে কাণ্ড ঘটে, আর্টেও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সেই যথেচ্ছাচার উপস্থিত হয় যদি সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসায় না উপস্থিত হওয়া যায় আর্টিস্ট ও রসিকদের দিক দিয়ে। ধারা ভেঙে নদী যদি চলে শতমুখী ছোটছোট তরঙ্গের লীলা-খেলা শোভা-সৌন্দর্য নিয়ে তবে সে বড় নদী হয়ে উঠতে পারে না। এইজন্যে শিল্পে পূর্বতন ধারার সঙ্গে নতুন ধারাকে মিলিয়ে নতুন নতুন সৌন্দর্যসৃষ্টির মুখে অগ্রসর হতে হয় আর্টের জগতে। সত্যই যে শক্তিমান সে পুরাতন প্রথাকে ঠেলে চলে, আর যে অশক্ত সে এই বাঁধা স্রোত বেয়ে, আস্তে আস্তে বড় শিল্প রচনার ধারা ও সুরে সুর মিলিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে চলে। বাইরে রেখায়-রেখায় বর্ণে-বর্ণে, ভিতরে ভাবে-ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে সুসঙ্গতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করেছে। যে ছবি লিখেছে, গান

গেয়েছে, নৃত্য করেছে সে যেমন এটা সহজে বুঝতে পারবে, তেমন যারা শুধু সৌন্দর্য সম্বন্ধে পড়েছে, কি বক্তৃতা করেছে বা বক্তৃতা শুনেছে তারা তা পারবে না। সৌন্দর্যলোকের সিংহদ্বারের ভিতর দিকে চাবি, নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহদ্বার খুলল তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌঁছল মন্দিরে এবং ভিতরের খবর বয়ে চলল বাইরে অবাধ স্রোতে—সুন্দর-অসুন্দরকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়।

টীকা

১. শিক্ষাষ্টক—চৈত্যদেব

২. 'কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে'—এই উদ্ধৃতিটিতে (১২) সংখ্যাটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ইহা ১/২ কাব্যপ্রকাশ মম্মমভট্ট (অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত) হইতে গৃহীত।

শিল্প ও দেহতত্ত্ব

কিছুর নোটিস যে দিচ্ছে, ঘটনা যেমন ঘটেছে তার সঠিক রূপটির প্রতিচ্ছায়া দেওয়া ছাড়া সে বেচারা অনন্যগতি; সে যদি ভাবে সে একটা কিছু রচনা করছে তো সেটা তার মস্ত ভ্রম। ডুবুরি সমুদ্রের তলা ঘেঁটে মুক্তার শুক্তি তুলে আনে, খুবই সুচতুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার, কিন্তু সে কি বলতে পারে আপনাকে মুক্তাহারের রচয়িতা, না, যে পাহাড় পর্বত দেশে বিদেশে ঘুরে ফটোগ্রাফ তুলে আনছে সে নিজেকে চিত্রকর বলে চালিয়ে দিতে পারে আর্টিস্ট মহলে? একটুখানি বুদ্ধি থাকলেই আর্টের ইতিহাস লেখা চলে, কিন্তু যে জিনিসগুলো নিয়ে আর্টের ইতিহাস তার রচয়িতা ইতিহাসবেত্তা নয় রসবেত্তা—নেপোলিয়ান বীররসের আর্টিস্ট, তাঁর হাতে ইউরোপের ইতিহাস সৃষ্ট হল, সীজার আর্টিস্ট গড়লে রোমের ইতিহাস। যে ডুবে তোলে সে তোলে মাত্র বুদ্ধিবলে; আর যে গড়ে তোলে সে ভাঙাকে জোড়া লাগায় না শুধু, সে বেজোড় সামগ্রীও রচনা করে চলে মন থেকে। ইতিহাসের ঘটনাগুলো পাথরের মতো সুনির্দিষ্ট শক্ত জিনিস, একচুল তার চেহারার অদল-বদল করার স্বাধীনতা নেই ঐতিহাসিকের, আর ঔপন্যাসিক কবি শিল্পী এঁদের হাতে পাষাণও রসের দ্বারা সিক্ত হয়ে কাদার মতো নরম হয়ে যায়, রচয়িতা তাকে যথা ইচ্ছা রূপ দিয়ে ছেড়ে দেন। ঘটনার অপলাপ ঐতিহাসিকের কাছে দুর্ঘটনা, কিন্তু আর্টিস্টের কাছে সেটা বড় সুঘটন বা সুগঠনের পক্ষে মস্ত সুযোগ উপস্থিত করে দেয়। ঠিকে যদি ভুল হয়ে যায় তবে অঙ্কটাই ভুল হয়; অঙ্কনের বেলাতেও ঠিক ওই কথা। কিন্তু পাটীগণিতের ঠিক আর খাঁটি গুণীদের ঠিকের প্রথা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র;—নামতা ঠিক রইল তো অঙ্ককর্তা বললেন, ঠিক হয়েছে, কিন্তু নামেই ছবিটা ঠিক মানুষ হল কি গরু গাধা বা আর-কিছু হল, রসের ঠিকানা হল না ছবির মধ্যে, অঙ্কনকর্তা বলে বসলেন, ভুল! ঐতিহাসিকের কারবার নিছক ঘটনাটি নিয়ে, ডাক্তারের কারবার নিখুঁত হাড়মাসের anatomy নিয়ে, আর আর্টিস্টদের কারবার অনির্বচনীয় অখণ্ড রসটি নিয়ে। আর্টিস্টদের কাছে ঘটনার ছাঁচ পায় না রস, রসের ছাঁদ পেয়ে বদলে যায় ঘটনা, হাড়মাসের ছাঁচে পায় না শিল্পীর মানস কিন্তু মানসের ছাঁদ অনুসারে গড়ে ওঠে সমস্ত ছবিটার হাড়হদ্দ, ভিতর বাহির। একটা গাছের বীজ, সে তার নিজের আকৃতি ও প্রকৃতি যেমনটি পেয়েছে সেইভাবেই যখন হাতে পড়ল, তখন সে গোলাকার কি চেপ্টা ইত্যাদি, কিন্তু সে থলি থেকে মাটিতে পড়েই রসের সঞ্চার নিজের মধ্যে যেমনি অনুভব করলে অমনি বদলে চলল নিজের আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই; যার বাহু ছিল না চোখ ছিল না, যে লুকিয়ে ছিল মাটির তলায় নীরস কঠিন বীজকোষে বদ্ধ হয়ে, সে উঠল মাটি ঠেলে, মেলিয়ে দিলে হাজার হাজার চোখ আর হাত আলোর দিকে আকাশের দিকে বাতাসের উপরে, নতুন শরীর নতুন ভঙ্গি লাভ করলে সে রসের প্রেরণায়, গোলাকার বীজ ছত্রাকার গাছ হয়ে শোভা পেলে, বীজের anatomy লুকিয়ে পড়ল ফুলের রেণুতে পাকা ফলের শোভার আড়ালে। বীজের হাড়হদ্দ ভেঙে তার anatomy চুরমার করে বেরিয়ে এল গাছের ছবি বীজকে ছাড়িয়ে। গাছ যে রচলে তার রচনায় ছাঁদ ও anatomyর দোষ দেবার সাহস কারু হল না, উল্টে বরং কোনো কোনো মানুষ তারই রচনা চুরি করে গাছপালা

আঁকতে বসে গেল—বীজতত্ত্বের বইখানার মধ্যে ফেলে রেখে দিলে যে অস্থিপঞ্জরের মতো শক্ত পিঞ্জরে বদ্ধ ছিল বীজের প্রাণ তার প্রকৃত anatomyর হিসেব। বীজের anatomy দিয়ে গাছের anatomy বিচার করতে যাওয়া, আর মানুষী মূর্তির anatomy দিয়ে মানস মূর্তির anatomyর দোষ ধরতে যাওয়া সমান মূর্খতা। Anatomyর একটা অচল দিকে আছে, যেটা নিয়ে এক রূপের সঙ্গে আর রূপের সুনির্দিষ্ট ভেদ, কিন্তু anatomyর একটা সচল দিকও আছে সেটা নিয়ে মানুষে মানুষে বা একই জাতের গাছে গাছে ও জীবে জীবে বাঁধা পার্থক্য একটুখানি ভাঙে—কোনো মানুষ হয় তালগাছের মতো, কেউ হয় ভাঁটার মতো, কোনো গাছ ছড়ায় ময়ূরের মতো পাখা, কেউ বাড়ায় ভূতের মতো হাত! প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বইখানাতে দেখবে মেঘের সুনির্দিষ্ট গোটাকতক গড়নের ছবি দেওয়া আছে—বৃষ্টির মেঘ, ঝড়ের মেঘ—সবার বাঁধা গঠন কিন্তু মেঘে যখন বাতাস লাগল রস ভরল তখন শাস্ত্র-ছাড়া সৃষ্টি-ছাড়া মূর্তি সব ফুটতে থাকল, মেঘে মেঘে রঙ লাগল অদ্ভুত অদ্ভুত, সাদা ধোঁয়া ধুমধাম করে সেজে এল লাল নীল হলদে সবুজ বিচিত্র সাজে, দশ অবতারের রঙ ও মূর্তিকে ছাড়িয়ে দশ সহস্র অবতার! সচিত্র প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পুঁথি খুলে সে সময় কোন রসিক চেয়ে দেখে মেঘের রূপগুলোর দিকে? এই যে মেঘের গতিবিধির মতো সচল সজল anatomy, একেই বলা হয় artistic anatomy, যার দ্বারায় রচয়িতা রসের আধারকে রসের উপযুক্ত মান পরিমাণ দিয়ে থাকেন। মানুষের তৃষ্ণা ভাঙতে যতটুকু জল দরকার তার পরিমাণ বুঝে জলের ঘটি একরকম হল, মানুষের স্নান করে শীতল হতে যতটা জল দরকার তার হিসেবে প্রস্তুত হল ঘড়া জালা ইত্যাদি; সুতরাং রসের বশে হল আধারের মান পরিমাণ আকৃতি পর্যন্ত। যার কোনো রসজ্ঞান নেই সেই শুধু দেখে পানীয় জলের ঠিক আধারটি হচ্ছে চৌকোনো পুকুর, ফটিকের গেলাস নয়, সোনার ঘটিও নয়। গোয়ালের গরু হয়তো দেখে পুকুরকে তার পানীয় জলের ঠিক আধার, কিন্তু সে যদি মানুষকে এসে বলে, 'তোমার গঠন সম্বন্ধে মোটেই জ্ঞান নেই, কেননা জলাধার তুমি এমন ভুল রকমে গড়েছ যে পুকুরের সঙ্গে মিলছেই না', তবে মানুষ কি জবাব দেয়?

ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপকাঠি কায়ামূলক, আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ামুলক। ঐতিহাসিককে রচনা করতে হয় না, তাই তার মাপকাঠি ঘটনাকে চুল চিরে ভাগ করে দেখিয়ে দেয়, ডাক্তারকেও জীবন্ত মানুষ রচনা করতে হয় না, কাজেই জীবন্মৃত ও মৃত মানুষের শবচ্ছেদ করার কাজের জন্য চলে তার মাপকাঠি, আর রচয়িতাকে অনেক সময় অবস্তুকে বস্তুজগতে, স্বপ্নকে জাগরণের মধ্যে টেনে আনতে হয়, রূপকে রসে, রসকে রূপে পরিণত করতে হয়, কাজেই তার হাতের মাপকাঠি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের, রূপকথার সোনার রূপোর কাটির মতো অদ্ভুত শক্তিমান। ঘটনা যাকে কুড়িয়ে ও খুঁড়ে তুলতে হয়, ঠিক ঠিক খোন্তা হল তার পক্ষে মহাস্ত্র, মানুষের ভৌতিক শরীরটার কারখানা নিয়ে যখন কারবার, ঠিক ঠিক মাংসপেশী অস্থিপঞ্জর ইত্যাদির ব্যবচ্ছেদ করার শূল ও শলাকা ইত্যাদি হল তখন মৃত্যুবাণ, কিন্তু রচনা প্রকাশ হবার আগেই এমন একটি জায়গার সৃষ্টি হয়ে বসে যে সেখানে কোদাল, কুড়ুল, শূল, শাল কিছু চলে না, রচয়িতার নিজের অস্থিপঞ্জর এবং ঘটাকাশের ঘটনাসমস্ত থেকে অনেক দূরে রচয়িতার সেই মনোজগৎ বা পটাকাশ, যেখানে ছবি ঘনিয়ে আসে মেঘের মতো, রস ফেনিয়ে ওঠে, রঙ ছাপিয়ে পড়ে আপনা আপনি। সেই সমস্ত রসের ও রূপের ছিটেফোঁটা যথোপযুক্ত পাত্র বানিয়ে ধরে দেয় রচয়িতা আমাদের জন্যে। এখন রচয়িতা রস বুঝে রসের পাত্র নির্বাচন করে যখন দিচ্ছে তখন রসের সঙ্গে রসের পাত্রটাও স্বীকার না করে যদি নিজের মনোমতো পাত্রের রসটা ঢেলে নিতে যাই তবে কি ফল হবে? ধর,

রৌদ্ররসকে একটা নবতাল বা দশতাল মূর্তির আধার গড়ে ধরে আনলেন রচয়িতা, পাত্র ও তার অন্তর্নিহিত রসের চমৎকার সামঞ্জস্য দিয়ে, এখন সেই রচয়িতার আধারকে ভেঙে রৌদ্ররস যদি মুঠোম হাত পরিমিত anatomy-দোরস্ত আমার একটা ফটোগ্রাফের মধ্যে ধরবার ইচ্ছে করি তো রৌদ্র হয় করুণ নয় হাস্য রসে পরিণত না হয়ে যাবে না; কিংবা ছোট মাপের পাত্রে না ঢুকে রসটা মাটি হবে মাটিতে পড়ে।

হারমোনিয়ামের anatomy, বীণার anatomy, বাঁশির anatomy রকম রকম বলেই সুরও ধরে রকম রকম; তেমনি আকারের বিচিত্রতা দিয়েই রসের বিচিত্রতা বাহিত হয় আর্টের জগতে, আকারের মধ্যে নির্দিষ্টতা সেখানে কিছুই নেই। হাড়ের পঞ্জরের মধ্যে মাংসপেশী দিয়ে বাঁধা আমাদের এতটুকু বুক, প্রকাণ্ড সুখ প্রকাণ্ড দুঃখ প্রকাণ্ড ভয় এতটুকু পাত্রে ধরা মুশকিল। হঠাৎ এক-এক সময়ে বুকটা অতিরিক্ত রসের ধাক্কায় ফেটে যায়; রসটা চাইলে বুককে অপরিমিত রকমে বাড়িয়ে দিতে, কিংবা দমিয়ে দিতে, আমাদের ছোট পিঁজরে হাড়ে আর তাঁতে নিরেট করে বাঁধা স্থিতি-স্থাপকতা কিংবা সচলতা তার নেই, অতিরিক্ত স্টিম পেয়ে বয়লারের মতো ফেটে চৌচির হয়ে গেল। রস বুকের মধ্যে এসে পাত্রটায় যে প্রসারণ বা আকুঞ্চন চাইলে, প্রকৃত মানুষের anatomy সেটা দিতে পারলে না; কাজেই আর্টিস্ট যে, সে রসের ছাঁদে কমে বাড়ে ছন্দিত হয় এমন একটা সচল তরল anatomy সৃষ্টি করে নিলে যা অন্তর এবং বাইরে সুসঙ্গত ও সুসংহত। রসকে ধরবার উপযুক্ত জিনিস বিচিত্র রঙ ও রেখা-সমস্ত গাছের ডালের মতো, ফুলের বোঁটার মতো, পাতার ঝিলিমিলির মতো তারা জীবনরসে প্রাণবন্ত ও গতিশীল। ফটোগ্রাফারের ওখানে ছবি ওঠে—সীসের টাইপ থেকে যেমন ছাপ ওঠে—ছবি ফোটে না। পারিজাতের মতো বাতাসে দাঁড়িয়ে আকাশে ফুল ফোটানো আর্টিস্টের কাজ, সুতরাং তার মন্ত্র মানুষের শরীরযন্ত্রের হিসেবের খাতার লেখার সঙ্গে এমনকি বাস্তব জগতের হাড়হদ্দের খবরের সঙ্গে মেলানো মুশকিল। অভ্রবিজ্ঞানের পুঁথিতে আবর্ত সম্বর্ত ইত্যাদি নামরূপ দিয়ে মেঘগুলো ধরা হয়েছে—কিন্তু কবিতা কি গান রচনার বেলা ওইসব পেঁচাল নামগুলো কি বেশি কাজে আসে? মেঘের ছবি আঁকার বেলাতেও ঠিক পুঁথিগত ঘোরপেঁচ এমনকি মেঘের নিজ মূর্তিগুলোর হুবহু ফটোগ্রাফও কাজে আসে না। রচিত যা তার মধ্যে বসবাস করলেও রচয়িতা চায় নিজের রচনাকে। সোনার খাঁচার মধ্যে থাকলেও বনের পাখি সে যেমন চায় নিজের রচিত বাসাটি দেখতে, রচয়িতাও ঠিক তেমনি দেখতে চায় নিজের মনোগতটি গিয়ে বসল নিজের মনোমতো করে রচা রঙ রেখা ছন্দোবন্ধ ঘেরা সুন্দর বাসায়। কোকিল সে পরের বাসায় ডিম পাড়ে—নামজাদা মস্ত পাখি। কিন্তু বাবুই সে যে রচয়িতা, দেখতে এতটুকু কিন্তু বাসা বাঁধে বাতাসের কোলে—মস্ত বাসা। আমাদের সঙ্গীতে বাঁধা অনেকগুলো ঠাট আছে, যে লোকটা সেই ঠাটের মধ্যেই সুরকে বেঁধে রাখলে সে গানের রচয়িতা হল না, সে নামে রাজার মতো পূর্বপুরুষের রচিত রাজগীর ঠাটটা মাত্র বজায় রেখে চলল ভীরু, কিন্তু যে রাজত্ব পেয়েও রাজত্ব হারাবার ভয় রাখলে না, নতুন রাজত্ব জিতে নিতে চলল সেই সাহসীই হল রাজ্যের রচয়িতা বা রাজা এবং এই স্বাধীনচেতারাই হয় সুরের ওস্তাদ। সুর লাগাতে পারে তারাই যারা সুরের ঠাট মাত্র ধরে থাকে না, বেসুরকেও সুরে ফেলে।

মানুষের anatomyতেই যদি মানুষ বদ্ধ থাকত, দেবতাগুলোকে ডাকতে যেতে পারতো কে? কার জন্যে আসত নেমে স্বর্গ থেকে ইন্দ্ররথ, পুষ্পক রথে চড়িয়ে লঙ্কা থেকে কে আনত সীতাকে অযোধ্যায়? ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশু আপনার anatomy ভাঙতে শুরু করলে, বানরের মতো পিঠের সোজা শিরদাঁড়াকে বাঁকিয়ে সে উঠে দাঁড়াল—দুই পায়ে ভর দিয়ে, গাছে গাছে ঝুলতে থাকল না। প্রথমেই যুদ্ধ হল মানুষের নিজের anatomyর

সঙ্গে, সে তাকে আস্তে আস্তে বদলে নিলে আপনার চলন-বলনের উপযুক্ত করে। বীজের anatomy নাশ করে যেমন বার হল গাছ, তেমনি বানরের anatomy পরিত্যাগ করে মানুষের anatomy নিয়ে এল মানুষ; ঠিক এইভাবেই medical anatomy নাশ করে আটিস্ট আবিষ্কার করলে artistic anatomy, যা রসের বশে কমে বাড়ে, আঁকে বাঁকে, প্রকৃতির সব জিনিসের মতো—গাছের ডালের মতো, বৃন্তের মতো, পাপড়ির মতো, মেঘের ঘটার মতো, জলের ধারার মতো। রসের বাধা জন্মায় যাতে এমন সব বস্তু কবিরা টেনে ফেলে দেন,—নিকঙ্কুশাঃ কবয়ঃ। লয়ে লয়ে না মিললে কবিতা হল না, একথা যার একটু কবিত্ব আছে সে বলবে না; তেমনি আকারে আকারে না মিললে ফটোগ্রাফ হল না বলতে পারি, কিন্তু ছবি হল না একথা বলা চলে না। 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' শুনতে বেশ লাগল, 'ছেলেটি কার্তিকের মতো' দেখতে বেশ লাগল, কিন্তু কবিতা লিখলেই কি কাশীদাসী সুর ধরতে হবে, না ছেলে আঁকতে হলেই পাড়ার আদুরে ছেলের anatomy কপি করলেই হবে? গণেশের মূর্তিটিতে আমাদের ঘরের ও পরের ছেলের anatomy যেমন করে ভাঙা হয়েছে তেমন আর কিছুতে নয়। হাতি ও মানুষের সমস্তখানি রূপ ও রেখার সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে একটা নতুন anatomy পেয়ে এল, কাজেই সেটা আমাদের চক্ষে পীড়া দিচ্ছে না, কেননা সেটা ঘটনা নয়, রচনা। আরব্য উপন্যাসের উড়ন্ত সতরঞ্চির কল্পনা বাস্তব-জগতে উড়োজাহাজ দিয়ে সপ্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কি আমাদের কাছে নগণ্য হয়েছিল, না, অবাধ কল্পনার সঙ্গে গল্পের ঠাট মিলছে কিন্তু বিশ্বরচনার সঙ্গে মিলছে না দেখে গালগল্প রচনার বাদশাকে কেউ আমরা দুষেছি? প্রত্যেক রচনা তার নিজের anatomy নিয়ে প্রকাশ হয়; ঠাট বদলায় যেমন প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর, তেমনি ছাঁদ বদলায় প্রত্যেক ছবির কবিতার রচনার বেলায়। ধর যদি এমন নিয়ম করা যায় যে কাশীদাসী ছন্দ ছাড়া কবিরা কোনো ছন্দে লিখতে পারবে না—যেমন আমরা চাচ্ছি ডাক্তারি anatomy ছাড়া ছবিতে আর কিছু চলবে না—তবে কাব্যজগতে ভাবের ও ছন্দের কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়,—সুরের বদলে থাকে শুধু দেশজোড়া কাশি আর রচয়িতার বদলে থাকে কতকগুলি দাস। কাজেই কবিদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে 'কবয়ঃ নিরঙ্কুশাঃ' বলে, কিন্তু বাস্তবজগৎ থেকে ছাড়া পেয়ে কবির মন উড়তে পারবে যথাসুখে যথাতথা, আর ছবি আটকে থাকবে ফটোগ্রাফারের বাক্সর মধ্যে—জালার মধ্যে বাঁধা আরব্য উপন্যাসের জিন্-পরীর মতো সুলেমানের সীলমোহর আঁটা চিরকালই, এ কোনদেশী কথা? ইউরোপ, যে চিরকাল বাস্তবের মধ্যে আর্টকে বাঁধতে চেয়েছে সে এখন সীলমোহর মায় জালা পর্যন্ত ভেঙে কি সঙ্গীতে, কি চিত্রে, ভাস্কর্যে, কবিতায়, সাহিত্যে বাঁধনের মুক্তি কামনা করছে; আর আমাদের আর্ট যেটা চিরকাল মুক্ত ছিল তাকে ধরে ডানা কেটে পিঁজিরের মধ্যে ঠেসে পুরতে চাচ্ছি আমরা। বড় পা'কে ছোট জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে চীনের রাজকন্যার যা ভোগ ভুগতে হয়েছে সেটা কষা জুতোর একটু চাপ পেলেই আমরা অনুভব করি—পা বেরিয়ে পড়তে চায় চট্ করে জুতো ছেড়ে, কিন্তু হায়! ছবি—সে কিনা আমাদের কাছে শুধু কাগজ, সুর—সে কিনা শুধু খানিক গলার শব্দ, কবিতা—সে শুধু কিনা ফর্মাবাঁধা বই; তাই তাদের মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে-চুরে চামড়ার থলিতে ভরে দিতে কষ্টও পাইনে ভয়ও পাইনে।

অন্যথা বৃত্তি হল আর্টের এবং রচনার পক্ষে মস্ত জিনিস, এই অন্যথা-বৃত্তি দিয়েই কালিদাসের মেঘদূতের গোড়া পত্তন হল, অন্যথা-বৃত্তি কবির চিত্ত মানুষের রূপকে দিলে মেঘের সচলতা এবং মেঘের বিস্তারকে দিলে মানুষের বাচালতা। এই অসম্ভব ঘটিয়ে কবি সাফাই গাইলেন যথা—"ধূমজ্যোতিসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ক মেঘঃ, সন্দেশার্থাঃ ক্ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ!"[১] ধূম আলো আর জল-বাতাস যার শরীর, তাকে শরীর

দাও মানুষের, তবে তো সে প্রিয়ার কানে প্রাণের কথা পৌঁছে দেবে? বিবেক ও বুদ্ধি মাফিক মেঘকে মেঘ রেখে কিছু রচনা করা কালিদাসও করেননি, কোন কবিই করেন না। যখন রচনার অনুকুল মেঘের ঠাট কবি তখন মেঘকে হয়তো মেঘই রাখলেন কিন্তু যখন রচনার প্রতিকূল ধুম জ্যোতি জল বাতাস তখন নানা বস্তুতে শক্ত করে, বেঁধে নিলেন কবি। এই অন্যথা-বৃত্তি কবিতার সর্বস্ব, তখনো যেমন এখনো তেমন, রসের বশে ভাবের খাতিরে রূপের অন্যথা হচ্ছে—

“শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন পথভোলা
ঐ যে পূরব গগন জুড়ে, উত্তরী তার যায় রে উড়ে
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা!
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে,
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্ খানে,
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে, ঐ ত আমার লাগায় মনে,
পরশখানি নানা সুরের ঢেউ তোলা।”

ভাব ও রসের অন্যান্য বৃত্তি পেয়ে মেঘ এখানে নতুন সচল anatomyতে রূপান্তরিত হল। এখন বলতে পারো মেঘকে তার স্বরূপে রেখে কবিতা লেখা যায় কি না? আমি বলি যায়, কিন্তু অভ্রবিজ্ঞানের হিসেব মেঘের রূপকে যেমন ছন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখায়, সেভাবে লিখলে কবিতা হয় না, রঙের ছন্দ বা ছাঁদ, সুরের ছাঁদ, কথার ছাঁদ দিয়ে মেঘের নিজস্ব ও প্রত্যক্ষ ছাঁদ না বদলালে কবিতা হতে পারে না, যেমন—

“আজি বর্ষা রাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয়
            অরুণ আলো মেশে।
বেণু বনের মাথায় মাথায়
রঙ লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধরায় হৃদয় হারায়
কোথা যে যায় ভেসে।”

মনে হবে অপ্রাকৃত কিছু নেই এখানে, কিন্তু কালো শুধু বলা চলল না, কোমল কালো হলে ভেসে চলতে পারল না আকাশে বাতাসে রঙের স্রোত বেয়ে কবির মানসকমল থেকে খসে-পড়া সুর-বোঝাই পাপড়িগুলি সেই দেশের খবর আনতে যে দেশের বাদল বাউল একতারা বাজাচ্ছে সারা বেলা। সকালের প্রকৃত মূর্তিটা হল মেঘের কালোয় একটু আলো কিন্তু টান-টোনের কোমলতা পাতার হিলিমিলি নানা রঙের ঝিলিমিলির মধ্যে তাকে কবি হারিয়ে দিলেন; মেঘের শরীর আলোর কম্পন পেলে, ফটোগ্রাফের মেঘের মতো চোখের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল না। বর্ষার শেষরাত্রে সত্যিকার মেঘ যেভাবে দেখতে দেখতে হারিয়ে যায়, সকালের মধ্যে মিলিয়ে দেয় তার বাঁধা রূপ, ঠিক সেই ভাবের একটি গতি পেলে কবির রচনা। সকালে মেঘে একটু আলো পড়েছে এই ফটোগ্রাফটি দিলে না কবিতা; আলো মেঘ লতাপাতার গতিমান ছন্দে ধরা পড়ল শেষ বর্ষার চিরন্তন রস এবং মেঘলোকের লীলাহিল্লোল। রচনার মধ্যে এই যে রূপের রসের চলাচল গতাগতি, এই

নিয়ে হল তফাত ঘটনার নোটিসের সঙ্গে রচনার প্রকৃতির। নোটিস সে নির্দেশ করেই থামল, রচনা চলে গেল গাইতে গাইতে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে মনের থেকে মনের দিকে এক কাল থেকে আর এক কালে বিচিত্রভাবে। কবিতায় বা ছবিতে এইভাবে চলায়মান রঙ রেখা রূপ ও ভাব দিয়ে যে রচনা তাকে আলঙ্কারিকেরা গতিচিত্র বলেন—অর্থাৎ গতিচিত্রে রূপ বা ভাব কোন বস্তুবিশেষের অঙ্গবিন্যাস বা রূপসংস্থানকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থাকে না কিন্তু রেখার রঙের ও ভাবের গতাগতি দিয়ে রসের সজীবতা প্রাপ্ত হয়ে আসা-যাওয়া করে। বীণার দুই দিকে বাঁধা টানা তারগুলি সোজা লাইনের মতো অবিচিত্র নির্জীব আছে—বলছেও না চলছেও না। সুর এই টানা তারের মধ্যে গতাগতি আরম্ভ করলে অমনি নিশ্চল তার চঞ্চল হল গীতের ছন্দে, ভাবের দ্বারা সজীব হল, গান গাইতে লাগল, নাচতে থাকল তালে তালে। পর্দায় পর্দায় খুলে গেল সুরের অসংখ্য পাপড়ি, সোজা anatomyর টানা পাঁচিল ভেঙে বার হল সুরের সুরধুনী-ধারা, নানা ভঙ্গিতে গতিমান। আকাশ এবং মাটি এরি দুই টানের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের anatomy-দোরস্ত শরীর। দুই খোঁটায় বাঁধা তারের মতো, এই হলে ডাক্তারি anatomyর সঠিক রূপ। আর বাতাসের স্পর্শে আলোর আঘাতে গাছ-ফুল-পাতা-লতা এরা লতিয়ে যাচ্ছে ছড়িয়ে যাচ্ছে শাখা-প্রশাখার আঁকা-বাঁকা নানা ছন্দের ধারায়; এই হচ্ছে artistic anatomyর সঠিক চেহারা। আর্টিস্ট রসের সম্পদ নিয়ে ঐশ্বর্যবান, কাজেই রস বন্টনের বেলায় রসপত্রের জন্য তাকে খুঁজে বেড়াতে হয় না কুমোরটুলি, সে রসের সঙ্গে রসপাত্রটাও সৃষ্টি করে ধরে দেয় ছোট বড় নানা আকারে ইচ্ছামতো। এই পাত্রসমস্যা শুধু যে ছবি লিখছে তাকেই যে পূরণ করতে হয় তা নয়, রসের পাত্র-পাত্রীর anatomy নিয়ে গণ্ডগোল রঙ্গমঞ্চে খুব বেশি রকম উপস্থিত হয়। নানা পৌরাণিক ও কাল্পনিক সমস্ত দেবতা উপদেবতা পশুপক্ষী যা রয়েছে তার anatomy ও model বাস্তব জগৎ থেকে নিলে তো চলে না। হরেরামপুরের সত্যি রাজার anatomy রাজশরীর হলেও রঙ্গমঞ্চের রাজা হবার কাজে যে লাগে তা নয়, একটা মুটের মধ্যে হয়তো রাম রাজার রসটি ফোটাবার উপযুক্ত anatomy খুঁজে পাওয়া যায়। নারীর anatomy হয়তো সীতা সাজবার কালে লাগল না, একজন ছেলের anatomy দিয়ে দৃশ্যটার মধ্যে উপযুক্ত রসের উপযুক্ত পাত্রটি ধরে দেওয়া গেল। পাখির কি বানরের কি নারদের ও দেবদেবীর ভাব ভঙ্গি চলন বলন প্রভৃতির পক্ষে যেরকম শরীরগঠন উপযুক্ত বোধ হল অধিকারী সেই হিসেবে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন বা সজ্জিত করে নিলে;—যেখানে আসল মানুষের উচ্চতা রচয়িতার ভাবনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলে না সেখানে রণ্পা দিয়ে anatomical মাপ বাড়িয়ে নিতে হল, যেখানে আসল দু' হাতের মানুষ কাজে এল না সেখানে গড়া হাত গড়া ডানা ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি ভাঙাচোরা দিয়ে নানা রসের পাত্র-পাত্রী সৃষ্টি করতে হল বেশ-কারকে,—রচয়িতার কল্পনার সঙ্গে অভিনেতার রূপের সামঞ্জস্য এইভাবে লাভ করতে হল নাটকে! কল্পনামূলক যা তাকে প্রকৃত ঘটনার নিয়মে গাঁথা চলে না, আর ঘটনামূলক নাটক সেখানেও একেবারে পাত্র-পাত্রীর সঠিক চেহারাটি নিয়ে কাজ চলে না, কেননা যে ভাব যে রস ধরতে চেয়েছেন রচয়িতা, তা রচয়িতার কল্পিত পাত্র-পাত্রীর চেহারার সঙ্গে যতটা পারা যায় মেলাতে হয় বেশ-কারকে। এক-একজন বেশ সুঠাম সুশ্রী, পাঠও করতে পারলে বেশ, কিন্তু তবু নাটকের নায়ক-বিশেষের পার্ট তাকে দেওয়া গেল না, কেননা সেখানে নাটক-রচয়িতার কল্পিতের সঙ্গে বিশ্ব-রচয়িতার কল্পিত মানুষটির anatomy গঠন ইত্যাদি মিলল না। ছবিতেও তেমনি কবিতাতেও তেমনি, ভাবের ছাঁদ অনেক সময়ে মানুষের কি আর কিছুর বাস্তব ও বাঁধা ছাঁদ দিয়ে পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করা যায় না, অদল-বদল ঘটাতেই হয়, কতখানি অদল-বদল সয় তা

আর্টিস্ট যে রসমূর্তি রচনা করছে সেই ভাল বুঝবে আর কেউ তো নয়। চোখে দেখছি যে মানুষ, যেসব গাছপালা নদ-নদী পাহাড়-পর্বত আকাশ—এরি উপরে আলো-আঁধার ভাব-ভঙ্গি দিয়ে বিচিত্র রস সৃজন করে চললেন যাঁর আমরা রচনা তিনি, আর এই যে নানা রেখা নানা রঙ নানা ছন্দ নানা সুর এদেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত করলে মানুষ নিজের কল্পিতটি। মানুষ বিশ্বের আকৃতির প্রতিকৃতি নিজের রচনায় বর্জন করলে বটে, কিন্তু প্রকৃতিটি ধরলে অপূর্ব কৌশলে যার দ্বারা রচনা দ্বিতীয় একটা সৃষ্টির সমান হয়ে উঠল। এই যে অপূর্ব কৌশল যার দ্বারা মানুষের রচনা মুক্তিলাভ করে ঘটিত জগতের ঘটনা সমস্ত থেকে, এটা কিছুতে লাভ করতে পারে না সেই মানুষ যে এই বিশ্বজোড়া রূপের মূর্ত দিকটার খবরই নিয়ে চলেছে, রসের অমূর্ততা মূর্তকে যেখানে মুক্ত করছে সেখানের কোন সন্ধান নিচ্ছে না, শুধু ফটোযন্ত্রের মতো আকার ধরেই রয়েছে, ছবি ওঠাচ্ছে মাত্র ছবি ফোটাচ্ছে না। মানুষের মধ্যে কতক আছে মায়াবাদী কতক কায়াবাদী; এদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ লেগেই আছে। একজন বলছে, কায়ার উপযুক্ত পরিমাণ হোক ছায়া-মায়া সমস্তই, আর-একজন বলছে তা কেন, কায়া যখন ছায়া ফেলে সেটা কি খাপে খাপে মেলে শরীরটার সঙ্গে, না নীল আকাশ রঙের মায়ায় যখন ভরপুর হয় তখন সে থাকে নীল, বনের শিয়রে যখন চাঁদনী মায়াজাল বিস্তার করলে তখন বনের হাড়হদ্দ সব উড়ে গিয়ে শুধু যে দেখ ছায়া, তার কি জবাব দেবে? মায়াকে ধরে রয়েছে কায়া, কায়াকে ঘিরে রয়েছে মায়া; কায়া অতিক্রম করছে মায়া দিয়ে আপনার বাঁধা রূপ, মায়া সে নিরূপিত করছে উপযুক্ত কায়া দ্বারা নিজকে। জাগতিক ব্যাপারে এটা নিত্য ঘটছে প্রতি মুহূর্তে। জগৎ শুধু মায়া কি শুধু কায়া নিয়ে চলছে না, এই দুইয়ের সমন্বয় চলেছে; তাই বিশ্বের ছবি এমন চমৎকারভাবে আর্টিস্টের মনটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে! এইযে সমন্বয়ের সূত্রে গাঁথা কায়া-মায়া ফুল আর তার রঙের মতো শোভা পাচ্ছে—anatomyর artistic ও inartistic সব রহস্য এরি মধ্যে লুকোনো আছে। রূপ পাচ্ছে রসের দ্বারা অনির্বচনীয়তা, রস হচ্ছে অনির্বচনীয় যথোপযুক্ত রূপ পেয়ে, রূপ পাচ্ছে। প্রসার রসের, রস পাচ্ছে প্রসার রূপের, এই একে-একে মিলনে হচ্ছে দ্বিতীয় সৃজন আর্টে, তারপর সুর, ছন্দ, বর্ণিকাভঙ্গ ইত্যাদি তৃতীয় এসে তাকে করে তুলেছে বিচিত্র ও গতিমান। ওদিকে এক রচয়িতা এদিকে এক রচয়িতা, মাঝে রয়েছে নানা রকমের বাঁধা রূপ; সেগুলো দুদিকের রঙ্গ-রসের পাত্র-পাত্রী হয়ে চলেছে—বেশ বদলে বদলে ঠাট বদলে বদলে—অভিনয় করছে নাচছে গাইছে হাসছে কাঁদছে চলাফেরা করছে! রচকের অধিকার আছে রূপকে ভাঙতে রসের ছাঁদে। কেননা রসের খাতিরে রূপের পরিবর্তন প্রকৃতির একটা সাধারণ নিয়ম, দিন চলেছে রাত চলেছে জগৎ চলেছে রূপান্তরিত হতে হতে, ঋতুতে ঋতুতে রসের প্রেরণাটি চলেছে গাছের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত রূপের নিয়ম বদলাতে বদলাতে পাতায় পাতায় ফুলে ফলে ডালে ডালে! শুধু এই নয়, যখন রস ভরে উঠল তখন এতখানি বিস্তীর্ণ পাত্রেও রস ধরল না—গন্ধ হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল রস, রঙে-রঙে ভরে দিলে চোখ, উথলে পড়ল রস মধুকরের ভিক্ষাপাত্রে, এই যে রসজ্ঞানের দাবি এ সত্য দাবি, সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে স্পর্ধার দাবি নয়, সত্যাগ্রহীর দাবি। ডাক্তারের দাবি ঐতিহাসিকের দাবি সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে একে তো অমান্য করে চলে না। আর্টিস্ট যখন কিছুকে যা থেকে তাতে রূপান্তরিত করলে তখন সে যা-তা করলে তা নয়, সে প্রকৃতির নিয়মকে অতিক্রম করলে না, উল্টে বরং বিশ্বপ্রকৃতিতে রূপমুক্তির নিয়মকে স্বীকার করলে, প্রমাণ করে চলল হাতে কলমে। আর যে মাটিতেই হোক বা তেল রঙেতেই হোক রূপের ঠিক-ঠিক নকল করে চলল, সে আঙুরই গড়ুক বা আমই গড়ুক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু সে দিয়ে যেতে পারলে না, সে অভিশপ্ত হল, কেননা সে বিশ্বের চলাচলের

নিয়মকে স্বীকার করলে না প্রমাণও করলে না কোন কিছু দিয়ে, অলঙ্কারশাস্ত্র মতো তার কাজ পুনরাবৃত্তি এবং ভ্রান্তিমৎ দোষে দুষ্ট হল। রক্ত চলাচলের খাদ্য চলাচলের পক্ষে যে ভৌতিক শরীর-গঠন অস্থিসংস্থান তার মধ্যে রসাধার আর-একটি জিনিস আছে যার anatomy ডাক্তার খুঁজে পায়নি এ পর্যন্ত। বাইরের শরীর আমাদের বাঁধা ছাঁচে ঢালা আর অন্তর্দেহটি ছাঁচে ঢালা একেবারেই নয় সুতরাং সে স্বাধীনভাবে রসের সম্পর্কে আসে, এ যেন এতটুকু খাঁচায় ধরা এমন একটি পাখি যার রসমূর্তি বিরাটের সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে, বচনাতীত সুর বর্ণনাতীত বর্ণ তার। এই পাখির মালিক হয়ে এসেছে কেবল মানুষ আর কোনো জীব নয়। বাস্তব জগৎ যেখানে সীমা টানলে রূপের লীলা শেষ করলে সুর থামালে আপনার, সেইখানে মানুষের খাঁচায় ধরা এই মানস পাখি সুর ধরলে, নতুনরূপে ধরে আনলে অরূপের রূপ—জগৎ সংসার নতুন দিকে পা বাড়ালে তবেই মুক্তির আনন্দে। মানুষ তার স্বপ্ন দিয়ে নিজেকেই যে শুধু মুক্তি দিচ্ছে তা নয় যাকে দর্শন করছে যাকে বর্ণন করছে তার জন্যে মুক্তি আনছে। আটঘাট-বাঁধা বীণা আপনাকে ছাড়িয়ে চলেছে এই স্বপ্নে, সুরের মধ্যে গিয়ে বাঁশি তার গাঁঠে-গাঁঠে-বাঁধা ঠাট ছাড়িয়ে বার হচ্ছে, এই স্বপ্নের দুয়ার দিয়ে ছবি অতিক্রম করেছে ছাপকে, এই পথে বিশ্বের হৃদয় দিয়ে মিলছে বিশ্বরূপের হৃদয়ে, এই স্বপ্নের পথ। বীণার সেই anatomyটাই বীণার সত্য anatomy, এ সত্য আর্টিস্টমাত্রকেই গ্রহণ করতে হয় আর্টের জগতে ঢোকার আগেই, না হলে সচরাচরকে ছাড়িয়ে সে উঠতে ভয় পায়। পড়া পাখি যা শুনলে তারই পুনরাবৃত্তি করতে থাকল, রচয়িতার দাবি সে গ্রহণ করতে পারলে কি? মানুষ যা দেখলে তাই এঁকে চলল, রচয়িতার দাবি নিতে পারলে কি সে? নিয়তির নিয়মে যারা ফুল পাতার সাজে সেজে এল, রঙিন ডানা মেলে নেচে চলল গেয়ে চলল, তারা কেউ এই বিশ্বসংসারের রচয়িতার দাবি নিতে পারলে না, এক যারা স্বপন দেখলে স্বপন ধরলে সেই আর্টিস্টরা ছাড়া। পাখি পারলে না রচয়িতার দাবি নিতে কিন্তু আকাশের পাখিকে ধরার ফাঁদ যে মানুষ রচনা করলে মাটিতে বসে সে এ দাবি গ্রহণ করলে, নিয়তিকৃত নিয়ম রহিতের নিয়ম যারা পদে পদে প্রমাণ করে চলল নিজেদের সমস্ত রচনায়, তারাই দাবি দিতে পারলে রচয়িতার। কবীর তাই বললেন—“ভরম জঞ্জাল দুখ ধন্দ ভারি”—ভ্রান্তির জঞ্জাল দূর করো, তাতে দুঃখ ও দীনতা আর ঘোর সংশয়: ‘সত্ত দাবী গহো আপ নির্ভয় রহো”—তোমার যে সত্য দাবি তাই গ্রহণ করো, নির্ভয় হও। যে মানুষ রচয়িতার সত্য দাবি নেয়নি কিন্তু স্বপন দেখলে ওড়বার, সে নিজের কাঁধে পাখির ডানা লাগিয়ে উড়তে গেল, পরীর মতো দেখতে হল বটে সে, কিন্তু পরচুলো তার বাতাস কাটলে না, ঝুপ করে পড়ে মরল সে; কিন্তু যে রচয়িতার সত্য দাবি গ্রহণ করলে তার রচনা মাধ্যাকর্ষণের টান ছাড়িয়ে উড়ল তাকে নিয়ে লোহার ডানা বিস্তার করে আকাশে। মানুষ জলে হাঁটবার স্বপন দেখলে, রচয়িতার দাবি গ্রহণ করলে না—ডুবে মরল দু’পা না যেতে, রচয়িতার রচনা পায়ের মতো একেবারেই দেখতে হল না কিন্তু গুরুভাবের দ্বারা সে জলের লঘুতাকে জয় করে স্রোতের বাধাকে তুচ্ছ করে চলে গেল সাত সমুদ্র পার। মানুষ নিমেষে তেপান্তর মাঠ পার হবার স্বপন দেখলে, রচয়িতার দাবি নিতে পারলে না, খানিক পথে দৌড়ে দৌড়ে ক্লান্ত হল তার anatomy-দোরস্ত শরীর, তৃষ্ণায় বুক ফেটে মরল সে হরিণের মতো, ঘোড়াও দৌড় অবলম্বন করে যতটা যেতে চায় নির্বিঘ্নে তা পারলে না, রণক্ষেত্রে ঘোড়া মায় সওয়ার পড়ে মরল! রচয়িতা নিয়ে এল লোহার পক্ষিরাজ ঘোড়া—যেটা ঘোড়ার মতো একেবারেই নয় হাড়হদ্দ কোনো দিক দিয়ে,—সৃজন করে উঠে বসল, আপন পর সবাইকে নিয়ে নিমেষে ঘুরে এল যোজন বিস্তীর্ণ পৃথিবী নির্ভয়ে! যা নিয়তির নিয়মে কোথাও নেই তাই হল, জলে শিলা ভাসল আকাশে মানুষ উড়ল,

ঘুমোতে ঘুমোতে পৃথিবী ঘুরে এল রচনায় চড়ে মানুষ! প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত আচরণে দোষ এখানে তো আমাদের চোখে পড়ে না। মানুষ যখন আয়নার সামনে বসে চুল ছাঁটে, টেরি বাগায়, ছিটের সার্টে বাঙলা anatomyর সৌন্দর্য ঢেকে সাহেবী ঢঙে ভেঙে নেয় নিজের দেহ, কাজল টেনে চোখের টান বাড়িয়ে প্রেয়সী দেখা দিলে বলে বাহবা,—চুলের খোঁপার ঘোরপেচ দেখে বাঁধা পড়ে—নিজের কোনো সমালোচনা যে মানে না তার কাছে, তখন সে ছবির সামনে এসে anatomyর কথা পাড়ে কেন সে আমার কাছে এক প্রকাণ্ড রহস্য!

ঈজিপ্টের লোক এককালে সত্যিই বিশ্বাস করত যে, জীবন কায়া ছেড়ে চলে যায় আবার কিছু দিন পরে সন্ধান করে করে নিজের ছেড়ে ফেলা কামিজের মতো কায়াতেই এসে ঢোকে। এইজন্যে কায়ার মায়া তারা কিছুতে ছাড়তে পারেনি, ভৌতিক শরীরকে ধরে রাখার উপায় সমস্ত আবিষ্কার করেছিল, একদল কারিগরই তৈরি হয়েছিল ঈজিপ্টে, যারা 'কা' প্রস্তুত করতো; তাদের কাজই ছিল যেমন মানুষ ঠিক সেই গড়নে পুত্তলিকা প্রস্তুত করা, গোরের মধ্যে ধরে রাখার জন্য; ঠিক এইসব 'কা'-নির্মাতাদের পাশে বসে ঈজিপ্টের একদল রচয়িতা artistic anatomy বৃহত্ত ও অন্যথা-বৃত্ত দিয়ে পুত্তলিকা বা 'কা'-নির্মাতাদের ঠিক বিপরীত রাস্তা ধরে গড়েছিল কত কি তার ঠিক নেই, দেবতা মানুষ পশু পক্ষী সবার anatomy ভেঙে-চুরে তারা নতুন মূর্তি দিয়ে অমরত্বের সিংহাসনে বসিয়ে গেল। ঈজিপ্টের এই ঘটনা হাজার হাজার বৎসর আগে ঘটেছিল; কায়া নির্মাতা কারিগর ও ছায়া-মায়ার জাদুকর দুই দলই গড়লে কিন্তু একজনের ভাগ্যে পড়ল মূর্ত— যা-কিছু তাই, আর-একজনের পাত্রে ঝরল অমূর্ত রস স্বর্গ থেকে,—এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোনো যুগের আর্টের ইতিহাসে হয়নি হবার নয়। ঈজিপ্ট তো দূরে, পাঁচ হাজার দশ হাজার বছর আরো দূরে, এই আজকের আমাদের মধ্যে যা ঘটছে, তাই দেখ না কেন; যারা ছাপ নিয়ে চলেছে মর্ত্য জগতের রূপ সমস্তের, তারা মূর্ত জিনিস এত পাচ্ছে দেখে সময়ে সময়ে আমারও লোভ হয়,—টাকা পাচ্ছে হাততালি পাচ্ছে অহংকে খুব বেশি করে পাচ্ছে। আর এরূপ যারা করছে না তারা শুধু আঁকা-বাঁকা ছন্দের আনন্দটুকু, ঝিলিমিলি রঙের সুরটুকু বুকের মধ্যে জমা করছে, লোহার সিন্দুক কিন্তু রয়েছে খালি; বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই কালে কালে খুব আদর করে আর্টিস্টদের যা সম্ভাষণ করেছে তা উর্দুতে বলতে গেলে বলতে হয়—খেয়ালী, হিন্দীতে—বাউর বা বাউল, আর সবচেয়ে মিষ্টি হল বাঙলা—পাগল। কিন্তু এই পাগল তো জগতে একটি নেই, উপস্থিত দশ বিশ লক্ষ কিংবা তারও চেয়ে হয়তো বেশি এবং অনুপস্থিত ভবিষ্যতের সব পাগলের সর্দার হয়ে যে রাজত্ব করছে, উল্কার মতো জ্যোতির্ময় সৃষ্টি রচনা সমস্ত সে ছড়িয়ে দিয়ে চলেছে পথে-বিপথে সৃজনের উৎসব করতে করতে। এমন যে খেয়ালের বাউল, জগতের আগত অনাগত সমস্ত খেয়ালী বা আর্টিস্ট হল তার চেলা, তারা পথ চলতে ঢেলাই হোক মাণিকই হোক যাই কুড়িয়ে পেলে অমনি সেটাকে যে খুব বুদ্ধিমানের মতো ঝুলিতে লুকিয়ে রাতারাতি আলো-আঁধারের ভ্রান্তি ধরে চোখে ধুলে দিয়ে বাজারে বেচে এল তা নয়—মাটির ঢেলাকে এমন করে ছেড়ে দিলে যে সেটা উড়ে এসে যখন হাতে পড়ল তখন দেখি সোনার চেয়ে সেটা মূল্যবান, আসল ফুলের চেয়ে হয়ে গেছে সুন্দর! বাঙলায় আমাদের মনে আর্টের মধ্যে অস্থিবিদ্যার কোনখানে স্থান, এই প্রশ্নটা ওঠবার কয়েক শত বৎসর আগে এই পাগলের দলের একজন আর্টিস্ট এসেছিল। সে জেগে বসে স্বপন দেখলে—যত মেয়ে শ্বশুর ঘরে রয়েছে আসতে পারছে না বাপের বাড়ি, একটা মূর্তিতে সেই সবারই রূপ ফুটিয়ে যাবে! আর্টিস্ট সে বসে গেল কাদা মাটি খড় বাঁশ রং তুলি নিয়ে, দেখতে দেখতে মাটির প্রতিমা সোনার কমল হয়ে ফুটে উঠল দশ দিকে সোনার পাপড়ি মেলে! এ মূর্তি বাঙলার ঘরে ঘরে দেখবে দু'দিন পরে, কিন্তু এরও উপরে

ডাক্তারিশাস্ত্রের হাত কিছু কিছু পড়তে আরম্ভ হয়েছে শহরে। বাঙলার কোনো অজ্ঞাত পল্লীতে এই মূর্তির মূল ছাঁদ যদি খোঁজ তো দেখবে—তার সমস্তটা artistic anatomyর নিয়মের দ্বারায় নিয়তির নিয়ম অতিক্রম করে শোভা পাচ্ছে ব্যতিক্রম ও অতিক্রমের সিংহাসনে।

টীকা

১. ৪র্থ শ্লোক, পূর্বমেঘ—মেঘদূতম্ (কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ)

অন্তর বাহির

ফটোগ্রাফের সঙ্গে ফটোকর্তার যোগ পুরো নয়—পাহাড় দেখলেম ক্যামেরা খুললেম ছবি উঠল ফটোকর্তার অন্তরের সঙ্গে পাহাড়ের যোগাযোগই হল না। এইজন্যে আর্টিস্টের লেখা পাহাড় যেমন মনে গিয়ে পৌঁছোয়, ফটোতে লেখা পাহাড় ঠিক তেমন ভাবে মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না—শুধু চোখের উপর দিয়েই ভেসে যায় বায়স্কোপের ছবি, মনের মধ্যে তলিয়ে যায় না। খবরের কাগজ খবর দিয়েই চলল অনবরত, আজ পড়লেম দুদিন পরে ভুললেম। কবি গান গেয়ে গেলেন, শিল্পী রচনা করে গেলেন, চোখ কানের রাস্তা ধরে মর্মে গিয়ে পৌঁছোল গান ও ছবি। ক্যামেরার মতো চোখ খুললেম বন্ধ করলেম, একই বস্তু একই ভাবে বারংবার এল কাছে,—এ হল অত্যন্ত সাধারণ দেখা। শিল্পীর মতো চোখ মেললেম বস্তুজগতের দিকে, রূপ চোখে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে রূপাতীত রসের উদয় হল।

ফটোগ্রাফ বস্তুজগতের একচুল ওলট-পালট করতে অক্ষম, কিন্তু শিল্পীর কল্পনা যে বরফের হাওয়া পেলে —ফটোগ্রাফের মধ্যে যতটা বস্তু তার সমস্তটা পালাই পালাই করে—সেই বরফের চূড়ায় হর-গৌরীকে বসিয়ে দিলে বিনা তর্কে। চোখের দেখা ও মনের দেখা দিয়ে শিল্পী যখন মিললেন চোখের সামনে বিদ্যমান যা এবং চোখের বাইরে অবিদ্যমান যা তার সঙ্গে, তখন নিয়তির নিয়ম উল্টে গেল অনেকখানি—দেবতা সমস্ত এসে সামনে দাঁড়াল ঠিক মানুষের মতোই দুই পায়ে কিন্তু অসংখ্য হাত অসংখ্য মাথা নিয়ে, নিচের দিকে রইল বাস্তব উপরে রইল অবাস্তব, সম্ভবমতো হল দুই পা, অসম্ভব রকম হল হাত ও মাথা, সৃষ্টির নিয়ম মিলল গিয়ে অনাসৃষ্টির অনিয়মে।

ফটোগ্রাফের যে কৌশল তা বস্তুর বাইরেটার সঙ্গেই যুক্ত আর শিল্পীর যে যোগ তা শিল্পীর নিজের অন্তর-বাহিরের সঙ্গে বস্তুজগতের অন্তর-বাহিরের যোগ এবং সেই যোগের পন্থা হল কল্পনা এবং বাস্তব ঘটনা দুয়ের সমন্বয় করার সাধনাটি।

নির্ভুলে ব্যাকরণ ও পরিভাষা ইত্যাদি দিয়ে যেমনটি-তাই ঘটনাকে বলে যাওয়া হলেই যে বলা হল তা নয়, তা যদি হত তো সাহিত্য খবরের কাগজেই বদ্ধ থাকত। তেমনি যা-তা এঁকে চলা মানে শিল্পের দিক থেকে বেঁকে ফটোগ্রাফের দিকে যাওয়া, সুর ছেড়ে হরবোলার বুলি বলা। অবিদ্যমানকে ছেড়ে বিদ্যমানে বর্তে নেই একদণ্ড এই সৃষ্টি এবং কল্পনাকে ছেড়ে শুধু ঘটনার মধ্যে বর্তে থাকতে পারে না মানুষের রচনা, ঘটনার সঙ্গে কল্পনার মিলন হল, তবে হল একটা শিল্পরচনা। গাছ দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু ফুল পাতা এরা দুলল, কখনো আলোর দিকে মুখ ফেরালে কখনো অন্ধকারের দিকে হাত বাড়ালে। মানুষ বাঁধা রইল মাটির সঙ্গে কিন্তু মন তার বিদ্যমান অবিদ্যমান দুই ডানা মেলে উড়ল, মানুষের শিল্প তার মনের পাখির গতিবিধির চিহ্ন রেখে গেল কালে-কালে—পাথরে কাগজে মাটিতে সোনায় কাঁসায় কাঠে কয়লায়। ইতর জীব তারা বর্তমানটুকুর ঘেরে বাঁধাই রয়েছে, বিদ্যমানের প্রাচীর ছাড়িয়ে যাওয়া শুধু মানুষেরই সাধ্য হয়েছে—ঘোড়া সে কোনোকালে

পক্ষিরাজ হবার কল্পনাই করতে পারলে না কিন্তু মানুষ অতিমানুষের কল্পনা অমানুষি সমস্ত রচনার স্বপ্ন দেখলে, বিদ্যমানের মধ্যে মানুষ আপনাকে ইতর জীবের মতো নিঃশেষে ফুরিয়ে দিতে পারলে না; সে কল্পনা ও স্মৃতি এই দুই টানাপোড়েনে প্রস্তুত করে চলল বিশ্বজোড়া মায়াজাল। সে ঘুমিয়ে স্বপন দেখলে, জেগে স্বপন দেখলে, বিদ্যমান থেকে অবিদ্যমান পর্যন্ত তার মন এল গেল—অবিদ্যমানকে আনলে, অনাবিষ্কৃতকে করলে আবিষ্কার। পাখিরা যে সুর পেলে সেই সুরেই গেয়ে গেল, অনাহত সুরের সন্ধান তারা পেলে না; দেওয়া-সুরেই গাইলে কোকিল, দেওয়া-সুরেই ডাকলে ময়ূর, কিন্তু মানুষের গলায় অবিদ্যমানের সুর পৌঁছোল—অনাহত তারের অপ্রকাশিত সুর, তাই শুনে বিশ্বজগৎ হরিণের মতো কান খাড়া করে স্তব্ধ হয়ে রইল, অগোচর রূপ সাগরের জল মানুষ ছুঁয়ে এল, তার হাতের পরশে ফুটল বিচিত্র ছবি বিচিত্র শিল্পকলা, আর একটি নতুন সৃষ্টি—পলে-পলে কালে-কালে যা নতুন থেকে নতুনতর রাজত্বে চলেছে তো চলেছেই! বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান দুই ডানার উত্থান-পতনের গতি ধরে চলেছে মানুষের মনের সঙ্গে মানুষের মানস-কল্পনার প্রকাশগুলি। অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের মধ্যে ধরে দিচ্ছে মানুষ, অন্তরকে আনছে বাইরে, বাইরেকে নিয়ে চলেছে অন্তর,—এই হল শিল্পরচনার মূলের কথা। শিল্প এল সামনে, পিছনে লুকিয়ে রইল শিল্পী,—এই হল শিল্পের সঠিক লক্ষণ। ময়ূর শিল্পী নয় কেননা সে তার চালচিত্র আড়াল করে নিজেকে সামনে ধরে দেয়। রচনাকে ঠেলে বেরিয়ে এল সুচতুর রচয়িতা এটা একটা মস্ত দোষ, ছবিটাকে আড়াল করে ছবি-লিখিয়ে তাড়াতাড়ি তোড়জোড় নিয়ে যদি সামনে দাঁড়ায়, ছবির কোণের নামটা এবং তুলির টানটাই দেখবার বিষয় বলে, তবে সে লোককে কি সওয়া যায় চিত্রবিদ বলে? অবিদ্যমানের দিকে, কল্পনার দিকে, অগোচরের দিকে, যে চিরন্তন টান রয়েছে সমস্ত শিল্পের সমস্ত শিল্পীর, এটা যে না বোঝে চিত্রের বিচিত্র রহস্য সে বোঝে না, তার কাছে বাস্তব ও কাল্পনিক দুয়েরই অর্থ অজ্ঞাত থেকে যায়, দাঁড়ে বাঁধা পাখির মতো শিল্পশাস্ত্রের বুলিই সে আউড়ে চলে অনর্গল; যথা—"সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং" কিংবা "তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকম্। বায়ুগত্যা লিখেৎ যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ॥"[১] অথবা "সুপ্তং চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতম্। নিম্নোন্নতবিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ॥"[২] যে ওস্তাদ বোল সৃষ্টি করে সে বোঝে বোলের মর্ম কিন্তু খোল সে বোল বলে মাত্র, বলে কিন্তু বোঝে না বোলের সার্থকতা অথবা প্রয়োগের কৌশল। মানুষের লেখা পুঁথিগত শিল্পের চেহারা এক, আর মানুষের মনোমতো করে রচা শিল্পের রূপ অন্য। শাস্ত্রকার চাইলেন শিল্পী আঁকুক ঠিক ঠিক তরঙ্গ অগ্নিশিখা ধুম নিম্ন উন্নত সুপ্ত মৃত জীবিত এককথায় সশ্বাস ইব চলন্ত বলন্ত ইংরেজিতে যাকে বলি life-like ছবি— কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তার ছাড়িয়ে যে শিল্পলোক এবং কল্পনার রাজ্য তার যে অধিবাসী তারা এঁকে চলল এর ঠিক বিপরীত, শুধু নকলনবিসেরাই ধরে রইল সামনে বিদ্যমান শাস্ত্রের বচন ও বস্তুজগত।—"Do not imitate; do not follow others—you will be always behind them."—COROT. আসল মেঘ চলে যায় পলে পলে রূপ বদলাতে বদলাতে, নকল মেঘের বদল নেই, এটা শাস্ত্রকার পণ্ডিতের ঢের আগে শিল্পী আবিষ্কার করে গেছে, তাই সে বলেছে—অনুসরণ অনুকরণ অনুবাদ, এই সব করলে পিছিয়ে পড়বে, পটের 'সশ্বাস ইব' অবস্থায় স-সে-মি-রা হয়ে হবে পুঁথির ও পরের তল্পিদার মাত্র, শিল্পী হবে না শিল্পকে পাবে না— "Nothing is so tiring as a constant close intimate of life once come back inevitively to imaginative work".—WEERTZ.

"তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকম্। বায়ুগত্যা লিখে যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ॥"[৩] অথবা "সুপ্তং চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতম্। নিম্নোন্নতবিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ॥"[৪] —এ হল শিল্পে বাস্তবপন্থীর কথা—যেন ঢেউ উঠছে পড়ছে, যেন আগুন জ্বলছে, নিশান লটপট করছে, আঁচল উড়ছে বাতাসে, যেন ঘুমন্ত যেন জীবন্ত যেন মৃত যেন নিম্নোন্নত,—এককথায় 'সশ্বাস ইব' হল চরম কথা। কিন্তু এই মতের অনুসরণে গিয়ে কি মানুষ অনুকরণেই ঠেকে রইল না শিল্পী সে ছবি লিখে চলল বায়ুর চেয়ে গতিমান কল্পনার সাহায্যে নিজের বর্ণ ও রেখা সমস্তকে কখন তরঙ্গায়িত শিখায়িত ধূমায়িত করে দিয়ে—এমন মেঘ এমন আগুন, এমন সমুদ্রের এমন ঢেউ যা বাস্তব জগতে দেখেনি কেউ! শিল্পের জয়পতাকা কল্পনার বাতাসে উড়ে অচেতন রেখা চেতন হয়, সচেতন রঙ ঘুমিয়ে পড়ে কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে, শয়ন ছেড়ে জেগে ওঠে মনের মধ্যেকার সুপ্ত ভাব, স্থির বিদ্যুল্লেখার মতো শোভা পায় স্বপ্নপুরের অলক্ষ্য রূপরেখা! কল্পনার যেখানে প্রসার নেই সেখানে রেখা শুধু দপ্তরীর রুলটানা আলো-ছায়া অ্যানাটমি পারসপেক্‌টিভ ইত্যাদির ঘূর্ণাবর্ত, শুধু কুস্তির মারপেঁচ, ভূষণ সেখানে বারঙ্গনার সাজের মতো অপদার্থ এবং বর্ণ সেখানে বহুরূপীর রং-চং-করা সঙ মাত্র, তা সে শাস্ত্রমতো অনুলোম পদ্ধতিতেই আঁকা হোক বা প্রতিলোম পদ্ধতিতেই টানা হোক। "To make a thing which is obviously stone, wood or glass speak is a greater triumph than to produce wax-works or peep-shows,"—Rodin. শিল্পী কতখানি প্রকাণ্ড কল্পনা নিয়ে বাস্তব জগৎ থেকে সরে দাঁড়াল যখন সে কাঠ পাথর কাগজকে কথা বলাতে চাইলে! শিল্পের প্রাণ হচ্ছে কল্পনা, অবিদ্যমানের নিশ্বাস। চৌরঙ্গীর মার্কেটে যে মোমের পুতুলগুলো বিক্রী হচ্ছে তারা একেবারে 'সশ্বাস ইব', চোখ নাড়ে ঘাড় ফেরায় হাসে কাঁদে 'পাপা' 'মামা' বলেও ডাকে কিন্তু 'ইব' পর্যন্তই তার দৌড়! কোনো শিল্পী যদি শিল্পশাস্ত্র লিখতে চায় তবে এই 'ইব' কথাটি তার চিত্রশব্দ-কল্পদ্রুম থেকে বাদ দিয়ে তাকে লিখতে হবে 'সশ্বাস ইব' নয় 'সশ্বাসং যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং'। শিল্পীর মানস কল্পনা যে কল্পলোকের দিব্য নিশ্বাসে প্রাণবন্ত হয় সে হাওয়া কি এই বাতাস যা ঐ লাট প্রাসাদের নিশান দুলিয়ে গড়ের মাঠের ধুলোয় কলের ধুলোয় মলিন হয়ে আমাদের নাকে মুখে দিবারাত্রি যাওয়া-আসা করছে? আর্টিস্টদের মনোরথ যে বাতাস কেটে চলে সে বাতাস হচ্ছে এমন এক তরল হাওয়া যার উপর পালকের ভার সয় না অথচ বিশ্বরচনার ভার সে ধরে আছে! শিল্পশাস্ত্র খুবই গভীর, তার একটা লাইনের অর্থ হাজার রকম, কিন্তু তার চেয়ে গভীর জিনিস হল শিল্প, যার একটা লাইনের মর্ম ঝড়ি-ঝুড়ি শিল্পশাস্ত্রেও কুলোয় না, আবার শিল্পের চেয়ে গভীর হল শিল্পীর মন যার মধ্যে বহির্জগৎ তলিয়ে রইল—স্মৃতির শুক্তিতে ধরা মুক্তি, নতুন জগৎ সৃষ্টি হল জলের মাঝে বাড়বানল। এই যে শিল্পীর মন এর কাজই হল বাইরে গিয়ে আবিষ্কার এবং ভিতরে থেকেও আবিষ্কার, আবির্ভূত যে জগৎ এই গাছপালা জীবজন্তু আকাশ আলো এর সামনে এসে শিল্পীর মন থমকে দাঁড়িয়ে শুধু নকল নিয়ে খুশি হয় না সে খুঁজে খুঁজে ফেরে অনাবিষ্কৃত রয়েছে যা তাকে! শিল্পীর মন দেহপিঞ্জরের অন্তঃপুরে জাদুঘরের মরা পাখির মতো দিন রাত সুখে দুঃখে সমভাবে থাকে না—সে বোধ করে স্বপন দেখে স্বপন রচনা করে চলে অসংখ্য অদ্ভুত অতি বিচিত্র! নিছক ঘটনা আর নিছক কল্পনা এ দুয়েরই কথা শাস্ত্রকার লিখলেন। একদিকে বলা হল "সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্", দর্পণে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তার চেয়ে সচল সশ্বাস,—রূপে প্রমাণে ভাবে লাবণ্যে সাদৃশ্যে বর্ণিকাভঙ্গে সম্পূর্ণ চিত্র আর-কিছুই হতে পারে না। কিন্তু সবাই তো এ বিষয়ে এক মত হতে পারলে না; এর ঠিক উল্টো রাস্তা ধরে একদল শাস্ত্রকার বললেন—"অপি শ্রেয়স্করং নৃণাং দেববিম্বমলক্ষণম্। সলক্ষণং

সত্যবিম্বং ন হি শ্রেয়স্করং সদা॥" কিছুর প্রতিকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলা হল—"মানবাদীনামস্বর্গ্যাণ্যশুভানি চ।" শাস্ত্র পড়ে শিল্পী হতে চললে এই দোটানা সমস্যায় পড়ে হাবুডুবু খেতে হবে; নানা মুনির নানা মত! মানুষের শিল্প যে নানা রাস্তা ধরে চলেছে তার অন্ধিসন্ধি এত যে তার শেষ নেই, বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান ঘটনা এবং অঘটন কল্পনা এই দুই খাত রেখে চলেছে শিল্পের ধারা—কিন্তু এই দুয়েরই গতি কোন দিকে—রসসমুদ্রের দিকে, এই দুয়েরই উৎপত্তি কোনখানে—রসের উৎসে, সুতরাং ভারত-শিল্পই বলো আর যে শিল্পই বলো রসের সংস্পর্শ নিয়ে তাদের বিচার। শিল্পে বাস্তবিকতা কিংবা অবাস্তবিকতা কোনটা প্রয়োজনীয় একথার উত্তর শাস্ত্রকার তো দিতে পারে না! শাস্ত্র হল নানা মুনির নানা মতের সমষ্টি এবং নানা শিল্পের নানা পথে পদক্ষেপের হিসাবের খাতা মাত্র, কাজেই শাস্ত্র পড়ে শিল্পের স্বরূপ কেমন করে ধরা যাবে? সমুদ্র ঘাঁটলে মাছ ওঠে নুন ওঠে মুক্তাও ওঠে কিন্তু হীরক ওঠে না, সেখানে মাটি ঘাঁটতে হয় যে মাটিতে শিল্পী জন্মেছে ও গড়েছে। শাস্ত্র ঘাঁটলে শাস্ত্রের বচন পাই শাস্ত্রজ্ঞান পাই, শিল্পীর রচনারহস্য ও শিল্পজ্ঞান শিল্পের মধ্যেই গোপন রয়ে যায়। শাস্ত্রকার যখন ছিল না এমন দিনও তো পৃথিবীতে একদিন এসেছিল, সে সময়কার শিল্পী শাস্ত্র না পড়েও শিল্পজ্ঞান লাভ করে গেছে—জগতের সমস্ত আদিম অধিবাসীদের শিল্পকলা এর সাক্ষ্য দিচ্ছে—এই আদিম শিল্পচর্চা করে দেখি মানুষ জলের রেখা, ফলের ডৌল, পাখির পালক, মাছের আঁশ এমনি নানা জিনিসের স্মৃতি কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে সাজাচ্ছে ঘটি-বাটি কাপড়-চোপড় অস্ত্র-শস্ত্র সমস্ত জিনিসের উপরে এমনকি মানুষের নিজের গায়ের চামড়ায় পর্যন্ত স্মৃতি ও কল্পনার জাল পড়েছে! মানুষের চিরসহচরী এই কল্পনা ও স্মৃতি, শিল্পের দুই পার্শ্বদেবতা! বিদ্যমান জগৎ বাঁধা জগৎ, আর কল্পনার জগৎ সে অবিদ্যমান, কাজেই বাঁধা জগতের মতো সসীম নয়। অনন্ত প্রসার মানুষের কল্পনার,—তেপান্তর-মাঠের ক্ষীর-সমুদ্রের ইন্দ্রলোক-চন্দ্রলোকের। বিদ্যমান জগৎ নির্দিষ্ট রূপ পেয়ে আমাদের চারিদিকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে—তাল, বট, তেঁতুল, কোকিল, ময়ূর, কাক, গরু, বাছুর, মানুষ, হয়, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, এরা কালের পর কাল একই রূপ একই ভঙ্গি একই সুর নিয়ে খালি আসা-যাওয়া করছে। পৃথিবীটা খুব বড় এবং এখনো মানুষের কাছ থেকে আপনার অনেক রহস্য সে লুকিয়ে রেখেছে, তাই এখনো মানুষ উত্তরমেরু ধবলগিরি অতিক্রম করার কল্পনা করছে, দুদিন পরে যখন এ দুটো জায়গাই মানুষের জানা জগতের মধ্যে ধরা পড়বে তখন মানুষের চাঁদ ধরার কল্পনা সত্য হয়ে উঠবার দিকে যাবে! এমনি বাস্তব এবং কল্পনা, কল্পনা ও বাস্তব এই দুটি পদচিহ্ন রেখে চলেছে ও চলবে মানুষ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এবং তার পরেও নতুন যুগে যেসব যুগ এখনো মানুষের কল্পনার মধ্যেই রয়েছে! অঘটিত ঘটনা অবিদ্যমান সমস্ত কল্পনা আজ যেগুলো মানুষের মনোরাজ্যের জিনিস সেগুলো কালে সম্ভব হয়ে উঠবার প্রতীক্ষা করছে না, জোর করে একথা কে বলতে পারে? এক যুগের খেয়ালী যা কল্পনা করলে আর-এক যুগে সেটা বাস্তব হয়ে উঠল, এর প্রমাণ মানুষের ইতিহাসে বড় অল্প নেই, কত যুগ ধরে পাখিদের দেখাদেখি মানুষ শূন্যে ওড়ার কল্পনা করে এল, এতদিনে সেটা সত্যি হয়ে উঠল কিন্তু এতেও মানুষের কল্পনা শেষ হল না, ওড়ার নানা ফন্দি ডানায় বিনা ডানায়, এমনি নানা কল্পনায় মানুষের মন বিদ্যমানকে ছেড়ে চলল অবিদ্যমানের দিকে। হঠযোগ থেকে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ইস্টিম গাড়ি, দু চাকার গাড়ি, শেষে হাওয়া গাড়ি এবং উড়োজাহাজে কল্পনা এসে ঠেকেছে কিন্তু ওড়ার কল্পনা এখনো শেষ হয়নি, রাবণের পুষ্পক রথে গিয়ে ঠেকলেও মানুষ আরো অসম্ভব অদ্ভুত রথের কল্পনা করবে না তা কে বলতে পারে? দেশলাইয়ের কল্পনা চকমকি থেকে এখন মেঘের কোলের বিদ্যুতে গিয়ে ঠেকেছে কিন্তু এখনো নিষ্প্রভ আলো

তাপহীন আগুন এ সমস্তই অবিদ্যমানের কোলে দুলছে একদিন বিদ্যমান হবার প্রতীক্ষায়। অবিদ্যমান হচ্ছে বিদ্যমান সমস্তের জননী, অজানা প্রসব করছে জানা জগৎ, অসম্ভব চলেছে সম্ভব হতে কল্পনার সোপান বেয়ে। "অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, সমস্তই চিহ্নবর্জিত ছিল, অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারায় সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন, বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিলেন।" আগে সৃষ্টির কল্পনা তবে তো সৃষ্টি! ইউরোপের স্বরগ্রামে শুনেছি আগে নিখাদ স্বরটা একেবারে অজ্ঞাত ছিল হঠাৎ এক খেয়ালী সেই অজানা সুরের কল্পনা ধরে বসল এবং তারি সন্ধানে মরীচিকালুব্ধের মতো ছুটল অবিদ্যমান যে সুর তাকে বিদ্যমান করতে চেয়ে! সঙ্গীত তখন ইউরোপে পাত্রীদের হাতে ধর্মের সেবায় বাঁধা রয়েছে, ছয়-সুরের বেশি আর-একটা সুরের কল্পনা পাদ্রী সঙ্গীতবেত্তার কাছে অমার্জনীয় ছিল, খেয়ালী লোকটার নির্বাসনদণ্ড ব্যবস্থা হয়ে গেল, সে একটা কাল্পনিক সুরের জন্যে ঘর ছাড়লে, দেশ ছাড়লে, নির্যাতন সইলে, তারপর যে সুর কল্পনায় ছিল তাকে বিদিত হল সে নিজে এবং বিদিত করে গেল বিদ্যমান জগতে। এমনি একটার পর একটা সুরের পাখি ধরে গেছে কল্পনার জালে মানুষ, অনাহতকে ধরে গেছে আহতের মধ্যে।

মানুষের সমস্ত কাজে-কর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কল্পনাটা প্রথম তারপর বাস্তব,—এই হল রচনার ধারা ও রীতি। কল্পনাটা মানুষের মধ্যে প্রবল শক্তিতে কাজ করে; এই শক্তি সৃষ্টি করার দিকে মানুষের দৈহিক ও মানসিক আর সমস্ত শক্তিকে উদগ্র করে দেয়। মাতাল ও পাগলের দেহ বিকল হয়ে গেল, উৎকট কল্পনা তাদের বিকট মূর্তিতে বিদ্যমান হল; কিন্তু যে সুস্থ সাধনের দ্বারায় বিরাট কল্পনা সমস্তকে স্মরণের মধ্যে ধারণ করতে সমর্থ হল সেই বীর হল রূপ ও অরূপ দুই রাজ্যের রাজা, সে হল বীর, সে হল কবি, সে হল শিল্পী, সে হল ঋষি, আবিষ্কর্তা, গুণী, রচয়িতা। কল্পনাপ্রবণতা হল মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা, কেননা দেখি কল্পনা তার আশৈশব সহচরী। খেয়াল জিনিসটা বিশ্বসংসারকে পুরোনো হতে দিচ্ছে না মানুষের কাছে, একই আকাশের তলায় একই ঋতু-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা পৃথিবীতেই চলি-বলি খাই-দাই ঘুমোই, কিন্তু কল্পনায় গড়ে চলি খেলা করি বিচরণ করি আমরা নতুন নতুন জগতে চিরযৌবন, চিরবসন্তের স্বপ্ন নিয়ে! বস্তুজগতের এইটুকু ঘটনার স্মৃতিগুলো বড় হয়ে ওঠে কল্পনায়। মানুষের এত বড় ঐশ্বর্য এই কল্পনা একে হারালে তার মতো দীন ও অধম কে? কোন দিকে অগ্রসর হবার রাস্তা তার বন্ধ হল, কায়ার মায়াহীন প্রাচীরের সুদৃঢ় বন্ধনে সে বন্দী রইল "সশ্বাস ইব" কিন্তু সশ্বাস মোটেই নয়।

কাব্যে পুনরুক্তি একটা মহৎ দোষ; পুনঃ পুনঃ কেবল পুনরুক্তি সেইখানেই চলে যেখানে উক্তকে সমর্থন করতে হয় একটা কথা বারবার বলে। যে ছবি হয়ে গেছে তাকে আবার এঁকে কি লাভ, জানালা দিয়ে দিনরাত চোখে পড়ছে যে আকাশ ও মাঠ ঘর বাড়ি সেটার সঠিক প্রতিচ্ছবি কি দরকার মানুষের, যদি না সে স্মৃতির সঙ্গে কল্পনাকে এক করে দেখায়! কল্পিত থেকে বঞ্চিত বাস্তবটা হল মানুষের কাটা হাত পায়ের মতো বিশ্রী জিনিস, মৃতদেহ সেও স্মৃতি জাগায় কল্পনা জাগায় কিন্তু আসলের নকল কিংবা আসলের থেকে বিচ্ছিন্ন যেটা সেটা প্রাণে বাজে না, বিশ্রী রকমে কানে বাজে চোখে বাজে। বিদ্যমান বস্তুর প্রতিকৃতি প্রতিবিম্ব সঠিক নকল ইত্যাদির মধ্যেই যারা আর্টকে বন্ধ করে স্মৃতি ও কল্পনার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায় কিংবা অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের সম্পর্ক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে উন্মত্তকে অবাধ্যতা দিয়ে ছেড়ে দিতে চায় অনির্দিষ্ট পথে তারা শাস্ত্রকার হলেও তাদের কথা শোনায় বিপদ আছে। এমনো লোক আছে যার নেশায় চোখ এমন বুঁদ হয়ে গেছে

যে দিন কি রাত, উত্তম কি অধম, বস্তু কি অবস্তু সব জ্ঞান তার লোপ পেয়েছে—টলে পড়ার দিকেই যার ঝোঁক; আবার এমনো লোক আছে যার চোখে রঙ্গ রসের নেশা একেবারেই লাগল না, সে গট্ হয়ে বসে আছে সাদা চোখে সাদাসিধে লোকটি, একজন বকে চলেছে প্রলাপবাক্য আর একজন কিছুই বলছে না বা বলছে সাদা কথা,—শিল্পজগতে এই দু'জনের জন্যই স্থানাভাব। নাটকের মধ্যে যেখানে মাতলামি দেখাতে হয় সেখানে একটা সত্যিকার মাতাল এনে ছেড়ে দিলে সে কুকাণ্ড বাধায়, অন্যদিকে আবার যার কোনো কিছুতে মত্ততার লেশ নেই তাকে এনে রঙ্গমঞ্চে ছেড়ে দিলেও সেই বিপদ, দুই পক্ষই যাত্রা মাটি করে বসে থাকে। মাতলামির রঙ যার চোখে ইচ্ছামতো আসে যায়, নেশা যার চোখের আলো মনের গতিকে নিস্তেজ করে বাস্তব অবাস্তব দুয়ের বিষয়ে অন্ধ ও আতুর করে দেয় না, সেই হয় আর্টিস্ট, মনকে মনের দিকে কল্পনাকে বাস্তবের স্মৃতির দিকে অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের দিকে অভিনয়ন করেন আর্টিস্ট 'সশ্বাস ইব' স-সে-মি-রা অবস্থান নয়, মোহগ্রস্ত বা জীবন্মৃত নয় কিন্তু রসের দ্বারায় সঞ্জীবিত প্রস্ফুটিত।

শিল্পশাস্ত্র ঘাঁটতেই যদি হয় তবে গোড়াতেই আমাদের দুটো বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে—কোনটা মত এবং কোনটা মন্ত্র এ দুয়ের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণাটি নিয়ে কাজ করতে হবে। মত জিনিসটা একজনের, দশজনে সেটা মানতে পারে নাও মানতে পারে, একের কাছে যেটা ঠিক অন্যের কাছে সেটা ভুল, নানা মুনির নানা মত। মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। মত একটা লোকের অভিমতকে ধরে প্রচারিত হল আর মন্ত্র প্রকাশ করলে আপনাকে সব দিক দিয়ে যেটা সত্য সেইটে ধরে। শিল্পশাস্ত্রে মত এবং মন্ত্র দুটোই স্থান পেয়েছে, মতকে ইচ্ছা করলে শিল্পী বর্জন করতে পারেন কিন্তু মন্ত্রকে ঠেলে ফেলা চলে না।

"যথা সুমেরুঃ প্রবরো নগানাং যথাৎজানাং গরুড়ঃ প্রধানঃ।
যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশ স্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ॥"[৫]

খণ্ড খণ্ড অনেকগুলো সত্য দিয়ে এটা বলা হলেও সমস্ত শ্লোকটা কলাবিদ্যার সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড অহমিকা নিয়ে মত আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। যে রাজভক্ত তার কাছে ক্ষিতীশচন্দ্র হলেন শ্রেষ্ঠ কিন্তু এমন অনেক ফটিকচাঁদ আছে রাজাও যার পায়ে মাথা লোটায়। এছাড়া চিত্রকলাই সকল কলার শ্রেষ্ঠ কলা একথা একেবারেই অসত্য কেননা গীতকলা কাব্যকলা নাট্যকলা এরা কেউ কম যায় না! মতের মধ্যে এই একটা মস্ত ফাঁক আছে, মন্ত্রে কিন্তু তা নেই দেখ—"শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কা ভাবাঃ বিভাবজনিতশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ"[৬] —এ সত্যের দ্বারায় পরখ করা জিনিস, এ মন্ত্রশিল্পীকে সুমন্ত্রণা দিচ্ছে ভাব ও তার আবির্ভাব সম্বন্ধে, অতএব এতে কারু দুই মত হবার কথা নয় কিন্তু "দৌর্বল্যং স্থূলরেখত্বং অবিভক্তত্বমেব চ। বর্ণানাং সঙ্করশ্চাত্র চিত্রদোষা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"[৭] এটা একটা লোকের মত, মন্ত্রের মতো খুব সাচ্চা জিনিস নয়, এর মধ্যে অনেকখানি সত্য এবং মিথ্যাও লুকিয়ে আছে, দৌর্বল্য স্থূলরেখত্ব অবিভক্তত্ব বর্ণসঙ্করত্ব হল চিত্রদোষ কিন্তু কিসের দৌর্বল্য কিসের অবিভক্তত্ব টীকা না হলে বোঝা দুষ্কর, তাছাড়া এসব দোষ যে চিত্রে কোনো কাজে আসে না তা নয় এসবই চাই চিত্রে, বর্ণসঙ্কর না হলে মেঘলা আকাশ সূর্যোদয় এমনকি কোনো কিছুই আঁকা চলে না, অমিশ্র বর্ণ সে এক ছবি দেয়। মিশ্রবর্ণ সে অন্য ছবি দেয়, ফুলের বোঁটার টান দুর্বল গাছের গুঁড়ির টান সবল দূর্বল স্থূল সূক্ষ্ম সব রেখা সব বর্ণ ভাব ভঙ্গি মান পরিমাণ সুর এমনকি বেসুর তা তো অনেক সময় দোষ না হয়ে গুণই হয়ে ওঠে গুণীর জাদুমন্ত্রে।

এইবার শিল্পের একটা মন্ত্র দেখ, পরিষ্কার সত্য কথা—"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্। সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥"[৮] ভারতবর্ষ থেকে ওদিকে আমেরিকা কোনো দেশের কোনো চিত্রবিদ এর উল্টো মানে বুঝে ভুল করবে না, কেননা চিত্রকরের কারবারই হল এই ছটার কোনোটা কিংবা এর কোনো কোনোটাকে নিয়ে। একটা চিত্রে পুরোমাত্রায় এ ছয়টা পাব না নিশ্চয় কিন্তু দুটো চারটে চিত্র ওল্টালেই বুঝবো কেউ রূপপ্রধান, কেউ প্রমাণসর্বস্ব, কেউ ভাবলাবণ্য-যুক্ত, কেউ বর্ণ ও বর্ণিকাভঙ্গে মনোহর, কেউ ষড়ঙ্গের দুটো নিয়ে চিত্র, কেউ পাঁচটি নিয়ে হয়েছে ছবি।

মত অপেক্ষা রাখে সমর্থনের, মন্ত্র যা তা নিজেই সমর্থ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও সত্যের দ্বারায় বলীয়ান। ধর্মের যেমন, তেমন শিল্পকলাতেও মানুষ মতও চালিয়েছে মন্ত্রও দিয়েছে। তার মধ্যে মতগুলো দেখি কোনোটা চলেছে কোনোটা চলেনি এবং মত ধরে কোনো শিল্প মরল, কোনোটা আধমরা হয়ে রইল কিন্তু শিল্পের মূল মন্ত্রগুলো সেই পৃথিবীর আদিমতম এবং নতুনতম শিল্পে সমানভাবে কাজ করে চলল। মত খণ্ডন হল মহাকলরবের মধ্যে কিন্তু মন্ত্রের সাধন করে চলল মানুষ নীরবে মানবের ইতিহাসে এটা নিত্য ঘটনা, মানুষের গড়া শিল্পের ইতিহাসেও এর প্রমাণ যথেষ্ট রয়েছে। সাদা মানুষ, সে কালো মানুষ সম্বন্ধে শক্ত মত নিয়ে এগোয় কিন্তু কালো মানুষ পদে-পদে সেই মতের সমর্থন করে চলে না কিন্তু মানুষ যেখানে মানুষের কাছে মন্ত্র নিয়ে এগোয়— মানুষে মানুষে অভেদমন্ত্র দয়ার মন্ত্র প্রেমের মন্ত্র—সেখানে মতভেদ হয় না সাদায়-কালোয়, তেমনি শিল্পের বাস্তব ও কল্পনা, মানুষি ও মানসী, প্রতিকৃতি ও প্রকৃতি, reality ও ideality এইসব নানা দিকে যেসব মতগুলো আছে তা নিয়ে এর সঙ্গে ওর বিবাদ কিন্তু কলাবিদ শিল্পসাধক বাস্তব জগতের এবং কল্পনা জগতের মধ্য থেকে শিল্পের যেসব মন্ত্র আবিষ্কার করেছে সেগুলো গ্রহণ সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক অথবা মতামতের কথা কোনো দলের কেউ তোলে না। বৌদ্ধযুগ থেকে আরম্ভ করে মোগল এবং ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত আমাদের কলাবিদ্যা সমস্ত এমনকি কলাবিদদের আকৃতি প্রকৃতি পর্যন্ত নানা মতের চাপনে রকম রকম লক্ষণে চিহ্নিত হয়েছে। এই যে আমাদের নানা কলাবিদ্যার নানা আকৃতি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা এগুলো কোনো এক কালের শাস্ত্রমত বা লোকমত বা ব্যক্তিবিশেষের মতের সঙ্গে মেলালে দেখব নিখুঁত মিলছে না—অজন্তার অতুলনীয় চিত্র সে হয়ে যাচ্ছে চিত্রাভাস, মোগল শিল্প হয়ে যাচ্ছে যবন-দোষ-দুষ্ট এবং তার পরের শিল্প হয়ে দাঁড়াচ্ছে সকল দোষের আধার! চীন দোষ, জাপান দোষ, ব্রিটন দোষ, জার্মান দোষ,—দোষের অন্ত নেই মতের কাছে। কিন্তু শিল্পশাস্ত্রের মধ্য থেকে শিল্পের মন্ত্রগুলো বেছে নাও এবং সেইসকল মন্ত্র দিয়ে পরখ করো, একা ভারত-শিল্পের অসংখ্য অবতারণা ঠিক করা যাবে—ভারত-শিল্পের সেই সত্যরূপ যেটি নিয়ে ভারত-শিল্প বিশ্বের শিল্পের সঙ্গে এক এবং পৃথক। কোনো শিল্পের স্বরূপ শাস্ত্রমতের মধ্যে ধরা থাকে না সেটা শিল্পের নিজের মধ্যেই ধরা থাকে। ভারত-শিল্পের কেন সব শিল্পের প্রাণের খোঁজে যে শিক্ষার্থীরা চলবেন তাঁদের এই মত ও মন্ত্রের পার্থক্য প্রথমেই হৃদয়ঙ্গম করা চাই মতকে মন্ত্র বলে ভুল করলে চলবে না। যুদ্ধের সময় দু পক্ষের সেনাপতি মত দেন, কোন পথে কিভাবে ফৌজ চলবে, ব্যূহ রচনা করবে এবং সেই মতো ম্যাপ প্রস্তুত করে নিয়ে ফৌজের চালনা হয়। শিল্পশাস্ত্রকারের মতগুলো এই ম্যাপ, দেশের শিল্প কখন কি মূর্তি ধরেছিল তার প্রথা ও প্রণালীর সুস্পষ্ট ইতিহাস শাস্ত্র থেকে পাওয়া যায় বলে তার মধ্যে কোনো একটা পথে যদি আজ আমরা শিল্পকে চালাতে চাই তো এইসব প্রাচীন মত শিল্পে পেটেন্ট নেওয়ার বেলা খুব কাজে আসবে, দেশের প্রাচীন art-এর ইতিহাস লিখতে কাজে আসবে, গত art-এর নতুন থিসিস্ লিখতে কাজে আসবে, এমনকি

artist না হলেও art সম্বন্ধে original research লেখার পক্ষেও এইসব মত যথেষ্ট রকম ব্যবহারে লাগবে কেননা এদের copyright বহুদিন শেষ হয়েছে,—কিন্তু শিল্পকে যারা চায় তাদের কাজে এইসব মত বেশি কাজে আসবে না। শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে এমনকি বৈদ্যশাস্ত্রের বৈষ্ণবশাস্ত্রের এককথায় নিখিল শাস্ত্রের অপার সমুদ্রের তলায় ও শিল্পেরই মধ্যে যেসব মন্ত্রগুলো এখানে ওখানে লুকিয়ে আছে সেগুলো উপকারে লাগবে। যে জানতে চায় শিল্পকে তাকে মত ও মন্ত্র দুই উদ্ধার করে করে চলতে হয়। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের ম্যাপ ধরে চললেই যুদ্ধে জিৎ হয় না, এটা পাকা সেনাপতি পাকা সেপাই দুজনেই বোঝে, ম্যাপের সীমানার পরে যে অনির্দিষ্ট সীমানা তার কল্পনা সেনাপতিও ধরে থাকে সিপাহীও ধরে থাকে এবং বীরত্বের যে একটি মন্ত্র দুঃসাহস তাকে মনে পোষণ করে অগ্রসর হয়, জিতলে পুরস্কার হারলে তিরস্কার! নূতনকে জয়ের কল্পনা তাদের মনকে দোলায়, ম্যাপে দাগা মতামতের উল্টো পথে অনেক সময়ে তারা চলে মন্ত্রের সাধনে শরীর পাতনে, হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে তারা মন্ত্রণা করে সেনা ও সেনাপতি, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ বিপথ অতিক্রম করে গিয়ে দেয় হানা অজানা পুরীর দরজায়, হঠাৎ দখল হয়ে যায় একটা রাজত্ব যেন মন্ত্রবলে। শিল্পকে পেলে তো কথাই নেই, শিল্পের মন্ত্রগুলো পেলে শিল্প পেতে দেরি হয় না, কিন্তু মতগুলোতে পেয়ে বসলে শাস্ত্রমতে যাকে পাওয়া বলে তাকেই পায় মানুষ, শিল্প রচনাকে পায় না মনোমতো মনোগত এসবের কল্পনাকেও পায় না।

টীকা

১. ৩/৪৫/২৮ বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই সম্পাদিত)
২. ৩/৪৫/২৯ ঐ ঐ
৩. ৩/৪৫/২৮ ঐ ঐ
৪. ৩/৪৫/২৯ ঐ ঐ
৫. ৩/৪৫/৫১ ঐ ঐ
৬. ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
৭. ৩/৪৫/১৮ বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ
৮. বাৎস্যায়ণ—কামসূত্রে ১ম অধিকরণ, ৩য় অধ্যায় ১৬শ অনুচ্ছেদে যশোধর পণ্ডিতকৃত জয়মঙ্গলা টীকা

মত ও মন্ত্র

শিল্পকে পাওয়া আর বাস্তব শিল্পকে পাওয়ার মানেতে তফাত আছে—"There is true and false realisation, there is a realisation which seeks to impress the vital essence of the subject and there is a realisation which bases its success upon its power to present a deceptive illusion."—R.G. HATTON. বর্হিজগতের কাল্পনিক প্রতিলিপিই চিত্র, মনোজগতে ধরা নানা বস্তুর যে স্মৃতি তার আলেখ্যই চিত্র,—এ দুটোই মত, মন্ত্র নয়। বাইরে যা দেখছি খুঁটে খুঁটে তার কাপি নেওয়া কিংবা চোখ উল্টে ভিতরের দিকে বাইরেরই যেসব স্মৃতি রয়েছে জমা তার হুবহু ছাপ তোলায় তফাত একটুও নেই, দুটোই একজাতির চিত্র—এও ছাপ সেও ছাপ, কাপি ছবি নয়। ফটো যন্ত্র বাইরের গাছপালার ছাপ নেয়, আর আচার্য জগদীশচন্দ্রের কল গাছের ভিতরকার ব্যাপারের রেকর্ড তোলে, দুটোই কিন্তু কল, artist নয়; ধর, কোন উপায়ে যদি কল দুটোই বেঁচে উঠে কাজে লেগে যায় তাহলেও তারা কি artist, একথা বলাতে পারবে আপনাদের? চোখের সামনে সূর্যোদয় আর অতীত সমস্ত সূর্যোদয়ের স্মৃতিচিত্র (memory picture) দুয়ের মধ্যেও না হয় রং-চঙের তফাত হল, কিন্তু তাই বলে একটা আর্ট আর অন্যটা আর্ট নয়, স্মৃতির যথাযথ প্রতিলিপিই আর্ট, সামনের যথাযথটা আর্ট নয়, কিংবা সামনেরটাই আর্ট আর মনেরটা ঠিক তার উল্টো জিনিস, এ তর্ক উঠতেই পারে না, কেননা যথাযথ প্রতিলিপি, তা সে এ-পিঠেরই হোক বা ও-পিঠেরই হোক, সে কাপি, এবং যারা তা করছে তারা নকলই করছে, কেউ আসল গড়ছে না। মুখস্থ আউড়ে গেল পাখি একটু না হয় ভুল করে, তার পাঠ, বলে গেল ছেলে পরিষ্কার বইখানার পাতা খুলে—দু'জনেই পুনরুক্তি করলে, অন্যের কথার প্রতিধ্বনি দিলে, বানিয়ে দুটো রূপকথা বললে না, ছড়া কাটলে না, কেননা কল্পনা নেই দু'জনেরই, কাজেই রচনা করলে না তারা কেউ, সুতরাং আর্টিস্ট হবার দিকেও গেল না এরা, নকলনবিস হয়েই রইল। কল্পনাশূন্য চোখের দেখা বা ওইভাবে চোখে দেখার স্মৃতি শিল্প-শব্দকল্পদ্রুম লিখতে হলে এর মানে দিতে হবে গাছের জড় বা শিকড়; জড় সে জগৎকে আঁকড়ে রয়েছে, খুব কাজের জিনিস কল্পনা এবং রচনার রস যেমনি শিকড়ে লাগল অমনি ডাল-পালা বিস্তার না করে সে থাকতে পারলে না। নিশ্চল মাটির তলায় অন্ধকার ছেড়ে সে প্রকাশিত হল আলোর জগতে, ভাবের বাতাস লাগল তার দেহে, ফুটল পাতা হয়ে ফুল হয়ে ফল হয়ে, হাওয়ায় দুলল রূপের ডালি, রসের রচনা বীজের মধ্যে যতটা বস্তু এবং শিকড়ের মধ্যে যতটা সঞ্চয় ছিল তাই নিয়ে! বাইরেটা এবং বাইরের স্মৃতিটা শিল্পীর ভাণ্ডার, শিল্পীর কল্পনালক্ষ্মী সেখান থেকে এটা ওটা সেটা নিয়ে নানা সামগ্রী বানিয়ে পরিবেশন করেন। মূর্খেরাই কেবল এই ভাণ্ডারকে হোটেল এবং দোকান বলে ভ্রম করে যেখানে ready-made সমস্ত পাওয়া যায়—"People regard Nature as a store-house of ready-made ornaments instead of a book of reference for ideas and principles to be

thought out with diligence and applied with care. Ready-made ornaments are too often like ready-made clothes badly fitting and ill-suited to the subject." —FRANK JACKSON.

যে গড়ছে বা আঁকছে তার মনের কল্পনার সংস্পর্শশূন্য ছবি কলে এঁকেছে মানুষ, হাতেও গড়েছে কেষ্টনগরের পুতুল,—ঘটনার যথাযথ প্রতিরূপ। শিল্পের যতগুলো কৌশল, রূপ, প্রমাণ, ভাবলাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ, anatomy, perspective, shade and light, depth, space, movenemt ইত্যাদির নিয়মাবলী নির্ভুল ও সম্পূর্ণভাবে মেনে চলল কেষ্টনগরের কারিগরের গড়নটি কিন্তু এই বাস্তবের নিয়ম মেনে চলার ফলে একটা গ্রিক প্রস্তরমূর্তির সঙ্গে কি ঘুরণী পাড়ার মাটির পুতুলটিকে সমান করে তুলতে পারলে, না এইটেই প্রমাণ করলে যে মানুষ চেষ্টা করলে কলের চেয়ে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ নকল নিতে পাকা হয়ে উঠতে পারে? বাস্তবের দিকে যেমন দেখা গেল, কল্পনাশূন্য বাস্তব ছবি নেওয়া চলল বহির্জগতের, তেমনি অন্তর্জগতের বাস্তবস্পর্শশূন্য নিছক কল্পনার একটা কিছু ধরবার চেষ্টা করা যাক। কিন্তু কোথায় তেমন জিনিস? সত্যপীরের মাটির ঘোড়া, কালীঘাটের পট, নতুন বাঙলার আমাদের ছবি, পুরোনো বাঙলার দশভুজা এর একটাও নিছক কাল্পনিক জিনিস নয়, এরা সবাই বাস্তবকে ধরে তবে তো প্রকাশ হল? মন যে বাস্তবকে স্পর্শ করেই আছে, নানা বস্তুর নানা ভাবের স্মৃতি জমা হচ্ছে মনে। নিছক কল্পনা সে মনেই উঠতো মনেই থাকতো যদি না বাস্তব জগতের ভাব ও রূপের সংস্পর্শে সে আসতো। অসীমের কল্পনা তাও সীমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশ পায়, সমুদ্রের অসীম বিস্তার ডাঙার সীমারেখাতে এসে না মিললে ছবি হয় না, নকল যা তার সঙ্গে কল্পনার একটুও যোগ নেই কিন্তু বাস্তব জিনিসের সঙ্গে আমার স্মৃতির সঙ্গে কল্পনার যোগ সসীম থেকে আরম্ভ করে অসীমের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে দেখা যাচ্ছে। এই চোখের সামনে যে বিদ্যমান সৃষ্টি এটার মূলে দেখি সৃষ্টির কল্পনা রয়েছে, তাই এ এত বিচিত্র ও মনোহর—একটা গাছ আর একটার, একটি ফুল আর একটির, এক জীব আর এক জীবের, এক দিন আর এক দিনের মতো নয়; নীল আকাশ একই চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ে পলে পলে আলো-অন্ধকারে নতুন থেকে নতুন স্বপ্ন রচনা করে চলেছে চিরকাল ধরে, পুরোনো আর হতে চাচ্ছে না এই পৃথিবী, শুধু এর পিছনে রচয়িতার কল্পনা এবং দর্শকের কল্পনা কাজ করছে বলেই। বহির্জগৎ যেমন সৃষ্টি, তেমনি ঐ সত্যপীরের ঘোড়া, সেটা ঘোড়া নয় অথচ ঘোড়া, কালীঘাটের পট যেটা প্রকৃতির নয় কিন্তু নানা রূপ ধরেছে এটার ওটার সেটার রেখা নানা রঙের নানা আঁক বাঁকের সাহায্যে, এরাও সৃষ্টি; দেখতে কেউ বড় সৃষ্টি, কেউ ছোট সৃষ্টি, কেউ ভাল সৃষ্টি, কেউ হয়তো বা অনাসৃষ্টি, কিন্তু সৃষ্টি, নকলের মতো প্রতিবিম্ব নয়।

যে শিল্পজগৎ সত্য কল্পনার দ্বারা সজীব নয় সে বুদ্‌বুদের উপরে প্রতিবিম্বিত জগৎ-চিত্রটির মতো মিথ্যা ও ভঙ্গুর; দর্পণের উপরেই তার সমস্তখানি কিন্তু দর্পণের কাচ ও পারার এবং বুদ্‌বুদের জলবিন্দুটির যতটুকু সত্তা —তাও তার নেই। রচনা যেখানে রচয়িতার স্মৃতি ও কল্পনার কাছে ঋণী সেইখানেই, সে আর্ট, যেখানে সে অন্যের রচনা ও কল্পনার কাছে ঋণী সেখানে সে আর্ট নয়, আসলের নকল মাত্র। হোমার, মিল্টন দু'জনেই অন্ধ ও কবি কিন্তু বিদ্যমান ও অবিদ্যমানের দুয়েরই ঋণ বিষয়ে তাঁরা অন্ধ ছিলেন না তাঁরা বাস্তব কল্পনা করে গেছেন অন্ধ কল্পনা করেননি। কালিদাস, ভবভূতি চক্ষুষ্মান কবি কিন্তু তাঁরাও কল্পনা বাদে বাস্তব কিংবা বাস্তব বাদে কল্পনার ছবি রেখে যাননি। গানের সুর সম্পূর্ণ কাল্পনিক জিনিস কিন্তু এই বাস্তব জগতের বায়ুতরঙ্গের উপর তার প্রতিষ্ঠা হল, কথার ছবির সঙ্গে সে আপনাকে মেলালে তবে সে সঙ্গীত হয়ে উঠল,—অনাহত আপনাকে করলে আহত বাতাস ধরে, কিন্তু হরবোলার বুলি বাস্তব জগতের সঠিক শব্দগুলোর প্রতিধ্বনি দিলে

সেইজন্য সে সঙ্গীত হওয়া দূরের কথা খুব নিকৃষ্ট যে টপ্পা তাও হল না। বাস্তবকে কল্পনা থেকে কতখানি সরালে কিংবা কল্পনাকে বাস্তব থেকে কতটা হঠিয়ে নিলে আর্ট হয় এ তর্কের মীমাংসা হওয়া শক্ত, কিন্তু কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, চোখে-দেখা জগতের সঙ্গে মনে-ভাবা জগতের মিলন না হলে যে ওতদ হবার জো নেই এটা দেখাই যাচ্ছে। "One of the hardest thing in the world is to determine how much realism is allowable to any particular picture." এই হল ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ চিত্রকর Burne-Jones-এর কথা। অনেক দিন ধরে চিত্র এঁকে যে জ্ঞান লাভ করলেন শিল্পী তারি ফলে বুঝলেন যে বস্তুতন্ত্রতা ছবিতে কতখানি সয় তা ঠিক করা মুশকিল। ইংরেজ শিল্পী এখানে কোনো মত দিলেন না, ছবি আঁকতে গেলে সবারই যে প্রশ্ন সামনে উদয় হয় তাই লিখলেন, কিন্তু আমাদের দেশে মত দেওয়া যেমন সুলভ, মত ধরে চলাও তেমনি সাধারণ— কে চিত্রবিদ তার সম্বন্ধে পরিষ্কার মত, কি চিত্র তারও বিষয়ে পাকা শেষ মত প্রচারিত হল এবং সেইসব মতের চশমা পরে ভারতবর্ষের চিত্রকলার আদর্শগুলোর দিকে চেয়ে দেখে অজন্তার শিল্পও আমাদের শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের চোখে কিভাবে পড়ল তার পরিষ্কার ছবি কার্তিক সংখ্যার প্রবাসীর কষ্টিপাথর থেকে তুলে দিলেম—"যাহা ছিল তাহা নাই। যাহা আছে সেই অজন্তাগুহার চিত্রাবলী,...তাহাতে যাহা আছে, তাহা কিন্তু চিত্র নহে চিত্রাভাস। তাহা পুরাতন ভারতচিত্রের অসম্যক নিদর্শন, চিত্র-সাহিত্যদর্পণের দোষ-পরিচ্ছেদের অনায়াসলভ্য উদাহরণ। তাহা কেবল বিলাসব্যসনমুক্ত যোগযুক্ত অনাসক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিভৃত নিবাসের ভিত্তি বিলেপন...ভারতচিত্রোচিত প্রশংসা লাভের অনুপযুক্ত। তাহা এক শ্রেণীর পূর্তকর্ম... তাহাতে যাহা কিছু চিত্রগুণের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অযত্নসম্ভূত আকস্মিক,...চিত্র-গুণের এবং চিত্র-দোষের যথাযথ পর্যবেক্ষণে যাঁহাদের চক্ষু অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট অজন্তা-গুহা চিত্রাবলী ভারতচিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর নিদর্শন বলিয়া মর্যাদা লাভ করিতে অসমর্থ। যাঁহাদের তুলিকাসম্পাতে এই সকল ভিত্তি-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাঁহারাও পুরাতন ভারতবর্ষে 'চিত্রবিৎ' বলিয়া কথিত হইতে পারিতেন না। তাঁহারা নমস্য; কিন্তু চিত্রে নহে, চরিত্রে। তাঁহাদের ভিত্তি-চিত্রও প্রশংসার্হ; কিন্তু কলা-লালিত্যে নহে, বিষয়-মাহাত্ম্যে" (শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ভারতচিত্র চর্চা)। মতের চশমা দিয়ে দেখলে অজন্তার ছবিতে কেন চাঁদের মধ্যেও অপরিণতি ও কলঙ্ক দেখা যায় এবং সেই দোষ ধরে বিশ্বকর্মাকেও বোকা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু সৃষ্টির প্রকাশ হল স্রষ্টার অভিমতে, শিল্পের প্রকাশ হল শিল্পীর অভিমতটি ধরে, ব্যক্তিবিশেষের বা শাস্ত্রমতবিশেষের সঙ্গে না মেলাই তার ধর্ম, কাজেই কলঙ্ক ও অপরিণতি যেমন হয় চাঁদের পক্ষে শোভার কারণ, শিল্পের পক্ষেও ঠিক ঐ কথাটাই খাটে। চিত্রষড়ঙ্গের কতখানি পরিপূর্ণতা পেলে চিত্র চিত্র হবে চিত্রাভাস হবে না, মডেল ড্রয়িং কতখানি সঠিক হলে তবে অজন্তার ছবিকে বলব চিত্র আর কতখানি কাঁচা থাকলে অজন্তার চিত্রাবলী হবে "চিত্র-সাহিত্যদর্পণের দোষ-পরিচ্ছেদের অনায়াসলভ্য উদাহরণ" তা বলা কঠিন, তবে পাকা ড্রয়িং হলেই যে সুন্দর চিত্র হয় না এটা বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী রোদাঁ বলেছেন—"It is a false idea that drawing in itself can be beautiful. It is only beautiful through the truths and the feeling that it translates... There does not exist a single work of art which owes its charm only to balance of line and tone and which makes appeal to the eye alone." —আদর্শ জিনিসটি নিছক অবিদ্যমান জিনিস, বস্তুত তার সঙ্গে পুরোপুরি মিলন অসম্ভব, ধর্মে-কর্মে, শিল্পে-সমাজে, ইতিহাসে, কোনো দিক দিয়ে কেউ মেলেনি, না মেলাই হল নিয়ম। সৃষ্টিকর্তার নিরাকার আদর্শ যা আমরা কল্পনা করি তার সঙ্গে

সৃষ্ট বস্তুগুলো এক হয়ে মিললে সৃষ্টিতে প্রলয় আসে, তেমনি শাস্ত্রের আদর্শ গিয়ে শিল্পে মিললে শিল্প লোপ পায়—থাকে শুধু শাস্ত্রের পাতায় লেখা ভারত-শিল্পের দু ছত্র শ্লোক মাত্র। দাঁড়িপাল্লা বাটখারা ইত্যাদি নিয়ে চাল ডাল ওজন করা চলে, ছবির চারিদিকের গিল্টির ফ্রেমখানাও ওজন করা যায়, ছবির কাগজটা—মায় রঙের ডেলা, রঙের বাক্স, তুলি এমনকি শিল্পীকে পর্যন্ত সঠিক মেপে নেওয়া চলে, কিন্তু শিল্পরস যে অপরিমেয় অনির্বচনীয় জিনিস, শাস্ত্রের বচন দিয়ে তার পরিমাণ করবে কে? তাই শাস্ত্রকারদের মধ্যে যিনি রসিক ছিলেন, শিল্প সম্বন্ধে লেখবার বেলায় মতের আকারে মনোভাব প্রকাশ করলেন না তিনি; শিল্পের একটি স্তোত্র রচনা করে অলঙ্কারশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করলেন, যথা—"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্। নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতিমাদধীতি ভারতী কবের্জয়তি॥"[১] নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা আনন্দের সঙ্গে একীভূতা অনন্যপরতন্ত্রা নবরসরুচিরা নির্মিতিধারিণী যে কবি ভারতী তাঁর জয়। শুধু ভারত-শিল্পের জন্য নয়, কাব্যচিত্র ভাস্কর্য সঙ্গীত নাট্য নৃত্য সব দেশের সব শিল্পের সবার জন্য এই মন্ত্রপূত সোনার পঞ্চপ্রদীপ ভারতবর্ষ ছেড়ে যে মানুষ একদিনও যায়নি সে জ্বালিয়ে গেছে। মতের ফুৎকারে এ কোনো দিন নেভবার নয়, কেননা রস এবং সত্য এই দুই একে অমৃতে সিঞ্চিত করেছে। সূর্যের মতো দীপ্যমান এই মন্ত্র,—এর আলোয় সমস্ত শিল্পেরই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, কল্পনারাজ্য ও বাস্তবজগৎ যেমন পরিষ্কার করে দেখা যায় এমন আর কিছুতে নয়। মতগুলো আলেয়ার মতো বেশ চকমকে ঝকঝকে কিন্তু আলো দেয় যেটুকু তার পিছনে অন্ধকার এত বেশি যে, সেই আলেয়ার পিছনে চলতে বিপদ পদে পদে।

শিল্প সম্বন্ধে বা যে-কোনো বিষয়ে যখন মানুষ মত প্রচার করতে চায় তখন একটা সৃষ্টিছাড়া আদর্শ আঁকড়ে না ধরলে মতটা জোর পায় না; "খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে"। শিল্প বিষয়ে মত যাঁরা দিলেন তাঁদের কাছে আদর্শই হল মুখ্য বিষয়, আর শিল্পটা হল গৌণ; শিল্পের মন্ত্রগুলো তা নয়, শিল্পকেই মুখ্য রেখে তারা উচ্চারিত হল। এই মত থেকে দেখি ভারত-শিল্প মিশর-শিল্প চীন-শিল্প পাশ্চাত্য-শিল্প প্রাচ্য-শিল্প—এখানে শিল্পে শিল্পে ভিন্ন, শিল্পীতে শিল্পীতে ভিন্ন, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, কারু মতে বেড়াল-চোখ কারু মতে পদ্ম-আঁখি; কারু মতে সাদা কারু মতে কালো হল ভাল, কিন্তু রসের ও সৌন্দর্যের যে মন্ত্র স্তন্যধারার মতো বিভিন্ন শিল্পকে এক করেছে সেটি প্রাণের রাস্তা ধরে চলেছে, মতের এতটুকু নালা বেয়ে নয়, কাজেই সে ধার দিয়ে শিল্পের বড় দিকটাতেই আমাদের নজর পড়ে। শিল্পের আপনার একটা যে জগৎজোড়া আদর্শ রয়েছে তাকেই লক্ষ্য করে চলেছে এ যাবৎ সব শিল্পী ও সব শিল্প তাই রক্ষে, না হলে শাস্ত্রের মতের পেষণে শিল্পকে ফেললে একদিনে শিল্প ছাতু হয়ে যেত। ভারতীয় মতে বিশুদ্ধ ছাতু কিংবা ইউরোপীয় মতে পরিষ্কার ধবধবে বিস্কুটের গুঁড়োর পুনরাবির্ভাবের জন্য শিল্পার্থীরা প্রাণপাত করতে উদ্যত হয়েছে, এ দৃশ্য অতি মনোরম এটা বেদব্যাস বললেও আমি বলব 'নহি' 'নহি', এভাবে শিল্পকে পাওয়া না-পাওয়াই। যা এককালে হয়ে গেছে তা সম্ভব হবে না কোনো দিন—"Efforts to revive the art principles of the past will at best produce an art that is still-born. It is impossible for us to live and feel, as did the ancient Greeks. In the same way those who strive to follow the Greek methods in sculpture achieve only a similarity of form, the work remaining soulless for all the time. Such imitation is mere aping." — KANDINSKY. যে সমস্ত শিল্প সম্ভূত হয়ে গেছে তাদের আজকের দিনে আবার সম্ভব করে তোলবার চেষ্টা—যে একবার

জন্মেছে তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করাবার চেষ্টার মতোই পাগলামি। বিদ্যমান ছবি যা বাতাসের মধ্যে আলোর মধ্যে সৃষ্টিকর্তার বিরাট কল্পনার প্রেরণায় অত্যাশ্চর্য রূপ পেয়ে এসেছে তাকে চারকোণা এতটুকু কেম্বিসে তেল-জলের সাহায্যে দ্বিতীয় বার জন্ম দিতে চায় কোন পাগল? অগ্নিশিখাকে যতই সঠিক নকল কর সে আলো দেবে না তাপও দেবে না; শুধু ভ্রান্ত একটা সাদৃশ্য দেবে 'ইব'তে গিয়ে যার শেষ। বায়ুগতিতে পতাকার বিচলন দেখাতে পারলেই যদি মানুষ শাস্ত্রমতে চিত্রবিদ হত—তবে ছবি যারা আঁকে এবং ছবি যারা দেখে সবাইকে বায়স্কোপের কর্তার পায়ের তলায় মাথা নোয়াতে হত। শিল্পীর কল্পনায় শিল্পের জিনিস আগুন হয়ে জ্বলে, বাতাস হয়ে বয়, জল হয়ে চলে, উড়ে আসে মনের দিকে সোনার ডানা মেলে, নিয়ে চলে বিদ্যমান ছাড়িয়ে অবিদ্যমান কল্পনা ও রসের রাজত্বে দর্শক ও শ্রোতার মন—এইজন্যই শিল্পের গৌরব করে মানুষ। বায়স্কোপের চলন্ত বলন্ত ভয়ঙ্কর রকমের বিদ্যমানের পুনরুক্তিকে মানুষ 'সশ্বাস ইব' অতএব চিত্র বলে তখনি মত প্রকাশ করে যখন তার বায়ু বিষম কুপিত হয়েছে। এখনকার ভারত-শিল্পের সাধনা অনাগত অজ্ঞাত যা তারি সাধনা না হয়ে যদি পূর্বগত প্রাচীন ও আগত আধুনিক এবং সম্ভূত শিল্পের আরাধনাই হয় সবার মতে, তবে কলাদেবীর মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি যথেষ্ট উঠবে কিন্তু এক লহমার জন্যেও শিল্পদেবতা সেখানে দেখা দেবেন না; "যস্যামতঃ তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।" বিদ্যমান যে জগৎ তাকে প্রতিচ্ছবি দ্বারা বিদ্যমান করা মানে পুনরুক্তি দোষে নিজের আর্টকে দুষ্ট করা। বিদ্যমান জগৎ বিদ্যমানই তো রয়েছে, তাকে পুনঃ পুনঃ ছবিতে আবৃত্তি করে ড্রয়িং না হয় মানুষ পেলে, রূপকে চিনতে শিখলে, রঙকে ধরতে শিখলে— কিন্তু এ তো প্রথম পাঠ! এইখানেই যে ছেলে পড়া শেষ করলে সে কি শিল্পের সবখানি পেলে? অথবা মানুষের চেষ্টা তার কল্পনাতেই রয়ে গেল, অবিদ্যমান অবস্থাতেই মূকের স্বপ্নদর্শনের মতো হল ছেলেটির দশা! অন্ধের রূপকল্পনার মতো অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের মধ্যে ধরতে সক্ষম রইল সে নির্বাক ও চক্ষুহারা? একে রইল বাইরে বাঁধা, অন্যে রইল ভিতরে বাঁধা।

শিল্পকে জানতে হলে যেখানে থেকে কেবল মতই বার হচ্ছে সেই টোলে গেলে আমাদের চলবে না। ঋষি ও কবি এবং যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা তাঁদের কাছে যেতে হবে চিত্রবিদকে। এর উত্তর কবীর দিয়েছেন চমৎকার—

"জিন বহ চিত্র বনাইয়া
সাঁচা সূত্রধারি
কহহী কবীর তে জন ভলে
চিত্র বংত লেহি বিচারি।"

যিনি এই চিত্রের রচয়িতা তিনি সত্য সূত্রধর; সেইজন শ্রেষ্ঠ, যে চিত্রের সহিত চিত্রকরকেও নিল বিচার করে।

"বিদ্যমান এই যে জগৎ-চিত্র এর উৎপত্তিস্থান অবিদ্যমানের মধ্যে",—চিত্রের রহস্য এককথায় প্রকাশ করলেন ঋষিরা।

ঘটনের মূলে রচনের মূলে শিল্পের মূলে শিল্পী না শাস্ত্র—এ বিষয়ে পরিষ্কার কথা বললেন ঋষি—"সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" কল্পনাতীত প্রদীপ্ত পুরুষ, নিমেষে নিমেষে ঘটনা সমস্তের জাতা তিনি।

অমুক শর্মার না বিশ্বকর্মার অভ্রান্ত শিল্পের প্রসাদ পেতে হবে মানুষ শিল্পীকে? সে সম্বন্ধে ঋষিদের আশীর্বচন উচ্চারিত হল, "হংসা শুক্লীকৃতাঃ যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ। ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবস্ত্বাং প্রসীদতু।"[২]

হংস এল সাদা হয়ে, শুক এল সবুজ হয়ে, ময়ূর এল বিচিত্র হয়ে, তারা সেইভাবেই জগৎচিত্রের মধ্যে গত হয়েই রইল, অবিদ্যমানকে জানতে পারলে না! রচনাও করতে পারলে না কল্পনাও করতে চাইলে না। মানুষ মনের মধ্যে ডুব দিয়ে অবিদ্যমানের মধ্যে বিদ্যমানকে ধরলে, —সে হল শিল্পী, সে রচনা করলে চিহ্নবর্জিত যা ছিল তাকে চিহ্নিত করলে, পাথরের রেখায় রঙের টানে সুরের মীড়ে গলার স্বরে।

বর্ষার মেঘ নীল পায়রার রং ধরে এল, শরতের মেঘ সাদা হাঁসের হাল্কা পালকের সাজে সেজে দেখা দিলে, কচি পাতা সবুজ ওড়না উড়িয়ে এল বসন্তে, নীল আকাশের চাঁদ রূপের নূপুর বাজিয়ে এল জলের উপর দিয়ে, কিন্তু এদের এই অপরূপ সাজ দেখবে যে সেই মানুষ এল নিরাভরণ নিরাবরণ, শীত তাকে পীড়া দেয়, রৌদ্র তাকে দগ্ধ করে, বাস্তব জগৎ তার উপরে অত্যাচার করে, বিশ্বচরাচরে রহস্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মধ্যে তাকে বন্দী করতে চায়—এই মানুষ স্বপন দেখলে অগোচরের অবাস্তবের অসম্ভবের অজানার, সেই দেখার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি বদল করে নিলে সৃষ্টির বাইরে এবং সৃষ্টির অন্তরে যে তার সঙ্গে অদ্বিতীয় শিল্পীর অপরাজিত প্রতিনিধি মানুষ মনোজগতের অধিকারী বহির্জগতের প্রভু।

টীকা

১. ১/১ কাব্যপ্রকাশ, মম্মটভট্ট
২. হিতোপদেশ

সন্ধ্যার উৎসব

“আশ্বিনে অম্বিকে পূজা বলি পড়ে পাঁঠা,
কার্ত্তিকে কালিকা পূজা ভাই-দ্বিতীয়ার ফোঁটা।
অঘ্রাণে নবান্ন দেয় নতুন ধান কেটে,
পৌষ মাসে বাউনী বাঁধে ঘরে ঘরে পিঠে।
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি,
ফাগুন মাসে দোলযাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি।
চৈত্র মাসে চড়ক সন্ন্যাস গাজনে বাঁধে ভারা,
বৈশাখ মাসে তুলসী গাছে দেয় বসুধারা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীবাটা জামাই আনতে দড়,
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা যাত্রী হয় জড়।
শ্রাবণ মাসে ঢেলা ফেলা ঘি আর মুড়ি,
ভাদ্র মাসে পচা পান্তা খায় মনসা বুড়ি।”

এই তো আছে বার মাসই। এর উপর ফাঁকে ফাঁকে আরো উৎসব এখন ঢুকেছে। যেমন, শোক-সভার উৎসব, স্মৃতি-সভার উৎসব,—এ-যে সভার সাম্বৎসরিক উৎসব। এর উপরে জেলে যাবার উৎসব, হরতালের উৎসব তাও আছে ঘরে বাইরে। যে দেশে এত উৎসব সে দেশের ছেলেরা, বুড়োরা, যুবোরা—আনন্দ সাগরের কূলে গিয়ে ওঠার কথা তো তাদের এতদিন! কিন্তু আনন্দের বদরিকাশ্রম দূরের কথা—এই অফুরন্ত আনন্দের মাঝে একটা চড়া পড়ে গেছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। এ এক রকম আনন্দের ভাসান—ভাঙা নৌকার কাঠ ঠিক এইভাবে চলে স্রোতে গা ভাসিয়ে, কোথায় যায় সে তার নিজেই জানে না। একই তালে চলে সে দুলতে দুলতে, চলার তার বৈচিত্র্য নেই লক্ষ্য নেই কেবলি জোয়ারে খানিক এগিয়ে চলা ভাঁটায় আবার দ্বিগুণ বেগে ফিরে আসা যেখানকার সেখানে। জীবন্ত জিনিসের উৎসব করে চলার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে। ঋতু-চলাচলের সঙ্গে কালের চলাচলের সঙ্গে গাছপালারা তাল মিলিয়ে চলে। গাছের পাখি আকাশের মেঘ, সকাল-সন্ধ্যার গ্রহ-তারা তাল মিলিয়ে চলে। না হলে হয় বেতালা—বেতালে উৎসব মাটি হয়। কালভেদে দেশভেদে বিভিন্ন রকমের উৎসব করে চলার রহস্যটি পেয়েছে মানুষ এই পৃথিবীতে এসে—গাছেদের কাছ থেকে আকাশের কাছ থেকে এবং যে মাটিতে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে তার কাছ থেকে। মাটির বুকের তালে তাল রেখে যে চলতে পারে না, সে খুঁড়িয়ে চলে কিংবা পড়ে যায় ধুপ করে মাটিতে। বাতাসের তালে তাল দিয়ে চলতে যে পাখির ডানা না চায় সে উঁচুতে উড়তে পারেই না। ডানা ঝট্‌পট্ করে হয় মরে যায়, নয় তো পাখি থাকে না, খাঁচায় বাঁধা

পড়ে। খায় দায় আর বনের দিকে চায় —“খায় দায় পাখিটি বনের দিকে আঁখিটি”। এইভাবে অবিচিত্র দিনের অনুৎসবের অনুৎসাহের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একদিন তার পক্ষিলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। জীয়ন্তে মরা থেকে মুক্তি পেয়ে সে শেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। খাঁচার পাখি পড়তে বললে পড়ে, শিস দিলে গান গায়; কিন্তু তাতে বলতে পারিনে পাখি উৎসব করেছে। তেমনি হুকুমমতো হয় হস্‌টেল বলো আর হস্‌টেলের বাইরেই বলো আমাদের উৎসব—এইবার পড়ো, এইবার গাও, এইবার খাও, এইবার সভার রিপোর্ট দাও, এইবার শোক প্রকাশ করো, এইবার স্মৃতি রক্ষা করো—এইভাবে দেশজোড়া একটা খাঁচার মধ্যে আমাদের নিয়ে কে যে খেলাচ্ছে তা বুঝিনে। শুধু বুঝি সুর লাগছে না, তালে ঠিক পা পড়ছে না, কোন রকমে চলেছি—হুকুমে উঠে-বসে পড়ে-শুনে হেসে-খেলে। আমাদের ছেলে-বুড়োর শিক্ষা-দীক্ষা উন্নতি অবনতি নিয়ে কত বিষয়ে কত দিকে লোক কত মাথা ঘামাচ্ছে এবং তাতে তারা আনন্দও পাচ্ছে। পাখি পড়িয়ে আনন্দ, পাখিকে শিস দিয়ে ডেকে গাইয়ে আনন্দ, খাইয়ে আনন্দ, শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আনন্দ, কিন্তু পাখির কিসে আনন্দ তা তো দেখে না কেউ। দাঁড়ের পাখির কোন আনন্দ নেই শিকল কাটার আনন্দটুকু ছাড়া, এটা তো কর্তারা বোঝে না—বড় বড় রিপোর্ট লিখে চলে খাঁচার পাখির সু ও কু ব্যবহার সম্বন্ধে এবং তাতেই তারা আনন্দ পায়। বারোমাস বেঁধে মার দিয়ে পাঁজিপুঁথি দেখে ছুটি নেওয়া গেল উৎসব করতে। এ যে আজকের নিয়ম হয়েছে তা নয়; এ নিয়ম এ দেশে বরাবরই চলে আসছে। বসন্তের হাওয়া না লাগলেও বাসন্তী পুজো পাঁজির ঠিক দিনক্ষণ দেখে আসছে দেশে বছরের পর বছর কত যুগ ধরে তার ঠিক নেই। যদি বলো বসন্তের ঋতু সেও তো ঠিক মাস ধরে আসে। আসে বটে, কিন্তু পাঁজির গণনা কিংবা ঘড়ির কাঁটা ধরে আসে না। বরাবর দেখি গাছের পাতাগুলো হঠাৎ সবুজ হয়ে ওঠে, হঠাৎ কোকিল পাপিয়া দূরদেশ থেকে এসে গান ধরে। উত্তর থেকে বাতাস ফিরে যায় দক্ষিণে হঠাৎ, আবার চলেও যায় হঠাৎ, বসন্তকালের আসর ভেঙে যায়, ফুলের ডালা নুয়ে পড়ে, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, নদী শুকিয়ে ওঠে, আকাশে আগুন লেগে যায় দেখতে দেখতে। দিন যেন আর কাটে না। যখন তখন হঠাৎ আকাশ ঢেকে মেঘ আসে ঝড় আসে বাতাস বয় ঢল নামে নদীতে। আনন্দের বন্যা ছোটে বর্ষা নামে জল ঝরে জল-ঝড়ে। তারপর আকাশ হঠাৎ নীল চোখ মেলে চায় পৃথিবীর দিকে। সোনায় লেখা সবুজ শাড়ি পরে পৃথিবী চলে দিগন্তে উৎসব করতে, তারপর শিশির ঝরে পাতায় পাতায়, হিমের পরশ লাগে, শিউরে ওঠে বাতাসের মন অচেনা হাতের ছোঁয়া পেয়ে, কোকিল গান ধরে—উহু উহু। এই উৎসব তো হচ্ছে ফিরে ফিরে কতকাল কিন্তু এ তো তবু পুরনো হয় না অবিচিত্র হয় না, বেসুরো বেতালা হয় না আমাদের বারো মাসে তেরো এবং তার চেয়ে বেশি পার্বণের উৎসবের মতো। এ যে প্রকৃতির উৎসব বা প্রকৃত উৎসব, এ নিত্যকাল ধরে চলেছে, চলবে ঋতুচক্রের চিহ্ন ধরে। সে কেন নতুন নতুন কবিকে নতুন নতুন শিল্পীকে নতুন শোভা নতুন রস দিয়ে মুগ্ধ করে, চলে—তার কারণ সন্ধান করে দেখি যে, উৎসব যা হচ্ছে তা স্বাভাবিক। তার মধ্যে নিয়ম একটা আছে কিন্তু বিচিত্রতায় সেটা ঢাকা। সেই নিয়মের ঠাট এমনভাবে লুকোনো থাকে যে বোঝাই যায় না। উৎসবের ধারার হিসেব আজ যেটা নিলেম সেটা কাল আবার তেমনিভাবে থাকবে কি না, কিংবা আমি যেমন হিসেবটা দেখলেম অন্যের চোখে উৎসবটার হিসেব সেইভাবে পড়বে কি না তা বলা যায় না। এই হল স্বভাবের নিয়মে উৎসবের রহস্য। কিন্তু মানুষের উৎসবের আমরা যেভাবে নিয়ম বেঁধে দিয়েছি, তাতে করে ওই অম্বিকা পূজা থেকে মনসা পূজার আনন্দ যেমন আজকের আমাদের কাছে পুরনো হয়ে পড়ছে, আমাদের এখানকার উৎসবগুলোও ঠিক সেই দশা পাবে, পেয়ে বসে আছে। দপ্তরির বাড়ির

রুলটানা খাতার শোভা খাতার প্রথম পাতা দেখলেই বোঝা গেল, আর দেখতে হয় না নিরেনব্বই খানা পাতায় কি আছে। কিন্তু ভাল গল্পের বই, তারও সোজা ফর্মাবাঁধা হিসেবমতো চেহারা, কিন্তু বিচিত্র ভাব বিচিত্র রস এসে তার প্রত্যেক পৃষ্ঠা রহস্যপূর্ণ ও বিচিত্র করে দেয়, কোন বই এক পাতা উল্টেই ফেলে দিই কোনটা বা শেষ হয়ে গেলেও ভাবি আরো হলে হত। ভাল গানেও এই, বারবার শুনলেও মন চায় আবার শুনি, ভাল ছবি, তার বেলাতেও এই; এবং সব প্রকৃত জিনিসের মধ্যে এই গুণটি আছে। এবং এই জন্য বাঙলার ইতিহাসের চেয়ে ভাল বাঙলা উপন্যাস ছেলে-মেয়েরা কিনে পড়ে জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে। হস্‌টেলের কেউ ভাল নভেল কিনলে কিছুদিন ধরে সন্ধ্যেবেলা একটা যেন উৎসব পড়ে যায় সেখানে। আবার নভেল পড়া এবং উৎসব করা দুই যখন বাতিকে দাঁড়ায় তখন আর ভালমন্দ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না—একটা কিছু হলেই হল এই ভাব দাঁড়ায় তখন। আমাদের সমস্ত কাণ্ড-কারখানা আমোদ-আহ্লাদ যেমন-তেমন হচ্ছে, যেমনটি হওয়া উচিত তেমনিটি হচ্ছে না; তার কারণ উৎসবের বাতিক চেগেছে এমন বিষম রকম—দেশে যে উৎসবের বাতি কেমন জ্বলল সেদিকে নজর দেবার সময়ই নেই। সময়ে সময়ে দেশে মরার ও জেলে গিয়ে পচবার উৎসব পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাতিক চাগে আমাদেরও মরালোকের শ্রাদ্ধ বাসর সাজাবার এবং জেলের মধ্যে দুগ্‌গোপুজো লাগাবার। উৎসাহটাই যে উৎসবের জনয়িতা তা তো নয়, রক্ত যখন অতিরিক্ত রকম উৎসাহে চলাচল করছে মস্তিষ্কে—তখন বুঝতে হবে জ্বর এল বলে, নয় জ্বরের চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটল বলে। হঠাৎ খেয়াল হল একটা সাম্বৎসরিক কি সম্মিলনী কি আর-কিছু খুব ধুমধামে করতে হবে, তখনই ছুটোছুটি পড়ে গেল বক্তা ধরতে স্টেজ বাঁধতে, বাদ্যি জোগাড় করতে। এ তো স্বাভাবিক অবস্থার কাজ নয়। স্বভাবের নিয়মে বসন্ত কালের উৎসব মনে হয় বটে হঠাৎ শুরু হল, কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে কোকিলকে এই উৎসবে আসতে হবে বলে ফাল্গুন মাস আসবার দশ এগারো মাস আগে থেকে সে গলা সাধছিল এমন গোপনে যে বাতাসও টের পায়নি। গাছগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে শীতকাল ভোর পাতা ফুল কত কি জোগাড় করে রেখেছে। উৎসবের ঢের আগে বসে যায় বোধন, তাই সুন্দর হয় উৎসব এবং তার রেশ চলে অনেক দিন ধরে বাতাসের মধ্যে ঝরা বাসি ফুলের সৌরভের মতো। এই স্বাভাবিক ছন্দে যে উৎসব হয় সেই উৎসব ঠিক উৎসব, শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই স্বাভাবিক অবস্থা না পেলে দেশে উৎসবের বাঁশি বাজবে না বাজবে না তা যতই কেন ফুলুটে ফুঁ দাও না, যতই কেন হারমোনিয়মের হাপর জোরে টিপে সুরের আগুন জ্বালাতে চাও না। বাঁশি বলবে না বাতি জ্বলবে না। সন্ধ্যার উৎসব আরতিটা এমনতরো হঠাৎ আয়োজন তো নয়, সেখানে সারা বেলার আয়োজন মেলে গিয়ে সারা রাতের আয়োজনের সঙ্গে। আকাশে তাই তো অতখানি রং লাগে, বাতাসে অতটা সুর ভরে—

দিনে রাতে মিলিয়ে দেওয়ার গান
রংএ রংএ
ওই আকাশে লুকিয়ে ভাসে
বাতাস ব'য়ে সেই তো আসে,
বাঁশি ডাকে
দেয় সে ধরা সুরে সুরে।
এই বাতাস এ লুকিয়ে রাখে

বেণু বনের তলায় তলায়
আলো ছায়ায় মিলিয়ে দেওয়া গান,
বাঁশি তারে ধরে সুরের ফাঁসে
এই বাতাসে।

শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড

মানব-শিল্পের শৈশবটা কাটল মানুষের ঘরের এবং বাইরের খুব দরকারি কাজ করতে। পাথর ঘষে তীরের ফলা তৈরি করা, হাঁড়িকুঁড়ি গড়া, কাপড় বোনা, হাড়ের মালা গাঁথা, লোহার বালা গড়া, শীতের কম্বল বসবার আসন—এমনি নানা জিনিসের উপরে শিল্পের ছাপ পড়ল। নানা জিনিস প্রস্তুতের নানা প্রক্রিয়া আস্তে আস্তে দখল হয় মানুষের। মানুষ সভ্যতার দিকে যখন এগোল তখন কতক শিল্পকলা রইল ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে, কতক রইল রাজসভার সঙ্গে জড়িয়ে। প্রধানত এই দুই রাস্তা ধরে শিল্পের ক্রিয়াকাণ্ড চলল সব দেশেই। পুজোর জন্য যেসব মন্দির প্রতিমা ইত্যাদি তাদের প্রস্তুত করার নানা প্রকরণ এবং প্রাসাদ নির্মাণ, হাট বসানো, কুয়ো খোঁড়া ইত্যাদির নানা কথা সংগ্রহ হয়ে পণ্ডিতদের দ্বারা শিল্পশাস্ত্রে ধরা হল, নানা শিল্প বিষয়ে নানা কথা নানা অধ্যায়ে বিভক্ত হয়ে শাস্ত্রের মধ্যগত রইল—এই হল শিল্পশাস্ত্রের গঠনের মোটামুটি হিসেব। তারপর ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চার শাস্ত্রের মধ্যে মধ্যে আনুষঙ্গিকভাবে নানা শিল্পকলার কথাও বলা হল এবং আংশিকভাবে নানা পুরাণেও প্রসঙ্গক্রমে শিল্পের এবং নানা কলাবিদ্যার কথা লেখা রইল।

শিল্পশাস্ত্রের মূল গ্রন্থসব যা ছিল বলেই শুনি, সেইসব প্রাচীন শাস্ত্রের সারসংগ্রহ বলে যেসব পুঁথি নানা কালে এ-দেবতা ও-ঋষি বা অমুক তমুকের কথিত বলে লেখা হল— রাজরাজড়ার পুস্তকাগারে ধরার জন্য সেইগুলোই কতক কতক এখন পাওয়া যাচ্ছে। তা থেকে দেখা যায় যে, ধর্মের সেবায় শিল্পের যেসব দিক জড়িয়ে ছিল তারি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হল কিন্তু অন্যান্য কলা যা শৌখিন রাজরাজড়ার সেবায় লাগত তাদের বিস্তারিত বিবরণ লেখাই গেল না। পূজার প্রতিমা কেমন করে করতে হবে তার ঠিকঠাক নিয়ম লক্ষণ সমস্তই পাই, কিন্তু কাপড়-চোপড় নানা গন্ধতৈল নানা মূল্যবান তৈজসপত্র এদের প্রস্তুতের প্রকরণ শিল্পশাস্ত্রে দেখি ক্বচিৎ ধরা হল। এ ধরনের সামগ্রীর মধ্যে এক বজ্রপ্রলেপের কথা লেখা আছে দেখি সব শিল্পশাস্ত্রে, কিন্তু বজ্রমণির বেলায় তার ধারণের কি গুণাগুণ তার বর্ণ ও মূল্যাদির হিসেব হল ধরা কিন্তু বজ্রমণিটা বিদ্ধ করা যায় কি প্রক্রিয়ায় এবং কত রকম গহনা হয়, কত নাম তাদের,—এসব কিছু নেই শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে। প্রতিমা-লক্ষণ, প্রাসাদ-নির্মাণ, কূপ-খনন, ইত্যাদি-ইত্যাদি নানা কথা শিল্পশাস্ত্রে যেমন নানা অধ্যায়ে ভাগ করে লেখা রইল, তেমন করে ভূষণশিল্প যেটা একটা খুব বড় আর্ট প্রাচ্য জগতের—তার হিসেব ধরা দরকারি বোধ হল না।

এই যে সমস্ত শৌখিন শিল্প, তার উদ্ভাবনা ও গঠনের প্রক্রিয়া সমস্ত শিল্পীদের ঘরে অলিখিত অবস্থায় পিতা থেকে পুত্রে অর্সাতে চলল। এইসব বিচিত্র শিল্পের নানা আদর্শ বর্তমান রইল কিন্তু তাদের প্রস্তুতকরণের প্রক্রিয়া সমস্ত কত যে লোপ পেয়ে গেল তার ঠিক নেই। এই কারণে বলতেই হয় আমাদের শিল্পশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র বলতে যা বোঝায় তা নয়, তাতে অঙ্গবিদ্যা হিসেবে আংশিকভাবে প্রসঙ্গক্রমে কোনো কোনো কলাবিদ্যার কথা বলা হয়েছে, ভারত-শিল্পের প্রায় সাড়ে-পনেরো আনা অংশের কথাই পাড়া হয়নি তাতে।

এখন ধর্মের সঙ্গে শিল্পের আগেকার যোগ বিচ্ছিন্ন হতেই চলল, শিল্পের যে অনাদৃত দিক বিচিত্র দিক যা নিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা সুন্দর হয়ে উঠল মধুময় হয়ে উঠল সেই দিকে মানুষের নজর পড়ল; ঘরের শিল্প আবার ঘরেই ফিরেছে পরের কাজ চুকিয়ে।

শিল্পকে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে না দেখে শিল্পের দিক দিয়ে দেখা খুব অল্পদিন হল ইউরোপে চলিত হয়েছে। প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে এইভাবে শিল্পরসের দিক দিয়ে কলা সমস্তকে দেখা আলঙ্কারিকগণ প্রচলিত করে গেছেন। শুধু কাব্যকলার সঙ্গে জড়িয়ে রাখলে অলঙ্কারশাস্ত্র রসশাস্ত্র ইত্যাদি খুব কাজে আসবে না, অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারপ্রণালী ধরে শিল্পবিদ্যা বুঝতে চললে ঢের বেশি ফল পাব আমরা। শিল্পের পুরাতত্ত্ব হিসেবে শিল্পশাস্ত্র কাজে লাগবে, প্রাচীনের সঙ্গে শিল্পশাস্ত্রের দিক দিয়ে এখনকার শিল্পীদের আংশিকভাবে যোগ ছাড়া বেশি কিছু হবে না; আমরা হাজার বছর আগে কত বড় শিল্পী ছিলেম এই ভাবের একটা ভুয়ো গর্বও লাভ হতে পারে—কিন্তু সে শুধু পড়ে-যাওয়া বিদ্যা হবে শিল্পবোধ তাতে হবে না। রসের ও ভাবের প্রক্রিয়া ধরে কবিতা ছবি মূর্তি এমনকি খেলনাটারও পরিচয় হল ঠিক পরিচয়। বিদেশীয় রসিকেরা এই পথে কাজ করে চলেছেন অনেকেই।

শিল্পী ও শিল্পরসিক কেমন করে হয় তা ঠিক করে বলা কঠিন। হঠাৎ দেখি কেউ রস পেয়ে গেল কেউ বা সারা বছর অলঙ্কারশাস্ত্র পড়ে পড়ে চোখই ক্ষরিয়ে ফেলল। কবি কেমন করে হয় কাব্যপ্রকাশে লেখা আছে দু চরণ শ্লোকে। কলাশাস্ত্রের গোড়ায় ঠিক এই কথা লেখা হলে মানায়—পড়ে পাই বিদ্যা, না-পড়ে পাই কলাবিদ্যা। কিন্তু না পড়ে পেলেও কলাবিদ্যাকে পড়ে পাওয়া শক্ত। হাতে-কলমে কাজ করা হল শিল্পের নানা প্রকরণ, সহজে দখল করার সহজ উপায়। রঙ রেখা এদের টেনে দেখলে এদের রহস্য সহজ হয়ে আসে।

পড়ার দ্বারা নয় ক্রিয়ার দ্বারা শিল্পকর্মে দক্ষতা হয় যদি এই কথাই হল তবে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা পড়াশুনো করছে না অথচ artistও হয়ে উঠছে না। তারা কেউ চাষা হচ্ছে কেউ দোকানি-পসারি মুটে-মজুর হচ্ছে। অবশ্য এদের অনেকের কাজই শিল্পশাস্ত্রের চৌষট্টি কলার কোনোটা-না-কোনোটার মধ্যে পড়ে যায়, কিন্তু হলে কি হয়! আমরা নিজেদের সব দিক দিয়ে যতই cultured বোধ করি না কেন চাষাকে artist ভাবা মজুরকে artist বলা শক্ত হয়েছে; যারা গাধাবোট টেনেই চলেছে তাদের কেউ এখন artist বলে না কিন্তু যে ছেলেরা বাচ খেলায় মজবুত হল তাদের বলি artist!

আজকে আমাদের পক্ষে ‘philosopher জ্ঞানী লোক, cultivator চাষা’, এবং artist তারাই যারা নিত্য জীবনযাত্রার থেকে স্বতন্ত্র অতিরিক্ত কিছু নিয়ে রয়েছে। আগে কিন্তু এ ভাবটা ছিল না, তখন শহরের লোক দেখি চোরের সিঁদ কাটার নানা কায়দা দেখে পুলিস ডাকার কথা ভুলে ফুটো দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন সিঁদটা কাটা হয়েছে এই নিয়ে art lecture আরম্ভ করে দিয়েছে। হয়তো বা চোর সে নিজের কাটা সিঁদের বাহার দেখে খুশিতে রয়েছে এমন সময় পুলিস এসে গ্রেপ্তার করলে artistকে। বর্ষাকালে দেখি ক্ষেতের দিকে চেয়ে চাষার গান চলল—

“গগন ঘটা ঘহরাণী সধো
        গগন ঘটা ঘহরাণী
পূরব দিস্‌সে উঠিহৈ বদরিয়া
        রিম ঝিম বরষত পানী।

আপন আপন মেড়ঁ সম্‌হারো
বহ্যো জাত য়হ পানী
সুরত নিরত কা বেল নহায়ন
কৱে খেত নির্বাণী।”
—কবীর

ঘনঘটা ঘটিয়ে এল পুবে বাদল উঠল রিমঝিম বরিষ নামল, সামাল ভাই ক্ষেতের আল, ঐযে জল বয়ে চলল। দুটি লতা—অনুরাগের বিরাগের—তাদের আজ এই রসের বৃষ্টিধারায় ভিজিয়ে নাও, এমন ক্ষেত লাগাও যেখানে অবাধ মুক্তির ফসল ফলে, ক্ষেতের ফসল কেটে ঘরে তুলতে পারে, তাকেই তো বলি কুশল কিষাণ।

সেকালে তাঁরা art কিসে নেই বা কিসে আছে এটা সুনিশ্চিত করে দিতে অথবা নানা রকম কলাবিদ্যার সংখ্যা নির্ধারণ করে চৌষট্টির মধ্যেই artকে ধরে রাখতে চাননি; এইজন্যই শাস্ত্রে বলা হল:

“বিদ্যা হ্যনন্তাশ্চ কলাঃ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে।
বিদ্যা মুখ্যাশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চতুঃষষ্টিঃ কলাঃ স্মৃতাঃ॥” (শুক্রনীতিসার)[১]

এইভাবে বিদ্যা এবং কলা দুয়ের প্রভেদটা মাত্র মোটামুটি রকমে শাস্ত্রে ধরা হল:

“যদ্‌যত্ স্যাদ্ বাচিকং সম্যক্ কর্ম্মবিদ্যাভিসংজ্ঞকম্।
শক্তে মূকোহপি যৎ কর্ত্তুং কলাসংজ্ঞন্তু তৎস্মৃতম্॥” (শুক্রনীতিসার)[২]

আমরা এখন artকে fine, industrial—নানাভাগে ভাগ করে নিয়েছি। আগেও এইরকম ভাগ ছিল শিল্পে—কর্মাশ্রয়া দ্যুতাশ্রয়া উপচারিকা ইত্যাদি হিসেব। সেকালের চৌষট্টি কলার ফর্দটার মধ্যে যাকে বলি fine art, যাকে বলি industrial art এবং যাকে বলি science, সবই এক কোঠায় রাখা গেছে। সেকালের হিসেবে ধরলে আজকালের Football, Billiards ইত্যাদি খেলা art-এর মধ্যে এসে পড়ে; সন্তানপালন একটা art-এর মধ্যে ছিল আগে, এখন ওটা আমরা Medical science-এর মধ্যে ফেলে দিয়েছি। এমনকি ছেলেদের খেলার পুতুল গড়া ও কেষ্টনগরের পুতুল গড়া এবং গড়ের মাঠের ধাতুমূর্তি গড়া—তিনটেকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের শিল্প বলে ধরে নিয়েছি। মানুষের উন্নত ও সুন্দর এবং সুকুমার বৃত্তিসমূহ যে শিল্পকাজের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় তাকে বলি fine art, মানুষের প্রতিদিনের জীবনের নানা সাজসরঞ্জাম যাতে করে শুধু কাজের নয় সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন হয়ে ওঠে তাকে বলি industrial art; এমনি art-এর মোটমাট জাতিবিভাগ সৃষ্টি হয়ে গেছে মানুষের নিজের মধ্যে সমাজবন্ধনের সময়ে নানা বর্ণবিভাগের প্রথায়; artistদের কাছে কিন্তু এরকম একটা বিভাগ নিয়ে art-এর উপভোগের তারতম্য ধরা একেবারেই নেই, সেখানে আর্ট এক কোঠায় না- art অন্য কোঠায়, ইতর বিশেষ, মাঝামাঝি, চলনসই—এসব কথা নেই, art কি art নয় এই বিচার।

শিল্পশাস্ত্র আমাদের যা রয়েছে তাতে ভাস্কর্যের একটা দিক, স্থাপত্যের খানিকটা— যেটা পূজন ও যজন-যাজনের সঙ্গে জোড়া, তারি উপরে বিশেষভাবে মতামতের জোর দেওয়া হয়েছে দেখা যায়। তাছাড়া এটাও দেখি যে শিল্পশাস্ত্রের সংগ্রহকার্যে ভারি একটা ত্বরা রয়েছে—কোনো রকমে একটা প্রাচীনত্বের ছাপ মেরে জিনিসটাকে সাধারণে প্রচার করার ত্বরা—একটা ধর্মবিপ্লবে এবং সেই সময়ের ত্বরা—শিল্পকে নিয়ে টানাটানি এসবই লক্ষ্য করি শিল্পশাস্ত্রের সংগ্রহের ধরন থেকে।

Art-এর মধ্যে একটা অনির্বচনীয়তা আছে যেটা artist-এর অনুভূতির বিষয় এবং অসাধারণ বলেই art-এর অনির্বচনীয় রস যে কি ব্যাপার তা সবাইকে বুঝিয়ে ওঠা কঠিন। রস পেলে তো পেলে, না পেলে তো পেলে না, এসব কথা শিল্পশাস্ত্রকার বিচার করবার সময় পাননি, এসব চিন্তা আলঙ্কারিকদের, রসের দিক দিয়ে তাঁরা বিচার করে দেখেন যে সেদিক দিয়ে এতটুকু বা এত বড় নেই সরস বা নীরস নিয়ে কথা। মাটির খেলনা সরস হল তো মগধের নাড়ুর চেয়ে বড় জিনিস হল এবং মগধ উড়িষ্যা সব শিল্পের বড় বড় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ ও গণেশের সমতুল্য হয়ে উঠল একটি সুন্দর আরতি-প্রদীপ। আর্টের জগৎ শিল্প কি শিল্প নয় এই নিয়ে,—উচ্চ-নীচ ভাল-মন্দ ভেদাভেদ, দেবতা কি মানুষ কি বানর এ নিয়ে দেখা নয়,—art কি art নয় এই নিয়ে সব জিনিসকে পরীক্ষা করা হল অকাট্য নিয়ম। Art for art এই কথাই হল artist-এর, art ধর্মের জন্য কি জাতীয় গৌরবের ধ্বজা সাজাবার জন্য কি nature-এর সম্মুখে mirror ধরার জন্য অথবা বিপশ্চিতাম্ মতম্-কে বলবৎ রাখার জন্য, এ তর্ক art-এর জগতে উঠতেই পারে না।

Artist যে উদ্দেশ্যেই কাজ করুক আর্টের দিকে চেয়ে করাই হল তার প্রধান কাজ। ময়ূর নিজের আনন্দে তার চিত্র-বিচিত্র কলাপ বিস্তার করে, বাগানের শোভা কি বনের শোভা কি খাঁচার শোভা তাতে হল কি না-হল ময়ূরের মনে একথা উদয়ও হল না; এতটা স্বাধীনতা মানুষ শিল্পে চায় কিন্তু পেলে কই?—ধর্ম বললে তুমি আমার কাজে লাগো, দেশ বললে আমার, এমনি নানা দিক দিয়ে শিকল পড়ে গেল শিল্পের হাতে পায়ে, তারপর একদিন চিরকালের ছাড়া পাখি তার মনিবের পোষ মানলে, ইশারাতে পুচ্ছ ওঠালে নামালে যে শুধু তাই নয়, জলযন্ত্র ঘোরালে ঘটিযন্ত্র চালালে কামান দাগলে নিয়মমতো!

"অপি শ্রেয়স্করং নৃণাম্ দেববিম্বমলক্ষণম্।
সলক্ষণং মর্ত্ত্যবিম্বম্ নহি শ্রেয়স্করং সদা॥"

এই হুকুমে এককালে আমাদের শিল্পীরা বাঁধা পড়ে ছিল। পুঁথিকার দেবতা সমস্তের ধ্যান দিলে শিল্পে, সেই ধ্যান মতো গড়ে চলল—এই ঘটনাই যদি পুরোপুরি ঘটতো তবে আমাদের art আর্ট কেবলমাত্র ধ্যানমালার illustration হয়ে যেত কিন্তু এর চেয়ে যে বড় জিনিস হয়ে উঠল বুদ্ধ নটরাজ প্রভৃতি নানা দেবমূর্তি সেটা ধ্যানমালার লিখিত ধ্যানের অতিরিক্ত এবং শিল্পশাস্ত্রের মান-পরিমাণ লক্ষণাদির বাঁধা নিয়মের থেকে স্বতন্ত্র আর-কিছু নিয়ে। প্রাচীন দেবমূর্তিগুলি আমাদের বাঙলার কার্তিকের মতো সম্পূর্ণ কাপ্তেনবাবু বা কলে কাটছাঁটা মরা জিনিস হয়ে পড়েনি শুধু শিল্পের শিল্পক্রিয়া তাদের অমরত্ব দিলে বলে এবং শুধু সেইটুকুর জন্য art-এর জগতে এইসব দেবতার স্থান হল।

শাস্ত্র বললে শিল্পকে ঘাড়ে ধরে, দেবলোকটাই আছে তোমার কাছে, মর্ত্যলোক নেই, যদি বা থাকে তো সেদিকে দৃকপাত করবে না—তাহলে অন্ধ হবে। কিন্তু artist-এর পথ স্বতন্ত্র কেননা art সে অনন্যপরতন্ত্রা, শিল্পীর কাছে দেবলোকের স্বপ্ন সেও যেমন প্রত্যক্ষ ও সুন্দর, মর্ত্যলোকের ছবি সেও তেমনি অভাবনীয় সুন্দর ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার, দুটোই তুল্যমূল্য, যদি art হল এবং রসের স্বাদ দিলে। শাস্ত্রী চাইলেন মর্ত্যকে ছেড়ে শাস্ত্রীয় স্বর্গ, ইহলোককে মুছে দিয়ে পুঁথির পরলোক। কিন্তু শিল্পীর শিল্পবৃত্তি তাকে অন্য পথ দেখালে; মর্ত্যলোকের মাটির দেহে সবখানি সুন্দর হতে সুন্দরতর হয়ে উঠল, শাস্ত্র যে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড চেয়েছিল তা হতেই পারলে না, অনেকখানি সৃষ্টিরহস্য শিল্পীর মনে ক্রিয়া করে পাগলামির অনাসৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে দিলে এ দেশের প্রতিমাশিল্পকে। শিল্পশাস্ত্রের দেবলোক ও তার অধিবাসী তাঁরা একেবারেই তেত্রিশ কোটি গণ্ডীর মধ্যে ঘেরা,

নিখুঁত মান-পরিমাণ লক্ষণ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বাঁধা শাস্ত্রীয় দেবলোক ও দেবতা হওয়া ছাড়া সেখানে উপায় নেই, শিল্পীর মনের দেবতা এবং শাস্ত্রের দেবলোকের সঙ্গে শিল্পীর শিল্পলোকের কল্পনায় তফাত থাকতে পারে এই ভয় করেই শাস্ত্রকার কষে বেঁধেছেন আপনার নিয়ম জায়গায় জায়গায়—"নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু"; পূজার জন্য যে প্রতিমা তা শাস্ত্রমতো না পড়লে তো চলে না সুতরাং শিল্পীর ওপরে কড়া হুকুম জারি করতেই হল নানা ভয় দিয়ে—"হীনাঙ্গী স্বামিনং হন্তি হ্যধিকাঙ্গীচ শিল্পিনম্।" একচুল এদিক ওদিক হলে একেবারে মৃত্যুদণ্ড; বেতের ভয় নয়—"কৃশা দুর্ভিক্ষদা নিত্যং স্থূলা রোগপ্রদা সদা", অন্ধতা বংশলোপ ইত্যাদি নানা ভয় দিয়ে শিল্পীকে ও শাস্ত্রীয় মূর্তিকে কঠিন নিয়মে বাঁধার চেষ্টা হল, কিন্তু এতে যে কাজ ঠিক চলল তা নয়, এদিক ওদিক হতেই থাকল মাপজোখ ইত্যাদিতে, শিল্পী মানুষ তো কল নয়, সে ক্রিয়াশীল ক্রীড়াশীল দুই-ই, সুতরাং একটু ঢিলে দিতে হল নিয়মের কষনে।

"লেখ্যা লেপ্যা সৈকতী চ মৃন্ময়ী পৈষ্টিকী তথা।
এতাসাং লক্ষণাভাবে ন কশ্চিৎ দোষ ঈরিতঃ॥
বাণলিঙ্গে স্বয়ম্ভূতে চন্দ্রকান্তসমুদ্ভবে।
রত্নজে গণ্ডকোদ্ভূতে মানদোষো ন সর্ব্বথা॥"[৩]

ছবি modelling, plaster cast এমনি অনেক জিনিস এবং স্ফটিক ও নানা রত্নভূষা এবং ছোটখাটো শিল্পদ্রব্য সমস্তই বাঁধনের বাইরে পড়ল, কেবল পাষাণ ও ধাতুজ পূজার জন্য যে মূর্তি রইল শাস্ত্রের মধ্যে বাঁধা কিন্তু এখানেও গোল বাধল ঠিক ঠিক শাস্ত্রমতো গড়ন কে জানে কেন শিল্পীর হাতে এল না, এদিক ওদিক হতেই থাকল কিছু কিছু— দেশভেদে কালভেদে শিল্পীর কল্পনাভেদে পূজকের অন্তর্দৃষ্টিভেদে, তখন সম্পূর্ণ ছাড়পত্র দেওয়া হল—

"প্রতিমায়াশ্চ যে দোষা হ্যর্চ্চকস্য তপোবলাৎ।
সর্ব্বত্রেশ্বরচিত্তস্য নাশং যান্তি ক্ষণাৎ কিল॥[৪]

এই ফাঁক পেয়ে দেশের শিল্প হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বিচিত্র হয়ে উঠল মন্দিরে মঠে।

সেকালে শাস্ত্রের নিয়মমতো গড়ার যেসব ব্যাঘাত পরে পরে এসেছিল, একালেও যদি শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসনে আমরা শিল্পীদের বাঁধতে চলি তবে ঠিক সেকালের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবেই হবে। অনেকে বলেন ইতিহাসের না হয় পুনরাবৃত্তি হলই, তাতে করে যদি তখনকার art ফিরে পাই তো মন্দ কি। এ হবার জো নেই, যা গেছে তা আর ফেরে না; তার নকল হতে পারে, ছোট ছেলে ঠাকুরদাদার হুবহু নকল দেখিয়ে চললে যেমন হাস্যকর অশোভন ব্যাপার হয় তাই হবে, গোলদীঘির অজন্তা-বিহার হবে, গড়ের মাঠের খেলনা তাজমহল হবে। কুঁড়েঘর আর বদলাল না কেননা সে এমন সুন্দর করে সৃষ্টি করা যে তখনো যেমন এখনো তেমনি তাতে স্বচ্ছন্দে বাস চলল। কিন্তু সেকালের প্রাসাদে একালে আমাদের বাস অসম্ভব, আলো বাতাস বিনা হাঁপিয়ে মারা যাব পাথর চাপা পড়ে। পুরাকালে আমাদের যাঁরা শিল্প ও শিল্পরসিক ছিলেন তাঁরা ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না। তাঁরা নিয়ম করতেন নিয়ম ভাঙতেন তাঁদের মধ্যে শিল্পী ও শিল্প দুই ছিল, কাজেই তাঁদের ভয় ছিল না। এখন আমাদের সেই সেকালের কোনো কিছুতে একটু-আধটুও অদল-বদল করতে ভয় হয় কেননা নিজের বলে আমাদের কিছুই নেই, সেকালের উপরে আগাছার মতো আমরা ঝুলছি মাত্র, সেকালই আমাদের সর্বস্ব!

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এক আফ্রিকার মূর্তিশিল্প যেমন ছিল তেমনি নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেই আছে, সেকালকে সে ছাড়াতে একেবারেই পারেনি।

সেকাল ছেড়ে কোনো শিল্প নেই এটা ঠিক, কিন্তু একাল ছেড়েও কোনো শিল্প থাকতে পারে না বেঁচে এটা একেবারেই ঠিক। গাছের আগায় নতুন মুকুল গাছের গোড়ায় অতীতের অন্ধকারে তার প্রথম বীজটির সঙ্গে যেভাবে যুক্ত রয়েছে সেভাবে থাকাই হল ঠিকভাবে থাকা; আমের নতুন মঞ্জরীর সঙ্গে পুরাতন বীজটার চেহারার সাদৃশ্য মোটেই নেই কিন্তু মঞ্জরীর গর্ভে লুকানো রয়েছে সেই পুরাতন বীজ যার মধ্যে সেই একই ক্রিয়া একই শক্তি ধরা রয়েছে, নতুন আবহাওয়াতেও যেটা ঠিকঠাক আমগাছই প্রসব করবে বর্তমানকালে; এই স্বাভাবিক গতি ধরে চলেছে শিল্প, এর উল্টো-পাল্টা হবার জো নেই।

আমাদের দেশের শিল্পমূর্তিকে যে কারণেই হোক এই স্বাভাবিক গতি থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হল এক সময়ে, দেবমূর্তির বাহুল্যের চাপন পেয়ে কিছুদিন গাছ আমাদের মনোমতো পথ ধরে প্রায় কল্পতরু হবার জোগাড় করলে কিন্তু কালের নিয়মে হঠাৎ পশ্চিমের হাওয়া বইল চাপন পাথর একটুখানি নড়ে গেল, অমনি গাছ আবার স্বাভাবিক রাস্তা ধরে মন্দিরের ছাদ তুলসীমঞ্চের গাঁথনি ফাটিয়ে নানা দিকে আলো বাতাস চেয়ে গতিবিধি শুরু করলে, পশ্চিমে ঝুঁকল কতক ডাল, পুবে বাড়ল কতক ডাল, এইভাবে আলো বাতাসের গতি ধরে বেড়ে চলল গাছ। শুধু ভারতবর্ষ নয়, সব দেশ এইভাবে শিল্পের দিকে বেড়ে চলেছে। মঞ্চে বাঁধা গাছ দেখতে মন্দ নয় কিন্তু দিকে বিদিকে নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আছে যে বনস্পতি তার মতো সে শক্তিমানও নয় ছায়াশীলও নয় সুন্দরও নয়। আমাদের প্রাচীন শিল্প ও শাস্ত্র সমস্তই বোধিবৃক্ষের কলমের চারার সঙ্গে সোনার গামলায় নীত হয়েছিল দেশ থেকে বিদেশে, কিন্তু সেইসব যবন দেশের হাওয়া আলো নিয়ে তাদের বেড়ে উঠতে অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, ভিক্ষু শিল্পীদের দ্বারা তাদের সহজ গতি ব্যাহত হয়নি; তবেই তো এককালের ভারতীয় উপনিবেশের অভারতীয় অন্তরের মধ্যে চলে গিয়েছিল ভারতীয় ভাব ও রস। ভারত-শিল্প যদি কেবলি টবের গাছ হত তো কোনকালে সেটা মরে যেত ঠিক নেই, খালি টব থাকত আর তাতে সিঁদুর দিয়ে পুজো লাগাত দেখতেম আজও পুত্রকামনায় নিষ্ক্রিয় দেশের শিল্পহীন অপুত্রক হতভাগারা।

সেকালের শাস্ত্রমতো ক্রিয়া করে চললে এখনো আমরা সেকালের মতোই সব দিকে বিস্তার লাভ করতে পারি, কিন্তু একালকে বাদ দিয়ে ক্রিয়া করা চলবে না কেননা বর্তমানকাল এবং বর্তমানের উপযোগী অনুপযোগী ক্রিয়া বলে কতকগুলো পদার্থ রয়েছে যেগুলোকে মেনে চলতেই হবে আমাদের, না হলে সেকালটা ভূতের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই দেবে না আমাদের এবং তাবৎ শিল্পজগতের অধিবাসীকে। দাশরথি রায়ের পাঁচালী আমরা অনেকেই পড়ি কতক কতক ভালও লাগে কিন্তু পাঁচালীর ছাঁদে যদি কবিতা ঢালাই করার কড়া আইন করে দেওয়া যায় হঠাৎ তবে বর্তমানের কোনো কবি তাতে ঘাড় পাতবে না, কিংবা আমি যদি আজ বলি আমার ছাঁদেই বাঙলার চিত্রকর যারা এসেছে ও আসছে তাদের ছবি লিখতে হবে এবং গভর্নমেন্টের সাহায্যে এটা হঠাৎ একটা আইনে পরিণত করে নিই তবে কেউ সেটা মানবে না, উল্টে বরং শিল্পীর স্বাধীনতায় বিষম ব্যাঘাত দেওয়া হল বলে আমাকে সুদ্ধ তোপে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে। আমাদের শিল্পশাস্ত্রকারদের কড়া মাস্টার এবং পাহারাওলা হিসেবে দেখলে সত্যই আমাদের সেকালের প্রতি অবিচার করা হবে। পূর্বেকার তাঁরা তখনকার কালের যা উপযোগী বা নিয়ম তারই কথা ভেবে গেছেন, একালের

আমাদের কি করা না-করা, শাস্ত্রের কোন আইন মানা না-মানা সমস্তই একালের উপরে ছেড়ে দিয়ে গেছেন তাঁরা, শাস্ত্রকে অস্ত্রের মতো একালের উপরে নিক্ষেপ করার জন্য তাঁরা প্রস্তুত করে যাননি!

তখনকার তাঁরা নানা শিল্পের রীতিনীতি ক্রিয়াকলাপ সংগ্রহ করে গেছেন নানা শাস্ত্রের আকারে—

"স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ লোকহিতার্থং সংগ্রহেণ বৈ,
তৎসারন্তু বশিষ্ঠাদ্যৈরস্মাভির্বৃদ্ধিহেতবে॥" (শুক্রনীতিসার)[৫]

শুক্রাচার্য কেন যে নানা শিল্প নানা সামাজিক রীতিনীতি সংগ্রহ করে শুক্রনীতিসার বলে পুঁথিখানা লিখলেন তা নিজেই বলে গেলেন—

"অল্পায়ুর্ভূভৃদাদ্যর্থং সংক্ষিপ্তং তর্কবিস্তৃতম্
ক্রিয়ৈকদেশবোধিনি শাস্ত্রাণ্যন্যানি সন্তি হি।
সর্ব্বোপজীবকং লোকস্থিতিকৃন্নীতিশাস্ত্রকম্
ধর্ম্মার্থকামমূলং হি স্মৃতং মোক্ষপ্রদং যতঃ॥"[৬]

মুক্তি দেবার জন্য শাস্ত্র, অল্পের মধ্যে অল্পায়ুধকে অনেকখানি বোঝাবার জন্য শাস্ত্র, রক্ষার জন্য শাস্ত্র,—হননের জন্য নয়!

পৃথিবীর সেকালের ভিত্তির উপরে একালের প্রতিষ্ঠা হল স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা, সেকাল একালের ঘাড় চেপে পড়ল—বাড়ির ভিত উঠে এল ছাতের উপরে, এ বড় বিষম প্রতিষ্ঠা! সেকালের বাস্তুশিল্প হিসেবেও এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা তার মালমশলার জন্য সম্পূর্ণভাবে সেকালের উপর নির্ভর করে চলতে বাধ্য,—নতুন প্রথায় কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব চর্চা চলল। শিল্পও তেমনি সেকাল, একাল ও ভবিষ্যকালের যোগাযোগে বর্ধিত হয়ে চলল, কোনো এককালের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাকে ধরে রাখবার উপায় রইল না। প্রাচীন ভারতের শিল্প শুধু নয়—তখনকার আচার-ব্যবহার সমুদয় কি ছিল কেমন ছিল তা প্রাচীন পুঁথির মধ্যে ধরা রইল বলেই শাস্ত্র পুরাণ ইত্যাদি পড়া। কিন্তু পড়ে জানা হল একরকম শিল্পকে না জানাই। অজন্তা চিত্র কেমন এবং তার বর্ণ দেবার লাইন টানার মাপজোখের হিসেবের ফর্দ পড়ে গেলে ছবিটা দেখার কাজ হয় না। প্রাচীন ভারতের শিল্পের যে দিকটা প্রত্যক্ষ হচ্ছে বর্তমানে—মন্দির মঠ মূর্তি ছবি কাপড়-চোপড় তৈজসপত্র ইত্যাদিতে তা থেকেই বেশি শিক্ষা পায় শিল্পী। এ হিসেবে একটা প্রাচীন মূর্তির ফটোগ্রাফও বেশি কাজের হল শিল্পকে বোঝাতে, আসল মূর্তিটা চোখে দেখলে তো কথাই নেই। ব্রজমণ্ডলে কি কি আছে ও ছিল, সেটা ব্রজপরিক্রমা পড়ে গেলেও ব্রজমণ্ডল দেখা হল না, জানা হল না—যতক্ষণ না তার ফটো দেখছি বা সেখানে তীর্থদর্শনে যাচ্ছি। না-দেখা ব্রজভূমি যেটা সম্পূর্ণ কল্পনার জিনিস তার মূল্য বড় কম নয়—art-এর দিক দিয়ে। কিন্তু শাস্ত্রমতো ব্রজভূমির একটা বর্ণনা বা symbol দুখানা হরিচরণ যদি হয়, তবে সেটা দেখে কি বুঝব ব্রজের শোভা? নিছক প্রতীক নিয়ে তন্ত্রসাধনা চলে,—শিল্পসাধনা তার চেয়ে বেশি কিছু চায়। সাধকের হিতার্থে শাস্ত্রমতো রূপকল্পনা হল অরূপের, যখন তখন একখণ্ড শিলা একটা যন্ত্র হলেই কাজ চলে গেল। কিন্তু শিল্প এমন নিছক প্রতীকমাত্র হয়ে বর্তে থাকতে পারে না। অনেকখানি চোখের দেখার মধ্যে না ধরলে দেবতাকে দেখানোই সম্ভব হয় না। অথচ দেবতাকে মনুষ্যত্বের কিছু বাহুল্য দিলেও চলে না। এই কারণে নানা মূর্তির নানা মুদ্রা হাত মাথা ইত্যাদির প্রাচুর্য দরকার হয়ে পড়ল। শিল্পশাস্ত্র নিখুঁত করে তার হিসেব দিলেন। কিন্তু

এতেও পাথর দেবতা হয়ে না উঠে মনুষ্যেতর কিছু হবার ভয় গেল না, —তখন শিল্পীর শিল্পজ্ঞান যেটা তাঁর নিজস্ব, তার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় রইল না।

এই যে শিল্পজ্ঞান, এ কোথা থেকে আসে শিল্পীর মধ্যে তা কে জানে? তবে শুধু শাস্ত্রকে মেনে চলে কিংবা শাস্ত্র পড়ে সেটা আসে না এটা ঠিক। এইখানে শিল্পীর প্রতিভাকে স্বীকার করা ছাড়া উপায় রইল না—কেননা দেখা গেল শাস্ত্রমতো মান পরিমাণ নিখুঁত করেও—"সর্ব্বাঙ্গৈঃ সর্ব্বরম্যোহি কশ্চিল্লক্ষে প্রজায়তে",—লাখে একটা মেলে সর্বাঙ্গসুন্দর। অতএব ধরে নেওয়া গেল "শাস্ত্রমানেন যো রম্যঃ স রম্যা নান্য এব হি"। এতে করে শাস্ত্রের মান বাড়ল বটে, কিন্তু শিল্পক্রিয়া খর্ব হল। তাই এক সময়ে একদল বললে—"তদ্ রম্যং লগ্নং যত্র চ যস্য হৃৎ।" অমনি শাস্ত্রের দিক দিয়ে এর উত্তর এল—"শাস্ত্রমানবিহীনং যদ্ সরম্যং তদ্ বিপশ্চিতাম্।" পণ্ডিতের মান বজায় করে শাস্ত্রকার ক্ষান্ত হলেন। কিন্তু এতে করে আমাদের দেশের শিল্পীরা শিল্পক্রিয়াতে প্রায় বারো আনা যে অপণ্ডিত থেকে যাবে, সেকথা শাস্ত্রকার না ভাবলেও তখনকার শিল্পীরা যে ভাবেনি তা নয়। প্রতিমা-শিল্প সেই এক ছাঁচ ধরে চলল। কিন্তু অন্যান্য শিল্প সমস্ত নতুন নতুন উদ্ভাবনার পথ ধরে নানা কালের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বৈচিত্র্য ধরে অফুরন্ত সৌন্দর্যধারা বইয়ে চলল দেশে।

চিত্রকলার ইতিহাস এদেশে যেমন বিচিত্র তেমন মূর্তি গড়ার ইতিহাস নয়। বাস্তুবিদ্যা তাও নানা নতুন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলে অব্যাহত ধারায় বইল নতুন থেকে নতুনতর সমস্তকে ধরে। কিন্তু ঠাকুরঘরের মধ্যে সেই পুরোনো দেবতা বারবার পুনরাবৃত্ত হতে হতে দেবতার একটা মুখোসমাত্রে পর্যবসিত হতে চলল। শাস্ত্রমতো ক্রিয়া করে দেবমূর্তি গড়া প্রায় উঠেই গেছে এখন। ধ্যানগুলো বাহনগুলো কার কি এই নিয়েই কাজ চলেছে ভাস্করপাড়ায় কত দিন থেকে যে তার ঠিকানা নেই। দেবশিল্প বলে যদি কোনো সামগ্রী হয়ে থাকে এককালে দেশে তো সে বহু যুগ আগে। তারপর থেকে সে শিল্পের অধঃপতনই হয়েছে বেশি বাঁধাবাঁধির ফলে। ঘরে যে শিল্প এই বাঁধনে পড়ে মরতে বসল, বাইরে গিয়ে সেই শিল্প বাঁধন শিথিল পেয়ে দিব্যি বেঁচে গেল দেখতে পাই। নতুন নতুন প্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষার স্বাধীনতা শিল্পীর থাকল তবেই শিল্পক্রিয়া চলল, না হলে শিল্পের দুর্দশার সূত্রপাত হল—শাস্ত্রের দ্বারায় সে বিপদ ঠেকানো গেল না।

শিল্পশাস্ত্রে আমাদের দেশে এখানে ওখানে যা ছড়ানো রয়েছে তা থেকে সব শিল্পের তালিকা এবং বাস্তু মন্দির মঠ নির্মাণ, নগরস্থাপন, বিচারপদ্ধতি, নাগরিকের চাল-চোলের সম্বন্ধে নানা কথা এবং এইরকম নানা ব্যাপারের মধ্যে পূজার অঙ্গ হিসেবে প্রতিমানির্মাণ, তার বাহন ব্যবস্থা ইত্যাদিরই খুঁটিনাটি মাপজোখের কথা পাই। চিত্র বিষয়ে দু'-একখানা পুঁথিও পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব পুঁথিতে কোনো কোনো শিল্পকে অঙ্গবিদ্যা হিসেবে দেখে আংশিকভাবে সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। Art-এর পাঠ্য পুস্তক হিসেবে এগুলো বেশি কাজের হবে না, এই আমার বিশ্বাস। চিত্র যদি শিখতে চাই তবে চিত্রশালাতে যেতেই হবে আমাদের। প্রাচীন চিত্রে কেমন করে রেখাপাত, কেমন করে বর্ণপ্রলেপ, কেমন করে নানা অলঙ্কার বর্ধনা ইত্যাদি দেওয়া হত—তার প্রক্রিয়া ছবি দেখেই আমাদের শিখে নিতে হবে। কোনো শিল্পশাস্ত্রে এসমস্ত প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে ধরা নেই। কেমন কাগজে ছবি লেখা হত, কি কি বর্ণ সংযোগ হত, কোথায় কোথায় কেমন ধারা পালিশ দেওয়া হত ছবিতে, কত রকম তুলির টান, কত রকম রঙের খেলা, কত বিচিত্র ভাবভঙ্গি রেখার ও লেখার—এ সমস্ত এক-একখানি ছবি দেখে শেখা ছাড়া উপায় নেই। শাস্ত্রে কুলোয় না এত বিচিত্র প্রক্রিয়ার রহস্য সমস্ত হয়েছে ছবির মধ্যে ধরা মোগল বাদশাদের আমল পর্যন্ত, তারপর এসেছে ইউরোপ জাপান চীন থেকে নতুন

নতুন প্রক্রিয়ায় রচনা করা ছবি। এর চেয়ে প্রকাণ্ড পরিষ্কার সুন্দর শিল্প ব্যাখ্যানের পুঁথি যার পাতায় পাতায় ছবি পাতায় পাতায় উপদেশ এমন আর কি হতে পারে! এই পুঁথির একখানি পাতা সংগ্রহ করে নিয়ে চলেছে বিদেশের তারা কত অর্থব্যয়ে নিজেদের শিল্পজ্ঞান জাগিয়ে তুলতে। আর আমরা টাকার অভাবে একটা ছোটখাটো চিত্রশালাও রাখতে পারছিনে দেশে। পাথরগুলো মন্দিরগুলো ভেঙে নেবার উপায় নেই—না হলে ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন দেখে আর আমাদের কিছু শেখার উপায় বিদেশীরা রাখত না।

ভাবতে পারো original ছবির মূর্তি নাই হল, reproduction দেখেই আমরা শিল্পকাজে পাকা হয়ে উঠব, পুঁথি পড়ে পাকা হয়ে যাব,—এ মতের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই। কেননা আফ্রিকার অধিবাসী যারা, কোথায় তাদের art gallery কোথায় বা তাদের শিল্পশাস্ত্র। ছবির দিক দিয়ে মূর্তির দিক দিয়ে দেশটা উজাড় হলে ক্ষতি এমন কিছু নয়। শুধু মরুভূমিকে চষে আমাদেরই আবার সবুজ করে তুলতে হবে, পূর্বপুরুষদের সঞ্চয় ও ঐশ্বর্য অন্যে ভোগ করে বড় হতে থাকবে? দেশের স্থাপত্যরক্ষার আইন তাড়াতাড়ি না হলেও ও-জিনিস সহজে দেশ থেকে নড়ত না, সময় লাগত। কিন্তু এইসব ছোটখাটো শিল্পসামগ্রী,—চমৎকার কাঁথা, চমৎকার শাড়ি, মনভোলানো খেলনা, চোখ-ঠিকরানো গহনাগাঁটি ঘটিবাটি অস্ত্রশস্ত্র এবং রামধনুকের প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রশালা উড়ে চলেছে বিদেশে। যদি এখন থেকে দেশে এদের রাখার চেষ্টা আইনের দ্বারা হোক পয়সার দ্বারা হোক না করা হয় তবে শীঘ্রই শিল্পক্রিয়া আমাদের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। থাকবে শুধু বিদেশ যেটুকু ভিক্ষা দেবে, বিনা রোজগারে বিনা খাটুনির পাওনাটা।

শিল্পী হল ক্রিয়াশীল, শিল্প চাই তো ক্রিয়া করা চাই। তার প্রথম ক্রিয়া দেশেরটাকে দেশে ধরে রাখা, দ্বিতীয় ক্রিয়া বিদেশেরটাকে নিজের করে নেওয়া, তৃতীয় ক্রিয়া শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা নয়,—করে চলা ছবি মূর্তি নাচ গান অভিনয় এমনি নানা ক্রিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা একেবারেই করা নয় সেইটেই আগে শুরু করতে হল—বক্তৃতা দিতে হল। যেগুলো দরকারি প্রথম শিক্ষার পক্ষে—ছবির মূর্তির একটা যথাসম্ভব সংগ্রহ, তা হল না এ পর্যন্ত। ছবি সম্বন্ধে বই যা শেখাবে বক্তৃতা যা বোঝাবে তার চেয়ে ঢের পরিষ্কার ঢের সহজ করে বোঝাবে সত্যিকার ছবি—এটা কবে বোঝাতে পারব লোককে তা জানিনে।

আমাদের ছবি মূর্তি ইত্যাদির একটা মস্ত সংগ্রহ চৌরঙ্গীতে রয়েছে। কিন্তু সেটার নাম আমরা দিয়েছি জাদুঘর। কোন দিন সেটা ফুঁয়ে উড়ে যাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে তার ঠিক নেই। তখন আমাদের ঘর শূন্য। এই ভেবেই ছবি মূর্তি সাধ্যাতীত ব্যয় করেও ধরে রাখলেম, দু-চার জন শিল্পী তা দেখে শিখলে, কাজে এলো দু-চার দিন, তারপর এল দুঃসময়, চলল সব উড়ে বিদেশে—রূপো সোনার কাঠির স্পর্শে। এ আমি দেখতে পাচ্ছি—রইল না, দেশের শিল্প দেশে রইল না। বিদেশী এল, চোখে ধুলো দিয়ে নিয়ে গেল রাতারাতি ভাণ্ডার লুঠ করে। সকালে দেখি আমাদের ঘর শূন্য ভাণ্ডার খালি শুধু শিল্পী বসে একটা ভুয়ো কৌলীন্য মর্যাদা নিয়ে অথর্ব। আমরা বসে রয়েছি বাইরের দিকে চেয়ে। বাইরেটাও যে কত সুন্দর তার নীল আকাশ সবুজ বন আলো-আঁধার পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ ফুল-ফল নিয়ে, তাও বুঝতে পারছিনে। মন ভাবছে না, হাত পা চলছে না, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় হাত পেতেই বসে আছি। হঠাৎ কোনো একটা সুযোগ যদি এসে পড়ে এই আশায়। এই হল জাতীয় জীবনের সব দিক দিয়ে অতি ভয়ঙ্কর পক্ষাঘাতের প্রথম লক্ষণ—বাইরেটা রইল ঠিক কিন্তু ভিতরটা নিঃসার শিল্পের দিক দিয়ে। এই মানসিক এবং বাইরেও হাত-পায়ের পক্ষাঘাত নিবারণ কেবল শিল্পক্রিয়ার দ্বারা হতে পারে, বহুকাল ধরে হয়েও এসেছে। রাজ্য গেল রাজা গেল এমনকি ধর্মও অনেকখানি গেল যখন, তখন

বাঁচবার রাস্তা হল মানুষের পক্ষে শিল্প। আপৎকালে শিল্পের উপর নির্ভর এটা শাস্ত্রের কথা। কেননা শাস্ত্রকাররা জানতেন ক্রিয়াশীলতা এবং ক্রীড়াশীলতা দুটোই শিল্পের এবং জীবনেরও লক্ষণ তাই ক্রিয়াভেদে তাঁরা কলাভেদ নির্ণয় করে গেলেন। "পৃথক পৃথক ক্রিয়াভির্হি কলাভেদস্তু জায়তে।"—(শুক্রনীতিসার)

টীকা

১. ৪।২৬৪ শুক্রাচার্যকৃত শুক্রনীতিসার
২. ৪।২৬৫ ঐ ঐ
৩. ৪র্থ অধ্যায়, ৪৭২-৭৩ শ্লোক, ঐ ঐ
৪. ঐ ৪৮০ ঐ ঐ
৫. ১।৩, ঐ ঐ
৬. ১।৩-৪, ঐ ঐ

শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড

“পৃথক পৃথক ক্রিয়াভির্হি কলাভেদস্তু জায়তে”

—শুক্রাচার্য

ক্রিয়ার ভেদে হল নানারূপ কলা। কুমোর কাঠামোটায় যখন মাটি চাপিয়ে ক্রিয়া কর গেল, তখন হল ঠাকুর গড়া, আবার সে যখন চাকের উপরে মাটি চাপিয়ে গড়তে চলল তখন সে ক্রিয়ার ফলে হল হাঁড়িকুঁড়ি। ধুনুরী তাঁতের যন্ত্রে ঘা দিয়ে তুলো ধুনে চলল, সেই লোকই আবার আর একটা তারের যন্ত্রে অন্য ক্রিয়া করে সুরের সৃষ্টি করলে। কামারের হাতুড়ি লোহাকে পিটে ঠিক করে দিলে। ভাস্করের হাতুড়ি পেটার ক্রিয়া থেকে বার হয়ে এল অষ্টধাতুর এবং পাথরের দেবতা মানুষ হাতি ঘোড়া মন্দির মঠ ইত্যাদির নানা সাজ-সরঞ্জাম। ছবি লেখা হাতুড়ি চালানোর ফলে হয় না, কলম চালানো তুলি চালানোর ক্রিয়া জানা হল তো ছবি হল। আবার তুলি বুলিয়ে পাথর কাটা চলল না, সারং বাজিয়ে তুলো ধোনাও গেল না—যদিও কেউ কেউ সুর ধোনে বটে। ছবিটা লেখা, তাই অন্য লেখার সঙ্গে তার মিল লেখনীর দিকে। ছবি আঁকা দেখ তুলি দিয়েও চললো কলম দিয়েও হল। জাপানে তারা কবিতা লিখলে রসিদ লিখলে, এবং ছবিও লিখলে একই তুলিতে। এটা দেখছি যে কতক শিল্পকর্ম বড় একটা যন্ত্রের খুঁটিনাটি অপেক্ষা না করেই সহজে সুনিষ্পন্ন হয়ে যায় আর কতক শিল্পকর্ম যান্ত্রিকভাবে নিষ্পন্নই হতে চায়। শিল্পে যে উচ্চ-নীচ ভেদ হয়েছে তা যান্ত্রিক ক্রিয়ার বাহুল্য ও তার অভাব নিয়ে। কুমোর তাঁতি এরা অনেকখানি যন্ত্রের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে কাজ করে যায়—না করে তার উপায় নেই—কিন্তু পুতুল গড়বার বেলায় কুমোরের বউ শুধু হাতেই নানান খেলনা গড়ে চলে। ক্রিয়া যেখানে যন্ত্রের দ্বারা না হলে হয়ইনা সেখানে কর্মটা কলে যেন জলের মতো নিষ্পন্ন হয়ে গেলেও তার যান্ত্রিকতা একেবারে সুস্পষ্ট বিদ্যমান থাকে। এর ঠিক উল্টো হয় উচ্চ অঙ্গের শিল্পে, ক্রিয়ার যান্ত্রিকতা সেখানে যেটুকু বা থাকে সেটা আন্তরিকতায় ঢাকা পড়ে যায়।

ক্রিয়ার বা techniqueএর কৃত্রিমতা ও অকৃত্রিমতা ভেদ নিয়ে কতক শিল্প পড়ল fine artএর কোঠায়, কতক শিল্প রইল craftএর কোঠায়। মনের আনন্দে গলা ছেড়ে যখন গান গাওয়া, তখন সেটা Gramophoneএ কালোয়াতি গাওনার থেকে অনেকখানি বড় জিনিস। আবার যখন গাইয়ে এক এক সময় নিজের গলাটাকে যন্ত্রের সঙ্গে এমন বেঁধে ফেললে যে নিজেই একটা Gramophone হয়ে উঠল সে তখন আর্টিস্ট রইল না—technician হল মাত্র। ক্রিয়া বা technique কে ছাপিয়ে চলা হল সুন্দর চলা। অকৃত্রিমভাবের চলার art বড় কম art নয়। নর্তনক্রিয়ার মধ্যে, অভিনয়ের মধ্যে, সচরাচর চলা বলার থেকে অনেক বিষয়ে তফাত না করলে ভাল নাচ ভাল অভিনয় হয় না। কিন্তু এই দুই কলারই মূলমন্ত্র হল অকৃত্রিমতা অর্থাৎ ক্রিয়ার যান্ত্রিকতা লুকিয়ে চলা বলা। সব কর্মের সঙ্গেই তার নিষ্পদনের প্রক্রিয়া রয়েছে।

মনের মধ্যে যা রয়েছে নানা ক্রিয়া ধরে সেটা যতক্ষণ প্রকাশ না হচ্ছে ততক্ষণে সে মনেই আছে বাইরে নেই। ব্যাকরণের অভিধানের নানা ক্রিয়াকর্ম বিশেষ্য বিশেষণ ধরে মাসিকপত্রে মস্ত একটা সমালোচনা বা প্রবন্ধ বার হল, তবেই জানলেম অমুক লোকটা অমুকের উপর চটেছে বা খুশি আছে, কি এ লোকটা এই ভাবছে ও লোকটা তাই ভাবছে।

ছবিতেও রং রেখার কতকগুলো ক্রিয়া ধরে তবে চিত্রকরের মনের কথা বার হয়ে এল। রং রেখার একরকম ক্রিয়া করা গেল—ছবিটা হল landscape, অন্য প্রক্রিয়ায় হল portrait; আর এক রকমে রং রেখার ক্রিয়া করলেম, সেটা হল caricature,—এক ক্রিয়ার ছবি দেগে লোককে কাঁদানো গেল, অন্য রকমে লোককে হাসানো গেল। তবে এও দেখছি artist যা করলে দর্শকের উপর তার প্রতিক্রিয়া হলই না, কিংবা উল্টো হল; যেখানে হাসা উচিত সেখানে হয়তো দর্শক কাঁদলেন। প্রদর্শকের ক্রিয়ার অপকর্ষ কিংবা দর্শকের বুদ্ধির অভাবও এর কারণ হতে পারে। বিদ্যুৎ চালনা করলে একটা মরা মাছও দেখেছি চমকে উঠল, কিন্তু এক টুকরো পাথর সে সাড়াই দিলে না। সুতরাং পাত্রভেদে দর্শক শ্রোতা ও ভোক্তার ওপরে কলাসমূহের প্রতিক্রিয়া এক এক রকম হয়ে থাকে। এখানে যে ক্রিয়া করছে তার কোনো হাত নেই। তার দেখার বিষয় হচ্ছে যে কর্ম সে করলে তার উপযুক্ত ক্রিয়া সে আচরণ করলে কি না। কর্মের সুসম্পন্নতার দিকে চেয়েই শিল্পীর ক্রিয়া করে চলা। কর্মটা কার ভাল লাগবে কি মন্দ লাগবে এ লক্ষ্য রেখে চলা যারা হুকুমে কিছু করছে তাদেরই পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু ভিতরের তাগিদে যে মানুষ কর্ম করছে তার লক্ষ্য মনিব নয়—কর্মের সুচারুতার দিকেই তার দৃষ্টি। অন্য কর্মের কথা থাক, শিল্পকর্মের যে নানা ক্রিয়া তা কর্মভেদে শিল্পীকে অভ্যাসের দ্বারা এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষার দ্বারা দিনের পর দিন ধরে দখল করতে হল। এসব জিনিস হাতে-কলমে করে শিখতে হল। শিল্পশাস্ত্র ছন্দশাস্ত্র এমনি সব নানা পুঁথি পড়ে গেলেই কেউ কারিগরিতে পাকা হল না। করার অভ্যাসই কারিগরকে নিপুণ করে তুললে। পড়ার অভ্যাস শাস্ত্রপাঠে নিপুণ করে, করার অভ্যাস কর্মে দক্ষতা দেয়, এটা ভারি সত্য কথা। যে কাজে যে যখন মজবুত হতে চেয়েছে সে সেই কাজের নানা ক্রিয়া নিয়ে নাড়াচাড়া এমনকি খেলা করতে করতেও কর্ম সম্পাদনে পাকা হয়েছে। শিল্পশাস্ত্র পড়ে শাস্ত্রী এবং একখানা শাস্ত্র না পড়েও লোকে শিল্পী হয়ে উঠল এমন ঘটনা মানুষের ইতিহাসে বিরল নয়। ভাষা ও পুঁথির অক্ষর সৃষ্টি হবার পূর্বে গুহাবাসী মানুষ যেসব ছবি লিখলে এখানকার অনেকেই তেমন করে হরিণ মহিষ বাঘ এসব আঁকতে একেবারেই পারে না বলতে চাইনে, শুধু এইটুকু আশ্চর্যের বিষয় হয় যে প্রাচীনতম যুগের মানুষের হাতে শিল্পশাস্ত্র ছিল না অথচ তারা ভারে ভারে আশ্চর্য শিল্পসামগ্রী রেখে গেল পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের শিল্পশাস্ত্র লেখার কার্যের সুবিধার জন্য। আফ্রিকার নিরক্ষর বর্বরদের মূর্তিশিল্প অতি আশ্চর্য ও মনোহর বলে এখন ইউরোপে আদর পাচ্ছে বড় বড় শিল্পীর কাছে। কিন্তু সেইসব বর্বর জাতির মধ্য থেকে লিখিত শিল্পশাস্ত্র একখানিও পাওয়া যায়নি। তারা শিল্পক্রিয়া করে চলেছে মাত্র। মানুষের এই ক্রিয়াশীল নিরক্ষর অবস্থায় গড়া জিনিসের থেকে পরবর্তীকালের ভাষাবিদ কলাবিদ বসে বসে আদিম শিল্পের একটা শাস্ত্র রচনা করলে, অলিখিতকে লিখিতের মধ্যে ধরলে। এইভাবেই সব কালে সব দেশে শিল্পশাস্ত্র দেখা দিয়েছে। এখন আমাদের হাতে মূর্তিলক্ষণ চিত্রলক্ষণ বাস্তুশাস্ত্র এমনি নানা পুঁথি যা পড়ছে সেসব শাস্ত্রের অনেকখানি অংশ যা গড়া হয়ে গেছে, যা আঁকা হয়ে গেছে, যা লেখা হয়ে গেছে, গাওয়া হয়ে গেছে শাস্ত্র-ছাড়া অবস্থায় মানুষের দ্বারা—তারই লিখিত হিসেব। শিল্পকর্ম এল নানা ক্রিয়া ধরে, শাস্ত্র লেখা হল সেই ক্রিয়ার লক্ষণাদি ধরে। ধর্মপ্রচার পূজা

ইত্যাদি সুবিধার জন্য শাস্ত্রের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থামতো ক্রিয়া করে মানুষ যে যুগে প্রতিমা তাদের বাহন তাদের স্থাপন করতে মন্দিরাদি গড়ছে—সেটা অনেক পরের কথা। তার অনেক আগে মানুষ হাত তৈরি করেছে পাথর কেটে গড়া লাইন টেনে আঁকার প্রক্রিয়ায়। শিল্পব্রত আচরণ করতে অনেক পাকা হয়ে উঠেছে মানুষ যখন, তখন দেখি তার হাতের কৌশল পায়ের কৌশল এমনকি তার শিল্পবুদ্ধিও স্ব-ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সে লাগিয়েছে শাস্ত্রমতো ধর্মবিশেষের নয়তো রাজা বাদশার তাঁবেদারিতে। ধর্মপ্রচারের ইতিহাস দেখায়, আমাদের মূর্তিশিল্প কেমন করে এক ধর্ম থেকে আর এক ধর্মের সম্পর্কে এসে রূপ বদলে নিচ্ছে এবং আস্তে আস্তে ধর্মপ্রচারের পথ ধরে বিদেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং সেখানকার মূর্তিশিল্পের সঙ্গে বোঝাপড়া অদল-বদল ক্রিয়া ধরে নতুন নতুন সমস্ত রূপের সৃজন করছে। বৌদ্ধদের ত্রয়স্ত্রিংশ লোকের অধিবাসীরা হিন্দুদের তেত্রিশ কোটিতে এসে পরিণত হল, কিভাবে নানা লৌকিক দেবদেবী এসে ঢুকে পড়ল দেশবিদেশ থেকে ভারতীয় দেবসভায়—সে এক বিচিত্র মহাভারতের বিচিত্র ইতিহাস আবার দিগ্‌বিজয়ের দিক দিয়ে নানা দেশে লোকশিল্প সমস্তের যাতায়াত ও শিল্পক্রিয়া-প্রক্রিয়ার আদান-প্রদান—তারও ইতিহাস বড় ছোটখাটো নয়। আমাদের শিল্প ব্যাপারে এই আমদানি রপ্তানির খাতা পুরো লেখা হয়নি এখনো। শিল্পশাস্ত্র বলে যে পুঁথি রয়েছে আমাদের তার মধ্য থেকে একটু একটু আভাস পাই মূর্তিশিল্পকে কেমন করে এক ধর্ম থেকে জোর করে আর-এক ধর্মের দাসত্বের কাজে লাগানো হচ্ছে—"সলক্ষণং মর্তবিম্বং ন হি শ্রেয়স্করং সদা।" শিল্পশাস্ত্রের একথা থেকে বেশ বোঝা যায়— সুলক্ষণযুক্ত বুদ্ধমূর্তিকে চিরকালের মতো চেপে দিতে চেষ্টা হচ্ছে এবং বুদ্ধের ধ্যান উড়িয়ে অন্য দেবতার ধ্যান লেখা হচ্ছে। এইভাবে ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাত বিজিত ও বিজেতার ঘাত-প্রতিঘাত ও দেশ-বিদেশের সংমিশ্রণে ভারত-শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া যেভাবে হয়ে চলেছে তার ইতিহাস শিল্পের উপরে ছাপ রেখে গেছে আপনার।

ক্রিয়া ধরেই মানুষ বড় হয়েছে, নতুন নতুন সত্য আবিষ্কার করেছে এবং করে চলেছে এখনো। সেইসব পরীক্ষার হিসেব পুঁথির আকারে সময়ে সময়ে ধরে রাখতে চেয়ে লিখিয়ে তাঁরা লিখলেন পুঁথি—যেগুলো সংগ্রহ মাত্র, Encyclopedia বা Catalogue। সুতরাং পুঁথি যে লেখা হয়ে ঢুকেছে এমন কথা বলা যায় না। অনেক কিছু কথা যা এখনকার তা আজ থেকে শত শত বৎসরের পুরোনো পুঁথিতে থাকতে পারে না। এই ধরনের লেখাকে শিল্পশাস্ত্র কি আর কোনো শাস্ত্র বলে নাম দেওয়াই ভুল— Encyclopediaকে Gospel বলে ধরার মতো কাজ। সব জাতেরই মধ্য ধর্মশাস্ত্র এবং সেইসব ধর্মপালনের নিত্য-ক্রিয়াপদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু সেইসব ক্রিয়া যথালিখিত পালন করে কেউ ইন্দ্রত্ব কেউ বুদ্ধত্ব পেলে কি না, কি কারু জন্য সেন্ট-পিটার স্বর্গের চাবি সহজে খুলে দিলে কি না বা হুরীরা বেহেস্তের দ্বারে অপেক্ষা করলে কি না তা পরীক্ষা করে প্রমাণ করার উপায় নেই। কিন্তু শিল্প সঙ্গীত ইত্যাদি নানা শাস্ত্রের ক্রিয়াপদ্ধতি হাতে-কলমে পরীক্ষা করে ফলাফল জানবার উপায় আছে। তাতে করে দেখা যায় যে মানুষের অনেক অসম্পূর্ণ পরীক্ষার হিসেবে এইসব তথাকথিত শিল্পশাস্ত্রের অনেক অংশ ভর্তি এবং যেভাবে ক্রিয়া করে চলে যে ফল পাওয়া উচিত মানুষ তা পায় না। আবার দেখি যেসব পরীক্ষা রং রেখা সুর সার ছন্দোবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে মানুষ অনেক কাল আগে সম্পূর্ণ করে গেছে তার সমস্ত প্রক্রিয়ার হিসেব নানা শাস্ত্রে ধরা রয়েছে। যথাযথভাবে সেইসব ক্রিয়া পালন করে চলে পুরোপুরি ফলও পাচ্ছে তখনকার মতো এখনকার কর্মীরাও।

যেসব ক্রিয়া সুপরীক্ষিত না হয়েই শাস্ত্রের পুঁথিগুলোতে ধরা গেছে, তার বিষয়ে দীপক মেঘমল্লার গেয়ে জল আগুনের ক্রিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে। কতগুলো ক্রিয়া করে বৃষ্টি আনা যেতে পারে এই বিশ্বাসে খুব আদিম যুগে মানুষ পরীক্ষা শুরু করলে। ধারা ব্রত হতে থাকল, সাত তারা আঁকা জলের কলসী ফুটো করে করে আকাশ ফুটো করার রূপক ধরে একটা ক্রিয়া—এইভাবে পরীক্ষা চলল কত কাল এবং মেয়েদের মধ্যে এখনো চলছে। তারপর শুরু হল নতুন পরীক্ষা, যজ্ঞক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রকে খুশি করে জল আদায় এবং মেঘমল্লার গেয়ে বাদল আনা। এইসব পরীক্ষার ক্রিয়াকাণ্ডের হিসেব ভালমন্দ নির্বিশেষে শাস্ত্রের মধ্যে একটা একটা সময়ে ধরা হয়ে গেল এবং সেই শাস্ত্রনির্দেশমতো মানুষ ক্রিয়া করে চলল। পরীক্ষা কিন্তু সফলতার দিকেও গেল না, অথচ শাস্ত্রেও এই এই ক্রিয়াতে জল হল না বা মেঘ এল না একথা লেখা রইল না। কতক মানুষ অসম্পূর্ণ প্রচীন প্রথা ধরে ক্রিয়া করে চলল। কিন্তু সত্যি কারিগর কাজের মানুষ যারা তারা ক্রিয়া করেই চলল জল মেঘ আনার জন্য সঙ্গীতশাস্ত্র যজনক্রিয়া এবং মেয়েলী শাস্ত্রের অলিখিত ও লিখিত ক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রাস্তা ধরে। অল্পজান জলজান নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা থেকে ক্রিয়া শুরু হয়ে এই অল্পদিন হল সেই আদিম যুগের আকাশ ফুটো করে জল বর্ষানোর যে চিন্তা তার সঙ্গে গিয়ে মিলল। ক্রিয়াবান মানুষ নতুন ক্রিয়ার দ্বারা বালুকণাকে তড়িৎসঞ্চারে শক্তিমান করে সত্যই আকাশ ফুটো করে বৃষ্টি বর্ষালে। সেই পুরোনো যুগের পরীক্ষা আর আজকের যুগের পরীক্ষার মধ্যে মানুষের ভাবনা ও কামনাগত সাদৃশ্য সুস্পষ্ট হলেও দেখছি পুরোনো প্রক্রিয়াটা ব্যর্থ হয়েছে এবং নতুন ক্রিয়া তার নতুনত্ব নিয়ে তবেই সার্থকতা পেতে চলেছে। অতি প্রাচীন ক্রিয়াবান এবং অত্যন্ত নবীন ক্রিয়াবান এই দুয়ের ক্রিয়ার উপকরণ প্রকরণ, এমনকি ধ্যানটাও, একদিকে মিলল একদিকে মিলল না। আবার দীপক গেয়ে গেয়ে বহুকাল ধরা-গলা চিরেও কালোয়াত তার শাস্ত্রের বচনের সত্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু গান বাজনার দিক দিয়েও গেল না অথচ কারিগর মানুষ তারা নতুন ক্রিয়া নতুন পন্থা ধরে তারে ও বিনা-তারে আগুন জ্বালিয়ে চলেছে আমাদের চোখের সামনে। শাস্ত্রমতো যজ্ঞক্রিয়া সঙ্গীতপ্রকরণ ইত্যাদির দরকারই বোধ করছে না তারা এবং ওইসব শাস্ত্রমতো ক্রিয়া হল না বলে তাদের ক্রিয়া যে ব্যর্থ হচ্ছে তাও নয়। ক্রিয়াবান মানুষের শিল্প নানা ক্রিয়া ধরে যেমন যেমন এগিয়ে চলেছে, তারি অনুসরণ করে শিল্পশাস্ত্রকার তেমনি তেমনি হিসেবের খাতা লিখে চলেছে। পণ্ডিত শিল্পশাস্ত্র লিখে পড়িয়ে চলল। শিল্পী তারি উপদেশ অনুসারে যখন পড়তে ও লিখতে আরম্ভ করেছে সে কালটা আজ থেকে খুব দূরে নয়। কিন্তু এই টোলের পড়া বিদ্যে থেকে অনেক দূরে সেই কালটা যে কালে নানা অনুপদিষ্ট উপায় ও ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রিয়াবান সম্পূর্ণ করে তুলছেন কাজ, কিংবা অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখে নতুন পরীক্ষায় অগ্রসর হয়েছেন। ক্রিয়া থেকে নানা কলার উৎপত্তি হয়ে চলেছে যখন সেই সময়ে ক্রিয়ার সার্থকতার উপরে মানুষের জীবনযাত্রার অনেকখানি নির্ভর করত। কর্ষণক্রিয়া খননক্রিয়া থেকে হাঁড়িকুঁড়ি অস্ত্রশস্ত্র কাপড়-চোপড় সমস্তই করে তুলতে হত কাজে হাত পাকিয়ে; করে শিখত, পড়ে শিখত, না দেখে শিখত, ঠেকে শিখত নিজেরা। পরের দেখা পরের শোনা নিয়ে কাজের মানুষ হয়ে ওঠা, কিংবা পড়ে পাস করা এখন হয়েছে। তখন ক্রিয়া করে কাজের মানুষ হত, বই মুখস্থ করে নয়। কাজেই তখন শাস্ত্র ছিল না। এখন পড়ার যুগে পুঁথির দরকার হয়ে পড়ল; নানা কাজের নানা manual বা ক্রিয়াপদ্ধতির পর পর রচনা হতে থাকল।

শিল্পের ইতিহাসের আদি কথা শিল্পক্রিয়ার দ্বারা মানুষ শিল্পের নানা দিকের নানা সন্ধান নিয়ে চলেছে ভাঙতে গড়তে, মধ্য যুগের কথা নানা শাস্ত্রে নানা কথার সঙ্গে শিল্পের কথাও মানুষ যতটা পারছে লিখে লিখে সংগ্রহ করছে, এবং খুব আধুনিক কথা হচ্ছে যখন রাজাদের সভায় পণ্ডিত এবং কবি ও শিল্পী দুজনেই এসে পড়েছে এবং বিশেষ বিশেষ কলার উন্নতির বা অবনতির সূত্রপাত হচ্ছে লোকমতের গতি বশে। শিল্পীর অভিমতের উপরে এই সময় শাস্ত্রমত লোকমত প্রাধান্য লাভ করে এই ভাল এই মন্দ এমনি একটা করে গণ্ডি টেনে দিলে এবং শিল্পের ক্রমবিকাশের বিচিত্র গতি বন্ধ হয়ে জড়তা উপস্থিত হল শিল্পের ধারায়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ সব দেশের সব শিল্পের মধ্যে কিছু কিছু বর্তমান আছে। যে মূর্তি গড়বে সে একই ছাঁদে একই প্রক্রিয়ায় মূর্তি গড়ে চলল। পুরুষানুক্রমে একই জিনিসে বুদ্ধিবৃত্তি চালিত হতে হতে শিল্পীরা এ সময়ে একটা অত্যাশ্চর্য দক্ষতা পেলে এক-এক কলায়। কিন্তু এভাবে তো জগৎ চলে না। স্থিরতা যেখানে নেই, যাদের জন্য বহুকাল ধরে শিল্পী হাত পাকালে কাজে তারা কোথায় চলে গেল, তার জায়গায় হঠাৎ-নবাব শাস্ত্রঘাঁটা রসিক এবং পুঁথি ধরে ব্যবস্থা এল দেশে। তখন কবিতা গণেশ-বন্দনা এবং রাজ-প্রশস্তি এই দুই জাঁতিকলের মধ্যে পেষা হয়ে শুকনো ছাতু হয়ে গেল এমন যে মানুষের কাজে এল না—সরস্বতী পোকার পেট ভরাবার কাজেই লাগল। ছবি মূর্তি এরাও রইল নোড়ানুড়ি চুন সুরকির কাজ করে দেবায়তন রাজপ্রাসাদ এমনি সব বড় বড় কারাগারের প্রকাণ্ড প্রকার খাড়া করে তুলতে এবং রসের শতমুখী ধারার ক্রিয়া ও ক্রীড়ার মুখে ভীষণ শক্ত বাঁধ বাঁধতে। এই নিরেট বাঁধ যদি কোনোদিন ভাঙল তো রস আবার ছুটল, নয়তো নিষ্ক্রিয় শিল্পকুণ্ডের জলের মতো কিছুদিন থাকল এবং অবশেষে একদিন শুকিয়ে গেল,—কেবল বাঁধগুলো পড়ে রইল একফোঁটা রসের শোচনীয় অবসানের সাক্ষী দিয়ে।

দেশের বিদেশের কলাবিদ্যাসমূহের এমন এক-একটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থার দেখা পাওয়া যাচ্ছে যখন কারিগর বেঁচে আছে, কিন্তু আর্ট কোথাও নেই দেশে। আর্টের দিক দিয়ে অনুর্বর ক্ষেত্রে খরার দিনের মধ্য দিয়ে চলা কোনো জাতিই এড়াতে পারেনি। এই রসহীনতার মধ্যে ক্রিয়া করে চলার শ্রান্তি সব জাতির সব আর্টিস্টদের কাজের উপরে সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে দেখতে পাই, আরো দেখি যখন আর্ট বর্তমান নেই জাতির মধ্যে তখনই জাগছে তার প্রাণে যা ছিল তার জন্য বেদনা এবং যা আসার সম্ভব ভবিষ্যতে তার জন্যে বিষম তৃষ্ণা! যারা ক্রিয়াবান তারা ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান তিনের মধ্য দিয়ে ক্রিয়া করে চলে, যারা তা নয় কিন্তু কিছু করতেও চায় তারা হয় ভূত নয় ভবিষ্যৎ এমনি একটা কিছুতে গ্রস্ত হয়ে থাকে। নতুন এল, পুরোনো কেউ জায়গা আটকে বসল না, নতুনকে বড় হবার দিকে অগ্রসর করে দিলে—এইটেই হল স্বভাবের নিয়ম, এ যেন কত কালের আসবাব আবর্জনায় ঠাসা পুরোনো বাড়িতে নতুন ছেলেরা জন্ম নিয়ে ক্রীড়া শুরু করে দিলে। সেকালের খেলনা একালের ছেলের খেলবার কাজে এল,—ছেলে ভাঙলে অনেক জিনিস কিন্তু এই ভাঙাচোরার মধ্য দিয়া ক্রিয়া ও ক্রীড়া শুরু হয়ে গেল। পুরোনোর কোলে নতুনের লীলা এটা প্রাচীন গম্ভীর লোকদের না-পছন্দের ব্যাপার, কেননা একালটাকেও সেকাল হিসেবে না দেখতে পেলে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে, চারিদিকের বাঁধা দস্তুরের মধ্যে ওলট-পালট অশান্তি এলে তাদের অসোয়াস্তির সীমা থাকে না, এইজন্য নতুনের ক্রিয়ার সঙ্গে পুরাতনের ক্রিয়ার কোনো কোনো স্থলে একটা সংঘাত বাধে এবং হঠাৎ যদি সেকালে মূল্যবান অথচ একালে একেবারেই অকেজো এমন কিছু জিনিস নতুন মানুষ খেলার মুখে ভেঙে চুরমার করে দেয় তবে পুরাতনের কাছে সে কানমলা গালাগালি খেয়ে মরে। কিন্তু ক্রিয়া এবং

ক্রীড়া দুয়েরই একটা লক্ষণ হল নড়াচড়া ও সজীবতা, সে ভেঙে গড়ে—ঠিক যেভাবে গতিহীন সোজা দাঁড়িকে গতি দেয় artist ভঙ্গি বা ভঙ্গ দিয়ে; নতুন জাতির জীবন তার সমস্ত ক্রিয়াপ্রবণতা ও ক্রীড়াশীলতা এইভাবে নিয়োগ করে নিষ্ক্রিয়তাকে ভেঙে ক্রিয়াশীল ক্রীড়াশীল করে তুলতে। যারা এত বড় যে শাস্ত্রের নিষেধ-বিধির উপরে চলে গেছে এবং যারা এত ছোট যে শাস্ত্রের বাইরে পড়ে গেছে—এদের দুজনের জন্যই শাস্ত্র নয়, যারা মাঝারি রকম মানুষ কেবল তাদেরই জন্য শাস্ত্র। এই শাস্ত্র ধরে গড়ে চললে তারা ভাল জিনিসের অনুকরণ করে ক্রমে হয়তো পাকা হয়ে উঠবে—এইজন্যই শিল্পের আইন-বাঁধা ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে মানুষ, ভবিষ্যতের ক্রমবিকাশের পথে কাঁটার বেড়া হিসেবে শাস্ত্র গড়া হয়নি। ধর্মশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সঙ্গীত, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র কারো কাঁটারোপণ কাজ নয়, চলার পথ নিষ্কণ্টক ও সহজ করে দিতেই শিল্পশাস্ত্রের সৃষ্টি। যে কিছু জানে না তাকে জানার পথে অগ্রসর করে দেওয়াই শাস্ত্রের লক্ষ্য। শাস্ত্রের একটা মানে যদিও শাসনে রাখা বোঝায়, তবু শাসনের প্রয়োগ স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে রকম রকম না হলে মানুষ শাসনের বিরুদ্ধে আচরণ করবেই। শাস্ত্রকারেরা একথা যে ভাবেননি তা নয়, অন্য শাস্ত্রের ফাঁকি কোথায় কি তা আমি জানিনে, শিল্পশাস্ত্রের শাসনে অনেকখানি ফাঁক আছে— "লেখ্যা লেপ্যা সৈকতী চ মৃন্ময়ী পৈষ্টিকী তথা। এতাসাং লক্ষণাভাবে ন কশ্চিৎ দোষ ঈরিতঃ॥"[২]

প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের শাসন এখন যদি মানতে হয় তো যেমনটি লেখা আছে তেমনি ভাবেই। এখনকার গাইয়ে বাজিয়ে কাব্যকার চিত্রকর সবাইকে ক্রিয়া করে চলে যেতে হয় প্রাচীন পথে, নতুন কিছু করার উপায় নেই। বর্তমানকে উজান বইয়ে অতীতের দিকে নিয়ে অতীতের মধ্যে কি ছিল তা জেনে চলা হল শিল্পীর শিক্ষার একটা দিক, তার পরে হল বর্তমানে চারিদিকে দেশ-বিদেশে কোথায় কি রয়েছে জেনে নেওয়া বা যাকে বলি পরখ করে গ্রহণ করে চলা, তারপরে হল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে ক্রিয়া করে চলা নিজের প্রথামতো; —আসল কথা চলা চাই চালানো চাই, না হলেই মুশকিল। ঠিক যেভাবে প্রপৌত্র তার প্রপিতামহের কতক এবং তার ভবিষ্যৎ বংশাবলীর খানিক জড়িয়ে নিয়ে চলে, এইভাবে চলা হল শিল্পই বলো আর যে কাজই বলো তার স্বাভাবিক গতি। এক কালের নতুন সে খানিকটা ক্রিয়াচক্র চালিয়ে থামল, আর এক নতুন সেখান থেকে ক্রিয়া শুরু করলে এবং অন্য নতুনের হাতে কাজ দিয়ে ক্ষান্ত হল,—এইভাবে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের মধ্যে ক্রিয়াপ্রবাহ চলল অবিচ্ছিন্নভাবে। গঙ্গার ধারায় কোথাও চড়া পড়ল না তবেই ধারা সরতে পেলে, কোথাও দুর্গমও হল না আবিল হল না আবর্জনায়। এক সময়ে দেবমূর্তির একটা বাজার সৃষ্টি হয়েছিল এদেশে, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার, শিল্পকর্মের প্রসার ছিল গৌণ; সুতরাং সেই কাজের উপযোগী মূর্তির মান-প্রমাণ-লক্ষণাদি দিয়ে শাস্ত্র বাঁধা হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের মূর্তিশিল্প ধ্যানযোগের সম্পূর্ণ সিদ্ধির উপায় ধরে একটা যে ছাপ পেলে সেটা সাময়িক ছাপ এবং বাঁধা দস্তুরের ক্রিয়ার ছাপ। চীন দেশে এক সময়ে মানুষের পা এইভাবে কড়া হুকুমে খুব ছোট করে তার স্বাভাবিক বাড় নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। চীনের সৌন্দর্যশাস্ত্রে এবং আমাদের এখনকার তথাকথিত "বিপশ্চিতাম্ মতম্"-এর মধ্যে ভয়ঙ্কর রকমের একটা মিল রয়েছে,—জীবন্ত জিনিসকে স্বাভাবিক বাড় থেকে বঞ্চিত করে শাসনের বলে একটা কৃত্রিম রূপ দেওয়ায়। কিন্তু চীনের শাসন ও সেকালে শিল্পশাস্ত্রের শাসন এই দুয়ের মধ্যে নিয়মের চাপের কষণের ইতর-বিশেষ হওয়ার দরুন আমাদের মূর্তিশিল্প একটা সুন্দর ছাঁদ পেলে, চীনের পদপল্লব বেঁকে চুরে একটা বীভৎস রূপ ধরলে। শাস্ত্রের নিয়ম যেখানে স্বভাবের নিয়ম ধরে বাঁধা সেখানে সে অনেকখানি বিস্তার দিলে শিল্পের

গতিবিধিকে অব্যাহতভাবে চলতে,কিন্তু স্বভাবকে অতিক্রম করে যেখানে কঠোর নিয়ম গড়া হল সেখানে কৃত্রিমতা কদর্যতাই গড়ে উঠল। দেবমূর্তির ব্যবসা খুলতে যখন নানা আইনে শিল্পীদের কঠিন বাঁধন পরানো হয়েছিল, ভারতবর্ষের মূর্তিশিল্প তখন একদিকে যেমন এক বিষয়ে প্রাচুর্যলাভ করলে অন্য দিকে তেমনিই খোঁড়া হয়ে রইল; কেবল ঠাকুর গড়তেই পাকা হল মানুষ এবং তাও ক্রমে দাঁড়াল গিয়ে পুঁথির লেখা মাপজোখে ঠিকঠাক করে কোঁদা ঠাকুরে যার মধ্যে দেবচক্ষু ইত্যাদি সবই থাকল—অমরত্বটুকু ছাড়া। পাথরের কাজে পরলোকের অবিচিত্র ছায়াই পড়ল, ইহলোকের বিচিত্রতা নয়, এবং আমাদের দেশে সব পাথরগুলো অবস্তু হয়ে উঠল একটাও বস্তু রইল না। শিল্পের হিসেবে এটা একেবারেই ভাল নয়। এই দুর্দৈব শিল্পে আসবেই কড়া আইন হলে এটা যেন শাস্ত্রকারেরা দেখেছিলেন, তাই তাঁরা শিল্প সম্বন্ধে আইনের বজ্র আঁটুনির মাঝে নানান ফস্কা গেরো রেখে গেলেন যার গুণে শিল্পের বাঁধা গতি বাঁধা জিনিসের দুর্গতি থেকে বেঁচে গেল। ভারতবর্ষের বাইরে নানা ধর্ম নানা কালে শাস্ত্রীয় মূর্তি সমস্তের রচনা পদ্ধতি দিয়ে শিল্পী ও শিল্পকে বেঁধেছে অনেক স্থানে। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে সেখানে যেখানে শিল্প একটা দেবমূর্তির বৈরূপ্যমাত্র হয়ে উঠেছে। আমাদের মূর্তিশিল্প যে এ দুর্গতি থেকে বেঁচে গেছে তার একটা কারণ শিল্পরচনারও ভার একদল নিরক্ষর artistএর হাতে ছিল যারা ক্রিয়াবান, এবং জোর করে তাদের শাস্ত্র গেলানো হয়নি। এদেশে এখনো পাকা কারিগর পাবে কিন্তু তাদের মধ্যে শিল্পশাস্ত্রজ্ঞানে একেবারে পাকা এমন লোক একজনও আছে কি না সন্দেহ। শিল্পশাস্ত্রের শাসন কি তারা অনেকেই জানে না অথচ দিব্য গড়ে চলেছে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত এবং অর্জিত শিল্পজ্ঞান নিয়ে নানা বস্তু! এদেশে শিল্পশাস্ত্র যা পাওয়া যাচ্ছে তা রাজ-রাজড়ার পুস্তকাগারে, নয়তো পণ্ডিতদের ঘরে,—শাস্ত্রে অপণ্ডিত কিন্তু শিল্পক্রিয়াতে সম্পূর্ণ পারগ শিল্পীদের পুঁথি ক্বচিৎ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং শাস্ত্র যে খুব একটা বড় জায়গা পেয়েছিল শিল্পীদের ঘরে তা বোধ হয় না, শুধু সিন্দূর-চন্দনে পূজা পেয়েছিল। শোনা শাস্ত্র কতক এবং বংশানুক্রমে ক্রিয়া করে দখল-করা কলাবিদ্যা অনেকখানি, এই নিয়ে ভারত-শিল্প গড়ে উঠেছে, এটা দুঃখের কারণ নয় সুখের বিষয় বলতে হয়। শাস্ত্রের চাপ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেনি, তা থেকে বেঁচে গেছে এদেশের শিল্পীরা কাজের দিক দিয়ে শুধু তারা নিরক্ষর ছিল বলে। এখন আমরা, যারা পড়ে শুনে পাকা হয়ে শিল্পক্রিয়া করতে চলেছি, সেকাল যদি হঠাৎ একালে ফিরে আসে তবে শাস্ত্রের চাপন আমাদের উপর অনিবার্য। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা নির্ভয় যে স্বভাবের নিয়মে সেকাল একালের ত্রিসীমানায় আসতে পারে না, এলেও সজীব একালের পৃথিবীতে গতজীবন সেকালটা যদি ভূতের উপদ্রব বাধায় তো একাল সেটা সইতে নারাজ হবেই একদিন। সেকালের সঙ্গে একালের শিল্পের যোগ শিল্পশাস্ত্র পড়াশুনার দিক দিয়ে যেরূপটা হওয়া স্বাভাবিক তাই হবে এইটেই আমার ধারণা; বৌদ্ধযুগে এবং তারপরেও দেখা যায় ধর্মে শ্রদ্ধাবান শিল্পশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং শিল্পক্রিয়াতেও নিপুণ ধর্মযাজকগণ ভারতবর্ষের বাইরে নানা ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচার ও সেই সঙ্গে শিল্পপ্রচারও করেছেন। ধর্মের অনুশাসন তাঁরা স্থানে স্থানে কঠিনভাবে প্রয়োগ করেছেন সেইসব অন্যব্রতগণের উপরে কিন্তু শিল্পশাস্ত্রের নিয়মগুলো ঢিলে করে দিয়েছেন দেশে দেশে। শিল্পের দেশীয়তার সঙ্গে শাস্ত্রমতে বিশুদ্ধ শিল্পের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন—কোন বাধা দেননি সে পথে। সেকালের তাঁরা পণ্ডিত ছিলেন শাস্ত্র ও শিল্পে, কাজেই কালে-কালে দেশে দেশে একই শিল্পের পুনরাবৃত্তি যে একেবারেই দোষ, বিচিত্রতাই যে শিল্পের মূল কথা, সেটা তাঁরা ভাল রকমই জানতেন। একালের ইউরোপীয় শিল্পের নিয়ম ও লক্ষণাদির সঙ্গে আমাদের art studentদের যখন মিলন হল তখন নিজেদের শিল্পের জ্ঞান ছিলই না তাদের মধ্যে, সুতরাং

ইউরোপের শিল্প imposed হতে চলল এদেশে, মিলন সার্থক হল শোভন হল না। তেমনি সেকালের শিল্পশাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা যদি একালে imposed হয় তবে সে কার্যটা অশোভনতা এবং কৃত্রিমতারই সৃষ্টি করবে। এরূপ impositionএর বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিকটায় অনেক যুদ্ধ চলেছে। চলছে, সুতরাং শিল্পেও সেকালে একালে যে স্বাভাবিক যোগ না ঘটিয়ে imposition ঘটালে বিপত্তির সম্ভাবনা তা সব দিক দিয়েই দেখতে পাচ্ছি। প্রাচীন ভারত-শিল্প শিল্পশাস্ত্র সমস্তই আমাদের এবং সেটা খুব বড় বলে যতই মনে করি না, সিন্দবাদের বুড়োর মতো কেবল তাকেই ঘাড়ে করে বইতে নতুন ভারতে সবাই এলেম—কবি শিল্পী গায়ক বাদক এমনকি পণ্ডিতেরাও—এটা ভাবাই স্বাভাবিক অবস্থার কাজ নয়। সেকাল একালের মধ্যে মিলে নবীনতার সৃজন করবে, গাছের পুরোনো বীজটা নতুন জীবন-রসে মিলে নতুন বীজের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে যেভাবে সেইভাবে সেকাল এগিয়ে চলবে একালের ক্রিয়ার ছন্দ ধরে ভবিষ্যৎকালের সফলতার দিকে,—এ না হলেই বিপদ। গাছটা তার পুরোনো বীজের খোলার মধ্য গিয়ে ঢুকে পড়ল কিংবা পুরোনো বীজ আপনাকে গাছের ছাঁদে মেলাতে না চেয়ে গাছের ঘাড় মটকে মাটির মধ্য টেনে নিয়ে চলল, দুজনেই আপনার মৃত্যু ডেকে আনলে। শিল্পের গতি কালে কালে নতুন নতুন শিল্পীর মতি ধরে চলেছে, কোনো এক কালের বা এক শাস্ত্রের মত ধরে চলেনি, চলতে পারে না। শিল্পশাস্ত্রমতো গড়ে সেকালে তারা ভাল গড়েছে সুতরাং আমরা একালেও সেই প্রাচীন মত ধরে গড়লে ভালই গড়ব এই কথাই স্থির জেনে যদিই বা ক্রিয়া করে চলি তবে সেকালের অনুকরণের কাজ ছাড়া কিছু বেশি গড়ব বলে মনে তো হয় না। আমাদের একালের তথাকথিত কালোয়াত, তারা এটা প্রমাণ করছে। একালের শিক্ষা-সমস্যায় সেকালের টোলের পণ্ডিতের ব্যবস্থার কতকটা স্থান আছে সত্যি কিন্তু টোলের শিক্ষাব্যবস্থা ও কাজ চালানোর ধারাকে একালের শিক্ষা-সমস্যার সবখানি মেটাতে দিলে টোলও বিপদে পড়বে, বিশ্ববিদ্যালয়ও বিপদে পড়বে। আজ আমরা ঠিক শাস্ত্রমতো যদি কেউ মূর্তি গড়া শিখতে চাই তবে কিছুকাল আমাদের মূর্তি গড়া থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে; কেননা শাস্ত্র লিখেছে—রাজা গেছেন পণ্ডিতের কাছে মূর্তি গড়বার উপদেশ নিতে। রাজা বললেন—মূর্তি গড়ার উপদেশ করুন। পণ্ডিত বললেন—চিত্রসূত্র থেকে ছবি আঁকার সম্বন্ধে আগে জান তো বুঝবে চিত্রকল্পে মূর্তি গড়ার উপদেশ যা আছে। রাজা চিত্রসূত্রই আগে জানতে চাইলেন পণ্ডিত তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, নৃত্যসূত্র না জানলে চিত্রসূত্র জানাই হবে না। রাজা নিরুপায়, নৃত্যসূত্রই মঞ্জুর করলেন। পণ্ডিত আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, বাদনসূত্র না জানলে নৃত্যসূত্রের খেইটা ধরাই যাবে না। রাজা বললেন, তবে বাদনই চলুক। তখন পণ্ডিত গায়নের কথা তুললেন। ঠিকঠাক শাস্ত্রমতো মূর্তিগড়া শিখতে হলে গান থেকে আরম্ভ করে বাজনা নাচ ছবি আঁকা ও শেষ মূর্তি গড়াতে গিয়ে তারপর পাকা হতে হবে কাজে! আমাদের দেশে যেমন শিল্পশাস্ত্রকার তেমনি ইউরোপেও Siluvius একখানা বাস্তুশাস্ত্র লিখেছেন বহুদিন আগে, দেউলী হতে হলে মানুষটাকে কি-কি বিষয়ে পাকা হওয়া চাই তার তালিকা দিলেন—a knowledge of letters, of Drawing, of Geometry, of Arithmetic, of Optics বেশ কথা, of History, of Natural and Moral Philosophy, of Jurisprudence, of Medicine, of Astrology,of Music and so on;—এর পরে যে সত্যই কিছু গড়তে আঁকতে এককথায় কিছু করতে চায় সে কি বলবে না, 'Everything is worth knowing; learn the art and lay it aside?'

রসায়নশাস্ত্রে জল গ্যাস এসব তৈরির প্রক্রিয়া বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে সুনিশ্চিত হয়ে তবে পুঁথির মধ্যে মানুষ প্রক্রিয়ার হিসেবটা ধরলে। বই পড়ে সেই ক্রিয়া কর ঠিকঠাক ফল নিশ্চয় পাবে। কিন্তু শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ ও মান-পরিমাণমতো মূর্তি গড়লে পাথর দেবতাই হবে যে তা নয়, আট-দশ হাত মনুষ্যেতর ব্যাপারও হতে পারে। ছন্দশাস্ত্রমতো ঠিকঠাক ছন্দ-বাঁধা জিনিস সব সময়ে কবিতা হয় না, ঠিকঠাক সা-র-গ-ম দোরস্ত জিনিস সব সময়ে সঙ্গীতও হয় না,—এর প্রমাণ হাতে-হাতে পাই। ইতিহাস পুরাণ রূপক ইত্যাদির দিক দিয়ে লাট কর্জনের মতে আমাদের দেবমূর্তির সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই আমাদের দেবতার অথচ তাঁর কাছে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সবাই মনুষ্যেতর বীভৎস কিছু। শিল্পশাস্ত্রের নিছক আইনে বলে মূর্তিগুলোর মধ্যে দেবত্ব যে আসেনি তা আইনের পিছনে থাকে বলে। Mythology, Symbolism, মুদ্রা, রূপক ইত্যাদি এমনি সব জিনিসের শক্তি অনেকখানি কাজ করে, তবে শাস্ত্রবিধিমতো কাটা পাথরকে এ-দেবতা সে-দেবতা বলে প্রতিপন্ন করছে এটা ঠিক! মর্ত্যভূমির অনেকখানি জড়িয়ে আছে বলেই এইসব মূর্তি আমাদের কাছে সুন্দর ঠেকে। আর্টে নিছক দেবতা হতে পারে না—নরদেব পর্যন্ত আর্টের গতি,—এইটে আমার ধারণা। অবশ্য লাট কর্জনের মতো রূপক ইত্যাদির জ্ঞান ও সেই সঙ্গে রসজ্ঞানেরও যার অভাব তার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ঈজিপ্টের রাজাদের মূর্তি রাজার নাম রাজার ইতিহাস, এসবের অপেক্ষা না রেখে স্বাধীনভাবেই রসিকের কাছে আপনার নরদেবত্ব প্রমাণ করছে; এবং বুদ্ধমূর্তি নটরাজমূর্তি কপিলমূর্তি এমনি অসংখ্য মূর্তি এদেশে রয়েছে যা পুরাণের রূপক ছেড়েও নিজের মহিমা নিজের রূপ দিয়ে প্রচার করছে; সেইসব মূর্তি হচ্ছে শিল্পীর কাছে অলিখিত যে শিল্পশাস্ত্র তার বিধিনিয়ম ও প্রক্রিয়ার ফল, হাজার বছর ধরে শিল্পশাস্ত্রমতো গড়ে চললেও এ জিনিস পাওয়া শক্ত, কেবল তারাই পেয়েছে যারা মনের মধ্যে মনের আকাশে নিজের মনের মধ্যের মানসদেবতাকে ক্রিয়ার দ্বারায় বশ করতে শিখেছে অনেক সাধনা অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। বাঁধা-ধরা যোগশাস্ত্র পড়িয়ে যোগী সৃষ্টি করা যায় না, বাঁধা-ধরা ছন্দ নিয়ে সুর নিয়ে কবিতা বা সুরকে ধরে আনা যায় না—তা যদি হত তো ভাবনা ছিল না। যে কবিতা ছিল কালিদাসের আমলে, ছন্দশাস্ত্রমতো তারি পুনরাবৃত্তি চলত, তাহলে সাহিত্যসেবার দরকারই হত না আজকের মানুষের; শাস্ত্রের তথাকথিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া ধরে ছবি হত কবিতা হত গান হত প্রস্তুত ঠিক কালিদাসের মতো তানসেনের মতো দেবী চিত্রলেখার মতো। কিন্তু সৌভাগ্য যে এটা ঘটা সম্ভব হল না, শিল্পীর intention বা ধ্যান তারি অনুপাতে ক্রিয়া চলল, কর্মের ভাবভঙ্গি মান-পরিমাণ সব সেই intention ও তার ক্রিয়াবশে হল,—জিনিসটা দেবতার ছাঁদ পেলে কি মানুষের ছাঁদ পেলে,নবতাল হল কি দশতাল হল। দেবতা হলেই নবতাল, নর হলেই অষ্টতাল ইত্যাদি শাস্ত্রের বাঁধা যে নিয়ম intention ও তার ক্রিয়ার বশে কাজ করে, সে নিয়ম শিল্পী মাত্রেই ভাঙলে বদলালে, প্রাচীন ভারত-শিল্পের ইতিহাস থেকেও এটা সপ্রমাণ করা শক্ত নয়, একালে তো এটা নিত্য ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। নিছক শিল্পক্রিয়া থেকেই ঠিকঠাক ছন্দ সুর ছাঁদ বাঁধ সমস্তই বেরিয়েছে একদিন একথা যদি অস্বীকার করি তবে শাস্ত্রকেও অস্বীকার করা হয়, কেননা শাস্ত্রই বলেছেন—ব্রহ্মা অদ্ভুত সমস্ত যা তার দেবতা, তাঁর থেকে সুর এসেছে ছন্দ এসেছে সৃষ্টি এসেছে—তিনি কোনো বাঁধা শাস্ত্র দেখে সৃষ্টিক্রিয়া করে চলেননি। যে নিয়মে শিল্পী সুরূপ কুরূপ গড়ে—কিংবা সুভাব কুভাব দেবভাব মানুষভাব রাক্ষসভাব আসে কাজে, তার প্রক্রিয়া ও হিসেব সম্পূর্ণভাবে শিল্পীর নিজস্ব জিনিস—শাস্ত্রের মধ্যে তার হিসেব ধরা নেই। মূর্তির আধ্যাত্মিকতা শাস্ত্রে লেখা মাপজোখ নিয়ে ধরা যায় না, শিল্পীর আত্মায় তার

ব্যক্ত করার হিসেবের পুঁথিটা লুকানো আছে—সেই পুঁথি অনুসারে ক্রিয়া করে চলে শিল্পী নানা কাণ্ড বাধিয়ে যায় যার হিসেব শুধু ক্রিয়াবানদের কাছেই ধরা পড়ে।

টীকা

১. ৪|৪০৭ শুক্রাচার্যকৃত শুক্রনীতিসার
২. ৪|৪৭২-৭৩ ঐ ঐ।

শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভাল মন্দ

কথা বলা আর কথা শোনা, ভাত রাঁধা আর ভাত খাওয়া, বাসা বাঁধা আর বাসা ভাড়া নেওয়া, গাড়ি চালানো আর গাড়ি চড়া, ছবি দেখা ও ছবি লেখা,—একদিকে রইল সামগ্রীটার উপভোগ, আর একদিকে রইল ভোগ করবার বস্তুটির প্রস্তুতকরণের প্রকরণ। প্রকরণের সঙ্গে আর্টিস্টের যোগ, আর যা করা হল তার উপভোগের সঙ্গে যোগ হল দর্শকের শ্রোতার এককথায় ভোক্তার। এ যেন একজন নানা উপায়ে উপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে ধরছে, আর-একজন সেটা রয়ে বসে ভোগ করে চলেছে—মালি যেন ফুল ফুটিয়ে ধরছে বাগানের মালিকের সামনে। মালাকর মালা গেঁথেই চলল—পরের সঙ্গে অপরের মিলনের মালা; গাঁথুনীর কৌশল ফুলের পাশে ফুলকে ধরার প্রক্রিয়ার মধ্যে যে আনন্দ সেইটুকু পেলে মালাকর, আর যারা দুজনে সেই মালায় একের পাশে আরেকে চিরকালের মতো ধরা পড়ে গেল তারা পেল আরেক জিনিস। যা নিজের মালিনীকে পরানো চলল না, নিজের ঘরেও ধরে রাখা চলল না—পরের জন্যই যার সবখানি এমন যে মালা সে মালা সুকৌশলে গেঁথে চলার কাজ নিয়ে মালাকর কেমন করে দিন কাটায় যদি না গাঁথনী করে চলার মধ্যেই মালাকরের সকল আনন্দ লুকোনো থাকে? যারা আর্টিস্ট, প্রকরণের সফলতা লাভের তপস্যা তাদের করতেই হয়। কিন্তু এই তপস্যায় যদি কেবলি কঠোর তপ থাকত অথচ সঙ্গে সঙ্গে কার্য করার আনন্দ না থাকত, তবে যেমন-তেমন করেই কাজ সারতে চাইত সবাই, আর তাদের কাজগুলো কলে-প্রস্তুত জিনিসের মতো কাজ দিত, কিন্তু আনন্দ দিত না। নিয়ম ও প্রকরণ এবং তার কঠোরতাই ফোটে নির্মমভাবে কলের কাজে, আর মানুষের আর্টে অনিয়ন্ত্রিত আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ এসে লাগে। আর্টের প্রকরণগুলোতে আনন্দ না মিশলে আর্ট হত ফটোগ্রাফের মতো অসম্পূর্ণ জিনিস। "There is fascination in the technical side of art without which artists would stop short so soon as the excitement he experienced on first tackling his subject has subsided, and our picture galleries would be full of sketches."

ছবির বেলাতে যে কথা কবির বেলাতেও ঐ কথা, গায়ক বাদক পাচক চালক নর্তক সবার বেলাতেই এই কথাই কথা। হাত উঠছে পড়ছে—ঠিক রঙে ঠিক রং মিলিয়ে তালে তালে—এতে একটা আনন্দ বোধ করে শরীর ও মন আর্টিস্টের। নেচে যে আনন্দ বোধ করে না সে নাচতেই পারে না ভাল করে। মন চলল দুলে শরীর চলল তালে তালে, শরীর-মনের এই যে আনন্দের মিলন এই হল আর্টের প্রকরণের চরম সাধনা। Sketch যেমন সম্পূর্ণ ছবি নয়, নিরানন্দ প্রকরণও তেমনি পরিপূর্ণ নয় অসম্পূর্ণ। Sketch যেখানে খসড়া মাত্র দিয়ে খালাস সেখানে তার মধ্যে শুধু তাড়া থাকে, একটা দৃশ্য কি একটি জিনিস তাড়াতাড়ি কাগজে উঠিয়ে কিংবা বলে দিয়েই খালাস। এই ভাবের sketchগুলি স্কুলে ছেলের নোট বই যে কাজ দেয় ঠিক সেই কাজই দেয়। এই sketch আর্টিস্টের কাজে লাগে ব্যাপারটা শুধু মনে পড়িয়ে দিতে; ফটোগ্রাফও অনেক সময় এ কাজটা সহজে সম্পন্ন করে কিন্তু যে sketch করার মধ্যে artistএর আনন্দ ধরা থাকে তার ধরন স্বতন্ত্র।

ছোট গল্পের মতো ছোট ও সামান্য হলেও সেটা সম্পূর্ণ জিনিস এবং সেটা লিখতে অনেকখানি art চাই। ছোট হলেও ছোট গল্প হয় না, একটুখানি টান দিয়ে অনেকখানি বলা বা বেশ করে কিছু ফুলিয়ে বলার কৌশল শক্ত ব্যাপার। Artist কেন সে শ্রম স্বীকার করতে চায় তার একমাত্র কারণ বলবার এই যে, নানা কারিগরি—তাতে আনন্দ আছে। ফস্ করে বলা হয়ে গেল, যেমন-তেমন করে বলা হয়ে গেল, এতে আর্টিস্টের আনন্দ নেই। মৃগয়া করতে গিয়ে যদি মৃগ এসে আপনিই ধরা দিলে তো শিকারীর আনন্দ একটুও হল না; যারা সঙ্গের সাধারণ লোক তারাই বিনা পরিশ্রমে পড়ে-পাওয়া মৃগমাংস পেট ভরে খেয়ে আনন্দ করলে। শিকারী তেমন জিনিস পরিবেশন করে সুখ পায় না যা বিনা ফাঁদে ধরা হল। সঙ্গীতের চিত্রের কাব্যের সব শিল্পীরই প্রকরণের দিকটায় খাটুনি আছে—ভাব ও রসকে ফাঁদে-ধরার ছাঁদে-বাঁধার খাটুনি। কিন্তু সে কলের মতো খাটুনি নয়, কলের কুলির মতো নিরানন্দ খাটুনি নয়। শিশু লালন-পালনের মধ্যে দুঃখ ও খাটুনির দিক একটা আছে কিন্তু সেই খাটুনিতেই আনন্দ। যতনের খাটুনি অযতনের খাটুনি দুয়ের ফল হল তফাত, মায়ের খাটুনি আর ধাইয়ের খাটুনির মধ্যে ভারি প্রভেদ দেখা যায়। শিল্পসামগ্রী গঠনের উপর খাটা কিভাবে হল তার ছাপ পড়ে। যেখানে আর্টিস্ট যতন দিয়ে গড়লে সেটি যতনের জিনিস হয়ে প্রকাশ পেল। আর যেখানে সে যত্ন নিলে না গড়তে, শুধু খেটেখুটে কাজ উদ্ধার করলে সেখানে গড়নটাও বিশ্রী হয়ে রইল। সেদিন দেখলেম আমার নাতনীটি একটি গুটি থেকে প্রজাপতি ফোটানোর প্রথা-প্রকরণ না জেনেই একটা অসম্পূর্ণ ডানাভাঙা প্রজাপতি টেনে এনেছে অসময়ে আলোতে। কাঁচা হাতের তাড়াতাড়ি লেখার মতো সেটা ভয়ঙ্কর বিশ্রী দেখতে হল। তারপরে সেদিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখলেম কত যত্নে কত পরিশ্রমে সৃষ্টি-করা পাখির ডিম বিনা পাখিতে ফোটাবার কল। পক্ষিমাতার বুকের পরশ, অদ্ভুত ধীরতা, বুদ্ধি এবং অভিনিবেশ সহকারে দিনের পর দিন ধারণার মধ্যে নিয়ে তবে এই কল গড়া হয়েছে। পাখি নিজে যে আনন্দ বোধ করে বাচ্চা ফোটানোর কাজে, সেই আনন্দ সেই যতন দিয়ে গড়েছে মানুষ তার কল, শত শত পক্ষিশিশুর উপরে ঢেলে দিয়েছে লোহার কল আপনার প্রকাণ্ড স্নেহ। এই কল গড়তে বা গড়বার প্রকরণে যদি কোথাও ভুল থাকত, কিংবা শিল্পী আগুনে যেমন-তেমন করে কলটা গড়ে ফেলত, তবে মায়ের মতো বাচ্চা না ফুটিয়ে রাক্ষসীর মতো কলটা কেবলই ডিম খেত, একটিও বাচ্চা ফিরিয়ে দিত না মানুষকে, কিংবা ফেরাত ভাঙা আধ-পোড়া অসম্পূর্ণ অবস্থায়। যা কিছু সৃষ্টি করে তার প্রক্রিয়ার মূলে এই যতন না হলে কাজ ব্যর্থ হয়ে যায়, সৃষ্টি অসম্পূর্ণ থাকে অশোভন হয়, অচল হয়।

লাইন টানার প্রকরণ, রং দেবার প্রকরণ ইত্যাদি ভাল না হলে সামগ্রীটা যেমন নজরে ধরে না তেমনি সেই লাইন টানার রং দেওয়ার সময়ে হাত এবং মনের কোথাও একটু অযতন ঘটলে করা ঠিক মতো হয় না, মন থেকে মনের কাজটাও পৌঁছোয় না। ভোঁতা তীর মচকানো ধনুক নিয়ে কে কবে লক্ষ্যভেদ করেছে, অযতনে গাণ্ডীব টেনেও কেউ লড়াই জেতেনি। "Craft is only a means, but the artist who neglects it will never attain his end....Such an artist would be like a horseman, who forgets to give oats to his horse."—RODIN. যে ঘোড়ার যতন জানে তার হাতে দেখতে দেখতে ছেকড়া গাড়ির ঘোড়াও সুন্দর হয়ে ওঠে, যে মালি গাছে যতন দেয় তার মরা গাছেও ফুল ফোটে। ঘরের যে যতন নেয় না লক্ষ্মীশ্রী তার ঘর থেকে পালায়।

ভাল করবার, ভাল লেখবার, ভাল আঁকবার, ভাল গড়বার প্রকরণ যে যতন দিয়ে ধরে সেই যথার্থ ভাল গড়ে, আর কলের মতো সে নিখুঁত প্রক্রিয়া দখল করে চলে। সে চলে ঠিক সেইভাবে যেভাবে কলের পুতুল

নেচে চলে। একদিকে শুকনো প্রকরণ, আর একদিকে যতনমাখা প্রকরণ, শিল্পীর technique-এর এই দুটো দিক—নীরস দিক আর সরস দিক। নুড়ির আগাগোড়া নীরস—যতই তার মধ্যে প্রবেশ কর, সে নুড়ি ছাড়া কিছু নয়। আর বাদাম তাব খোলার মধ্যে শাঁস লুকোনো রয়েছে। ছেলে যখন বাদাম ভাঙতে আরম্ভ করে তখন তার মনে বাদাম ভাঙার সঙ্গে বাদাম যে হস্তগত হতে চলেছে তার স্বাদ আর ভাঙার আনন্দটুকু থাকে। তাই সে বাদাম ভাঙার কঠিন প্রক্রিয়াতেও রস পায়। আক চিবোতে দাঁতের ব্যথা আছেই, কিন্তু চিবোনোর সঙ্গে-সঙ্গেই রস পেতে থাকে মানুষ, কাজে-কাজেই দাঁত চিবিয়ে চলে আনন্দে। একোগুড় পেটুকেই খায়, আর আর্টিস্টকেই রস পেতে হয় কাজ আর চলা থেকেই। যারা আর্ট-আর্ট করে মশগুল অথচ আর্ট সৃষ্টি করে না, তারা পেটুকের মতো প্রস্তুত গুড়টাই খেয়ে চলে। আর আর্ট যারা সৃষ্টি করে তারা হয়তো অনেক সময় গুড় খেতেও পায় না। কিন্তু ঐ আকমাড়া কলটা যত্নে ঘুরিয়েই স্ফূর্তি পায় ঠিক ঘোরাবার। শাল যে বুনছে সে বুনেই আনন্দ পাচ্ছে। হাতের ছুঁচ চালানোর যতন আর আনন্দ, দিনের পর দিন চোখ-ঠিকরে-যাওয়া সূক্ষ্ম কারুকার্য ফুটিয়ে চলায় আনন্দ। এই আনন্দ যদি না তার থাকে যদি এ শাল সে পরতে পাবে না এই দুঃখই কেবল তার মনে জাগে, যদি শাল বোনার প্রকরণের মধ্যে কষ্টটাই বাজে তার মনে আঙুলে আর চোখে, তবে সে-আর্টিস্টের হাতের শাল ঘোড়ার গায়ের কম্বলের চেয়ে কদর্য না হয়ে যায় না।

ফরাসি দেশের প্রসিদ্ধ শিল্পী রোদাঁকে তাঁর ছাত্র প্রশ্ন করেছিল—"Can an artist get along without technique?" তাতে শিল্পগুরু উত্তর দিলেন, "On the contrary, it is necessary to have consummate technique in order to hide what one knows...The great difficulty and crown of art is to draw, to paint, to write with ease and simplicity." এখানে কাজের সারল্য ও স্বতঃস্ফূর্তির কথা বলা হল এবং এই দুই গুণ যাতে পৌঁছোয় কাজে সেই consumate technique বা পরিপূর্ণভাবে প্রকরণের দখলের কথা বলা হল। প্রকরণের সার্থকতা তখনি যখন সেটা নিয়ে সহজভাবে আমরা কাজ করে যাই, সেখানে প্রকরণ কাজের শান্তি ব্যক্ত না করে স্ফূর্তিটাই দেখায়। কি রকম ছন্দ কষে বাঁধা হল, কত মাথা ঘামিয়ে গানের সুরটা এবং গানটা লেখায় ধরা হল,— এইটেই যে লেখায় রইল, বড় লেখা হলেও সেটা artistic হল না; কেননা তার মধ্যে লেখার প্রকরণের শুকনো দিকটাই রয়েছে, আর যেখানে যতন এসে আনন্দ এসে প্রকরণের কঠোরতা কর্কশতা মিটিয়ে দিয়ে ভাবের এবং লাবণ্যের প্রসন্নতা প্রকাশ করলে সেখানে ছোট হলেও সেটি হল আর্ট। প্রকরণে পূর্ণ অধিকার না হলে লেখায় বলায় চলায় কাজে কর্মে স্বতঃস্ফূর্তি গুণটি আসে না, অথচ এই গুণটি সমস্ত বড় শিল্পের একটা বিশেষ লক্ষণ। এত সহজে কেমন করে আর্টিস্ট যা বলবার যা দেখাবার তা প্রকাশ করে গেল এইটেই প্রথম লক্ষ্য করে আমাদের মন বড় শিল্পীর কাজে। শিল্পী কি কঠিন প্রক্রিয়ায় রচনা করেছে তা তো রচনায় রেখে দেয় না, মুছে দিয়ে চলে যায় তার হিসেব, এবং এই কারণে ঠিক সেই কাজটি নকল করতে চাইলে আমরা ঠকে যাই ঠেকে যাই, হদিস পাইনে কি কি উপায়ে কোন পথ ধরে গিয়ে শিল্পী তার পরশমণি আবিষ্কার করে নিলে। সুতরাং বলতে হবে একজনের technique অন্যের অধিকারে কিছুতেই আসতে পারে না, সে চেষ্টা করাই ভুল, কেননা তাতে করে চেষ্টা কাজের ওপরে আপনার সুস্পষ্ট ছাপ দিয়ে যায় এবং আর্টিস্টের কাজে সেই ব্যর্থ চেষ্টার দুঃখটাই বর্তমান থেকে যায়। যে দেখে তাকে পর্যন্ত পীড়া দিতে থাকে।

বাঁশি বীণা এসব তৈরি করার প্রকরণ যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, তেমনি এদের বাজানোর প্রকরণও আলাদা আলাদা। বাঁশির ফুটো ছেড়ে ছেড়ে সুর বার করতে হয়, বীণাতে তারে তারে ঘা দিয়ে ঘাটের পর ঘাট চেপে সুর বার করতে হয়। সাতটা সুর তার ওপর এবং তার মাঝে মাঝে আঙুল খেলিয়ে বেড়ালে। এই তো বাজনার প্রকরণ সামান্য রয়েছে এবং যন্ত্রে আর কণ্ঠে রাগ-রাগিণী ভাঁজবারও বাঁধা প্রকরণ আছে আমাদের— সেগুলো শিখলে সহজেই বাজিয়ে আর গাইয়ে দুই-ই হতে পারে মানুষ। নাচের বেলায় ছবিমূর্তি গড়ার বেলায় ঐ একই কথা। সুরের রঙের অঙ্গভঙ্গির কতকগুলো প্রকরণ বাঁধা হয়ে গেছে—বাঁধা রাস্তার মতো সেগুলো সাধারণের পক্ষে সাধারণভাবে চলাচলের বেশ কাজের পথ। কিন্তু এই বাঁধা রাস্তায় বাঁধা অবস্থাতেই যে চলল হাতের কাজ পায়ের কাজ গলার কাজ করে, সে বাঁধন আর বাঁধনের বেদনাটাই প্রকাশ করে চলল কাজে, সে তো কখনো আপনাকে প্রকরণিক ছাড়া আর্টিস্ট বলতে পারে না। প্রকরণের বাঁধন যে দরদ দিয়ে আনন্দ দিয়ে মুক্ত করলে সেই হল গুণী; নীরস প্রকরণিকের সঙ্গে তার তফাত হল ঐখানে। গুণী সে বাঁধনের কষণ রসিয়ে তুললে, লসন পৌঁছে দিলে কষণে; নর্তকীর কোমরে মেখলার বেড় যেমন, তেমনি techniqueএর বাঁধন শোভা ধরলে আর্টিস্টের গড়নটিকে ঘিরে ঘিরে। Techniqueএর এই যে সকল দিক যা নিয়ে মানুষের হাতের কাজে আর কলে-কাটা কলে-কোঁদা জিনিসে তফাত হচ্ছে, কিছু করতে যাবার পূর্বে এটার বিষয়ে যদি আমরা না ভাবি তবে art জিনিস আমাদের দ্বারা করা শক্ত হয়। হাতের কাগজ হাতের কাজে এমনি করে ছেড়ে দিলেম যে সেটি মনের জিনিস হয়ে রইল, মুখের কথা সুরের বেদনায় এমন করে ভরে দিলেম যে তারা মন থেকে মনে চলাচলি করতে লাগল, মন দুলিয়ে দিয়ে গেল। প্রত্যেক পা-ফেলা এইরকম যখন হল তখন জানলেম নানা শিল্পের নানা প্রকরণে সিদ্ধি লাভ করলেন artist। গাছ গাছই রইল, ফুলও দিলে না ফলও দিলে না সে যেমন, আর্টের প্রকরণগুলো আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল অথচ তা দিয়ে কিছু ফলানো গেল না বা কোনো কিছুকে ফুলের মতো ফুটিয়ে তোলা গেল না; কেবল প্রকরণেরই প্রতিষ্ঠা করে গেলেম কাজে, এ হলে নিষ্ফলা গাছ প্রতিষ্ঠা করা হল।

প্রকরণের সফলতা তখনই যখন সে কিছুর জননী হল, না হলে সে সুন্দরী কিন্তু বন্ধ্যা। রসের জনয়িতা আর্ট, সেই আর্ট-সৃষ্টির প্রকরণ নীরস নিরানন্দভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ যে করলে তার সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হল; নিজের কাজে সে প্রয়াসকেই প্রতিষ্ঠিত করলে, প্রসন্নতাকে নয়,—এমন কাজ দেখে মন কোনোদিন প্রসন্ন হয় না।

আর্ট স্কুল থেকে যে একেবারেই আর্টিস্ট বার হয় না তার কারণ আমি দেখেছি— সেখানে ছেলেগুলো খেটেই চলে বাঁধা নিয়মে, খেটে চলার আনন্দ বোধ করবার অবসর কেউ সেখানে দেয় না, কলের মতো হাত হয়ে ওঠে পাকা ছবি মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করবার প্রকরণে কিন্তু মন থেকে যায় উপবাসী অপ্রসন্ন। বেশি দিন উপবাসে রাখলে পেটের খিদে মরে যায়, বত্রিশ পাটি দাঁত চিবোতে পাকা হয়ে উঠল, কিন্তু খিদে মরে গেল, এই দুর্ঘটনা ঘটছে আর্ট স্কুলের শতকরা নিরানব্বইটা ছাত্রের। সবাই বার হয় প্রকরণিক হয়ে, ক্বচিৎ কেউ সেখান থেকে আসে আর্টিস্ট হয়ে। মন নেই কাজ করে চলেছে হাত কলের মতো, সে কাজ দেখে তারি মন খুশি হয় যে ফুলকে ফোটায়নি ফুটতে দেখেনি এবং যার বুকে রস ফোটেনি কোনোদিন।

গড়া হয়ে গেলে হাতের কাজ তো আর্টিস্টের হাতে থাকে না। অন্যে নিয়ে সেটা উপভোগ করে। আর্টিস্ট যে জনয়িতা নিজের জনিত আর্ট ভোগ করা তার ধর্ম নয়, তার সৃষ্টি করার প্রকরণের মধ্যে যেটুকু আনন্দ

সেইটুকুই আর্টিস্টের প্রাপ্য, কাজের আরম্ভ থেকে শেষ এইটুকুর মধ্যে তার সমস্তটুকু নিঃশেষ করে পায় আর্টিস্ট; সৃষ্টি করা শেষ যেমনি হল অমনি কাজটির সঙ্গে আর্টিস্টের হাতে কলমে যোগ বিচ্ছিন্ন হল। আর্টিস্ট এসে পড়ল দর্শকের জায়গায়, সবার পাশে সেও দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলে আপনার কাজের দিকে, অন্যে সেটা নিয়ে গেল কি ফেলে গেল তা দেখবার অপেক্ষা নেই, আর্টিস্ট সে ফিরে এল নতুন একটা কাজের প্রক্রিয়ার মধ্যে। এই তো হল আর্টিস্টের প্রতি পলের জীবন—সে শুধু বাঁচে তার কাজ করে চলার মধ্যে যে আনন্দ তাই নিয়ে, আনন্দের সেই এক মুহূর্তে তারি ছাপ পড়ে তার কাজে কর্মে সব দিক দিয়ে, তার সৃষ্টি ছন্দ পায় ছাঁচ পায় ঐ এক বিন্দু আনন্দের কোলে। কলের নাগরদোলায় ছেলেগুলো দুলছে আর মায়ের কোলে ছেলে দুলছে,—এ দুই-ই তো দেখেছি। কল সে দুলিয়ে আনন্দ পাচ্ছে না, কাজেই সে কোঁচ-কোঁচ শব্দে জানিয়েই চলেছে সে কথা, আর মায়ে দোলা দিচ্ছে দিনের পর দিন রাতের পর রাত, তাতেও তো দুঃখ রয়েছে কিন্তু বেসুর কোথাও তো নেই। মা গাইছে "আমার ছেলে আমার কোলে, গাছের পাখি গাছে দোলে", দোলাবার শ্রম সেখানে প্রতিমুহূর্তে সুরে ভরছে, মিটিয়ে দিচ্ছে দুঃখ দোলা দেবার আনন্দ-হিল্লোল। কলের দোলা সে তো পাত্র বাছে না, তোমাকে আমাকে ছেলেকে বুড়োকে সমানভাবে দুলিয়ে চলে ঝাঁকানি দিয়ে বেসুরে চেঁচিয়ে কিন্তু মায়ের কোলে ছেলের দোলা সে মায়ে-মায়ে বিভিন্ন প্রকারের হলেও সবার মধ্যে সুর বাজে ব্যথা বাজে না, কাজেই এরকম দোলানো ক্রিয়ার মধ্যে আনন্দ আছে বলেই সেটাতে ছেলে এবং মা দুজনেই আনন্দ পায়। ছেলের ওজনের একখানা কাঠ কোনো মায়ের হাতে দিয়ে তাকে দোলাতে বলো—কিছুক্ষণ পরে মায়ের হাত ভেরে যাবে কেননা ছেলে দোলানোর প্রক্রিয়ায় যে আনন্দ কাঠ দোলানোতে সেটি নেই। ছোট মেয়ে কাঠের পুতুল দোলাচ্ছে, সে জানছে কাঠের ছেলেকে ঠিক আপনার ছেলে বলেই, সেলেটখানা দোলাতে দাও সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। হাতুড়ি পেটানোর আনন্দ তখনই পাই যখন পিটে যে কাজটি করছি সেই কাজ সম্পূর্ণভাবে মন অধিকার করেছে এবং হাতুড়ি পেটার প্রকরণ সম্পূর্ণভাবে অধিকারে এসেছে আমার। এ না হলে কাজে মন কিন্তু হাতে এল না সেটা, কিংবা হাত পিটেই চলল, কাজে বসল না মন,—দুদিক দিয়েই কাজটা ব্যর্থ হয়ে চলল। নল রাজার হাতে রথ যেমন চলত তার তো বর্ণনা পড়েছি এবং সেই ঘোড়া সেই রাশ সেই গাড়ি ছক্কর গাড়ির কোচম্যানের হাতে কিভাবে চলে তারও প্রমাণ আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই সামনে ধরা আছে। যে গাড়ি হাঁকিয়ে আনন্দ পাচ্ছে এবং যে কোনো রকমে সোয়ারি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে কড়ায় গণ্ডায় ভাড়া চুকিয়ে পেয়েই আনন্দ পাচ্ছে, এই দুয়ের রাশটানার প্রক্রিয়ায় কতখানি তফাত তা বেশ বুঝি আমরা। একের শূর্তি রাশের মধ্য দিয়ে ঘোড়াতে পৌঁছোচ্ছে, ঘোড়া সুন্দরভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে নেচে চলেছে, আর একের হাতের রাশে ত্বরা পৌঁছোচ্ছে, কিন্তু ঘোড়া আর একটুও পারছে না খুঁড়িয়ে চলেছে কিংবা চাবুকের চোটে বিশ্রী রকম বেগে দৌড়োচ্ছে ঝাঁকানি দিতে দিতে। যে প্রকরণ সম্পূর্ণ কায়দা না হলে কেউ আর্টিস্ট হতে পারে না সেটি হচ্ছে আকার গড়বার বা বলবার করবার সামান্য প্রকরণ নয় সেটি হচ্ছে আনন্দের সঙ্গে কর্মসাধনের অসামান্য প্রকরণ।

অনেকের বিশ্বাস যে মূর্তি গড়বার ছবি লেখবার শাস্ত্রীয় প্রকরণগুলি শিখিয়ে দিতে পারলেই দেশে নানা দিক দিয়ে গানের আর্টিস্ট মূর্তিমান হয়ে এসে উপস্থিত হবে আমাদেব মধ্যে শিল্পের মধ্যে। খেয়াল বলে শখ বলে জিনিসটাকে বাদ দিয়ে প্রাচীন শিল্পের শাস্ত্রকথিত রূপটার সঙ্গে মান-পরিমাণ ইত্যাদি দিয়ে যুক্ত হওয়াকেই তারা ভাবে আর্ট পুনরায় দেশের মধ্যে ধরে আনার পন্থা। এইভাবে অধিগত যেটা হবে সেটা শিল্প

হবে না গত শিল্পের প্রাণশুন্য ভান হবে মাত্র, তা তারা বোঝে না। শিল্প এবং তার নিয়ম-প্রকরণ ইত্যাদির সঙ্গে শিল্পীর শখ ও খেয়ালের কতখানি যোগ তা তারা কেমন করে বুঝবে যারা শিল্প করে না শিল্পশাস্ত্রই পড়ে মাত্র অভিধান ব্যাকরণ ভাষা পরিভাষা ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি যেভাবে পড়ে ছাত্ররা,—তাই এরা ভাবে বুঝি ঐ রাস্তা ধরে চললেই ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে দেশের শিল্প, এবং সেটা সঙ্করত্ব পরিহার করে একেবারে বিশুদ্ধ অবস্থায় আমাদের ঠাকুরঘরে এসে বসবে। সামান্য একটা-কিছু যে গড়তে চেষ্টা করেছে কিংবা জগতের শিল্পের ইতিহাসে যার একটুমাত্র দখল জন্মেছে সেই বলবে, খেয়াল ও খেয়ালী এরাই হচ্ছে শিল্পের এবং নব নব প্রকরণের জন্মদাতা,—শাস্ত্র নয় শাস্ত্রবাগীশও নয়। যার শখ রইল তার কাছে শিল্প শিল্পপ্রকরণ সব রইল, আর যার শখ রইল না তার কাছে শিল্প রইল না শুধু প্রক্রিয়া শাস্ত্রের বচন ইত্যাদি রইল। কাজেই দেশের শিল্পকে পালনের ভার খেয়ালীর হাতে দিলে তত ভয় নেই যত ভয় খেয়াল যার নেই এমন প্রকরণিক ও শাস্ত্রজ্ঞের হাতে খেয়ানৌকার হালখানা পড়লে। খেয়ালীদের হাতে পড়ে ভারত-শিল্পের নিয়ম-প্রকরণিকদের মধ্যে ওলট-পালট ঘটে ভারত-শিল্প ভারতীয় থাকবে না বিজাতীয় রকম কিছু-একটা হয়ে উঠবে এটা সাধারণের কেউ কেউ ভাবছেন এবং সেইজন্য তাঁরা খেয়ালকে বাদ দিয়ে শাস্ত্র এবং তার শিক্ষার সঙ্গে শিল্পশিক্ষার্থীদের জুড়ে কি হয় দেখতে চাচ্ছেন। যথা, "ভারত শিল্পপদ্ধতির নামে শিল্প-সাঙ্কর্যের উদয় হইতেছে বলিয়া তাহার কৌলীন্য-রক্ষার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক, কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার পথ বড়ই বন্ধুর" (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ভারতবর্ষ, ১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা)।

কৌলীন্যের পথ সত্যই বন্ধুর বটে; অল্পই প্রসার সে পথের, ছোট পথ সেটা, কৃত্রিম পথ, জল ধরে রাখার কুণ্ড বা নালা সেটা, সেই পথে ভারত-শিল্পকে নিতে চাওয়া মানে কি তা জানিনে। খেলায়মতো যে পথে চলবার কিছু জো নেই সে পথ কখনো কোনো শিল্পের পথ হতে পারে না, কোনো বড় জিনিস উৎকৃষ্ট পথ উদার পথ ছাড়া বন্ধুর পথে চলেনি সঙ্করতাকে ভয় করে। সঙ্করত্বের ভয় করে হিন্দুশাস্ত্রমতো ভারত-শিল্পের নিয়মে শিল্পীকে বদ্ধ করলে সঙ্করত্বের হাত থেকে বাঁচাতে পারি শিল্পকে কিন্তু বাঁধা প্রকরণের ভয়ঙ্করত্ব যখন শিল্পের সর্বাঙ্গে জরা আর মৃত্যুর লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুলবে তখন শিবেরও অসাধ্য তাকে শুধরে রমণীয় করে তোলা। আর্ট বিষয়ে খেয়ালীর কাছে যেতেই হবে নবযৌবন ভিক্ষা করে। এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত রয়েছে;— আমাদের সঙ্গীতবিদ্যা প্রকরণসার হয়ে যে দশা পেয়েছে এখন তার সঙ্গে প্রাণের যোগ করে দেওয়া তম্বুর ঋষিরও কর্ম নয়। যদি কেউ সে কাজ করতে পারে তো সে বিদেশের খেয়ালী বা দেশেরই কোন খেয়ালী যার প্রাণে গানের শখ আছে এবং গানের ইতিহাস কসরত শেখার শখের চেয়ে গান গাইবার শখ যার বেশি। বিশ্বকর্মা একজন খেয়ালী তাই বিশ্বের জিনিস তিনি গড়ে উঠতে পারছেন এমন চমৎকার সুন্দর করে— চামচিকে থেকে আরম্ভ করে জম্বুদ্বীপের এবং তারও বাইরের যা কিছু তা! বিশ্বকর্মা যদি শাস্ত্রের নিয়ম-প্রকরণ মেনেই চলতেন তবে শুধু দেবমূর্তির কারিগর বলেই বলাতে পারতেন, বিশ্বকর্মা বলে তাঁকে কোনো আর্টিস্ট পূজা দিত না। বিশ্বকর্মা হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশে বিশুদ্ধ গাছ বা তুলসী গাছেই যদি হাত পাকাতেন তবে কি ভয়ঙ্কর একঘেয়ে জগৎই তিনি বানিয়ে তুলতেন! এবং কবি ও রসিকদের তাহলে কি উপায় হত—একটা গাছ দেখলেই সব গাছ দেখার আনন্দ এক নিমেষে চুকে যেত! একটা গাছ বারে বারে, একটি পাহাড় একটি নদী একই সমুদ্র বারে বারে পুনরাবৃত্তি হতে হতে চলত আর তার মধ্যে একটি মাত্র মানুষ হয় পুরুষ নয় স্ত্রী নয় দেবতা নয় দেবী থাকত এবং বর্ণসঙ্করতা আনার ভয়েই বিশ্বকর্মা আলোছায়ার মেলামেশায় সঙ্করত্ব দিয়ে দুই

সন্ধ্যার রমণীয় ছবি ফোটাতে পারতেন না, হয় থাকত চোখ-ঠিকরানো আগুনের তেজ নয় থাকত ভীষণ অন্ধকার বিশ্বছবিটির উপর লেপা।

শিল্পপদ্ধতির ও প্রকরণের সঙ্করত্ব বাঁচাতে গিয়ে শিল্পে যে ভয়ঙ্করত্বটি এসে পড়বে সেটা ঠেকাবার পরামর্শ শাস্ত্রকারেরা দিতে ভোলননি। শিল্পীর হাত সব সময় শুদ্ধ এই কথা শাস্ত্র বলেছেন, শিল্পী দেবতাই গড়ুন আর বানরই গড়ুন বা দেবতাতে বানরে পাখিতে মানুষে মিলিয়ে খিচুড়িই প্রস্তুত করুন। সে যদি শিল্পী হয়, যদি তার প্রকরণের সঙ্গে তার মনের আনন্দভাবের বিশুদ্ধি এসব জুড়ে দিয়ে থাকে সে, তবে সে বিশুদ্ধ জিনিসই রয়ে গেল। পণ্ডিতের ব্যবস্থামতো গোবর গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে শাস্ত্রের মন্ত্র পড়ে ধ্যান করে গড়লেই বিশুদ্ধি আসে না, অন্তরের পূতধারা তারি স্রোত যখন শিল্পীর হাতের কাজ ধুয়ে দেয় তখনই সে হয় বিশুদ্ধ, ভারত-শিল্প বা আর কোনো বিশুদ্ধ শিল্প। হিন্দু শিল্পশাস্ত্র মতে গড়া হলেই বিশুদ্ধ ভারত-শিল্প হবে একথা বলা চলত যদি ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুরই হত—গ্রিক মোগল চীন নেপাল, কত কি নিয়ে যে ভারত-শিল্প হয়েছে তা কে জানে! সুতরাং ভারতবর্ষে যেমন একটি মাত্র ধর্ম নেই তেমনি ভারত-শিল্পে কৌলিন্য বলে পদার্থ একেবারেই নেই। কেননা ভারতবর্ষ যেমন প্রকাণ্ড বিস্তার নিয়েছে সেইরকম তার আর্টও বিস্তার পেয়েছে শাস্ত্রগত পদ্ধতি ছেড়েই। কোনো দেশের কোনো শাস্ত্রের কৌলীন্যও তার নেই, সে সহজ নদীর মতো সেকাল একাল সব কাল সব দেশ সব মানুষ সব মন সব সমাজের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে, গঙ্গাধারাকে যারা ছোট করে দেখে তারাই কাশীর গঙ্গাকে কৌলীন্যে মণ্ডিত করে তুলতে চায় পুরাণের প্রমাণবলে, তারাই চায় শিল্প বাঁধা প্রকরণের মধ্যে থেকে পুষ্করতীর্থের কুণ্ডের জলের মতো বিশুদ্ধ এবং সবুজ হয়ে বর্তমান থাকে চিরকাল। সে সবুজ যে কচি পাতার সজীব সবুজ নয় দূষিত জলের বিষাক্ত সবুজ সেটা ভুলে যায় তারা।

শাস্ত্রমতো আমাদের শিল্প কেমন হবে,—হিন্দু ভারত-শিল্প বা মোগল রাজপুত মারাঠা বাঙ্গালী ইঙ্গবঙ্গ হবে কিংবা আর-কিছু হবে, তা আমি জ্যোতির্বেত্তা নই যে ঠিক করে বলে দেব; কিংবা কোন রূপটা হলে ভাল হয় তাও আমার আজকের বলবার কথা নয়, বিষয় হচ্ছে প্রকরণের ব্যাপার নিয়ে। যার আর্টের খেয়াল নেই সে নিজের আর্ট বা অন্যের আর্টে প্রকরণ দখল করাতে যে শ্রম আছে তা নিতেই চায় না। প্রথম চাই খেয়াল বা শখ, তারপর লোক খুঁজে বা শাস্ত্র ঘেঁটে নানা প্রকরণের দখল এবং সবশেষে নিজের মনোমতো করে প্রস্তুত-করা সামগ্রী সমস্ত। এখানেও পুঁথি পড়ে চলার চেয়ে হাতে হাতে কারিগরের কাছে এবং নিজে নিজে কাজ করতে করতে প্রকরণে যে জ্ঞান জন্মায় সেটা মূল্যবান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশি রঙের যে বইখানা লিখেছেন সেইরকম আরো অনেকগুলো বই হলে ক্রমে সেগুলি হয়তো বর্ণশাস্ত্র হয়ে উঠবে। এবং সেইসব রঙ প্রস্তুতের প্রকরণ পাচ্ছেন তিনি কতক পুঁথি থেকে কতক বণিকদের কাছ থেকে। এখন আমাদের কাজে সেটা লাগছে, পরেও কাজে লাগবে, কিন্তু এই বই শাস্ত্র হয়ে ওঠবার পর আজ থেকে একশত বৎসর পরের শিল্পী হয়তো দেখবে নতুন বর্ণবিধান, কিংবা সে হয়তো নিজেই একটা নতুন বর্ণ আবিষ্কার করবে; সে সময় তাকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের লিখিত বর্ণশাস্ত্রের মধ্যেই থাকতে হবে, না হলে তার জাতিপাত, একথা কি কেউ বলবে, না বর্ণশাস্ত্রে বর্ণসঙ্করত্ব ঢোকাচ্ছে বলে তাকে দোষ দেবে? শাস্ত্রকে এভাবে প্রকরণ অর্জনের ব্যাঘাতজনক করে তুলে কি ফল তা আর্টিস্ট আবিষ্কর্তা এবং যাঁরা আচার্য এবং শাস্ত্রকার তাঁরা বুঝবেন, শুধু বুঝবেন না তাঁরা যাঁরা শিল্পের একটা অদ্ভুত কৌলীন্য প্রকাশ করছেন;—কাচের বোতলে-ভরা ডিস্‌টিলড্ ওয়াটারের চেয়ে স্বচ্ছ সেই কৌলীন্য হলেও সেটা কতটা বড় জিনিস তা বলতে পারিনে, কিন্তু সেটা বোতলের মধ্যে জাদুঘরের মরা

টিকটিকির মতো বিশ্বের হাওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে চিরকাল আপনার এতটুকু কৌলীন্যে ডুবে এটা যেন দেখতে পাচ্ছি।

প্রকরণ চারিদিক থেকে অর্জন করতে হয় আর্টিস্টের তখন বাছবিচার নেই, শুধু সেই প্রকরণ প্রয়োগের সময় কোনটা কিসে খাটবে তার বিচার। ভূদৃশ্য আঁকার প্রকরণ দেশীয় এবং শাস্ত্রীয় যে শিল্প তাতে নেই, এ প্রকরণ বিলেত থেকে আনতেই হবে। মানুষের চেহারা—সেখানেও অর্জন করা চাই আঁকার এই প্রকরণ। খালি দেবতা এঁকে ভারত-শিল্পের আভিজাত্য বজায় রেখে চললে মানুষ গরু গাছপালা এমনকি পৃথিবীটাই বাদ পড়ে যায়। ভারত-শিল্পের বিশেষত্বই এই এবং ভারতবর্ষেরও বিশেষত্ব সেই। কি সমাজ কি শিল্প কি উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান সবার প্রথা-প্রকরণ অর্জনের বেলায় সে অকুলীন—একটুও ভয় পায়নি ভারত-শিল্প গ্রিসের স্পর্শে আসতে, অসভ্য পার্বত্যজাতির শিল্পের এমনকি অনার্য আদিম শিল্পেরও স্পর্শে আসতে। সব দিক দিয়ে সে অর্জন করেছে শিল্পপ্রকরণ সামাজিক ব্যবস্থা জীবনযাত্রার পদ্ধতি। হিন্দু ভারতবর্ষের চেয়ে যে বড় ভারতবর্ষ, হিন্দু ভারত-শিল্পের চেয়ে যে বড় ভারত-শিল্প, তাই গড়ে তোলার প্রকরণ অর্জনের যে আনন্দ তারি মধ্যে ভারতবর্ষ এবং ভারত-শিল্পের মূল যুক্ত হয়েছে বলেই গ্রিস মরে গেল, ঈজিপ্ট চলে গেল, চীন তার চিরাগত প্রথা-প্রকরণের পাঁচিলে বন্ধ হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে রইল যখন তখনো ভারতবর্ষ ভারত-শিল্প ইত্যাদি তৈলকটাহে দশরথের মৃতদেহ যেভাবে ছিল সেভাবে রইল না, সে নতুন থেকে নতুনতর অর্জনের মধ্যে চলে বলে বেঁচে রইল। যুগ-যুগান্তরের অর্জন প্রথা-প্রকরণ তাকে চেপে মারতে পারল না, সে আনন্দের সঙ্গে ভাঙতে লাগল গড়তে লাগল সৃষ্টির জিনিস। ভারত-সভ্যতার এই বড় দিক,—এই দিক দিয়েই ভারত-শিল্পের মর্যাদা ও মহিমা। যেখানে শখ মিটল লোকের নতুন নতুন দেখবার নতুন নতুন অর্জন করে আনবার, সেইখানেই মরল দেশের আর্ট ও আর্টের নানা প্রকরণ। আবার নতুনে শখ যেখানে নতুনের জন্য একটা বিপরীত উন্মাদনাতে পরিণত হল সেখানেও মরল শিল্প। এই দুই দিক বুঝে যে খেয়ালি চলে সে-ই consumate technique লাভ করে, এবং আর্টের খোঁজে চলতে পারে সাহসে বুক বেঁধে, না হলে খানিক চলে সে ভয়ে মরে,—হয় পালিয়ে আসে চিরকেলে ঘরটায়, নয়তো গিয়ে আশ্রয় নেয় পরের দ্বারে অধম ভিক্ষুকের মতো। আর্টিস্ট হতে পারা যায় যা হলে তার মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান অর্জনটাই একমাত্র উপায় নয়, অনেকগুলো অর্জন চাই অনেক দিক দিয়ে তবেই হয় আর্টিস্ট; এটা স্পষ্টই বলা হয়েছে অলঙ্কারশাস্ত্রে— শক্তিনিপুণতা লোকশাস্ত্রে কাব্যাদ্ বেক্ষণাৎ, কাব্যজ্ঞশিক্ষয়া অভ্যাস ইতি হেতুসমুদ্ভবে। প্রথমে চাই শক্তি আর্ট সাধন করবার, তারপর নিপুণতা বা প্রকরণাদির উপর সম্পূর্ণ দখল, তারপর শাস্ত্র কাব্য ইত্যাদির আবেক্ষণ, নানা শিল্পের জিনিসের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচয়, তারপর গুরুর কাছে রীতিমতো শিক্ষালাভ এবং অভ্যাস।

শাস্ত্রের মধ্যে নানা উপদেশ লিপিবদ্ধ হল কালে কালে, সেটা পড়ে নিয়ে শাস্ত্রজ্ঞান পেয়ে গেলেন, কিন্তু আকাশে বাতাসে যেসব শিল্পের নানা প্রকরণ—রঙ দেবার প্রকরণ, আলোছায়ার রহস্যভেদ করার প্রকরণ—লেখা হচ্ছে দিনরাত, সেগুলোও তো পড়া চাই। লিখিত শিল্পশাস্ত্রের চেয়ে শিল্পীর সঙ্গে বেশি যোগ অলিখিত এবং নতুন নতুন করে লিখিত শাস্ত্রের। কেবলি শাস্ত্রের মর্ম নয় এই বিশ্বের মর্মস্থানে কি সব লুকোনো আছে তারি মর্ম জানার প্রকরণ হচ্ছে আর্টের প্রকরণ,—নিজের সৃষ্টির সঙ্গে এবং স্রষ্টার সৃষ্টির সঙ্গে যাতে যুক্ত হওয়া যায় সেই অভ্যাসের প্রকরণ জানা, শাস্ত্রমতো পুতুল কাটার অভ্যাসটা শুধু নয়;—এই হল consumate technique লাভের প্রকরণ। আর্টিস্টের চলা আনন্দে চলা—হাতুড়ি পিটে কলম চালিয়ে সোনা গালিয়ে হীরে

কেটে সুর ভেঁজে তাল ঠুকে, শাস্ত্রের অঙ্কুশ খেতে খেতে ইন্দ্রের ঐরাবতের মতো চলা নয়। আর্টের প্রকরণ নিরঙ্কুশ প্রকরণ, আর্টের পন্থা নিরঙ্কুশ পন্থা, এইজন্য বলা হয়েছে "কবয়ো নিরঙ্কুশাঃ"।

রস ও রচনার ধারা

ছবি দেখা এবং ছবি লেখা, গান শোনা আর গান গাওয়া। একদিকে রইল যে রস উপভোগ করছে সে, আর একদিকে রইল রস দেবার নানা উপকরণ প্রকরণ নিয়ে ক্রিয়া করে চলেছে যে আর্টিস্ট সে। একদিকে ক্রিয়া করেই আনন্দ, অন্যদিকে ভোগ করেই আনন্দ। রসিক ভোগ করে, আর্টিস্ট রচনা করেই খুশি হয়! যে রচয়িতা নয় সে শুধু ভোগের অধিকারী। আর যে রচয়িতা সে ভোগ এবং ক্রিয়া দুই নিয়ে ঐশ্বর্যবান। রচয়িতা যে নয় সে বিশ্বপ্রকৃতির দান পেয়ে নিজেই ধন্য হল। আর রচয়িতা যে সে দান পেলে এবং দান করলে রস অন্যকে। বিশ্বপ্রকৃতি স্বাধীনা, অনন্যপরতা তার শিল্পক্রিয়া, মানুষ থাকুক না থাকুক, দেখুক বা না দেখুক চিরকাল ধরে রচনা করেই চলল নানা ব্যাপার। দর্শকের অপেক্ষা নেই বললেই চলে সেখানে, কিন্তু দর্শক মানুষের মন যতদিন পায়নি এই সমস্ত রহস্যময় সৃষ্টি ততদিন সব কিছু থেকেও ছিল না।

"ইদম্ বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিৎ আসীৎ" একথা মানুষ যখন বললে তখনি সৃষ্টির মধ্যে প্রথম এক নতুন লীলা আরম্ভ হল—ক্রিয়া এবং তার ফল এবং তার উপভোগ তিন মিলে নতুন ছন্দে রসের ধারা বইল বিশ্বে। মানুষের হাতের শিল্পক্রিয়ার ব্যাপার সমস্ত এই নিয়মে সৃজন হল!

"দেব শিল্পানামনুকৃতির্হি ইহলোকে"—যে নিয়মে প্রকৃতির সৃজন ক্রিয়া চলল, সেই নিয়মের অনুরূপ পথ ধরে চলল মানুষেরও সৃষ্টি কার্য। কাজ, অকাজ, সুকাজ, কুকাজ, কত কি করে চলেছে মানুষ ঐ সব কাজ করে আনন্দ পাচ্ছে বলেই, শিল্প কাজও তেমনি একটা কাজ; কতক মানুষ তাই নিয়ে পড়ে আছে, কতক মানুষ তাই দেখে মজে আছে। কাজ করে চলার আনন্দ, কাজটা দেখে চলার আনন্দ আর্টের জগৎ, এই আনন্দের জগৎ। দর্শকের প্রদর্শকের রচয়িতার ভোক্তার শুভ দৃষ্টির উপরে আর্টের রাঙ্গানো পট ছন্দে দুলছে, এরই তলা দিয়ে মন চলেছে মনের পানে—রসের গোপন ধারা বয়ে দুজনে দুজনের মিলন হচ্ছে। মালি ফুল ফোটাচ্ছে, ফুলের ভাল মন্দ বেছে গাঁথছে মালা, বাঁধছে তোড়া, ধরছে নিয়ে বাগানের মালিকের সামনে। মালি পেলে সমঝদার মালিক, মালিক পেলে উপযুক্ত মালি—তবেই ক্রিয়া ঠিক ছন্দ পেলে, না হলেই দুজনের দ্বন্দ্ব বাধল, ভোগের স্বাদ বিস্বাদ নীরস হয়ে দেখা দিলে।

আর্টকে পেতে তপস্যা আছে,—প্রক্রিয়ার অর্জনের তপ, মননের তপ, দর্শনের তপ, শ্রবণের তপ। সহজে এই বিশ্বপ্রকৃতি আপনার বিরাট রহস্যের প্রাচীর তো ভেদ করতে দেয় না যাকে তাকে; চারিদিকে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে যে ক্রিয়া যে লীলা চলেছে তার মধ্যে নিরাসক্ত হয়ে বসে থাকা ঢের সহজ—খেলায় যোগ দেওয়ার চেয়ে। আর্টিস্টের তপস্যা হল এই খেলায় যোগ দেবার উপযুক্ত হয়ে ওঠার তপস্যা। ফুটবল খেলা চলেছে—খেলুড়ির দলে কেবল তারাই ঢুকতে পেলে যারা বহু কষ্টে খেলতে জেনেছে—বাকি লোক তারা দর্শক বা সমঝদার হয়ে খেলা দেখতেই রইল। যেমন খেলবার তপস্যা খেলুড়ির দলে ভর্তি হয়ে আসল খেলায় যোগ দেবার উপায় করে দিলে, যেমন খেলা দেখার সাধনা অনেকখানি জলে ভেজা রোদে পোড়া

ইত্যাদি কঠোর করার মধ্যে দিয়ে খেলার বিষয়ে মর্মজ্ঞ করে তুললে কাউকে কাউকে; তেমনি দুই ধরনের সাধনা থেকে এক দল হল আর্টিস্ট অন্য দল হল রসিক। আর্টিস্ট হবার তপস্যা এবং আর্ট বিষয়ে সমঝদার হবার সাধনা—দু দিকেই রস উপভোগের সঙ্গে অনেকখানি কর্মভোগ জড়ানো রইল তবে হল মানুষ পাকা আর্টিস্ট বা পাকা সমঝদার। এই দুই দল, আর্টিস্ট ও সমঝদার—এরা দুজনেই ক্রিয়া করছে বিভিন্ন রকম কিন্তু ফল পেতে চলেছে এক। রস পাওয়া নিয়ে কথা—খেলা করে রস, খেলা দেখে রস।

রস জিনিস অনির্বচনীয়, সুতরাং তার ক্রিয়ার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় দিক রয়েছে, সেই জন্যে ঠিক করে কেউ বলতে পারে না, কেমন করে কোন প্রক্রিয়া ধরে চললে রস হবে বা রস পাওয়া যাবে। কিন্তু শিল্পক্রিয়ার সবখানিই তো অনির্বচনীয় থাকতে পারে না—তাহলে কাজ চলে কেমন করে? এই ভেবে আর্টের নানা প্রক্রিয়া নির্বাচনের চেষ্টা হল—শিল্পশাস্ত্রকার তাঁরা কতকগুলো বাধা আইন করে দিয়ে বললেন—এই করে চলো তবেই ভাল হবে, লোকেও রস পাবে। এইভাবে শিল্পে একটা বাঁধা প্রকরণে ক্রিয়া করে চলার রাস্তা ক্রমে প্রস্তুত হয়ে চলল। এই পুঁথিগত ক্রিয়া পদ্ধতি, যারা নিজের পথ নিজে দেখতে পারে না বা চায় না তাদের জন্য। বাঁধা পথে ক্রিয়া করে চলার সুবিধে আছে জেনে কতক লোক সেই রাস্তায় চলল কিন্তু বাকি যারা তারা কোন পথে যায় তাই নিয়ে তর্ক তুললে। 'বিপশ্চিতাং মতম্' আর 'একেষাং মতম্' এই নিয়ে পথ হল দুই ভাগ — একটা একেবারে নিষ্কণ্টক পথ কিন্তু দৌড় নেই সেখানে, আর একটা পথ নানা কাঁটা খোঁচায় খানা ডোবায় রহস্যসঙ্কুল, কিন্তু চলার স্বাধীনতা আছে যথেষ্ট সেখানে এবং একটা অনির্বচনীয়তারও হাওয়া বইছে অজানা পথের প্রত্যেক ঘোর প্যাঁচে। শাস্ত্রমতো পথে কেমন করে চলতে হবে ভাবতেই হয় না, তার আঁকে বাঁকে সাইনবোর্ড, চোখ বন্ধ করে শাস্ত্রমতো ক্রিয়া করে চলা চলল। কিন্তু মনোমতো এই শেষের পথটায় চোখ খোলা রেখে চলা ছাড়া উপায় নেই। বিচিত্র ক্রিয়া ধরে এই পথে মানুষ চলতে চলতে শিল্পক্রিয়ার যে সমস্ত বিচিত্র প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলে তার সংখ্যা করা শক্ত ব্যাপার। এই দুই পথে চলার কিন্তু একটা প্রধান ক্রিয়া হল—মনে ধরা ও মনে ধরানো! প্রথম পথে শুধু বিপশ্চিৎ, যাঁরা তাদের মনে ধরানো। দ্বিতীয় পথে বিপশ্চিৎ অবিপশ্চিৎ নেই—মনে ধরা মনে ধরানো নিয়ে কথা।

জগতের তাবৎ শিল্পক্রিয়া এই দুই পথ অবলম্বন করে চলেছে দুটো ধারা সৃষ্টি করে। দুই ধারাই চলেছে অনির্বচনীয় রসের দিকে, একথা দু' দলের কেউ অস্বীকার করতে পারে না। অলঙ্কারের পণ্ডিতেরা যে রস চান তাকেও তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন অনির্বচনীয় বলে, আর যে অলঙ্কার পড়ে না কিন্তু অলঙ্কার পরে এবং অলঙ্কার গড়ে সেও বললে—মনে ধরল তো রস হল, না হলে হল না। মনে ধরবে জেনেই তবে তো মন্দিরটা গড়া হল, মসজিদটা বানিয়ে তোলা হল, ছবিগুলো গানগুলো গল্পগুলো রচা হল বিচিত্র করে, না হলে সবই কাজ-চালানো সাদাসিধে রকমে হয়ে গেল না কেন? খুব আদিম মানুষ তার নিজের ছুরিখানিকে ভালবাসলে—জিনিসটি মনে ধরল—তবেই তার বাঁটের উপরে দিনের পর দিন ধরে কঠিন প্রক্রিয়ায় সে নানা রকম কারিগরি করে গেল এবং সেই ছুরির বাঁটখানি চিরকালের জন্যে শিল্প-রসিকদের কাছে আদরের সামগ্রী হয়ে থাকল। এখন একটা তর্ক সহজেই মনে আসে—এই যে হ্যারিসন্ রোডের দুই ধারের বাড়ি এবং ঐ যে চৌরঙ্গীর আফিস আদালত ইত্যাদি বৃহৎ ব্যাপার এগুলো তো কারু না কারু মনের মতো করে গড়া, তবে এগুলোও আর্ট না হবে কেন ? এদের শিল্পক্রিয়া তো মনে ধরানো এবং মনে ধরার পথেই চলল। একটু যদি ভেবে দেখা যায় তবে দেখি এই সব ঘরবাড়ির প্রকাশ ঠিক মনে ধরার উপরে নির্ভর করে হল না, বহুল

পরিমাণে এই ধরনের জিনিসগুলো নির্মাতার মনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে তার পকেটের সঙ্গেই জোড়া থেকে গেল। বাইরেটা হয়ে উঠল ইট কাঠ ইত্যাদি নানা জিনিসের সরঞ্জামের ভারগ্রস্ত। ভিতরটা দরিদ্র রইল, নীরস রইল, কেননা এসব কাজে নির্মাতার অন্তরের রস তো পৌঁছোয়নি, পৌঁছেছে অনেকখানি রৌপ্যরস যেটা কৃত্রিম উপায়ে জিনিসটাকে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে মাত্র কিন্তু মনোরম করে তুলতে পারেনি।

মনোগত জিনিস মনোমতো জিনিস ঠিক এই প্রক্রিয়ার উল্টো রাস্তা ধরে চলল—শুধু বাইরেটা নয়, মনোমতো পদার্থের অন্তর বার দুই মনোরম হয়ে বর্তমান হল, আর্টিস্টের মন ছাপ রেখে চলল বস্তুটার ভিতর বাইরের প্রত্যেক ক্রিয়া প্রক্রিয়াতে। আর্টিস্ট মিলল ওতপ্রোতভাবে তার কাজের সঙ্গে, যেভাবে প্রেয়সীর সঙ্গে মেলে প্রণয়ী। তবেই আর্ট জন্ম নিলে। একই জিনিস, একই ভাব, রকম রকম প্রক্রিয়ায় বলা হল, করা হল, অথচ দুটোই ভাল হল দেখি, এইখানে আর্টের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা কোনো ভাল উপায় নির্বাচন করে নিয়ে চলার বাঁধা উপায় রইল না, কাজেই বলতে হল আর্ট আর তার প্রক্রিয়া দুই অনির্বচনীয়—কেমন করে কি উপায়ে যে আর্টিস্ট রস দেবে তার ঠিক নেই। রসের প্রকাশ বিচিত্র পথ ধরে এল সামনে—আমার রুচি অনুসারে আমি তাকে এমন পাত্রে কি তেমন পাত্রে ধরে নিলেম। বাঁশি বীণা এসব তৈরির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাঁধা প্রকরণ আছে, সেটা ধরে ক্রিয়া করে চললে তবে ঠিক বাঁশি ঠিক বীণা প্রস্তুত হয় এবং এই দুটো যন্ত্রই বাজাবার প্রকরণ প্রণালীও বাঁধা; বীণাতে ফু দিলে বীণা বাজে না, বাঁশিতে মেজ্‌রাপ্‌ ঘষে বাঁশি বাজায় কে ? সুতরাং সামান্য প্রকরণ হল বাজানোর—বাঁশিতে সাত সুর ছেড়ে ছেড়ে এবং বীণাতে সাত সুরের পর্দা চেপে চেপে ধরে, কিন্তু কি বাজাই সেখানে আমার স্বাধীনতা চাই। কেমন ভাবে বাজাই সেখানেও রুখতে গেলে হাত চলে না দেখি—কিংবা চলে এমন বাঁধা রাস্তায় যে প্রায় কলে বাজনা হয়ে ওঠে, সঙ্গীতকলার দিকেও যায় না ব্যাপারটা। এই দুই পথেই চলেছে সঙ্গীত ক্রিয়া এবং তার ফলে একদল হয়ে উঠছে শুকনো প্রকরণিক, আর একদল হয়ে উঠছে—নানা রকম সৃষ্টি এমনকি অনাসৃষ্টি করতেও মজবুত। অবশ্য অনাসৃষ্টি কিছু বেশি দিন টেঁকে না সংসারে, সৃষ্টির নিয়মে সে আপনা হতেই ঠিক পথ ধরে আস্তে আস্তে। ঠিক যেভাবে ধূমকেতু প্রথমটা একেবারে ছাড়া পেয়ে দৌড় দেয়, পরে আস্তে আস্তে আপনিই তার সুন্দর বাঁকটি লাভ করতে চলে, সেই ভাবে অনাসৃষ্টি সেও আপনা হতেই নানা দিকের নানা বাধায় ঠিক হয়ে আসে ক্রমে এবং সুন্দর সৃষ্টির নিয়মে ধরা পড়ে যায়। ছেলে একটা বিগড়ে গিয়ে অনাসৃষ্টি বাধালে তার শোধরাবার রাস্তা কোনদিন বন্ধ হয় না, কিন্তু একটা কলের ঘড়ি বিগড়োলো তো বিগড়োবার দিকেই গেল—ঘড়ি তো জীবন্ত নয়, সে যে কল তার গ্যারান্টি আছে এতদিন চলবার পর তারপর অচল হবেই জানা কথা। আমাদের সঙ্গীত যখনই শুধু কলের মেট্রোনোমের স্পন্দন ধরে চলল, গায়কের হৃদ্‌স্পন্দন ধরে নয়, তখনই দেখলেম সেটা ভারি বিশ্রী জিনিস হয়ে উঠল। আর যখন গুণী সে ক্রিয়া প্রক্রিয়ার বাঁধনের কষন একটুখানি এলিয়ে নিয়ে লসন পৌঁছে দিলে কাজের মধ্যে তখন নর্তকীর কোমরে মেখলার বেড় যেমন তেমনি টেকনিক্‌ বা প্রকরণের বাঁধনও শোভার কারণ হল, আর্টিস্টের রচনাকে ঘিরে ঘিরে ছন্দে দুলে উঠল রচনার প্রক্রিয়া, রচনার অন্তরের সঙ্গে এক তালে মিলল বাহিরের ছাঁদ! রূপ ফোটানো এবং রস গছানো দুয়ের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মিল হল, পরিণয় হল, তবে হল আর্টের জন্ম। নয়তো জিনিসটা চোখের উপরে এল, কানের কাছে এল, বাতাসে ভেসে গেল—মনে পৌঁছল না, প্রাণেও বাজল না কিছু। রূপের রাস্তা ধরে রসে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আর্টিস্ট হাত গুটিয়ে বসল, তারপর এল ভোক্তার পালা, দর্শকের পালা, শ্রোতার পালা। শিল্পশাস্ত্রের রসশাস্ত্রের কথা অনেকখানি এই ভোক্তার দিকে

রস উপভোগের নানা প্রক্রিয়ার সন্ধান দিয়ে চলেছে বিস্তারিত ভাবে। রচয়িতাকে কতকটা ভোক্তারও কাজ করতে হয়, কেননা সে-ও তার বাইরে এবং তার অন্তরে যে রসের ফোয়ারা ছুটছে তাকে উপভোগ করছে। মধুকর মধুর স্বাদ পেলে তবেই না মধু সংগ্রহ করে সে মধুর পদার্থ সৃজন করে চলল, না হলে শুধু মোম দিয়েই সে মৌচাক রচনা করে চলত, আর যে ভাবে বোলতা তার চাকটা খুব কাজের জিনিস করে তোলে সেই ভাবেই কাজের হয়ে পড়ত সব রচনা মানুষের—এক ফোঁটাও বাজে মধু থাকত না রচনায়। এই যে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা, এ তো সবাই পেলে না, শুধু দুই শ্রেণীর মানুষ পেলে দেখি—শিল্পী আর রসিক!

এই স্বাদ গ্রহণের দিক, এটা শিল্পক্রিয়ার একটা ভারি রহস্যময় দিক—কোনো বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এই ক্ষমতা লাভ করা অসম্ভব বললেও চলে। অথচ এ ক্ষমতা না পেলে কি শিল্পী, কি রসিক কারু চলে না। এই স্বাদ বা আস্বাদের কথা কেবল "ইব ইব" দিয়ে অলঙ্কার শাস্ত্রকারেরা বোঝাতে চেষ্টা করছেন —"হৃদয়মিব প্রবিশন্ সর্বাঙ্গীনিব আলিঙ্গন্ ব্রহ্মাস্বাদমিব অনুভাবয়ন্" ইত্যাদি ইত্যাদি! রস অনির্বচনীয় উপায়ে আপনার স্বাদ জানায় শিল্পীকে রসিককে—দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি নানা পথ ধরে, শুধু এইটুকু সূত্র ধরে শিল্পক্রিয়া চলল। ছোঁয়ার দিক দিয়ে এক প্রস্থ শিল্পদ্রব্য মখমলের সুকোমল স্পর্শ থেকে আরম্ভ করে একেবারে মর্মস্পর্শী রচনায় গিয়ে ঠেকল। দেখাশোনার দিক দিয়েও এই ব্যাপারে ঘটল শিল্পক্রিয়ার বাইরে দেখা—কেবল চোখের দেখা থেকে একেবারে প্রাণের দেখায় গিয়ে শেষ হল। শিল্প রচনার ধারা রসের মধ্যে গিয়ে মিলল, তার স্বরূপ ধরা গেল না। 'অনির্বচনীয়' বলেই তাকে নির্দেশ করলেন পণ্ডিতেরা। যে-যে উপায় যে-যে প্রক্রিয়ায় ক্রিয়া করে যে-যে রসের উদ্রেক করা যেতে পারে তারি শুধু বিচার করে চলল রসশাস্ত্রের বিচার বিতর্ক। নদীর দুই পারের আঁকবাঁকের নানা হিসেব নিয়ে চলা গেল, কিন্তু যে সমুদ্রে গিয়ে নদী শেষ হল সেখানে আর শাস্ত্র কূল পেলে না। বিচার চলল না রসকে নিয়ে, কেননা দেখা গেল তা করতে গেলেই রস যে বিরস হয়ে যায়। শিল্পী এই রস-সমুদ্রের দিকে তাবধি করতে শিখলে কেমন করে তা জানার উপায় নেই। তবে আমাদের দিকে শিল্পীর কাছ থেকে কিভাবে রস আসা যাওয়া করছে নানা রূপের বাহনে বাহিত হয়ে তার দিকে নজর করে দেখলে দেখি রস এক থেকে অনেকে সঞ্চারিত হয়ে যেতে চাচ্ছে। এক রস সংক্রামিত হচ্ছে বহুতে, বহু থেকে একে মিলছে রস, এই ভাবের একটা ক্রিয়া যে চলেছে শিল্পীর দিকেও নানা রস পৌঁছোবার সময়ে তা আন্দাজ করা যায়। আলো ছায়ার মধ্যে দিয়ে নানা রূপে নানা ভাবে বিচিত্র হয়ে আসছে রস শিল্পীর হৃদয়ে এটা ঋষিরা বলেছেন—"ছায়া তপয়োরিব ব্রহ্মলোকে"—রূপ আপনাকে লুকোচ্ছে কখনো আলোর পর্দায়, কখনো ছায়ার পর্দায়, কখনো বা নিজেকে প্রকাশ করছে আলোকে সুস্পষ্ট অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে। কখনো চোখের উপরে ভাসল রূপ, কখনো প্রাণের গভীরে গিয়ে পেলেম তার দেখা, এই ভাবের ক্রিয়া ধরে সৃষ্টির রস পৌঁছোচ্ছে সকলের কাছে—শিল্পী কিংবা সাধারণ এটা বাছে না, এই নিয়ম—রস ঝরেই চলেছে অনবরত বিশ্বের চারিদিকে পাত্রপাত্র নির্বিচারে। কিন্তু একদল মানুষের মন এই রস পাওয়া বিষয়ে দেখছি নিষ্ক্রিয়। অন্য দলের মন সর্বদা সচেতন রইল। এই দুই থাকে পড়ে গেল শিল্পীর দল আর সাধারণের দল। একের মনোরসনা জড় হয়ে রইল এই সৃষ্টির অনির্বচনীয় রসের বিষয়ে কিংবা রইল নিযুক্ত সামান্য রস অপরস সমস্ত চাখতে, আর একদলের মন ভ্রমরের মতো রসের আস্বাদে মত্ত হয়ে রইল সংসারের দরকারা সমস্ত কাজ ফেলে। একদলের কাছে শিল্পক্রিয়ার কোনো মূল্যই রইল না, অন্যদল বললে—"ওটাই চাই, না হলে চলে না।" রসের মধ্যে ডুবে থেকেও একদল যে রসের আস্বাদ পায় না, তার কারণ তো মনে হয়— চায়

না বলেই পায় না। এই আস্বাদ নিয়ে তফাত যেমন শিল্পীতে ও সাধারণে, তেমনি এই আস্বাদ শিল্পীতে শিল্পীতেও একটা প্রভেদ সৃজন করে, যাতে করে একের শিল্পক্রিয়া অন্যের আচরণ করা শক্ত হয়ে ওঠে। রস আস্বাদ করা গেল তবে তো শিল্পের মধ্যে দিয়ে রস সঞ্চারের চেষ্টা হল; রসের স্বাদ নেই, শিল্প নেই! সাধারণ যে একেবারে রসে বঞ্চিত হল তা নয়—দক্ষিণের হাওয়া তারও মন মাতায়, শিল্পীরও মন উতলা করে। কিন্তু সাধারণ যেখানে চুপ করে রইল শিল্পী সেখানে গেয়ে উঠল—দক্ষিণ হাওয়ার ক্রিয়ায় সাড়া দিলে শিল্পীর হৃদয়-বীণা! এই শিল্পীর হৃদয়-বীণার তার সে বিশ্বের রসের তার গ্রহণের জন্য পলকে পলকে নতুন ছন্দে বাঁধা হচ্ছে—আপনি তো নয়। এখানে আর্টিস্টের তপস্যা কাজ করছে, রসিকের সাধনা কাজ করছে। এই জন্যে আর্টিস্টকে বলা যায় ক্রিয়াবান এবং ক্রিয়া থেকেই নানা কলার সৃষ্টি এটাও বলা হয়। সাধারণ যেখানে রস পাচ্ছে না, সেখানে সে নিষ্ক্রিয় রইল, শুধু জানিয়ে দিলে, কিছু ভাল লাগছে না কাজ কর্ম—মন উড়ু উড়ু করছে। কিন্তু এই স্বাদহীন অবিচিত্র দিন আর্টিস্টের কাছে যখন এল, তখন আর্টিস্ট তা থেকেই রস পেয়ে গাইলেন—

“এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না,
মন উড়েছে উড়ুক না রে
মেলে দিয়ে গানের পাখ্না।”

—যে অবিচিত্র মুহূর্তগুলো সাধারণ মানুষ তাস খেলার কাজেই কাটিয়ে দিলে সেই মুহূর্তগুলো অপূর্ব রসের ছন্দে দুলিয়ে দিয়ে গেল আর্টিস্টের মন, শিল্প রচনা সোনার ডানা মেলে বেরিয়ে এল অবিচিত্র দিনের আবরণ কেটে। আর্টিস্টের মন কিভাবে দিনরাত ক্রিয়া করে চলেছে তা থেকে দেখা গেল—শিল্পীর মনের ক্রিয়া যেসব অনির্দিষ্ট পথ ধরে চলেছে, শিল্পক্রিয়া তারই ছাপ পেতে পেতে নানা রূপ ধরছে বিরল-বিচিত্র বহু-বিচিত্র। আর্টিস্ট যে রস দিচ্ছে আমাদের তার রচনার মধ্যে দিয়ে সে রস অনির্বচনীয়। তাকে হিসেব করে যাচাই করে নেওয়া চলে না। কিন্তু যেসব বস্তু নিয়ে ক্রিয়া প্রক্রিয়া নিয়ে রসের পাত্র সমস্ত রচনা হচ্ছে তাদের হিসেব করে দেখা চলে অনেকখানি। রঙ রেখা ছন্দ বন্ধ সুর সার সমস্তই আস্তে আস্তে আপনাদের মান পরিমাণ গতাগতির রহস্য ধরে দিলে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির কাছে। রসের বিচার করা চলল না, কিন্তু রসের উপকরণ প্রকরণ ইত্যাদির ভাল মন্দ যাচাই করা চলল।

শিল্পীর দিকে রসের ক্রিয়া এইভাবে হল। বিশ্বকর্মার দিক থেকে সে বিচিত্র বস্তু ধরে প্রকাশ পেয়ে বিচিত্র হয়ে ধরা দিলে আরেক ক্রিয়াশীল ও ক্রীড়াশীল শিল্পীর কাছে। শিল্পী এরই রস ও স্বাদ পেলে যেমনি, অমনি সে রচনা ক্রিয়ায় অগ্রসর হল। এবারে বিচিত্র সে একের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সংক্রামিত হতে চলল এক থেকে আরেকে, একই ছবিকে একই রচনাকে, বিচিত্র মনের গতি বিচিত্রভাবে ধরে চলল, রস বহুধা হয়ে দেখা দিলে, এই হল গোড়ার কথা, তারপর এল শিল্পীর ক্রিয়া পদ্ধতি ও তার বিচার। শিল্পী যে অনির্বচনীয় রসের স্বাদ পেল তাকে পুরোপুরি নানা বস্তু দিয়ে নানা রচনায় ধরে ফেলা তার সাধ্য নেই। কথা দিয়ে সব কথা বলা চলল না, রূপ দিয়ে সবখানি দেখানো গেল না। লোহার তার দিয়ে অনির্বচনীয় সুরের তার পৌঁছোনো গেল না ভোক্তার কাছে, এই জন্যে শিল্পক্রিয়াকে কতক ইঙ্গিত আভাসে কতক বা ফলিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জানাতে হল। এই দুই রকম ক্রিয়া দুটো সুনির্দিষ্ট পথে নিয়ে চলল মানুষের আর্টকে, দুটো সুস্পষ্ট ভাগ দেখা দিলে শিল্পকর্মের প্রক্রিয়ায়। একটুখানিকে দিয়ে অনেকখানির ইঙ্গিত দেওয়ার প্রক্রিয়া এবং অনেকখানি দিয়ে একটুখানিকে

ফলিয়ে দেওয়ার প্রকরণ তাবৎ শিল্পকর্মকে এই দুই শ্রেণীতে রেখে দেখা চলল। বিরল-বিচিত্রতা এবং বহু-বিচিত্রতা এই দুই কেন্দ্র—এর মাঝে এ-ক্রিয়ার যোগাযোগে মানুষ রকম রকম শিল্প রচনা করে চলল।

যেখানে ঘটনাটা বড় বেশি কিছু নয় কিন্তু ভাবটা গভীর, সেখানে ইঙ্গিতে আভাসে অনেকখানি ব্যক্ত করতে হল এবং রচনার প্রক্রিয়াও সেখানে ক্রিয়ার স্বল্পতা ও সরলতাকে বরণ করলে, আবার যেখানে ইঙ্গিত দেবার অপেক্ষা নেই একটুকু সেখানে ইনিয়ে বিনিয়ে নানা ডাল পালায় বিচিত্র করে তোলা হল, কোথাও বা বিচিত্র ঘটনা বিচিত্র ভাবের ঘাত প্রতিঘাত রঙের পর রং, রেখার পর রেখা আলো ছায়ার নানা কায়দা দিয়ে এক জিনিসকে বৃহৎ ব্যাপারে পরিণত করে যাওয়া গেল। এই বিরল-বৈচিত্র্য ও বহু-বৈচিত্রের ক্রিয়া প্রক্রিয়া ধরে বিশ্বপ্রকৃতিতে হয়ে চলেছে নানা কাণ্ডকারখানা। বর্ষার দিন রাতের আকাশে গভীরতা রয়েছে, সুতরাং এই দুই ছবি বিরল-বিচিত্র-ক্রিয়া দিয়ে নিষ্পন্ন হল। স্বভাবের নিয়মে একটুখানি বসন্তের দিন ফুলে ফলে গানে গন্ধে বিচিত্র হয়ে উঠল—রং ফলানোর সুর ধরার সুগন্ধি আবির ছিটানোর অন্ত রইল না! বর্ষায় ঘনিয়ে উঠল, বসন্তে ফেনিয়ে উঠল রস ও রস দেবার ক্রিয়া প্রক্রিয়া—কোথাও বিরল-বৈচিত্র্য কোথাও বহু-বৈচিত্র্যের পথে। আবার সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, সেখানে বিরলতা বহুলতা দুয়ের ঘাতে প্রতিঘাতে বিচিত্র হয়ে ফুটল ছবি—দিক জুড়ে যেন কাশ্মেরী বুনন্ ক্রিয়া চলল। রং রেখার অতি বিচিত্র সমাচার। শিল্পক্রিয়ার এই যে দুই প্রক্রিয়া বিরল-বৈচিত্র্য আর বহু-বৈচিত্র্য সাধন এ কাব্যকলায়, নাট্যকলায়, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে সব দিক দিয়ে আপনাকে জাহির করেছে। একটুখানি ইঙ্গিত দেওয়া এবং অনেকখানি বিনিয়ে বলা, এই দুই কূলের মধ্যে ধরা রইল সমস্ত শিল্পের গতাগতি। একটুখানি দিয়ে রস জাগাই বা অনেকখানি দিয়ে রস জাগাই দুই-ই আর্ট। রস জাগল কি না, আলো জ্বলল কি না এই নিয়ে যখন কথা তখন অনেক কাঠ-কাঠরা স্তূপাকার করেই জ্বাললেম বা একটি প্রদীপে একটুকু তেলে আলো করলেম—আর্ট হিসাবে দুই ক্রিয়াকেই বলতে হবে ভাল হল। রোম সম্রাট দেশকে দেশ জ্বালিয়ে দেওয়ালি বাধালে, হনুমান লঙ্কার চালে চালে আগুন ধরিয়ে উৎসব করলে এবং একটি ছোট মেয়ে এতটুকু কুলুঙ্গীতে একটি পিদুম, বা খোকা সে একটা মাত্র ফুলঝুরি পুড়িয়ে আনন্দ বাধালে, আর্টের হিসেবে এই ক'টা ক্রিয়াকে বাদ দেওয়া গেল না; কেননা সবাই রস জাগালে রস জাগানোর উপকরণের স্বল্পতা বা বহুলতা নিয়ে কথাই উঠল না। আবার কেবল উপকরণই যথেষ্ট পরিমাণে এক জায়গায় করলেম, কিন্তু আগুন জ্বলল না, উপকরণের ভারে চাপা পড়ে খানিক ধুঁয়া দিলে মাত্র, অথবা প্রদীপের তেলে এবং পলতের তুলোয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত করলেম এমন যে আগুন মিট্‌মিট্ করতে থাকল, আলো-আঁধারে ঘর আরো অন্ধকার হল, ফুলঝুরিটাও নিস্তেজভাবে শুধু ঝরার ইঙ্গিত করতেই কাজ শেষ করলে—এ হলে ক্রিয়া প্রক্রিয়া সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেল, কর্মটাও শিল্পের বাইরের জিনিস হয়ে রইল। বিরল-বৈচিত্র্য বহু-বৈচিত্র্য হল বটে নিয়ম, কিন্তু সেখানে প্রক্রিয়া চেপে দিলে আসল জিনিস যে রস তাকে, সেখানে আর্ট রইল না। আগুনটা জ্বালানি কাঠ-কাঠরাকে ছাপিয়ে দেখা দিলে, প্রদীপের শিষ নিষ্কলুষ আলো দিয়ে শোভা পেলে তেল, প্রদীপ, পলতের উপরে, তবেই হল কর্মটা সার্থক ক্রিয়া প্রক্রিয়া নিয়ে। এ না হলে সবই রইল কিন্তু রস জাগল না, ব্যর্থ ক্রিয়া প্রক্রিয়া রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত গুণটি নষ্ট করে দিয়ে গেল। আমরা তো রসশাস্ত্র শিল্পশাস্ত্র সবই পড়ে চলি, কিন্তু রস পাই কোথা? সেখানে শুধু রসের উপকরণ প্রকরণ স্তূপাকার করে ধরা হল কিন্তু সেগুলোতে কেউ আগুন ধরালে না, রচনাকে ভাসিয়ে নিলে না রসের স্রোত! কাব্যে শিল্পে ছন্দ ক্রিয়া রইল ঠিক কিন্তু আছে বলে আপনাকেই সে জাহির করতে পারলে না, রসের তলানি হিসেবে রইল ক্রিয়া প্রক্রিয়া ছাই ভস্ম! তাই বলি,

শুধু ক্রিয়া প্রক্রিয়া—তা সে বিরল-বিচিত্রই হোক বা বহু-বিচিত্রই হোক, তা করে গেলেই যে রচনা সার্থক হবে এমন কথা নেই। এই দুই খাত—এর মধ্যে দিয়ে চলেছে রচনা-প্রবাহ কিভাবে সেটা দেখি— আর্টিস্টদের বাদশা সাহাজহাঁ তাঁর রচনা পাষাণের অক্ষরে ধরা গেল। মোগল বাস্তু-শিল্পের গতাগতি, বিরল-বৈচিত্র্য বহু-বৈচিত্র দুই পথেই চলল—মোতি মসজিদ, সেখানে কোনো কিছুরই বাহুল্য নেই নিষ্কলুষতার শুভ্রতার একটুখানি আভাস, প্রকাণ্ড দুর্গ প্রাকারের রক্তবর্ণ পাষাণের বুকে একটুখানি সুধার প্রলেপের ব্যঞ্জনা। তারপর তাজবিবির রৌজা, সেখানে একটি ফোটা চোখের জল ব্যথিত হৃদয়ের রক্ত বিন্দুর সঙ্গে মিশে বিচিত্র আলপনা টেনে চলল সাদা পাথরের গায়ে, প্রেমের জাল বুনে চলল দিনের পর দিন ধরে একটুখানি স্বপ্নের চারিদিক ঘিরে, এমন কত ব্যঞ্জনা একটুখানি বিরহের স্বাদ জানাতে! এর সঙ্গে গড়ের মাঠের স্মৃতিস্তম্ভ স্মৃতিসৌধ মিলিয়ে দেখ, কোথাও একটুখানি কোথাও অনেকখানি ক্রিয়া প্রক্রিয়া উপকরণ প্রকরণ দিয়ে রচা কিন্তু ব্যঞ্জনা নেই রসও নেই, কেবল বাস্তক্রিয়া আর ইট কাঠ পাথরের অপচয়!

"বৃক্ষৈব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠতেকঃ" মহাশূন্যের মাঝে ফুটল একটিমাত্র রূপ বিরল-বৈচিত্র্য ক্রিয়া ধরে, অবর্ণনীয়কে বর্ণন করতে সবটাই প্রায় ইঙ্গিতের মধ্যে রইল ছবির! এই ধরনের বিরল-বিচিত্রতার প্রসার ভারতবর্ষের শিল্পক্রিয়ায় বেশি স্থান পায়নি, কিন্তু মিশরের ভাস্কর্যে, চীনের ও জাপানের চিত্রশিল্পে কবিতাতে এই বিরল-বৈচিত্র্য সম্পাদনের চেষ্টা প্রচুর পরিমাণে হয়েছে। ভারতবর্ষের বুদ্ধমূর্তি—কেবল সেখানেই এই নিয়মের দেখা পাওয়া যায়, নিঃসঙ্গতা ও নিশ্চলতা এবং অনেকখানি স্তব্ধতা ধরে এই ভাবের শিল্পক্রিয়া করা চলল। তারপর বহু-বিচিত্রতার পথ—মোগল বাদশাহের স্নানাগার শিশ্‌মহলের দেওয়াল অবিরল নক্সার বহু-বিচিত্রতাকে ধরে গন্ধর্ব নগরের রং রেখার ফোয়ারাকে হারিয়ে দিলে—অন্তহীন বর্ণচ্ছটা—দিক্‌ভোলানো রেখার ঘোরপ্যাঁচ এক চমৎকার শোভার সৃষ্টি করলে! স্থাপত্যের দিক দিয়ে এই বহু-বিচিত্রতার নিয়ম ধরে গেল দক্ষিণ ভারতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির, মঠ, গোপুর, বিমান ইত্যাদির নির্মাতারা! সারা ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য ক্রিয়া এই বহুবিচিত্রতার পথে গেল, বিরল-বিচিত্রতার দিকে ক্বচিৎ গেল দেখা যায়। মোগল আমলে স্থাপত্য ধরলে মধ্যপথ কোথাও স্বল্পবিচিত্র কোথাও বহুবিচিত্র। এই যে দুই বিপরীতমুখী পথ এরি গতাগতি ধরে চলতে চলতে মানুষের শিল্পক্রিয়া ছবি, কবিতা, নাচ, গান সমস্তই বিচিত্ররূপ ধরে প্রকাশ পেলে। সুবিচিত্রতা মোগল শিল্পের, বহু-বিচিত্রতা ভারত-শিল্পের এবং বিরল-বিচিত্রতা মিশর শিল্পের মূলমন্ত্র। চীন ও জাপান এবং ভারতের উপনিবেশ সমস্তের শিল্প কতক মোগল কতক ভারত-শিল্পের রাস্তা ধরে বিচিত্ররূপ ধরলে—কখন বিরল কখন বিচিত্র তাদের শিল্পক্রিয়ার রাস্তা সমস্ত, কিন্তু মিশর এবং ভারত এই দুই প্রাচীন দেশ, এখানেই শিল্প দুটো বিভিন্ন রাস্তা ধরলে যেটা এদের শিল্পে সুব্যক্ত রইল। এই দুই পথ এবং এদেরই জড়াজড়ি নিয়ে বিচিত্র রকম শিল্পক্রিয়ার সৃজন হল দেশে দেশে—ঈজিপ্টের আর্টের বিরল-বৈচিত্র্য খানিক পেলে গ্রিস, এইভাবে এক ধারার সঙ্গে অন্য ধারা এক পথের সঙ্গে অন্যের মিশ্রণে উঠল শিল্পের নানা ছন্দ ছাঁদ। প্রকৃতির নিয়মে যেভাবে নতুন নতুন শোভা নিয়ে ভাব নিয়ে সকাল আসে, সন্ধ্যা আসে, দিন রাত যাওয়া আসা করে নানা ঋতু, নানা ছবি দিয়ে, ঠিক সেই ভাবের ক্রিয়া ধরে চলল মানুষের রচনাগুলোও। সাহিত্য জগতে কাদম্বরী-রচয়িতা বহু-বিচিত্রতাকে বরণ করলেন—এক রঙ অশেষ বর্ণনার অফুরন্ত ধারায় বয়ে চলল একটুখানি গল্পকে ভাসিয়ে নিয়ে। কাব্য জগতে কালিদাস বিচিত্রতাকে সৃজন করলেন—এক টুকরো মেঘ একটুখানি কথা নিয়ে ঘনিয়ে উঠে বিচিত্র দৃশ্যের উপরে আলো ছায়া ফেলতে ফেলতে চলল অলকার চিত্র

বিচিত্র যক্ষপুরীর একটি ঘরের অবিচিত্র জীবনটির অভিমুখে। বিরল-বিচিত্রতার বিশাল ছন্দ, তার প্রকাশ আমাদের কাব্যে, সাহিত্যে বিরল হলেও বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে তার দেখা পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকামের আখ্যায়িকা এই বিরল-বৈচিত্র্যের নিয়মে রচা। জবালাতনয় সত্যকাম মাতাকে প্রশ্ন করছেন—"ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎসামি কিংগোত্রে স্বহমস্মীতি!" মাতা জবালা উত্তর দিলেন—"নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি, জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা।" গৌতমের কাছে উপস্থিত হয়ে সত্যকাম বললেন—"ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তম্‌।" গৌতম শুধোলেন—"কিংগোত্রো নু সোম্যাসীতি?" এতে সত্যকাম উত্তর দিলেন—"নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্‌গোত্রোহহমস্ম্যপৃচ্ছং মাতরং সা মা। প্রত্যব্রবীদ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রোস্ত্বমসি, জবালা তু নামহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি সোহহং সত্যকামো জবালোহস্মি ভো ইতি।" এর পর আর দু-চার ছত্রে গৌতমের উক্তি দিয়ে আখ্যায়িকা শেষ হল। মায়ের সঙ্গে সত্যকামের কথা—গুরুর সঙ্গে সত্যকামের কথা—দু কথায় গল্পটা শেষ হল। বর্ণনা, দৃশ্য এসব একটুও নেই, সাদা ঝক্‌ঝকে পটের উপরে দুটি টান ইঙ্গিত দিতে থাকল অনেকখানি। উপনিষদের এই আখ্যায়িকা হল বিরল-বৈচিত্র্য সাধনের সুন্দর উদাহরণ। এই একই আখ্যায়িকাটার বহু-বৈচিত্র্য সাধন করে আরো সুন্দর হল বলা চলে না, কিন্তু আর একটি সুন্দর কবিতা হল দেখ বাংলাতে—

"অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যা-সূর্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম মাঝে ঋষি পুত্রগণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবন গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধ শান্ত আঁখি
শ্রান্ত হোম ধেনুগণে; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মেলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটির প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি; নক্ষত্র মণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মত। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে, মহর্ষি গৌতম
কহিলেন—বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি
কর অবধান!
হেন কালে অর্ঘ্য বহি করপুট ভরি
পশিলা প্রাঙ্গণ তলে তরুণ বালক;
বন্দি ফল ফুল দলে ঋষির চরণ পদ্ম
নমি ভক্তিভরে কহিলা কোকিল কণ্ঠে—

সুধাস্নিগ্ধ স্বরে—ভগবন! ব্রহ্মবিদ্যা অভিলষি
আসিয়াছি দীক্ষা তরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম মোর নাম—”

এই ভাবে উপনিষদের ছবির সাদা অংশগুলো খালি ভর্তি করে দিলেন কবি বিচিত্র দৃশ্য বিচিত্র বর্ণনা দিয়ে—ছবির পর ছবি ভাবনার পর ভাবনা একত্র হয়ে ছন্দের দৃশ্যের ভাবের বিচিত্র লীলা দেখিয়ে চলল রচনা।

এই যে দু রকমের শিল্পক্রিয়ার প্রক্রিয়া তা সার্থক হল যেখানে রচয়িতার উৎকৃষ্ট রসের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রক্রিয়া ধরে ক্রিয়া চলল; শুধু প্রক্রিয়ার হেরফের রইল মুখ্য হয়ে কিন্তু লক্ষ্যটা হয়ে গেল গৌণ—সেখানে একটা জটিলতা বা শূন্যতার সৃষ্টি হল মাত্র, যথা—

“কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল
তার মধ্যে মণিপুর পরম শিবের স্থল
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি।”

এ সমস্ত কথা ছন্দে বলা হল মাত্র, গদ্যে বললেও দেষ ছিল না, খালি কথার স্তুপ সৃজন হল, রস হল না, বৈচিত্র্য থাকা না থাকা সমান হল। আবার কোনো রস-বৈচিত্র্য নেই এমনও ছক্রিয়া দিয়ে সাদা কথা বলা গেল—

“সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন।”

কবি চণ্ডীদাসের লেখা থেকে এ দুটোই তোলা হল কিন্তু খালি প্রক্রিয়া, রস এখানে কোথায় তাই যেন জানিয়ে দিতেই কবি চণ্ডীদাসই লিখে গেলেন শিল্পক্রিয়ার দুই রাস্তা ধরে সুন্দর সুন্দর কবিতা। প্রথম বিরল-বৈচিত্রের রাস্তায় চলল কাব্যক্রিয়া—

“সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।”

রং রেখা রূপ সমস্ত বাদ দিয়ে লিখে চললেন কবি। এবার বিরল-বৈচিত্র্য এবং বহু-বৈচিত্র্য দুই মিলিয়ে রসের সৃজন করলেন কবি চণ্ডীদাস—

আরম্ভ হল বিরল-বৈচিত্র্য দিয়ে—

“বেলি অসকালে দেখিনু ভালে
পথেতে যাইতে সে
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে?”

শুরু হল এবার বহু-বৈচিত্রের কাজ—

"সই রূপ কে চাহিতে পারে
অঙ্গের আভা বসন শোভা
পাসরিতে নারি তারে
বাম অঙ্গুলিতে মূকুর সহিতে
কনক কটোরি হাতে
সিতায় সিন্দুর নয়নে কাজল
মুকুতা শোভিত নথে
নীল শাড়ি মোহন করি
উছলিতে দেখি পাশ
কি আর পরাণে সোঁপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ।" ইত্যাদি

অথবা যেমন একেবারেই বহু-বৈচিত্র্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল কাজ—

"পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী
সখীর সহিতে যায়।" ইত্যাদি

বহু-বিচিত্র—ফুটে ফেটে ছড়িয়ে পড়ার দিকেই তার ঝোঁক, বিরল-বিচিত্র—তার চেষ্টা না ফোটার দিকেই। শিল্প কৌশল এই দুই দিককে সুন্দর গতি দেয় নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা রচনার মুখ্য উদ্দেশ্যে যে রস তাই ফোটাতে।

পর্বত জিনিসটা নানা শিলাখণ্ডে নানা গাছপালা নিঝরে বহুল পরিমাণে বিচিত্র, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি বিরল-বিচিএতার প্রাচীর টেনে দিয়েছে পর্বতের চূড়ায় চূড়ায়—খণ্ড খণ্ড পাথরগুলো না হলে পর্বতের অস্তিত্ব লোপ করে পাথরের স্তূপকেই প্রকাশ করে চলত, বহু-বিচিত্র যা তার উপরে বিরল-বিচিত্র আলো ছায়ার ঘোমটা পরে পর্বত দেখাল নীল অতি গম্ভীর ও বৃহৎ। আকাশ বাতাস পর্বত জল স্থল যে নিয়ম স্বীকার করে চলেছে তাকেই মেনে নিয়েছে মানুষ আপনার শিল্পক্রিয়ায়। এই স্বভাবের নিয়ম মানলে বলেই মানুষের শিল্প স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারলে, ছন্দিত হতে পারলে এক থেকে অনেকের মধ্যে। ছবির সকাল যে সত্যিকার সকালের গতি ধরে সত্যি হয়ে উঠল রসিক মানুষের কাছে—কাদম্বরীর গোড়াতেই চন্দ্র অস্ত গিয়ে সকাল হচ্ছে—রচয়িতা শিল্পীর পথ ধরে বর্ণন করতে চললেন ঘটনাটি—চাঁদ অস্ত যাচ্ছে—এইটুকু বলেই কথা থামতে চায়, বিচিত্র বহুবিচিত্র কিছু হতে চায় না দেখে কবি চাঁদকে ঠেলে রেখে রঙের অবতারণা করলেন—"একদাতু সন্ধ্যারাগ লোহিতে" সকালের রং বিচিত্র হতে বিচিত্রতর হয়ে উঠতে চলল দেখে কবি পদ্মফুলের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—সামাল; রঙের ক্রিয়া বদলাল—"গগনতল কমলিনী মধ্যমনুরক্ত" সূর্যের আলো অসম্ভব রকমে চটপট দেখা দেয় বলে এমন সময় কবি আর এক পোঁছ ফিরিয়ে দিলেন রঙের খেলা—"গগনতলকমলিনী মধ্যমনুরক্ত-পক্ষপুটে বৃদ্ধ হংসইব মন্দাকিনী পুলিনাদপরজলনিধি তটমবরতি চন্দ্রমসি!"[১] যে চাঁদ চটপট ডুবতে চাইছিল এবং যে সকাল হঠাৎ ফুটতে চাইছিল রঙ্গমঞ্চের কৃত্রিম দৃশ্যের পথ ধরে তাদের স্বাভাবিক পথে চালালেন শিল্পক্রিয়ার দ্বারায় কবি—আলো আস্তে ফুটল, চাঁদ আস্তে ডুবল, লেখাতে সকাল এল, যে ভাবে যে প্রক্রিয়ায় চোখের সামনে সত্যিকার সকাল আসে। কিন্তু শিল্পে বা সাহিত্যে কিংবা কাব্যে এই

কাদম্বরীর রচয়িতার একটি মাত্র প্রভাব বর্ণনাতেও পুনরাবৃত্তি হয়ে হয়ে চলল না। কত কবির কাছে কত প্রভাত এল অফুরন্ত সৌন্দর্য ও রস নিয়ে তার ঠিক নেই। বেদের মধ্যে ঋষিরা, কবিতার মধ্যে কবিরা, ছবিতে চিত্রকরেরা, যুগে যুগে দেশে দেশে বিরল-বিচিত্র অতি-বিচিত্র করেই লিখল বটে কিন্তু একটা লেখা ঠিক আরেকটার মতো হল না—এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। কলের প্রক্রিয়া রসায়নের প্রক্রিয়ায় যা একবার হল তা হল, আবার সেই ক্রিয়া করলে ঠিক সেই পদার্থটাই পাওয়া যাবে; কিন্তু শিল্পের প্রক্রিয়া হল এর বিপরীত—দিনের পর রাত আসছে ফিরে ফিরে কিন্তু স্বভাবের ক্রিয়ায় একই রাত একই দিন তো ফিরে ফিরে পুনরাবৃত্তি হয়ে চলল না, দিন রাতের অবিচিত্র আসা যাওয়ার মাঝে রইল নতুন রং, নতুন ভাব, নতুন যা-কিছু হতে পারে তা। এইভাবে বিচিত্র হল সৃষ্টির মধ্যে আলো-অন্ধকারের আনাগোনা এবং এইভাবেই এল রস শিল্পে। একের নিয়ম এবং বহুর নিয়ম ধরে যে প্রক্রিয়া চলেছে আবহমান কাল নতুন থেকে নতুনের সৃজন পথে—তারই স্বাভাবিক ক্রিয়াবশে। শাস্ত্রে যেমন ক্রিয়া প্রক্রিয়ার হিসেব তাই ধরে চললেই সে আর্ট হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রক্রিয়া নিখুঁত হলেও যতক্ষণ সে কিছুর জননী হল, ততক্ষণ হল না। সে ক্রিয়াই রইল, প্রক্রিয়াই রইল, বন্ধ্যা নারীর মতো তার সৌন্দর্য রইল হয়তো, কিন্তু রসের জননী হতে পারলে না সে। প্রক্রিয়ার কৃত্রিমতা ছাড়িয়ে উঠল যখন রচনা তখনি হল সে সার্থক; না হলে রঙ্গমঞ্চে এবং কলে যেভাবে নানা জিনিস ফোটে কৃত্রিমতা নিয়ে সেই ভাবের কাজ হল। বর্ণনা স্বাভাবিক হল যেখানে তার একটা নিদর্শন দিই:—

"পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন।"

যেমন খৈ ফোটে তেমনি প্রক্রিয়ার কৃত্রিম তাপে পট্‌পট্ চড়বড় তড়বড় হড়বড় করে ফুটে গেল কতকগুলো কথা। সব ফুটল, শুধু ফুটল না সকালের রস! ছেলের মুখেই কবিতাটা রয়ে গেল, বুকে গিয়ে এত করে ফোটানো ফুলের একটি কাঁটাও বিঁধল না। এই হল কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত শিল্পের ভানের একটি নমুনা। সব থেকেও নেই—রোল্ড গোল্ডের মতো গড় গড় গড়িয়ে বেড়াতে লাগল প্রক্রিয়ার ঠেলায় নানা কথা—সুর দিলে না—খানিক শব্দ দিলে মাত্র। কথায় চিঁড়ে ভেজে না—কিন্তু কথায় মন ভেজে—যদি কথার মতো কথা হয়। কচি ছেলে একটি কথা শিখলে—'মা'—একটি মাত্র অবিচিত্র শব্দ—কিন্তু ছেলের প্রাণ তাতে পৌঁছে শব্দটি স্বতঃস্ফূর্ত গুণ পেলে, শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রী সেই শব্দে সাড়া দিলে। কলের খোকা পুতুল—সে-ও ডাকলে 'মা'—মনে একটা ক্ষণিক কৌতুক জাগল এবং নিভল। হ্যালিডে পার্কে দেশমাতা বঙ্গমাতাকে পালে পালে নেতা বিচিত্র সুর ধরে চিৎকার করে ডেকে চলল, সাড়া বেশি দূর পৌঁছতে পারল না—মুখের কথা সে যে, প্রাণের কথা তো নয়; হাওয়া কেটেই চলল বাক্যবাণ, খানিক কানের পটহে পিটিয়ে পিটিয়ে মিলাল শব্দ আকাশে। কথা বিচিত্র হোক স্বল্পবিচিত্রই হোক তাকে বলার আর্ট জানা হল তো হল কথার মতো কথা। কথা

স্ফুরল ছেলের মুখে, কলের মুখে কথা স্ফুরল না, কথা বমন করলে কল, দুয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ হয়ে গেল!

আর্টের রচনায় এই স্ফূর্তি বলে একটা জিনিস থাকে যেটা ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে ছাড়িয়ে দেখা দেয়। এই স্বতঃস্ফূর্ত যে চেতনা তাই পৌঁছোয় সমস্ত ভাল রচনায়, তবেই তার সঙ্গে আমাদের হৃদয়তন্ত্রীর সুর মেলে। শিল্পক্রিয়ার দ্বারায় পাথর যখন চেতনাবান তখনই পাথরের সুখ দুঃখ আনন্দ বিষাদ আমাদের মনে এসে ঘা দেয়। সচেতনের সঙ্গে অচেতনের না হলে মিলন অসম্ভব! বহু-বিচিত্র বিরল-বিচিত্র এ দুটোই বহিরঙ্গ ব্যাপার আর্টের। শুধু তাদের দিয়ে মন টলানো যায় না—চিত্তই চিত্তকে আকর্ষণ করতে যখন চলে সুরূপ কুরূপ ইত্যাদির বাধা সেখানে তখন থেকেও থাকে না। এটা পদে পদে আমরা লক্ষ্য করছি—যে ভালবাসা নিয়ে এল, রস নিয়ে এল, সে নানা অলঙ্কারে সেজে এল, কিংবা একটি ফুলে অথবা একেবারেই কোনো ভূষণে নয়। সেজে এল তাতে বড় আসে যায় না—বর্ষার কালো মেঘ, সঙ্গে সে বিদ্যুৎ বাজ নিয়ে এল; শরতের সাদা মেঘ, সে চাঁদের আলোয় মাখা হয়ে এল—দুই সাজে দুই মনোহর জিনিসকে পাঠিয়ে দিলেন বিশ্বনিয়ন্তা। সবুজের ঘোমটা ঢাকা দেশ, নিরাভরণ নিরাবরণ মরুভূমি দুয়েই রস জাগালে দু রকম উপায়ে। এই বিভিন্ন পথ ধরে মানুষের কাছ থেকেও মানুষের রস পৌঁছতে চলল—ভিন্ন ভিন্ন রকমের লেখা ছবি মূর্তি স্থাপত্য ইত্যাদির উৎপত্তি হল এই নিয়ম থেকে। কোনো একটা নিয়ম শিল্পে নেই বললেও বলা চলে রসের বশে রচনার নিয়ম ওল্টাতে পাল্টাতে চলে শিল্পী। রসের মহলে পৌঁছবার অসংখ্য দ্বার, অনেক ধরনের রাস্তা এবং সোপান শিল্পীরা খুলে দিয়ে গেছেন কিন্তু রসের পন্থা এখনো কত যে অবিদিত রয়েছে, তার ঠিকানা কি, এই নতুন নতুন পথে চলাই হল শিল্পীর মনোমতো চলা। আর যারা শিল্পী নয় তারা একটা বাঁধা পথ, যে পথে সবাই চলেছে, সেই পথই লোকে নিরাপদ ভেবে সিধে চলে যায়—যেভাবে পাণ্ডার হাত ধরে লোকে দেব দর্শন করে আসে সেই ভাবে।

টীকা

১. কাদম্বরী (উদ্ধৃতির মধ্যে 'হংসইব' স্থলে 'হংস ইব' পড়িতে হইবে)

শিল্পবৃত্তি

জোর করে করা আর প্রবৃত্তির সঙ্গে করে চলা—এই দুয়ের পার্থক্য শিল্পকাজে ইতর-বিশেষ ঘটায়। এক দেয় সত্যকার শিল্প—আর দেয় মিথ্যাকার শিল্পের ভান। একটা হাতে-বোনা কাঁথা, এবং অন্যটা কলে-বোনা কাঁথা—একটাতে প্রবৃত্তি নিয়ে কাজ হল, অন্যটিতে কুলির খাটুনি দিয়ে কাজ হল। হাতে-সেলাই কাঁথা সে কলে-বোনা কাঁথাকে হার মানালে আর্টের দিক দিয়ে। নকল যা তা যতই কেন আসলের ভান করুক কোথাও-না-কোথাও এমন একটা ফাঁকি থাকে তার মধ্যে যা থেকে ধরা পড়ে যায় তার জাতির খবর।

প্রবৃত্তি হল মনের এবং তারি অনুসরণ করে মানুষ রকম রকম বৃত্তি বেছে নিতে প্রবৃত্ত হয়। চাণক্যের প্রবৃত্তি নীতিমালার, কালিদাসের প্রবৃত্তি কাব্যকলার অবতারণা করলে জগতে। চাণক্য শ্লোকে এবং ছন্দে বললেন যা বলবার, কালিদাসও বললেন কথা সেই উপায়ে। নীতিকথা সেও রসিয়ে উঠল কালিদাসের কাছে, আর চাণক্যের কাছে রসের কথা সেও গম্ভীর রকমে নীরস হয়ে উঠল, কাব্য রইল না। কবি যে ছন্দ যে ভাষা এবং যেসব মালমশলা নিয়ে কাজ করেন তাই নিয়ে নীতিশিক্ষার গুরুও লিখলেন, কিন্তু সে লেখার স্থান হল না কাব্যজগতে, নীতিপুস্তকেই বদ্ধ রইল; যথা—

“ছেলে—দেখ বাবা কালো পাখি বসে ঐ গাছে।
বাবা—রূপে কালো, কিন্তু ওর গুণ ভালো আছে॥”

ছেলের মধ্যে রস আছে, সে কালো পাখি দেখেই ভাবে ভোর, কিন্তু ছেলের বাবার মধ্যে নীতি আছে, তাই সে ফ্‌স করে নীতিকথা বললে। ছেলের কাছে সব পাখিই সুন্দর, গুণে যে তারতম্য আছে সে তা জানেই না, বাবার কথায় অবাক হয়ে শুধোলে—“কি গুণ উহার বাবা বলো না আমায়।” বাবা কোকিলের সম্বন্ধে শকুনতত্ত্ব থেকে কিছুই বললেন না কেবল একটু কবিত্বের ভান করলেন—“কোকিলের মিষ্টস্বরে শরীর জুড়ায়।”

এইবার ছেলেদের জন্যে একটু কবিতা পড়ে দেখা যাক।

“আয়রে পাখি আয়
কালো জামা গায়
আসতে যেতে ঘুঙ্গুর বাজে আমার যাদুর পায়।”

কবির কোকিল আর নীতিশিক্ষার গুণবান কোকিল কোনটা আসল কোকিল তা স্পষ্ট ধরা গেল,—একটা ছোট ছেলেও এটা বুঝে নিতে বিলম্ব করলে না কথা বলতে ও পড়তে শেখার আগে। প্রবৃত্তির ভেদে শুধু যে দুটো জিনিসকে দুই ছাঁচ দিলে তা নয়, দুয়ের মধ্যে সরস-নীরস আসল-নকল এমনি নানা ভিন্নতা দিলে।

ছেলে-ভুলানো ছড়ার বাঁধুনি একরকম, ভারতচন্দ্রের কবিতার বাঁধুনি অন্য; একজন নামজাদা কবি, অন্যজন এমন যে তার নামও কেউ জানে না, অথচ কাব্যরসে প্রবৃত্তি দুজনেরই—অতএব কাব্যজগতে আর্ট হিসেবে

দুজনের কাজের মধ্যে বাঁধুনির ভেদাভেদ ভাষার ভেদাভেদ ইত্যাদি নিয়ে উচ্চ-নীচ ভাল-মন্দ এ বিচার করা চলে না, দুজনকেই কবি বলে স্বীকার করতে হল। দুজনের দুটো কবিতা পাশাপাশি রাখি—

"ভাল মালা গাঁথে ভালো মালিয়ারে
বনমালি মেঘমালি কালিয়ারে।"

(বিদ্যাসুন্দর)

"সায়মণির কোলে রতন মণি দোলে"

কিংবা,

"দোলেরে মাল চন্দনী গোপাল"

(ছেলে-ভুলানো ছড়া)

এর কোন কবিকে প্রথম কাকে দ্বিতীয় কাকে তৃতীয় পুরস্কার দেবে রসিক বিচার করে বলতে পারে না। ফুলের মালা, রতন হার, এবং ফুলচন্দনে মেশানো মালা এক শিল্পপ্রবৃত্তির থেকে তিনই রচা হল কিন্তু ছাঁদ পেলে রুচি অনুসারে, বিভিন্ন রকমের মাল-মশলা নিয়ে আর্ট রইল এক, আর্টের প্রকাশ হল বিভিন্ন ছাঁদে।

নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলার পথ আগলে রয়েছে লোকমত ধর্মমত রাজার হুকুম এমনি অনেক জিনিস—তট যেমন আগল দেয়, ঝরনার বেগকে নিয়ন্ত্রিত করে চালায়, সেই ভাবের কাজ চলেছে মানুষের জীবনে, শিল্পী তার প্রবৃত্তি অনুসারে স্বাধীনভাবে রচনা করে যাবার সুযোগ যদি পেয়ে যেত তবে সে কথাই ছিল না, অনিয়ন্ত্রিতভাবে সে যা-তা গড়ে লিখে বলে কয়ে যেতে পারত। কিন্তু নিয়মের দ্বারা বিধৃত এই বিশ্বসৃষ্টি, তার মধ্যে শিল্পীও ধরা পড়বে না, ছাড়া থাকবে, চলবে যেমন খুশি প্রবৃত্তির বশে,—এ হতে পারলে না, বিশ্বপ্রকৃতি শিল্পীর মনকে ও কাজকে আলোছায়ার রঙের রেখার সুরের ছন্দের নিয়মে বাঁধলে, পাগলের মতো সে যা-তা খেয়াল নিয়ে থাকতে পারলে না। শুধু এই নয়, স্থান কাল সমাজ ধর্ম, এককথায় এক মানুষের প্রবৃত্তি অন্য মানুষের প্রবৃত্তির সংস্পর্শে এসে সুনিয়ন্ত্রিত হতে থাকল, মন হরণের মনোহর রাস্তা শিল্পী এবং শিল্পরসিক দুয়ে মিলে প্রস্তুত করলে, ঠিক যেভাবে মাটি ও জল দুয়ে মিলে নদীর খাত প্রস্তুত হয় সেই ভাবের ক্রিয়াবশে শিল্পীর প্রবৃত্তি ও সাধারণের প্রবৃত্তির যোগাযোগ হল।

যেখানে শিল্পীর প্রবৃত্তি গতি তার আশপাশের দ্বারা আক্রান্ত হতে চলল, সেখানে বাঁধ ভেঙে বইল শিল্পীর প্রাণের ধারা; যেখানে আশপাশ তাকে সুন্দর চলতে দিলে দুই তটের মধ্য দিয়ে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে, সেখানে নদীতে মাটিতে ঝগড়া বাধল না—নদী চলল সুন্দর আঁকবাঁক পেয়ে নদীর দুই কূলে শ্যামশোভা ছড়িয়ে দিয়ে! শিল্পের মূলে রয়েছে শিল্পবৃত্তির সঙ্গে জাতি ধর্ম ইত্যাদির এইভাবে সুন্দর মিলন, আর সেখানে ধর্ম বললে শিল্পকে, 'ধর্মসঙ্গীতেই বদ্ধ থাক' কিংবা 'দেবতা গড়তে থাক', সেখানে দেশ বললে, 'দেশের মধ্যেই তুমি বদ্ধ থাক',—সেইখানেই বাঁধ ভাঙল শিকল কাটল;—এই হল সৃষ্টির নিয়ম শিল্পেরও নিয়ম।

প্রবত্তির বশেই চলেছে মানুষের জীবন নানা বৃত্তি বেছে নিতে নিতে। কোনো কিছুতে প্রবৃত্তি নেই এমন জীব নেই জীবনও নেই। আহারে প্রবৃত্তি গেল মানুষটা উপবাসে রইল, বাঁচার প্রবৃত্তি গেল সে গলায় দড়ি দিলে, ছবি আঁকতে প্রবৃত্তি মানুষকে চিত্রকরের বৃত্তির দিকে নিয়ে গেল, পড়ার প্রবৃত্তি ছেলেকে পাণ্ডিত্যের দিকে, খাওয়ার প্রবৃত্তি ফলারের দিকে, ধনের প্রবৃত্তি চাকরি থেকে আরম্ভ করে জাল জুয়াচুরি যুদ্ধবিগ্রহ জমিদারি এবং

রাজ্যলাভের দিকে নিযুক্ত করলে মানুষের সকল অধ্যবসায়কে—কেউ হল রাজা, কেউ কবি, কেউ ধর্মপ্রচারক, কেউ আর্টিস্ট, কেউ বা আর্ট-সমালোচক, কেউ ছাত্র, কেউ মাস্টার, কেউ কেরানী, কেউ সওদাগর, চোর ডাকাত কত কি!

সমান প্রবৃত্তি সমান বৃত্তির দিকে চালায় একদল মানুষকে। সমব্যবসায়ী তারা সমান ভাবের জীবনযাত্রার পথ ধরে চলে, এবং এইভাবে কবির দল, সাহিত্যিকের দল, কারিগরের দল এমনি নানা দল সৃষ্টি হয়ে যায় নানা পথে নানাপন্থী হয়ে ধর্মপন্থী শিল্পপন্থী কর্মপন্থী কত কি দেখা দেয় তার ঠিক নেই।

কাজে প্রবৃত্তি নেই অথচ যখন কাজ করতে হচ্ছে শিল্পীকে, তখন দেখা যায় শিল্পকার্য অবনতি পাচ্ছে। নানা দেশের শিল্পের ইতিহাস থেকে এটা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। শিল্পের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, শৈশব অবস্থায় শিল্পকর্মের মধ্যে প্রবৃত্তির প্রেরণা প্রবলভাবে কাজ করছে—রং দেবার রেখা টানবার প্রবল প্রবৃত্তি এবং তাই নিয়ে খেলা। যে কোনো দেশের পল্লীশিল্পগুলোর চর্চা করে দেখলে দেখি, সেখানে বর্ণ ও রেখার উপর মানুষের একান্ত প্রবৃত্তি পরিষ্কার ধরা যায়। আর্টের শৈশব অবস্থায় প্রবৃত্তির প্রবলতাবশে রঙের প্রাচুর্য রেখার সরলতা নিয়ে ঢেলে দিচ্ছে আপনাকে মানুষের মন সরলভাবে খেলার পুতুল, গায়ের কাঁথা, ঘরের ঘটি-বাটি সাজ-সরঞ্জাম যা নিজের জন্য এবং যা কিছু পাঁচজনের জন্য সমস্ত সামগ্রীর উপরে। রং দেবার এবং রেখা টানার প্রবল ইচ্ছা শৈশব অবস্থার শিল্পের মূল লক্ষণ; সেখানে উপাদান বাছে না, মন মাটি ইট কাঠ সবার উপরে প্রবৃত্তির ছাপ রেখে চলে ঠিক ছোট ছেলে যেভাবে লাল নীল রং পেলে যাতে-তাতে মাখায়, আঁচড় টানে সোজা বাঁকা নানা রকম; কতকটা এইভাবে কাজ করে গেল আদিম অবস্থায় মানবশিল্পীরা।

যে ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলো কত কালের তা কে জানে, তার মধ্যেও শিল্পের এই শৈশব অবস্থার রূপটি সুস্পষ্ট ধরা পড়েছে; যথা—

"এক যে গাছ ছিল
লতায় লতিয়ে গেল
তার এক কুঁড়ি হল
ফুল ফুল ফুল ফুটে গেল।"

একটি মাত্র রূপ সে রেখায় লতায় পত্রে পুষ্পে ভরে উঠল। আদিম শিল্পের রঙের হিসেবও এইরূপে ছড়ার মধ্যে ধরা রয়েছে নিখুঁতভাবে; যথা—

"এপারেতে কালো রং বিষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্
ওপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্ টুক্ করে।"

যেন নীলাম্বরী শাড়ির কিনারায় চওড়া রাঙা পাড়ের টানটোন।

অথবা—

"রং নয়তো কাঁচা সোনা,
মুখটি যেন চাঁদের কোণা!"

কিংবা—

"কে বলেরে আমার গোপাল বোঁচা
সুখ সায়রের মাটি এনে নাক করেছি সোজা;

কে বলেরে গোপাল আমার কালো
পাটনা থেকে হলুদ এনে গা করেছি আলো।”

ছেলেবেলায় যেসব মাটি ও কাঠের পুতুল নিয়ে সবাই খেলেছি তার বিশেষত্বই ছিল— আলো-করা হলুদ রং এবং একেবারে ঠিক সোজা নাক, কালো কাপড়ের কিনারায় রাঙা টুকটুকে পাড়, রং রেখার পরিষ্কার টানটোন!

রঙের দিকে এবং রেখার দিকে শিল্পীর সহজ ও প্রবল প্রবৃত্তি, এরি উপরে মানুষের শিল্পের পত্তন হল এবং এই উৎস যখন ধারা ধরে বইতে আরম্ভ করলে তখন শিল্পের যৌবন অবস্থা ধরা যেতে পারে। এই যৌবন অবস্থায় নদীর স্রোতের মতো মানুষের শিল্পে মনোভাব প্রকাশের প্রবৃত্তি, রং দেবার প্রবৃত্তি, রেখা টানার প্রবৃত্তি, সুরে বলার ছন্দে বলার প্রবৃত্তি আর উচ্ছৃঙ্খল নেই, একটা একটা ধারা ধরে সুসংযত হয়েছে, অবাধ সুন্দর বাঁক ও তটরেখার মধ্য দিয়ে ঝিকমিক করে বয়ে চলেছে, ভাবের এবং রসের গভীরতা লাভ করতে করতে। তখন শুধু বর্ণের জন্যই বর্ণ নয়, রেখার জন্যই রেখা নয়, এমনকি বলতে পারি কেবল আর্টের জন্যই আর্টও নয়— মানুষের সকল প্রবৃত্তি ধর্ম ও কর্মকে এনে একসঙ্গে মিলিয়েছে, বাইরের দেখার সঙ্গে অন্তরের দেখার মিলন হয়ে গেছে, সুরের সঙ্গে শাল বোনার কাজ চলেছে, দেবতার আরতি ঘোষণা করেছে অষ্টধাতুর ঘন্টা, মন্দিরের বাইরের বিচিত্র কারুকার্য অন্তরের দেবতাকে ঘিরে রয়েছে। বীণার অনেকগুলো ঘাট স্পর্শ করে রাগ-রাগিণী যেমনভাবে চলে তেমনি চলেছে মানবসমাজের ঘাটে ঘাটে স্রোত বইয়ে এই যৌবন অবস্থার শিল্প। কোথাও মন্দিরের ঘাটে লাগল স্রোত—একরকম তরঙ্গ উঠল রসের ধারায়; কোথাও লাগল স্রোত রাজ-অট্টালিকায় বিলাসভবনে—সেখানে আর এক রকম তরঙ্গ উঠল শিল্পের ধারায়;—এইরকম নানা বাঁকে বাঁকে আঁকতে বাঁকতে জোয়ার-ভাঁটার ছন্দ ধরে চলেছে শিল্প দেশের জাতির ধর্মের কর্মের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িতে হয়ে যৌবনাবস্থায়।

দেশ কাল ধর্ম জাতি ইত্যাদি ভেদে মানুষের প্রবৃত্তির বেগ এবং সেই সঙ্গে তার শিল্পও নিয়ন্ত্রিত হয়ে বিচিত্র পথ অনুসরণ করে চলে বিচিত্র ভাবাপন্ন হয়ে বিচিত্ররূপে।

দেশ-বিদেশে শিশুচরিত্রে যেমন তেমনি পৃথিবীর আদিম জাতিদের মধ্যে যেসমস্ত শিল্প, তাদের মধ্যে একটা মিল দেখা যায়; সেখানে পূর্ব-পশ্চিম ভেদে ধর্ম ও সমাজপদ্ধতি ভেদে শিল্পকার্যসমূহের তারতম্য বড় একটা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকে না, শুধু শিল্পের ধারা যখন নদী হয়ে বয়ে চলল মানুষের ঘরের কাছ দিয়ে, দেশের বুকের উপর দিয়ে, তখনি দেখি শিল্পের নানা রূপ বিভাগ সুনির্দিষ্ট হয়ে শিল্পের নানা মন্ত্র তন্ত্র প্রথা প্রণালীর দ্বারা এক এক রকম ছাঁচ পেয়ে চলেছে।

আমাদের দেশে বৌদ্ধ হিন্দু মোগল ইত্যাদি—ওদের দেশে গ্রিক রোম খ্রিস্ট তুর্ক ইত্যাদি নানা ধর্মের নানা টানে যেপ্রকার বিভিন্ন ছাঁচ পেলে শিল্প, তাতে করে শিল্পের একটা জাতিবিভাগ স্পষ্ট হয়ে উঠল, অথচ শিল্প হিসেবে তাদের মধ্যে আসলে পার্থক্য নেই। নদীর জল সব নদীতেই জল ছাড়া আর তো অন্য পদার্থ নয়— দুধও নয় দইও নয় ক্ষীরও নয় জল মাত্র; তেমনি শিল্প সব দেশেরই, শুধু রূপ ও নাম মাত্র ভিন্ন হয়ে গেছে— দেশ কাল পাত্র ভেদে যেমন যাতে ধারা বইল তারি হিসেব নিয়ে।

নৌকা সব দেশেই নৌকা, রথ সব দেশেই রথ; কিন্তু বর্মা দেশের নৌকা, বাঙলা দেশের নৌকা, মিশর দেশের নৌকা, গ্রিস দেশের নৌকা, সবার ভিন্ন ভিন্ন গঠনপ্রণালী হয়েছে। ছাঁচ বদলায়, যান বাহন ইত্যাদির উপায় উপকরণ সবই বদলায়, অথচ নৌকা যে সে নৌকাই, রথ যে সে রথই থাকে।

শিল্প হল এক জিনিস যা সর্বদেশে সর্বকালে সমান, ছাঁচ হল উপযুক্ত অনুপযুক্ত ভাল মন্দ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন মানুষের মনের কতগুলো প্রবৃত্তি সব দেশেই এক, কিন্তু ধর্মের প্রভাবে সমাজের প্রভাবে স্বতন্ত্র ছাঁচ পেয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, শিল্পও ঠিক সেইভাবে নানা রূপে কালে কালে জাতি-ভেদে, সময়-ভেদে, এমনকি শিল্পীতে শিল্পীতে যে একটুখানি চিন্তার শিক্ষাদীক্ষার ভিন্নতা থাকে তার বশেও নতুন নতুন রূপ ও ভাবভঙ্গি পায়।

সব বাঁশিই ফুঁয়ে বাজে কিন্তু মেলাতে শিশুর জন্য যে বাঁশি আসে তার তিনটে ফুটো, খুব বর্বর জাতির মধ্যেও তিন সুরের বেশি সুর নেই, অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতির বাঁশিতে পাঁচটা ফুটো, জাপানে এখনো সঙ্গীতশাস্ত্রে পাঁচ সুরের হিসেব ছাড়া সাতটা সুর নেই— এমনি পূর্ব পশ্চিম সব দেশেই একই বাঁশি তার ফুটোর হিসেব নিয়ে নানা রকম সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করে চলেছে যেমন, তেমনি শিল্পকলা বড় ছোট নানা রাস্তা ধরে নতুন নতুন রসের সৃজন করেছে। মানুষের মনোভাব দেশকালের আবহাওয়া ইত্যাদি জোয়ার-ভাঁটার মতো শিল্পের ধারাকে ছন্দ দিচ্ছে নানা প্রকার, এই হল শিল্পের যৌবনাবস্থার কথা।

নির্ঝর যেমন আপনাকে রূপান্তরিত করলে নদ নদী খালে বিলে তেমনি মানুষের শিল্পও অন্তরের অন্দরমহল থেকে নির্ঝর বইয়ে বার হল প্রবৃত্তির প্রেরণায় এবং বাহিরের জগতে নানা দিকে যে বিরাট রসের সমুদ্র বিচিত্র ছন্দে দুলছে তার দিক থেকে যে প্রেরণা এল তারি বশে জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়ে চলল গ্রামের পাশ দিয়ে, নগরের মধ্য দিয়ে মন্দির মঠ মসজিদ গীর্জা রাজ-অট্টালিকা দীনের কুটির সব জায়গাতে রকম রকম রস বিলিয়ে, শিল্পের গতিবিধির মোটামুটি হিসেব এই ছাড়া অন্য রূপ তত মনে হয় না।

শৈশব ও ভরা যৌবন তার মাঝে কৈশোর অবস্থা। নদী যখন কূলহারা অকূলে মিলতে চলেছে খরস্রোতে, আর সে যখন পর্বতশিখর ছেড়ে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর দিকে—এর মধ্যে রয়েছে আরো গোটাকতক আঁকবাঁক যার মধ্যে জলের বিচিত্র লীলা।

নদীর ইতিহাস জানতে হয় তার আদি অন্ত এবং মধ্য লীলা নিয়ে মানব-শিল্পের ইতিহাসও ঠিক এই হিসেবে ধরে চর্চা না করলে শিল্প সম্পূর্ণভাবে জানা হল না। এই যে তাজমহলটা সৃষ্টি হল আমাদের দেশে, এটার উৎপত্তির কারণ তুরস্ক কি মোগল সভ্যতার উপরে সম্পূর্ণভাবে ছাড়া তো যায় না; যে দেশ থেকে মোগল জাতি তাদের সভ্যতা নিয়ে এল ভারতে, সে দেশেও যাকে আমরা বলি মোগল স্থাপত্য তা ঠিক-ঠাক আগ্রা কি দিল্লীর মতো নয়। তাজের কিংবা সেকেন্দ্রার কি আগ্রার বা দিলীর স্থাপত্য যে প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ সৃষ্টি করলে, ঠিক সে প্রবৃত্তি নিয়ে বোগ্‌দাদ বসোরা কাবুল পারস্য দেশের মানুষ তাদের সমাধি বা রাজভবনগুলো গড়েনি। একই মোগল শিল্প, কিন্তু তার প্রকাশ হল দেশ কাল ইত্যাদি ভেদে নতুন রকমে। চীন দেশে গিয়ে মোগল শিল্প এক ছাঁচ পেলে, ভারতে আর এক, ভারতের পশ্চিমে অন্য ছাঁচ পেলে, আবার পূবে পশ্চিমে গিয়ে আপনার ছাঁচ বদলালে।

মানুষের প্রবৃত্তির অদল-বদল যা ঘটছে মানুষের মনে তা এ জাতের সঙ্গে ও জাতের, এ ধর্মের সঙ্গে ও ধর্মের, এ সভ্যতার সঙ্গে ও সভ্যতার ধাক্কায়; তাতে করেই শিল্পের ধারা নতুন নতুন ঢেউ তুলে অগ্রসর হচ্ছে বিচিত্র পথে যৌবন অবস্থায়। মানুষের বয়সের যেমন পুনরাবৃত্তি নেই তেমনি শিল্পেরও পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। শিল্পের সপ্তম আশ্চর্য সে আর একটিবারও ঠিক অমনিটি হয়ে দেখা দিতে পারে না, হয়তো অষ্টম আশ্চর্য প্রকাশ হবে শিল্পজগতে, কিন্তু সপ্তম সে বরাবর সপ্তমেই থাকবে।

কলের শিল্প একটার মতো এক লক্ষ সৃজন করে চলে কিন্তু যার সঙ্গে মানুষের মনোবৃত্তির যোগাযোগ তার নিয়মে এক জিনিস দুবার সৃষ্টি হয়ে চলে না। ছেলে যখন কাপিবুক্ কাপি করছে—তখন খাতার প্রত্যেক পাতায় লিখে চলল "সেবকশ্রী" কিন্তু সেই ছেলে বড় হয়ে যখন রচনা শুরু করলে তখন নতুন নতুন ছত্র দিয়ে সে খাতা ভর্তি করে গেল, নতুন নতুন ভাবের টানে লেখা নব নব ছন্দ পেয়ে চলল খাতা ভরে দিয়ে। কিছু বলতে বা প্রকাশ করতে পারুক বা নাই পারুক কলম চালানোতেই শিশু আনন্দ পায়। শিল্পের শৈশব অবস্থার কথাও এই, সেখানে শুধু হাতের কাজেই শিল্পীর আনন্দ। তাঁতি যখন কাপড়ের কিনারায় নানা রঙের আঁজি টানে তখন কোন রঙের পাশে কোন রং মানায় তার একটা হিসেব ধরে চলে, কিন্তু এই রং এই ভাব জাগায় এ জ্ঞান তার নেই, সেটা হয় যখন তাঁতি কেবল তাঁতি নেই শিল্পীও হয়ে উঠেছে। মেয়েরা কাঁথা বোনে, আমাদের চেয়ে ভাল জানে তারা কাঁথার কোথায় কোন সুতো কোন ফুল কোন পাড় দিতে হবে; রঙের প্রবৃত্তি রেখার প্রবৃত্তি তাদের ঠিক পথে চালায় কিন্তু একটা কাঁথার কাজ এক ভাব জাগায়, অন্যটা অন্য ভাব, এক রং জাগায় বৈরাগ্য অন্য রং জাগায় অনুরাগ; এক রেখা করে ঢল ঢল, এক রেখা চলে ছল ছল—এসব কথা হল শিল্পীর।

শিল্পীর কৈশোর ও যৌবনের কথা হল ভাবযুক্ত শিল্প, এ সময়ে লোকে শাল বুনলে— কাশ্মীরের পদ্ম-সরোবর আপনাকে ধরা দিলে একটুখানি কলকার কাজের মধ্যে। ঠিক যেভাবে কবির একটি ছত্রে ধরা গেল বিশ্বের বিরাট রহস্য, সেইভাবে এক টুকরো পাথর সেও রহস্যময় ভাবময় হয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল, অন্তরের স্বাদ দিতে থাকল। শৈশবের প্রবৃত্তি প্রবল প্রবাহ নিয়ে শিল্পকে ঝরিয়ে দিলে পথিবীর দিকে যেখানে মাটির ঘরে মানুষ বাস করছে, কৈশোরের প্রবৃত্তিরূপ শিল্প ঘর-বার দুয়ের মধ্যে আনাগোনা করতে থাকল।

"শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেল।" যৌবনে শিল্পের অভিসার, মনের সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে দুঃখের মধ্য দিয়ে সুখের মধ্য দিয়ে অনন্ত রসের দিকে শিল্পধারা শতমুখী হয়ে চলেছে সাগর-সঙ্গমের পথে—

"নব অনুরাগিণী রাধা কছু নাহি মানয়ে বাধা
একলি করল পয়াণ পন্থ বিপন্থ নাহি মান।"

প্রথম যৌবনে যখন শিল্পের অভিসার পথে বিপথে তখনকার ইতিহাস বড় জটিল, বড় রহস্যময়, বড় অস্থির—তখন শিল্প নিজেকে হারিয়েছে পরের জন্য, নিজের ঘরে আর থাকতে পারছে না শিল্প, পুবের আলো পশ্চিম মুখো হয়ে চলেছে দিবাভিসারে আবার পশ্চিমের আলো রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তিমিরাভিসারে চলেছে পুবের আলোর সঙ্গে মিলতে; এই ভাবের অবস্থা শিল্পের—'নৈহরবাঁ হম্‌কো নহিঁ ভাবে' (কবীর)। নতুনের বাঁশি শুনেছে শিল্প, বাপের বাড়ির খেলাঘর আর ভাল লাগছে না। আকবর বাদশাহের সময়কার শিল্পে এর সুস্পষ্ট আভাস দেখা যায়; ভারত-শিল্প মিলতে চলেছে মোগল-শিল্পে, খাঁটি তুর্ক-শিল্প ধরতে চলেছে ভারতীয় ছন্দ, ফতেপুর শিকরীর স্থাপত্য, সূফী কবিদের কবিতা এবং কবীরের সমস্ত চিন্তা এই অভিসারে চলেছে, রাজপুতের মেয়ে বসতে চলেছে দিল্লীশ্বরের পাশে। এই যে মিলনের আগেকার অভিসারপথ শিল্পের পক্ষে বড় সঙ্কটাপন্ন পথ—সমুদ্র যেখানে নদীর দিকে, নদী যেখানে সমুদ্রের দিকে মিলতে চলেছে সেই মোহানা পার হতে নাবিককে সাবধান হতে হয়, এ পাকা নাবিক মাত্রেই জানে। অগাধ সমুদ্রে নাবিকের তত ভয় নেই, বন্দরে তো সে একেবারেই নির্ভয়; কিন্তু সমুদ্র আর বন্দর দুয়ের মাঝে চোরাবালি যে আছে তাকেই ভয় নাবিকের। বন্দর থেকে বার হতে বিপদ, বন্দরে প্রবেশ করতে বিপদ—মোগল বাদশার অন্দরে ঢুকতেও বিপদ, সেখান হতে বার হতেও বিপদ। এই সঙ্কট পেরিয়ে গিয়েছিল এদেশের শিল্প একদিন আকবরের

আমলে, মিলন হল গিয়ে সার্থক সাজাহানের সময়ে যখন সত্যকার মোগল-শিল্প দেখা দিলে—তাজমহল। সঙ্গীতকলার দিক দিয়েও তখন এই মিলন ঘটে গেল, অশন বসন ভূষণ কিছুর কোনো দিকই বাদ পড়ল না, কিন্তু এই মিলন যখন বিচ্ছিন্ন হল ঔরঙ্গজেবের সময়ে তখন সকল দিকে শিল্পের অবনতি হতেই চলল, হাতের কাজে মনের কাজে জড়তা এল, বিষণ্ণতা এল—বাদশার হুকুমে সঙ্গীতবিদ্যা গভীর রকমে কবরস্থ করলে কালোয়াতরা, মোগল স্থাপত্য কতদূর অপদার্থতার মধ্যে নেমে গেল তার নিদর্শন লক্ষ্ণৌ নবাবের প্রাসাদ ও ইমামবাড়াতে ধরা রইল। এরপর ইউরোপীয় শিল্পের আবির্ভাব হল, মিলতে চলল মোগল-শিল্প তার সঙ্গে, মিলন সার্থক হল না, লক্ষ্ণৌর লা মারটিনিয়ার কলেজের মতো একটা বীভৎস সৃষ্টিছাড়া জিনিসের উৎপত্তি হল।

মোগল হিন্দু এবং সাহেব এই তিন আর্ট কোনো ত্রিবেণীসঙ্গমে গিয়ে মিলতে পারলে না। মোগলের আগে যেসব তুর্কীরা এদেশে বিজেতা হিসেবে এল তারা তুরস্ক শিল্পকেও সঙ্গে আনলে এবং মিলিয়ে দিলে বৌদ্ধ শিল্পের শেষ যে ধারা চলছিল তার সঙ্গে— আজমীঢ়, দিল্লী, জৌনপুর, গৌড়, হায়দ্রাবাদ, বিজাপুর এমনি সব স্থান জুড়ে একটা চমৎকার স্থাপত্যশিল্পের আবির্ভাব হল।

স্থাপত্যকে শিল্প হিসাবে, দেখলে মোগলদের তাজমহলের চেয়ে পূর্ব্ববর্তী তুরস্ক শিল্পের অভিযানের নিদর্শনগুলো কোনো অংশে কম নয়—আজমীঢ়ের মস্‌জিদ, দিল্লীর কুতুবমিনার, আল্‌তমাসের সমাধি, আলাউদ্দীন খিলিজি ও তোগলক শাহার সমাধি ও মসজিদ, জৌনপুরের অটলা দেবী মস্‌জিদ, আহম্মদাবাদের আবুতোরাবের সমাধি, মোহাফিজ্‌ খাঁর সমাধি, বিজাপুরের ইব্রাহিম রোজা আদিল শাহার গোল গম্বুজ,—দেখলেই বোঝা যায় যে ভারতের স্থাপত্যের সঙ্গে তুরস্কের স্থাপত্যের পরিণয় সুব্যক্তভাবে ঘটেছে, এক ধারার সঙ্গে মিলেছে আর এক ধারা—বাঙলার শের শাহের সমাধির গর্ভে লুকোনো দেখি আগ্রার মোগল আমলের তাজবিবির রৌজার সুন্দর ছাঁচ, দিল্লীর তোগলক শাহার কবরের গর্ভে নিহিত রয়েছে মোগল বাদশা হুমায়ুনের সমাধির আদরা, আহম্মদাবাদের আবুতোরাবের সমাধির মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে স্থাপত্যশিল্পে মোগল আমল যে প্রসার ও শুভ্র স্বচ্ছতা লাভ করলে সেটি।

এই যে বহির্ভারত এবং অন্তর্ভারত শিল্পের ধারায় মিলল, তার প্রধান লক্ষণ হল শিল্পের ধারায় পরিষ্কার পারম্পর্য লক্ষিত হতে থাকল; জলের এক ঢেউয়ের সঙ্গে অন্য ঢেউয়ে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হল না, বংশ-পরম্পরায় ছেদ পড়ল না, যদিও স্থান কাল পাত্র বশে তারতম্য হল একটু-আধটু মনোভাবের এবং বাইরেরও চেহারার। এমনি মোগল শিল্পের সঙ্গে রাজপুত শিল্পের সংমিশ্রণ—সেও আর একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস। আবার প্রাচীন ভারতের অন্তর যেখানে বহির্মুখী হয়ে চলল সেখানের ইতিহাস আরো প্রকাণ্ড আরো রহস্যময়।

মানুষের প্রবৃত্তির, জাতির প্রবৃত্তির গতি ধরে যেভাবে শিল্পের ধারা কালে কালে দেশে দেশে বইল, সেই অনুসারে শিল্পের চর্চা করে চলাতে শিল্পের প্রাণের ছন্দের হিসেব পাই; নিছক পুরাতত্ত্বের দিক দিয়ে গেলে একটা মোটামুটি হিসেব ছাড়া আর কিছু পাওয়া সম্ভব হয় না। প্রাচীন এবং আধুনিক বংশতালিকা মিলিয়ে একটা বংশের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মের তারিখ, মৃত্যুর তারিখ, তাদের নাম ধাম সবই পাই কিন্তু সেই বংশের প্রত্যেক মানুষের সম্পূর্ণ চরিত্র ও ইতিহাস কিছুতে তো ধরা পড়ে না, এবং সেই বংশের মধ্যে যে সাধারণ একটি প্রবৃত্তি যা বংশের সব মানুষকে কেমন তার পরিবারে এক করে একটা ভাল বা মন্দ গতি দিয়ে চলেছে তার হিসেব পরিষ্কার ধরতে পারিনে; শিল্পের চর্চাতেও ঠিক এই ঘটনা ঘটে নিছক পুরাতত্ত্বের দিক দিয়ে

শিল্পকে দেখতে গেলে। নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে কেউ এ পথে কেউ ও পথে শিল্পের চর্চা করে চলব আমরা, তারপর এমন দিন আসতেই হবে যখন এই দুই পথের হিসেব মিলিয়ে তবে শিল্পের পুরোপুরি ইতিহাস সব দেশে রচিত হবে।

কবির জীবন, সাহিত্যিকের জীবন, গায়কের জীবন, বাদ্যকরের জীবন, চিত্রকরের ও ভাস্করের জীবন স্ব স্ব অন্তরের প্রবৃত্তি নিয়ে একলা নেই—এরা বহির্জগতে থেকেও নানা সমাজ ধর্ম শিক্ষা দীক্ষা ও দেশকালের ধর্ম ও মর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবে বর্তমান রয়েছে। তার অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ঘিরে নিয়ে চলেছে তাকে বন্দীর মতো। দেশ-কাল-পাত্র এ সমস্তই গতি দিচ্ছে শিল্পীর মনোবৃত্তি সমস্তকে, এই হল স্বভাবের নিয়ম; যেখানে এর অভাব সেখানেই শিল্পের ধারা হয় একই অবস্থায় জড়বৎ রয়েছে, নয় তো বদ্ধ জলের মতো আস্তে আস্তে মরছে উজ্জীবনী শক্তির স্পর্শ অভাবে।

জলপ্রপাত মরুভূমির উপর দিয়ে বয়ে চলার রাস্তা না পেয়ে যদি বালির উপর ছড়িয়ে পড়ল তো সে শুকিয়ে মরল, আর যেখানে দেশ তাকে বুক পেতে ধারণ করে বইয়ে নিয়ে চলল দুই তটের মধ্য দিয়ে, সেখানে নদনদীর স্রোত বইল। এইভাবে জনসাধারণের প্রবৃত্তি এক-এক সময়ে এক-এক রসের ধারাকে কখনো বইয়েছে, কখনো বয়ে চলায় বাধাও দিয়েছে।

ইংরাজ যখন এদেশে এল সেই সময়ে প্রথম প্রথম দেশের প্রবৃত্তি বিদেশ মুখে ঘুরে দাঁড়াল, নতুনের মোহে পুরাতনকে পরিত্যাগ করলে। ধর্ম কর্ম শিল্প শিক্ষা দীক্ষা সব দিক দিয়ে আপনার যা সেটা মুছে গেল আমাদের কাছে, বিদেশের যা কিছু তাই রইল সামনে খাড়া পাহারার মতো। এই যে একভাবে পুব ও পশ্চিম মিলল, এ মিলন ঠিক মোগল বা তুর্কী যেভাবে মিলেছিল ভারতের সঙ্গে সেরূপ মিলন হল না—মোগল বা তুর্কের আমলে এক দেশ রাজবেশে এসে আর এক দেশের পাণিগ্রহণ করলে—ঠিক যেভাবে এখনো রাজপুত তারা ঘোড়ায় চড়ে এসে কন্যাকে কেড়ে নিয়ে যায় বিবাহের রাতে সেই ভাবের ক্ষাত্র বিবাহ হল তখন দেশের ও বিদেশের শিল্পে ও মনোভাবে। এক প্রাচ্য জাতি আর এক প্রাচ্য জাতির সঙ্গে মিলল, দেখতে দেখতে সার্থক হল সে মিলন, নতুন জাতের শিল্পকলা নতুন ফুলের মতো দেখা দিলে। পুব-পশ্চিম যখন মিলল তখন বিজেতা ও বিজিত দাসী ও প্রভু কেবল এই সম্পর্কটুকু নিয়ে মিলল, দুজনে পাশাপাশি রইল বটে কিন্তু ইডেন গার্ডেন ও বিডেন গার্ডেনে রইল আকাশ-পাতাল প্রভেদ। চৌরঙ্গী রইল নিজের রঙ্গে, চিৎপুর রইল চিৎপাত বাঁশের খাটিয়াতে। এভাবে দুই জাতির বাইরে বাইরে মিলনে শিল্পের উৎপত্তি হতেই পারে না। মালা অদল-বদল হল মোগলের সঙ্গে রাজপুতের, পরদেশীর সঙ্গে স্বদেশীর গান্ধর্ব মতে—উৎপত্তি হল তা থেকে ভারত সঙ্গীতকলার নতুন ধারা। রাখী বাঁধা হল হাতে হাতে রাজায় প্রায় এক সভ্যতায়, জন্ম নিলে কল্পনাতীত সুন্দরী কলাসমস্ত। এই ঘটনা মোগল আমলে নয়, তার পূর্বে; তারও পূর্বে কত বার ঘটেছে, কত বার কত দিক দিয়ে মিলন হয়েছে আর্যে অনার্যে, সমতলবাসীর সঙ্গে পর্বতবাসীর, সমুদ্রের এপারের রাজার সঙ্গে সমুদ্রের ওপারের রানীর। আমাদের ধর্মের ইতিহাস, কর্মের ইতিহাস, শিল্পের ইতিহাস, এই সার্থক মিলনের চিহ্নে ভরা রয়েছে।

তখনকার কালে উপনিবেশ অভিযান যা হয়েছিল তার শেষ হয়েছিল গিয়ে জাতিতে জাতিতে সত্য পরিণয়সূত্রে বাঁধা পড়ায়। এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়েছে কত বার— গ্রিস এল কিন্তু দেশের ঘরে তার বরের আসন পড়ল না, নাদির শা এল ডাকাতি করে চলে গেল, গ্রিস খাত কাটলে বিজাতীয় প্রথায়, সে খাতে শিল্পের ধারা বইল না; নাদির শা বানের মতো এল ঘরের জল বার করে নিয়ে গেল, রেখে গেল না কিছু শূন্য

ভাণ্ড ছাড়া,—"বর্গি এল বাঙলায় শুধু চৌথই আদায় করলে, দিয়ে গেল না কিছু খাজনা দেবার ভাবনা ছাড়া, —"বর্গি এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে!" কিন্তু নবাব এলেন ঢাকায় মুর্শিদাবাদে শুধু রাজত্ব করতে নয় ঢাকাই কাপড় বালুচরের শাড়ি এমনি কত কি নিজেরা পরতে এবং দেশকে পরাতে; বরের আসার ধুমধামে হাতি-ঘোড়ার চাপে দু-চারটে মন্দির ভাঙল ঘরও উজাড় হল, কিন্তু শেষ হল গিয়ে শিল্পকলার ছাঁদনাতলায় সমস্ত ব্যাপারটা!

এখন তো কত বুদ্ধমূর্তি চালান যাচ্ছে এদেশ থেকে ইউরোপের জাদুঘরে, কত শাস্ত্র কত পুঁথি কত চিত্র গিয়ে জমা হচ্ছে সেখানে তার ঠিক নেই, কিন্তু বৌদ্ধদের আমলে যেভাবে একটি মাত্র বুদ্ধমূর্তি—অথবা মূর্তিও নেই শুধু একখানা হাতে-লেখা পুঁথি—ধর্মে ধর্মে, চিন্তায় চিন্তায়, শিল্পে শিল্পে মিলিয়ে দিয়েছিল চীন ও ভারতের দুই সভ্যতাকে অটুটভাবে, সে ভাবের মিলন হতে কত দেরি লাগছে আজকের প্রাচ্যে ও আজকের পাশ্চাত্যে! এদেশকে বুঝতে চাচ্ছে ওরা ওদেশকে বুঝতে চাচ্ছি আমরা বড় কম দিন ধরে নয় কিন্তু বাইরে বোঝাপড়া হলে তো হয় না, শুধু পণ্ডিতে পণ্ডিতে মিললে তো জাতিতে জাতিতে মিলন হল না বিবাহসূত্রে।

দুই ভিন্ন জাতিতে সকল দিকে অন্তরের বোঝাপড়া চলে অন্দরের বাসরে শুধু, সদরে স্কুলে, হোটেলে, হোস্টেলে, আফিস ঘরে, বায়স্কোপে, ফুটবলের মাঠে এবং সরকারী বেসরকারী গার্ডেন পার্টি ও পর্দা পার্টিতে, যতক্ষণ মিলন ততক্ষণ দুই জাতিতে পুরো মিলন ভাব-সাব হল না, শিল্পকলাও নতুন ছন্দটি পেয়ে গেল না। পুব-পশ্চিমের মিলন যখন হবে তখন কেমন শিল্পকলা দেখা দেবে তা কে বলতে পারে? কিন্তু পুব-পশ্চিম দুই সভ্যতার মাঝে যে অন্ধযুগের পর্দা তা ছিড়ে না পড়লে এই সম্পূর্ণ মিলন ঘটা সম্ভব নয় জানা কথা। ওরা বড় আমরা ছোট কি আমরা বড় ওরা ছোট—শিল্প ব্যাপারে এ নিয়ে লড়াই করে মিলন হয় না, কাজেই শিল্পও দেখা দেয় না দেশে। লড়ায়ের দিনে যবন এসেছিল এদেশে এক হাতে কোরান অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে কিন্তু লড়াই শেষে যদি তেমনি ভাবেই তারা পাহারা দিতেই থাকত মনের মিলনের ঘাটিতে ঘাটিতে তবে নিষ্ফলা হত তাদের রাজশ্রী। ঐসব আমলে দেশে যেসমস্ত শিল্পকলা সৃষ্টি হল তার মূলে বিজিত এবং বিজেতায়, রাজায় ও প্রজায় মনের মিলন। বাবর থেকে আরম্ভ করে পরের পর মোগল বাদশার জীবনচরিত থেকে দেখা যায়, তারা জয় করে নিলে দেশ কিন্তু দেশের কাছেও বাঁধা দিলে মন সত্যি সত্যি এবং ঘরের দেওয়ালে সেকথা লিখে গেল তারা—এইখানেই স্বর্গ এই স্বর্গ। এই ভাবের যখন মিলন জাতিতে জাতিতে হয় তখনি শিল্পের দিক দিয়ে নতুন যৌবন পায় দেশ, একথা মোগল বাদশার সভাপণ্ডিত 'ভামিনী-বিলাসের' শেষ শ্লোকে স্পষ্ট করে বলে গেছেন— "শাস্ত্রন্যফলিতানি, নিত্যবিষয়ঃ সর্ব্বেহপি সম্ভাবিতাঃ দিল্লীবল্লভ-পাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ।"[১] নব যৌবন পাওয়ার কথা দেশ বাক্য দিয়ে লেখা দিয়ে কত ছন্দে কত সাজে কত সুরে বলে গেল যুগে যুগে কতবার।

প্রতি বসন্তে গাছ যেমন করে জানিয়ে যায় বছরে বছরে তার ফুল ফোটার ফল ধরার ইতিহাস, তেমনি জানিয়ে গেল দেশের শিল্প এই পরিণয়-কাহিনী পাষাণের অক্ষর দিয়ে। পুবে-পশ্চিমে এমনি মিলন আকাশপটে সোনার অক্ষরে লেখার সময় এখনো এসেছে কি ঠিক বলা যায় না, কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রির মধ্যেও বিদ্যুল্লেখায় সুস্পষ্ট পড়া যাচ্ছে— শিল্প বলো, সভ্যতা বলো, ধর্ম বলো, কর্ম বলো, সবই জীবন থেকে রস টেনে তবে বাঁচে। গাছ মিলল উপযুক্ত মাটিতে, পাতা পেলে বসন্তের আলো-বাতাস, তবেই কালে তাতে ফুল ফুটল ফল ধরল নব যৌবন পেলে পুরোনো শাখা। দুই ভিন্ন জাতি যেখানে জল আর মাটির মতো মিলেছে

সেই গভীরতার মধ্যে জগতের শিল্প শিকড় নামিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকে; মরুভূমিতে যেখানে না আকাশের জল, না সমুদ্রের জল মিলতে পারলে মাটির সঙ্গে, কোনো শিল্পের কোনো ফুল সেখানে ফোটা সম্ভব হল না। আকাশ বর্ষণে প্রবৃত্ত হল, পাত্র নেই জলকে ধরার, কিংবা ধুলো উড়ে উড়ে আকাশের কাছে রস চাইলে, উপর থেকে তপ্ত বাতাস ছাড়া আর কিছুই এল না—এ হলে পৃথিবী নিষ্ফলা অপ্রফুল্ল রইল। শিল্পের উৎপত্তির কথাও এই। চোখে দেখি মরুভূমির পারে আকাশ সে মিলছে, এ শুধু চোখের ভুল, এ মিলন শুধু মরীচিকারই সৃজন করে থাকে, যাকে ভুল করে অনেকেই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলজনক শিল্প বলে। বাদলের মেঘ সঙ্গে ঝড় ঝাপটা আনে বটে কিন্তু বর্ষণ যখন শুরু হল তখন পৃথিবী আর আকাশের মধ্যে অগণিত যোগসূত্র রচনা হয়ে গেল, ফলল তবে ফসল, কিন্তু শিলাবৃষ্টি নামল দূর আকাশ থেকে, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হল পৃথিবীর বুক জুড়ে। মধুকর এল, এ-ফুলে ও-ফুলে বিয়ে দিয়ে গেল, ফলের ফুলের শোভায় বাগান ভর্তি হল, পঙ্গপাল এল মেঘের মতো বটে কিন্তু দুর্ভিক্ষই বর্ষণ করে গেল চারিদিকে।

শুধু ভারতবর্ষ নয় সব দেশের শিল্পই এমনি এক-একটা দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। একটা থেকে আর একটাতে যাবার মধ্যের পথে এইসব সঙ্কট দেখা দেয়, যে সময় পরিবর্তনের তাড়া বাড়িওয়ালার নোটিসের মতো আসে—পুরোনো ঘটি-বাটি বেচেও যার দেনা শোধ করতে হয়। শিল্পের উৎপত্তির পক্ষে এক-একটা প্রতিকূল অবস্থা আসে, কিন্তু একথাও ঠিক যে এই সঙ্কটের সময়েই দেশ নিজের যা ছিল নিজের যেটুকু আছে এবং নিজকে যা পেতে হবে ভবিষ্যতে, তার বিষয়ে চিন্তা করে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না, শিল্প থাকতে শিল্পের মর্যাদা ঠিক দেয় না লোকে।

শিল্পের স্থবিরাবস্থা নেই, এই পৃথিবীর মতোই সে প্রাচীনা অথচ চিরযৌবনা। মানবপ্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতি এই দুয়ের মিলনে শিল্পের উৎপত্তি সুতরাং তার গতি কোন দেশে কোনো কালে বন্ধ হবার উপায় নেই। শিল্প যে এককালের মধ্যেই বদ্ধ থাকবে তারও উপায় নেই। সৃষ্টির একটা অংশ শিল্প, বাতাসের মতো জলধারার মতো মহাকালের সহচর হয়ে মানুষের ক্ষণিক জীবনের মুহূর্তগুলো বর্তমান থাকে, শিল্পকার্য মানুষের অন্তরের এবং বাহিরের প্রকৃতির সাক্ষীস্বরূপ, মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন পথ চলতে হয়, নতুন কথা লিখতে হয়, অমৃতের পাত্র পরিপূর্ণ করে দিতে হয় বাইরের এবং অন্তরের রসে। যদি স্থপতির শিল্প পাথরকে মাটিকে স্পর্শ করলে, ধুলো হল মধুমান্—"মধুমান্ পার্থিবো রজঃ", গানের সুর লাগল গিয়ে বাতাসে, বাতাস মধুময় হল—"মধুবাতাঃ", শিল্প ভাবসিন্ধুতে ডুব দিলে, লবণাম্বু সেও মধুর স্বাদ পেয়ে গেল—"মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"। শিল্পপ্রবৃত্তি অলৌকিক চমৎকারী কর্ম করতে প্রবৃত্ত করায় শিল্পীকে—বাইরে এনে ফোটাতে অন্তরের মধ্যে যে ফুল গোন রয়েছে তাকে। চারিদিকের আবহাওয়ায় মধুমাস লাগে যখন ফুল ফল ধরে আনা হতেই তখন গাছের মধ্যে প্রবৃত্তি জাগে প্রকাশের।

টীকা

১. ৩২ শ্লোক, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথকৃত ভামিনী-বিলাসে শান্তসমুন্নাস নামক চতুর্থ উল্লাস (বি.জি. বল কর্তৃক সম্পাদিত, বোম্বাই)

সুন্দর

কি সুন্দর এবং কি সুন্দর নয় এ নিয়ে ভারি গোলমাল বাধে যে রচনা করছে এবং যারা রচনাটি দেখছে বা পড়ছে কিংবা শুনছে তাদের মধ্যে; কেননা সবারই মনে একটা করে সুন্দর অসুন্দরের হিসেব ধরা রয়েছে, সবাই পেতে চায় নিজের হিসেবে যা সুন্দর তাকেই, কাজেই অন্যের রচনার সৌন্দর্যের হিসেবে সে নানা ভুল দেখে।

নিজের রচনাকে ইচ্ছা করে খারাপ করে দিতে কেউ চায় না, যথাসাধ্য সুন্দর করেই রচনা করতে চায় সবাই, কেউ পারে সুন্দর করতে কেউ বা পারে না। আমার হাতে বাঁশি দিলে বেসুরে বাজবেই, অকবি যে সে কবিতা লিখতে গেলে মুশকিলে পড়বেই। কচ্ছপ জলে বেশ সাঁতার দিত কিন্তু বাতাসে গা ভাসান দেওয়া তার পক্ষে এক নিমেষও সম্ভব হয়নি, অথচ আকাশে ওড়ার মতো কবিতা ছবি ইত্যাদি রচনার ঝোঁক তাবৎ মানুষেরই মধ্যে রয়েছে। গান শুনে মনে হয় বুঝি আমিও গাইতে পারি, মন মেতে ওঠে এমন যে ভুল হয়ে যায় সুরের পাখি বুকের খাঁচায় ধরা দেয়নি একেবারেই। বালক যখন সুরে বেসুরে তালে বেতালে মিলিয়ে নেচে গেয়ে চলল তখন তার সব অক্ষমতা সব দোষ ভুলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেলে শিশুকণ্ঠের এবং সুকুমার দেহের ভাষাটির অপূর্ব সৌন্দর্য, কিন্তু বড় হয়ে ছেলেমো করা তো সাজে না একেবারেই! তবেই দেখা যাচ্ছে স্থান কাল পাত্র হিসেবে সুন্দর ও অসুন্দর এই ভেদ হচ্ছে নানা রচনার মধ্যে। হরিণ সে বাঁশি শুনে ভোলে, সাপ সে বাঁশি শুনে ফণা তুলে তেড়ে আসে, সাপ-খেলানো বাঁশি সাপের কানে সুন্দর সুর দিলে, মানুষের কানে হয়তো খানিক সেটা ভাল ঠেকল, তাই বলে বিয়ের রাতে সানাই উঠিয়ে নহবৎখানায় সাপুড়ে এনে বসিয়ে দেয় কেউ? অবশ্য রুচিভেদে গড়ের বাদ্যি ঢাকের বাদ্যি বিয়ের রাতে এসে জোটে, ঘুমন্ত পাড়ার কানের শ্রবণশক্তি তেজস্কর পদার্থ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে কনসার্টের দলও অলিতে-গলিতে এসে আবির্ভূত হয়; কিন্তু নিজের মনকে প্রশ্ন করে দেখ, সে নিশ্চয়ই বলবে যে কিছুক্ষণের জন্য বলেই এসব সইছে; ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি—এটা মানুষের মন বলেই দিয়েছে বহুকাল আগে, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় আকাশ ভরে যে শাঁখ ঘণ্টা বাজে তার স্বরমাধুর্য সম্বন্ধে অন্য মত কারও আছে বলে তো বোধ হয় না। গড়ের বাদ্যি গড়ের মাঠে সুন্দর লাগে, মন্দিরের শাঁখ ঘণ্টা দূরে থেকেই ভাল লাগে। সভাস্থলে বীণা বেণু মন্দিরা, ঘরের মধ্যে সোনার চুড়ির ঝিনঝিন্ স্থান কাল পাত্রের হিসেবে সুন্দর অসুন্দর ঠেকে। মাঠ ছেড়ে গড়ের বাদ্যি যদি ঘরের মধ্যে ধুমধাম লাগায় তবে সে স্থান কাল পাত্রের হিসেব ডিঙ্গিয়ে চলে ও সেই কারণেই ভারি বিশ্রী ঠেকে কানে। মন্দির যখন নদীর ওপার থেকে আরতির ঝনঝন অনেকখানি বাতাস আলো দিয়ে ধুয়ে পাঠায় এপারে তখনি সুন্দর ঠেকে সেটি। সন্ধ্যাপ্রদীপ সন্ধ্যাতারা একজন খুব ঘরের কাছে অন্যজন খুব দূরের কিন্তু সুন্দর হিসেবে দুজনে সমান বলে আলোর তীক্ষ্ণতা স্তিমিত করে নিয়ে দুজনেই সুন্দর হল মানুষের চোখে!

দখিন হাওয়া শরতের আলো এসবের মাধুর্যের পরিমাপ তাপমান যন্ত্রের দ্বারা হয় না, মনের বীণায় এরা আপনার সুন্দর পরশ বুলিয়ে দিয়ে জানায় যখন, তখন বুঝি কতখানি মধুর এবং কতখানি সুন্দর এরা। মানুষের মধ্যে যারা ওস্তাদ নয় তারা নিজের হাতে কাঠের বীণাটায় ঘা দিতে থাকে মাত্র, মনে ঘা দেওয়ার কৌশল জানে না তারা। সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার উত্তর মানুষ না পেলে বাহির থেকে, না পেলে তার নিজের ভিতর থেকে, এইজন্যই মনে হয় দেশে দেশে কালে কালে সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে মানুষ ক্রমাগত আলোচনা করে চলেছে। পণ্ডিত থেকে অপণ্ডিত সবাই জানে সুন্দর আছে, কিন্তু কার কাছে কেমনটি সুন্দর কেমনটি নয় এর মীমাংসা হল না আজও। স্থান কাল দুই অনুকূল প্রতিকূল হয় সুন্দর সম্বন্ধে—এটা কতকটা স্থির হয়ে গেছে; কিন্তু পাত্র হিসেবে কার চোখে কি যে সুন্দর এর মীমাংসা প্রত্যেকে নিজেরাই করছি। শাঁখ ঘন্টা দূর থেকে একটা সময়ে ভাল লাগল বলে কানের কাছে তাকে যদি কেউ টেনে এনে বলে, শোনো কি সুন্দর, তবে তর্কের ঝড় না উঠে যায় না; একথা গড়ের বাদ্যি ইমামবাড়ার আজান সবারই সম্বন্ধে খাটে। দূরে থাকার দরুন অনেক জিনিস সুন্দর ঠেকে, দূরত্ব ঘুচিয়ে কাছে টেনে আনলেই তাদের সব সৌন্দর্য চলে যায়।

এই যে ব্যক্তিগত মতামত, সুন্দর অসুন্দরকে নিয়ে এই যে সব ছোটখাটো তর্ক-বিতর্ক, যার কোনো শেষ দেখা যায় না, নানা সুন্দরের সৃষ্টি করে করে মানুষ দেখতে চেয়েছে এটিকে নিরস্ত করতে পারে কি না। রচনাকে স্থান কাল পাত্রের অতীত করে দিতে চেয়েছে মানুষ; শোনাবার জন্য যেসব রচনা তা মানুষ উপযুক্ত ছন্দোবন্ধ সুর-সার ইত্যাদি দিয়ে, দেখাবার জন্যে যে রচনা যথোপযোগী রঙ চঙ ও নানা কায়দা দিয়ে সব সময়ে সবার উপভোগ্য ও সুন্দর করার চেষ্টা করে গেল কালে কালে। সুরকে সঙ্গীতশাস্ত্রের মধ্যে, কথাকে ছন্দশাস্ত্রে, ছবিকে বর্ণশাস্ত্রের মধ্যে ধরে মানুষ দেখতে চলল কি হয়, কিন্তু বাস্তবিক যা সুন্দর তা ধরা গেল না একটা কিছুর মধ্যে, সে বিচিত্রতা ও বিস্তাব চেয়ে বাঁধন কাটতে থাকল বারেবারে। কোনো ছবি বর্ণ ছেড়ে খালি রেখার ছন্দ ধরে হয়ে উঠল ভারি সুন্দর, কোনো গান শাস্ত্রমতো তাল মান সুর ছেড়ে প্রায় সহজ কথা হয়ে পড়ে হল সুন্দর, আবার কোথাও ছবি হয়ে হতে চলল সুন্দর, তিন শাস্ত্রের পাতা উল্টে-পাল্টে এক হয়ে গেল, ছন্দ পেয়ে ছবি অথবা ছবি পেয়ে ছন্দ সুন্দর হয়ে ওঠে, বোঝা কঠিন হল বোঝানও কঠিন হল! রচনাতে স্থান কাল পাত্রের সীমা অতিক্রম করার জন্য নতুন নতুন উপায়ের সৃষ্টি হয়েই চলল। আকাশের চাঁদকে আমরা প্রায় সকলেই সুন্দর দেখি, কিন্তু কি নিয়ে চাঁদ সুন্দর যদি এ প্রশ্ন করা যায় তবেই গোলযোগ বাধে। কেউ বলে চাঁদনি নিয়ে চাঁদ সুন্দর, কেউ বলে তার ছাঁদটি নিয়েই চাঁদ সুন্দর, কেননা অনেক শিল্পী দেখেছি কালো চাঁদ এঁকেছেন অথচ ছবিটির সৌন্দর্যহানি একটুও ঘটেনি। আর্টিস্ট মানুষের অনেক রকম পাগলামি থাকে, সুতরাং কালো চাঁদের উদাহরণটি সবাই স্বীকার করতে নাও রাজী হতে পারেন। কিন্তু ঠিক এই উপায় দেখেছি প্রকৃতিদেবীও অবলম্বন করেছেন নিজের রচনাতে—সাদা তুষারকে কালো নীলবর্ণ করে দেখিয়েছিলেন তিনি আমাকে যতদিন পাহাড়ে বাস করেছিলেম ততদিন—প্রত্যেক প্রভাতে সোনার আকাশপটের মাঝখানে কালো তুষারের ঢেউ অথচ দৃশ্যপটে একটুও সৌন্দর্যহানি হল না।

চাঁদনি রাতের বেলায় আমরা বলে থাকি, দিব্যি ফুটফুটে রাত, অন্ধকার রাতের বেলায় দিব্যি ঘুটঘুটে অন্ধকার তো বলিনে! কিন্তু কবিরা দুটোই যে সুন্দর তার এত প্রমাণ হাতের কাছে রেখে গেছেন যে তা উঠিয়ে লেখা বড় করা মিছে। এই সেদিন একখানা চীন দেশের পাখা আর একখানি জাপানের পাখা হাতে নিয়ে দেখছিলেম,—জাপানের পাখাখানি সাদা, তার উপরে নানা রঙের ছবির বাহার, দিনের আলোয় সুন্দর পৃথিবীর

একটুখানি যেন দেখা যাচ্ছে, চীনের পাখাখানি ঠিক এর উল্টো ধরনে আঁকা; অন্ধকার রাত্রির একটি মাত্র প্রলেপ, তার মধ্যে কোন ছবি কি কোন রং নেই—স্নিগ্ধ গভীর ঘুম-পাড়ানো কালো অথচ ভারি সুন্দর। এই যে সুন্দরকে দেখতে দুই দেশের দুই শিল্পী পাখা মেললে, একজন দিনের দুয়ার দিয়ে আলোর মাঝে উড়ে পড়ল প্রজাপতির মতো, অন্যজন একেবারে অন্ধকার সাগরে খেয়া দিয়ে চলল—এরা দুজনেই তো দেখে গেল দেখিয়ে গেল সুন্দরকে।

যারা ভারি পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধরে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—একথা একেবারেই বলা চলল না, বিষম অন্ধকার না বলে বলতে হল বিশদ অন্ধকার—যদিও ভাষাতত্ত্ববিদ এরূপ করায় দোষ দেখবেন। কালো দিয়ে যে আলো এবং রং সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দরভাবে তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এই যে সুন্দর কালো এর সাধনা বড় কঠিন। সেইজন্য জাপানে ও চীনদেশে একটা বয়স না পার হলে কালি দিয়ে ছবি আঁকতে চেষ্টা করতে হুকুম পায় না গুরুর কাছ থেকে শিল্পশিক্ষার্থীরা। যে রচনায় রস রইল সেই রচনায় সুন্দর হল এটা স্থির, কিন্তু রস পাবার মতো মনটি সকল মানুষেই সমানভাবে বিদ্যমান নেই, কাজেই এটা ভাল ওটা ভাল নয় এইরকম কথা ওঠে। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা, তাই কোন একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্ব নগরের বিচিত্র রঙের তারা-ফুলে-গাঁথা রঙিন মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে। মানুষ প্রথম ভাবলে, এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাঁতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এল, মানুষ বললে, ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর। আবার এল একদিন জলের ধারে সারস পাখি—মেঘ যাকে নিজের গায়ের রঙে সাজিয়ে পাঠালে। এমনি একের পর এক সুন্দর দেখতে দেখতে মানুষ বর্ষাকাল কাটালে, তারপর শরতে দেখা দিলে আকাশে নীল পদ্মমালার দুটি পাপড়িতে সেজে নীলকণ্ঠ পাখি, এমনি ঋতুর পর ঋতুতে সুন্দরের সন্দেশবহ আসতে লাগল একটির পর একটি মানুষের কাছে—সব শেষে এল রাতের কালো পাখি আকাশপটের আলো নিভিয়ে অন্ধকার দুখানি পাখনা মেলে—পৃথিবীর কোনো ফুল, আকাশের কোনো তারার সঙ্গে মানুষ তার তুলনা খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল!

এই যে একটি মানুষের কথা বললেম, এমন মানুষ জগতে একটি দুটি পাই যার কাছে সুন্দর ধরা দিচ্ছেন সকল দিকে নানা সাজে নানা রূপে বর্ণে সুরে ছন্দে! ময়ূরই সুন্দর, কলবিঙ্ক নয়, কাক নয় এই কথা যারা বলছে এমন মানুষই পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে দেখতে পাই।

সুরের নানা ভঙ্গি দখল না করে আমাদের গাইয়ে মুখভঙ্গিটাতেই যখন পাকা হয়ে উঠল, তখন সভার লোকে দূর ছাই করে তাকে গঞ্জনা দিলে, সুরের সৌন্দর্য ফুটল না তার চেষ্টায় বটে কিন্তু ঐ মুখভঙ্গি অঙ্গভঙ্গির মধ্যে আর একটা জিনিস ফুটল যেটি হয়ে উঠল একখানি সুন্দর ছবি ওস্তাদের!

আর্টিস্টদের কেউ কেউ ভুল করে বলেন 'সুন্দরের সন্ধানী'। সুন্দর যাকে ঘিরে থাকে না সেই বেড়ায় সুন্দরের খোঁজে গড়ের মাঠে জু গার্ডেনে মিউজিয়ামে—এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সুন্দর কি, সুন্দর কি নয় এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক লেখা-লেখি এবং সৌন্দর্যতত্ত্বের রসতত্ত্বের যত পুঁথি আছে তার বচন ধরে-ধরে যেন লাঠি হাতে চলা। ততক্ষণ সুন্দর যতক্ষণ কাছে নেই, সুন্দর এলেন তো ওসব ফেলে চলল মন স্বচ্ছন্দে

অবাধগতিতে সব তর্ক ভুলে। অজ রাজা যখন নগরে প্রবেশ করেছিলেন তখনকার কথা কার না জানা আছে? ফুল ফুটে গিয়েছিল সেদিন আপনা হতেই। মধুকরের কাছে যেভাবে হাওয়া এসে মধুর খবর দিয়ে যায় সেইভাবে খবর আসে সুন্দরের যে লোক যথার্থ আর্টিস্ট তার কাছে, তাকে ঘুরে বেড়াতে হয় না সুন্দরকে খুঁজে খুঁজে, আর্টিস্টে আর সুন্দরে লুকোচুরির লীলা চলে অনেক সময়ে কিন্তু সে দুই ছেলেতে পরিচয় হবার পরে খেলার মতো, ইচ্ছা করে গোপন থেকে পর্দা টেনে দিয়ে খেলা,—তার মধ্যে রস আছে বলেই খেলা চলে। যে সুন্দরকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্ধান করছে তার ছুটোছুটির সঙ্গে এ খেলার তফাত রয়েছে।

পিঁপড়ে ছুটোছুটি করে চিনির সন্ধানে কিন্তু মধু আহরণে মৌমাছির ছুটোছুটি সে একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। পিঁপড়ের চিনি সংগ্রহের সঙ্গে তার পেটের যোগ, চিনি না পেলে সে মরা ইঁদুরে গিয়ে চিম্‌টি বসায় কিন্তু পেট খুব তাড়া দিলেও মাছের আর মাংসের যুষ দিয়ে মৌচাক ভর্তি করতে চলে না মৌমাছি। মৌমাছি কি খেয়ে বাঁচে এবং আর্টিস্ট তারাও কি খেয়ে জীবনধারণ করে তার রহস্য এখনো ভেদ হয়নি। শুধু এটুকু বলা যায় যে তারা পিঁপড়ের মতো সুন্দর সামগ্রীকে পেটের তাড়নার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সুন্দরের সন্ধানে বার হয় না, ফুল ফোটে ওধারে সুন্দর হয়ে খবর আসে বাতাসে তাদের কাছে, চলে যায় তারা সুন্দরের নিমন্ত্রণে, সন্ধানে নয়। মৌচাকে যেমন মধু তেমনি ছবি মুর্তি কবিতা গান কত কি পাত্রে ধরলে মানুষ সুন্দরকে, এদিকে আবার বিশ্বজগতে সুন্দর নিজেকে ধরে দিলেন আপনা হতেই ফুলে ফলে লতায় পাতায় জলে স্থলে আকাশে কত স্থানে তার ঠিকানা নেই, এত সুন্দর আয়োজন কিন্তু ভোগে এল শুধু দু-চারজনের, আর বাকি অধিকাংশ তারা এসবের মধ্যে থেকে শুধু সৌন্দর্যতত্ত্বই বার করতে বসে গেল। সেই বেজান্‌ শহরের কথা মনে হয়; উপবনে সেখানে পাখি গাইল ফুল ফুটল মুকুল খুলল ফল ধরল পাতা ঝরল, সবই সুন্দরভাবে হয়ে চলল দিনে রাতে, কিন্তু শহরের কোনো মানুষ এগুলো থেকে কিছু নিতে পারলে না, পাথরের চেয়েও পাথর হয়ে বসে রইল, শুধু দু-চারজন পথিক দুটো-একটা হতভাগা ভিখিরী নয় পাগল তারাই কেবল থেকে-থেকে এল গেল সেই দেশের সেই বাগানে যেখানে দৃষ্টি-ভোলানো সুন্দরের সামনে মুখ করে বসে আছে মূক অন্ধ বধির নিশ্চল মানুষের দল ঘোলা চোখ মেলে।

যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম তার চোখের উপরে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে ফেললেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পেলে সে অতি সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে, কোনো গুরুর উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হল না তার, বিনা অঞ্জনেই সে নয়নরঞ্জনকে চিনে গেল।

মাটি থেকে আরম্ভ করে সোনা পর্যন্ত, যে ভাষায় কথা চলে সেটি থেকে ছন্দোময় ভাষা পর্যন্ত, তারের সুর থেকে গলার সুর পর্যন্ত বহুতর উপকরণ দিয়ে রূপদক্ষেরা রচনা করে চলেছেন সুন্দরের জন্য বিচিত্র আসন, মানুষের কাজে কতটা লাগবে কি না-লাগবে এ ভাবনা তাঁদের নেই। কাদায় যে গড়ে সে কাদাছানা থেকেই সুন্দররে ধ্যান ধরে চলে, না হলে গড়ার উপযুক্ত করে মাটি কিছুতে প্রস্তুত করতে পারে না সে—এ কথাটা কারিগরের কাছে হেঁয়ালি নয়। চাষের আরম্ভ থেকেই সোনার ধানের স্বপ্ন জমিতে বিছিয়ে দেয় চাষা কিন্তু যার সুন্দরের ধ্যান মনে নেই সে যখন ভাল মাটি নিয়ে বসে যায় এবং দেখে মাটি বাগ মানছে না তার হাতে, তখন সে হয়তো বোঝে হয়তো বোঝেও না কথাটার মর্ম।

ছন্দ, সুর-সার এবং রং প্রস্তুত ও তুলি টানার প্রকরণ সহজে মানুষ আয়ত্ত করতে পারে কিন্তু তুলি টানা হাতুড়ি পেটা কলম চালানোর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরের ধ্যানে মনকে স্থির রাখতে সবাই পারে না, এমনকি রূপদক্ষ তারাও সময়ে সময়ে লক্ষ্য হারিয়ে ফেলছে তাও দেখা যায়।

যে রচনাটি সর্বাঙ্গসুন্দর তার মধ্যে রচনার কল-কৌশল ধরা থাকে না—কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে! এইযে সহজ গতি এ থাকে না যা সর্বাঙ্গসুন্দর নয় তাতে—কৌশল নৈপুণ্য সবই চোখে পড়ে। কবিতা থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, ছবি মূর্তি সব থেকে এটা প্রমাণ করা চলে। কর্ম কোনো রকমে নিষ্পন্ন হল এবং কর্ম খুব হাঁকডাক ধুমধামে নিষ্পন্ন হল এ দুয়েরই চেয়ে ভাল হল কর্মটি যখন সহজে নিষ্পন্ন হয়ে গেল কিন্তু কর্মের জঞ্জালগুলো চোখে পড়ল না।

হাড় মাসের কত গাঁঠ খিল বাঁধন কষন ইত্যাদি অত্যন্ত জটিল ব্যাপার নিয়ে তৈরি হল মানুষের দেহযন্ত্র, এইসব যান্ত্রিক ব্যাপার যা নিয়ে মানুষটা চলছে বলছে সেগুলো আড়ালে রইল একখানি পাতলা পর্দার ওপারে তবেই সুন্দর ঠেকল মানুষটি। আর্গিন যন্ত্রের ঘেরাটোপ খুলে দিয়ে তার ভিতরের কারখানা যদি চোখের সামনে ধরে দেওয়া যায় তবে সেটা খুব সুদৃশ্য বলে ঠেকে না।

আমি একবার একটা ছাপার কল অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেম। যন্ত্রটা একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কাজ একা করছে, মানুষের চেয়ে সুচারু ও দ্রুতভাবে। এতে করে ভারি একটা আনন্দ হল, কিন্তু একটি পাখিকে উড়তে দেখে যে আনন্দ তার সঙ্গে সেদিনের আনন্দে তফাত ছিল। পাখির ডানার মধ্যে নানা কল-বল কিভাবে কাজ করছে তার খোঁজই নেই, ওড়ার সুন্দর ছন্দই সেখানে দেখা দিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন দেশে তার ঠিক নেই। সৃষ্টির নিয়মে সমস্ত সুন্দর জিনিস আপনার নির্মাণের কৌশল লুকিয়ে চলল দর্শকের কাছ থেকে এবং এই নিয়মই মেনে চলল সমস্ত সুন্দর জিনিস যা মানুষে রচনা করলে—যেখানে নির্মাণের নানা প্রকরণ ও কৌশল ধরা পড়ে গেল সেখানেই রচনার সৌন্দর্যহানি হল, কলের দিক ফুটল কিন্তু রসের দিক সৌন্দর্যের দিক চাপা পড়ে গেল। ঘুড়ি যখন আকাশে ওড়ে তখন যে কলটি তাতে বেঁধে দেয় কারিগর সেটি বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায় তবেই সুন্দর ঠেকে ঘুড়িখানির ওড়ার ছন্দ। জাহাজ এমনকি উড়ো কল তারাও দেখায় সুন্দর এই কারণে এবং সবচেয়ে দেখায় সুন্দর গঙ্গার উপরে নৌকাগুলি যার চলার হিসেব ও কল-বল প্রত্যক্ষ হয়েও চক্ষুশূল হচ্ছে না।

সুন্দর জিনিসের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্তমান হল। চোখের বাইরে যে পরকলা তার সঙ্গে চোখের ভিতরে যে মণিদর্পণ তার যোগাযোগ অচ্ছেদ্য হল, তখনই সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া গেল বিশ্বের জিনিস, চশমার কাচে আঁচড় পড়ল চোখ রইল পরিষ্কার, কিংবা চোখের মণিতে ছানি পড়ল চশমা রইল ঠিকঠাক, এ হলে সুন্দর দেখা একেবারেই সম্ভব হল না।

মৌখিক আত্মীয়তা ভারি বিশ্রী ঠেকে, কেননা, কথা সেখানে শুধু মুখ থেকে বার হচ্ছে, বুক থেকে নয়; কোলাকুলি সেও বাইরে বাইরে ছোঁয়াছুঁয়ি, বুকে-বুকে লাগা একে বলতে পারা গেল না! ভারি সুন্দর লাগে যখন মানুষটির সঙ্গে মানুষের হৃদয় বাইরেটির সঙ্গে ভিতরের ভাবগুলি সুন্দর মিল নিয়ে এসে লাগে মনে।

শিল্পসামগ্রী সংগ্রহের সময়ে দু-একখানা পার্সি কেতাবের খালি মলাট হাতে পড়ে সেখানে মলাটখানাই একটা বাইরের এবং ভিতরের সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হয় সামনে। এইভাবে কত সমুদ্রের ঝিনুক ফুলের

পাপড়ির মতো হাতে পড়েছে, আশ্চর্য বর্ণ আশ্চর্য সৌন্দর্য নিয়ে। প্রত্যেক বারেই লক্ষ্য করেছি চোখ এবং মন দুই-ই আকর্ষণ করেছে বস্তুগুলি। শাস্ত্রে সুন্দরের কতকগুলো লক্ষণ দিয়ে বলা হয়েছে এই হলেই হল রমণীয়, কিন্তু শুধু চোখে এবং দূরবীক্ষণ লাগিয়ে ও তারপরে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখেও সুন্দর সম্বন্ধে শেষ কথা স্বর্গ মর্ত্য পাতালে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আকাশের রামধনুতে যিনি সুন্দর, তিনি রয়েছেন পৃথিবীর ধূলিকণায়, তিনিই রয়েছেন অতলের তলাকার একটুকরো ঝিনুকের বাইরে সমান সৌন্দর্য ও শোভা বিকীর্ণ করে—হৈ সবমেঁ সহবীতেঁ ন্যারা!

অসুন্দর

মন সুন্দরের দিকে ফিরে ফিরে চায় অসুন্দরের দিক থেকে বারে বারে সরে আসে— এই জানা কথা বেশি করে জানানো নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু যারি থেকে মন সরে পড়তে চায় তাই অসুন্দর নাও হতে পারে—হয়তো আমাদের নিজেদের দেখার ভুলে চোখের সামনে থাকতেও সুন্দরকে চিনতে পারলেম না এমনো হওয়া বিচিত্র নয়। সুন্দরে অসুন্দরে একটা পরিষ্কার ভেদাভেদ নির্ণয় করে দেওয়া কঠিন, ব্যক্তিগত রুচি অরুচির হিসেবে দেখে চললে।

বাইরে থেকে মনের মধ্যে সুন্দর যে পথে আসছে অসুন্দরও সেই পথ ধরেই আনাগোনা করছে। বসন্তের হাওয়া গায়ে লাগে, আবার বসন্ত রোগ সেও গায়ে লাগে— দুয়ের বেলাতেই শরীর কাঁটাও দিয়ে ওঠে, কিন্তু মন বিচার করে বলে এটা সুন্দর ওটা ভয়ঙ্কর বিশ্রী। দাঁতের বেদনা সুন্দর অবস্থা কেউ বলে না, এখানে ব্যক্তিগত রুচি নিয়ে কথাই ওঠে না, কিন্তু দাঁতগুলি কেমন তার বেলা রুচিভেদে তর্ক ওঠে।

চলতি কথায় মনের উপরে সুন্দর-অসুন্দরের ক্রিয়া ভারি সহজে বোঝানো হয়েছে। সুন্দরের বেলায় বলা হল, জিনিসটি কি মানুষটি মনে ধরল, আর অসুন্দরের বেলায় বললেম, মনে ধরল না। প্রথমে বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় পরে মনের বিষয় হয়ে মনে রয়ে গেল সুন্দর, অসুন্দর বাইরের বিষয় হল, কিন্তু মনে তার স্থান হল না, পরিত্যক্ত হল মন থেকে অসুন্দর, মন মনে রাখতে চাইলে না অসুন্দরকে, এই হল নিয়ম।

মনের প্রহরী পাঁচ ইন্দ্রিয় সুতরাং প্রহরীর ভুলে অনেক সময় সুন্দর দরজা থেকে ফিরে যায় আর অসুন্দর চলে যায় সোজা বাসরঘরে! এটা ঘটতে দেখা গেছে দরোয়ান দূর করে দিলে পরম বন্ধুকে আর সোজা পথ ছেড়ে দিলে চাঁদাওয়ালাকে।

"হীরা হিরাইলরা কিচঁড়মে।" হীরা কাদার মধ্যে হারিয়ে রইল, চোখে পড়ল ঝকমকে কাঁচটা, এমন ঘটনাও ঘটে তো ? এবং যাই ঝকঝকে তাই সোনা নয়—একথাও বলতে হয়েছে রসিকদের যারা সুন্দরের সম্বন্ধে অন্ধ রইল তাদের শুনিয়ে।

অসুন্দরের মধ্যে একটা ভান থাকে, সুন্দরের কোনরূপ ভান থাকে না—এটা লক্ষ্য করা গেছে। মিথ্যার আবরণে অসুন্দর নিজেকে আচ্ছাদন করে আসে, সুন্দর আসে অনাবৃত—সত্যের উপরে তার প্রতিষ্ঠা।

আর্ট যা তা সুন্দর ও সত্য, ভান যা তা অসুন্দর এবং অসত্য। আর্ট বস্তুর ও ভাবের সত্যটাই প্রকাশ করে, যা ভান তা শুধু বাইরের জিনিসটা দিয়ে ধোঁকা দিয়ে যায়, এইজন্য এককে বলি সুন্দর অন্যকে বলি অসুন্দর, এককে বলি সত্য অন্যকে বলি অসত্য। এমনি সুন্দর-অসুন্দর সম্বন্ধে নানা মতামত রয়েছে দেখা যায়। মতামত জিনিসটা সময়ে সময়ে খুব কাজে লাগে কিন্তু তার একটা দোষও আছে, সে দুর্গপ্রাকারের মতো ভারি শক্ত বস্তু এবং ভারি সীমাবদ্ধ করে দেখায় সুন্দর অসুন্দর সব জিনিসকে; মতগুলো ছোট গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করে দেখায় বলেই মন সেখানে গিয়ে ধাক্কা খায়। তর্ক সৃজনের বেলায় মতামত কাজে আসে, রসসৃষ্টি সুন্দর কিন্তু সৃষ্টির

বেলায় মত ধরে চলে না। অসুন্দর ধোঁকা দেয়, অসুন্দর ভ্রান্তি জন্মায়, অসুন্দর অমঙ্গলের কারণ ইত্যাদি প্রচলিত মত সত্ত্বেও আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে 'সন্দেহালঙ্কার' এবং 'ভ্রান্তিম অলঙ্কার' দুটি অলঙ্কারের উল্লেখ রয়েছে— চলিত কথায় যার নাম ধোঁকা দেওয়া এবং উল্টো বুঝিয়ে দেওয়া। মতামত ধরে চললে এর মধ্যে সত্য সুন্দর ও মঙ্গল তিনের একটিও থাকতে পারে না—কিন্তু আর্ট, যার গোড়ার কথা হল সুন্দরকে দেখা ও দেখানো তার সব উপকরণ-প্রকরণ ভ্রান্তি উৎপাদন করেই চলেছে, মায়াপুরী সৃজন করে চলেছে সুর দিয়ে কথা দিয়ে রং দিয়ে, নশ্বরে করেছে অবিনশ্বরের আরোপ। খুব পাকা জাদুকরের চেয়ে আর্ট বেশি ভ্রান্তির সৃজন করছে —বিনা বীজে গাছ ফুল পাতা ফুটিয়ে ধরছে, চাঁদকে করে দিচ্ছে মানুষ, মানুষকে করে দিচ্ছে চাঁদ! সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের পক্ষে যেগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাধা তাই নিয়ে হচ্ছে রূপদক্ষ সকলের কারবার, সিঁধ দিচ্ছে এরা মতামতের দেয়ালে যে কাঠিটি দিয়ে তার মুখে কালির মতো লেগে আছে এই মতবিরুদ্ধ যা কিছু তা।

ছেলে একটা কাঠের ঘোড় নিয়ে খেলতে বসেছে। সত্যিকার ঘোড়ার রং গড়ন-পিটন সমস্তই এখানে বাদ পড়ে গেল অথচ ছেলে বুড়ো সবাই দেখছে সেটিকে নিছক সুন্দর। ছেলে ঘোড়াটা পেয়ে খেলছে সংসারের জিনিস নয়-হয় করছে না, হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙছে না, এইজন্য বলতে পারি ঘোড়াটি মঙ্গলের কারণ; কিন্তু সত্য তাকে তো ঘোড়ার মধ্যে কোথাও ধরা যাচ্ছে না, ছেলের কাছে যে সেটা সত্যি ঘোড়া তারও প্রমাণ পাচ্ছিনে কেননা শুনছি ছেলেই দিচ্ছে খেলনাটার নাম 'বাঘামামা'। মতের বাঁধন অস্বীকার করে খেলার ঘোড়া অসুন্দর হল না, সুন্দরই ঠেকল ছেলের ও ঠাকুরদাদার চোখে !

সুন্দর সে শুধু শুধুই সুন্দর, এ কারণে সে কারণে সুন্দর নয় এটা যেমন সত্যি তেমনি সত্যি অসুন্দর সে অসুন্দর বলেই অসুন্দর।

"নরা গজা বিশে শয়
তার অর্ধ বাঁচে হয়।
বাইশ বল্‌দা তের ছাগলা
তার অর্ধ বরা পাগলা।"

এর মধ্যে সত্য অনেকখানি রয়েছে, মঙ্গলের কারণও এটার যথেষ্ট বিদ্যমান, কিন্তু সুন্দর কবিতা তো এটা হল না!

" দ্বাদশ অঙ্গুলী কাঠি, সূর্যমন্ডলে দিয়া দিঠি।
রবি কুড়ি সোমে ষোল, পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল।
বুধ বৃহস্পতি এগার বারো, শুক্রু, শনি চৌদ্দ তেরো।
হাঁচি জেঠি পড়ে যবে, অষ্টগুণ লভ্য হবে।"

পূর্ণ মঙ্গলের আবির্ভাব এখানে একথা অস্বীকার করতে চাইনে, সত্যও আছে ধরে নিলেম কিন্তু সুন্দর তাঁর তো দেখা নেই বলতে হল!

এইবার একটি সুন্দর বচন শোনাই—

"ডাকয়ে পক্ষী না ছাড়ে বাসা
উড়িয়ে বসে খাবে করি আশা
ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা

খনা ডেকে বলে সেই সে ঊষা।”

ঊষার সহজ সুন্দর বর্ণনা, এর মধ্যে কতটা সত্য কতটা মঙ্গল এসব মাপতে গেলে এর রসভঙ্গ হয়। বেদেও ঊষার বর্ণনা আছে, সে আর এক ভাবের সুন্দর। অথচ এই খনার বচনের মধ্যে যেমন ঊষা কতক সত্য ঘটনা ধরে বর্ণনা করা হল ঠিক তেমনভাবে ঋষিরা ঊষার বর্ণনা করলেন না, সেখানে সত্য ও কল্পনা মিলে-মিশে সুন্দর হয়ে দেখা দিলে। সুতরাং তর্ক-বিতর্ক করে সুন্দর-অসুন্দরের ধারণা হওয়া আমার তো মনে হয় অসম্ভব ব্যাপার। ফোটা ফুল গন্ধ নিয়ে সুন্দর, না তার পাপড়িগুলির যথাযথ বিন্যাসটি নিয়ে, না তার ফোটার আদ্যন্ত রহস্য নিয়ে সুন্দর,—এ তর্কের তো শেষ নেই। যাকে বলতে চাই অসুন্দর তার বেলাতেও এই কথা ওঠে—কেন অসুন্দর ?

দীপশিখা সে যেমন ভয়ঙ্কর সত্য তেমনি ভয়ঙ্কর সুন্দর কিন্তু যেখানে সে ছেলের হাত পোড়ালে ঘরে আগুন ধরালে সেখানে সুন্দর বলে গৃহস্থ তাকে মনে করলে না। শান্তিনিকেতনে এমনি একটা লঙ্কাকান্ড দেখে আমার একটি ছাত্র এতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন যে একটি চমৎকার সুন্দর ছবি দিনের ডাকেই আমার কাছে এসে পড়েছিল। যদি আর্টিস্টের নিজের ঘরে এই কাণ্ডটা ঘটত তবে তিনি নিশ্চয় সুন্দর দেখতেন না অগ্নিকাণ্ডটি। এখানে দেখলেম, সুন্দর তিনি অমঙ্গলের রাজবেশ ধরে দেখা দিলেন আর্টিস্টকে, আর একথাও তো মিথ্যা নয় এই ‘রাজবৎ উদ্ধতদ্যুতি’ অগ্নিশিখাগুলি তার কাছে সে রাত্রে ভারি অসুন্দর ঠেকেছিল যার ঘরদ্বার পুড়ে ছাই হচ্ছিল। একের পক্ষে যা অসুন্দর হল তার স্বার্থে ঘা দিচ্ছে বলে, অন্যের পক্ষে তাই সুন্দর হয়ে দেখা দিলে স্বার্থে ঘা দিলে না বলে। অগ্নিকান্ডের ছবিখানা কিন্তু এই দুই মানসিক অবস্থার বাইরের জিনিস হয়ে তবেই সুন্দর হল, যাদের ঘর পুড়ল তাদের কাছে, যাদের ঘর পুড়ল না তাদেরও কাছে। প্রকৃতির মধ্যে আসল ঘর পোড়ার সময়ের যে অমঙ্গলের আশঙ্কা মনকে বিমুখ কচ্ছিল, ছবির অগ্নিশিখার লেলিহান উজ্জ্বল ছন্দটি থেকে সেটি বাদ গেল, রইল শুধু দৃশ্যটির সৌন্দর্য ও রস, কাজেই সুন্দর ঠেকল। এইভাবে আর একটি সদ্য-জবাই-করা মোরগের ছবি ভয়ঙ্কর সত্যরূপে এঁকে এনেছিল আমার সামনে আমার আর এক ছাত্র। ভারি বিশ্রী ঠেকল সে ছবি, আমার সইল না মনেও ধরল না, চোখের কাছে এসেই ঠিকরে পড়ল মাটিতে। এখন যদি বলা যায় এ ছবি নিশ্চয় সুন্দর ঠেকবে অন্যের কাছে, এর জবাব কি দেব ? —হাঁ সুন্দর ঠেকবে এই কথাই কি বলতে হবে না? আমাকে যেভাবে ছবিটা পীড়া দিলে সেভাবে অন্যকে নাও দিতে পারে, সুতরাং আমার অসুন্দর অন্যের সুন্দর এটা বলা চলল।

বিশ্বের কতকগুলো জিনিসকে মানুষের মন বিনা তর্কে সুন্দর বলে মেনে নিয়েছে, কতকগুলো জিনিসকে বলে গিয়েছে অসুন্দর। কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কতক জিনিস সুন্দর বলে প্রশংসা পেয়েছে, কতক জিনিস এ পরীক্ষায় এখনো উত্তীর্ণ হয়নি, সেগুলো রয়ে গেছে অসুন্দর। হয়তো দেখব এইসব অসুন্দর হঠাৎ একদিন পরীক্ষা পাস হয়ে গেছে, ওস্তাদের এবং কারিগরের হাতে পড়ে তারা সুন্দর হয়ে উঠেছে, ধুলো-মুঠো হয়ে গেছে সোনা-মুঠো!

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দুটি-তিনটি কারিগরি রয়েছে এক ওস্তাদের তাঁবেদার, তারা সকালে আসে সন্ধ্যায় আসে দিনে আসে রাতে আসে—আলো-অন্ধকারের অধিবাসের ডালা নানা সাজসজ্জার উপকরণে ভরে নিয়ে। সৃষ্টির জিনিসকে নতুন নতুন সুন্দর সাজে সাজিয়ে চলাই তাদের কাজ। কোনো দিন অবেলায় আফিস ঘরে চুপিচুপি ঢুকে দেখলে দেখা যায়, সেখানে এসেও এই কারিগর কয়জন অতি অসুন্দর দোয়াত কলম খাতাপত্র টেবিল

চেয়ার এমনকি বেহারার ঝাড়নটাকে পর্যন্ত চমৎকার আলো নয়তো চমৎকার ছায়া দিয়ে আশ্চর্য সৌন্দর্য দিয়ে গেছে—সেই আলো-অন্ধকারের রহস্য; তার মাঝে কালো যে হতভাগা বেরাল ছানাটাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেম সে এসে ঘুমিয়ে আছে অপূর্ব সাজ ধরে রূপকথার বেরাল রাজকন্যাটির মতো।

যার মধ্য দিয়ে কোনো রহস্য গতাগতি করছে না, যার মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য পলকে পলকে বদল ঘটাচ্ছে না এমন জিনিস যদি কোথাও থাকে তো সেইটিই অসুন্দর একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। যা চরিত্রবিহীন তা অসুন্দর। চরিত্র বিষয়ে একেবারে নিঃস্ব এমন কি জিনিস আছে তা খুঁজে পাইনে; এটুকু বলা যায় যা তার চারিদিকের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন, কটু কি মধু আমাদের কোনো স্বাদই দেয় না—তা আমাদের কাছে থেকেও নেই। বিস্বাদ যা তারও একটা স্বাদ আছে, যার চরিত্র নেই একেবারেই, যা কোনো স্বাদই দেয় না, এমন কিছু থাকে তো তাকেই বলি অসুন্দর। এর চেয়ে পরিষ্কারভাবে অসুন্দরকে দেখানোই শক্ত, কেননা জগতে সুন্দর-অসুন্দর একটা পরিষ্কার ব্যবধান নিয়ে বর্তমান নেই, সুন্দরে-অসুন্দরে মিলে এখানে লীলা চলেছে। যার কোনো শ্রী নেই তা বিশ্রী এটা ভারি সহজ কথা, কিন্তু একেবারে চরিত্রহীন স্বাদহীন শ্রীহীন তাকে কোথায় খুঁজে পাই তা কি কেউ বলে দিতে পারে ? আমি কিছুদিন আগে অসুখে পড়ে আবার আস্তে আস্তে সেরে উঠলেম, সেই সময়ে আমার এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বন্ধু এসে আমার কাজকর্ম ছবি-আঁকা বই-লেখা গানবাজনা গল্পগুজব সমস্ত বন্ধ করে আমাকে নিরবচ্ছিন্ন বিস্বাদ জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে উপদেশ দিলেন। শুনে আমার বুকের রক্ত তার সব রঙ হারিয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটি ফোঁটাতে পরিণত হবার যোগাড় হল। দেখলেম ভারি বিশ্রী সেই মনের অবস্থা,— এর চেয়ে অসুন্দর কোনো কিছুকে বোধ করিনি আর কোনো দিন।

এই ভাবের অবিচিত্র জীবনযাত্রা অনেক মানুষকে যে নির্বাহ করতে হচ্ছে না তা নয়। একটা কাজ করতে করতে কাজ করার স্বাদ ক্রমে ক্ষয় হয়ে গেল, তখন কলের মতো কাজ করে চলল জীবন্ত মানুষ—আফিসে যায়, সংসারের ভার বয়, ছবি কবিতাও লেখে, কিন্তু কোনো কিছুরই স্বাদ পায় না মন-রসনা। ছেলেগুলো নিত্য পাঠশালায় যে যেতে চায় না তার কারণ পড়তে যাওয়া-আসার সঙ্গে পড়ারও স্বাদ পাচ্ছে না ছেলেগুলি, সেই সময়ে তাদের মন উড়ু-উড়ু করতে থাকল এমন যে, তারা দেবতার কাছে নানা অসুন্দর ও অশুভ কামনা জানায়, নিজে হঠাৎ বুড়ো হোক, বুড়ো মাস্টার হঠাৎ মরুক ইত্যাদি ইত্যাদি—যে কটি অসুন্দরকে দেখে বুদ্ধদেবও ডরিয়েছিলেন, তাদের ভারি সুন্দর দেখলে ছেলেগুলি। শুভ যা তা সুন্দর, অশুভ যা তা অসুন্দর, এমনি একটা মত আছে। যখন দেখছি কোনো একটি পতঙ্গের কাছে রাত্রির অন্ধকার ভাল ঠেকল না, সে গিয়ে আত্মবিসর্জন করলে আগুনের কাছে, বলি যে, আগুন তাকে পোড়ায়নি সোনার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল তার দুখানি ডানা। প্রেমের সুন্দর অগ্নিশিখা নয়, এ যে অসুন্দর মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বা, সেটা বোঝারও সময় পেলে না পতঙ্গটি—এমনি হতভাগ্য। কিন্তু সতীদাহের বেলায় একথা কোনোদিন কেউ বলেনি বরং ওটা দর্শনীয় বলেই দেখতে ছুটত লোকে। রুচি অনুসারে একই জিনিস সুন্দর বা অসুন্দর আস্বাদ দেয়। চীনে বাড়িতে গিয়ে দেখলেম এক সুন্দর কাচের বাটিতে ছেলেরা শুঁটকি মাছ খাচ্ছে, বাটিটা সুন্দর লাগল, আহার্যের গন্ধটা কিন্তু চেনা নয় বলেই আমার নাকে ভারি অসুন্দর ঠেকল। এই ব্যক্তিগত রুচি-অরুচি ইত্যাদির উপরে যে রচনা উঠতে পারলে তাই যথার্থ সুন্দর হয়ে উঠল। মানুষ যখন নিজেই একটি ব্যক্তি তখন এই ব্যক্তিগত রুচি-অরুচি লোপ করে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষভাবে কিছু রচনা করা তার পক্ষে অসম্ভব। রচনার বিষয়-নির্বাচন

সেও রুচি অনুসারে করে চলে মানুষ; যে চা নিজের জন্য প্রস্তুত করা গেল সে আমার রুচি অনুসারে চিনি দুধ না দিয়ে যেমন-তেমন পাত্রে খেলেও কারো কিছু বলবার নেই, কিন্তু পরকে যেখানে নিমন্ত্রণ দিচ্ছি সেখানে পরের মুখ অনেকখানি চেয়ে কাজটি নিষ্পন্ন করতে হয়, না হলে ব্যাপার পন্ড হতেও পারে। ঘরে মেয়ে যেমন-তেমন সেজে বেড়াচ্ছে কারো দৃষ্টি পড়ে না সেদিকে, ঘরের মধ্যে একটি বাইরের লোক আসার খবর আসুক তখন মেয়েটাকে সুন্দর করতে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি পড়ে যায়। মেয়েটা সেজেগুজে মুখ দেখাতে চলেছে এমন সময় কাঁচি দিয়ে যদি তার বেনে খোঁপাটি কেটে দেওয়া যায় তবে যদি মেয়েটি সত্যই সুন্দরী হয় তবে একটু কাণাভাঙা সুন্দর পেয়ালাটির মতো চোখেই পড়ে না তার রূপের এই সামান্য খুঁত, কিন্তু শুধু সাজের দ্বারাই যাকে সুন্দর দেখাচ্ছে তার পক্ষে বেণীসংহারের মতো এমন দুর্ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। মেয়েরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনো পুঁথি পড়ে না অথচ তাদের হাতে দেখি সাজাবার ও দেখাবার সুন্দর এবং আশ্চর্য কৌশল সমস্ত কেমন করে এসে গেছে আপনা হতেই।

সব সুন্দর রচয়িতা আপনাকে গোপন রাখে, অসুন্দর সে নিজেই এগিয়ে আসে। ফুল কতখানি সুন্দর হয়ে ফোটে তা সে নিজেই জানে না, প্রজাপতি জানে না যে কতখানি সুন্দর তার গতাগতি, শামুক জানে না যে তাজমহলের চেয়ে আশ্চর্য সুন্দর সমাধি গড়ে যাচ্ছে সে! যে কাজে রচয়িতা ‘কেমনটা বানিয়েছি’ এইটুকুই প্রকাশ করে গেল সে কাজ অসুন্দর হল—এর নিদর্শন আমাদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। সেখানে প্রত্যেক পাথর কি কৌশলে একের পর আর স্তূপাকার করে তোলা হয়েছে এইটেই দেখা যায়। কারিগর তার তোড়জোড় নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে বুক ফুলিয়ে, কিন্তু তাজমহল সেখানে কারিগর কেমন করে পাথরগুলো কোন কোন খানে জুড়েছে তার হিসেবটিও যতটা সম্ভব মুছে দিয়ে তার সৃষ্টিটাকে এগিয়ে আসতে দিয়েছে সামনে। কাজের থেকে এতখানি আপনাকে লোপ করে দিতে যে না পারলে সে অসুন্দর কাজ করলে। বাড়ির কর্তা যেখানে অভ্যাগতকে আসন দিলে না, নিজেই গট্ হয়ে জায়গা জুড়ে বসল, সেখানে উৎসব তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিলে না। এই ভাবের অপূর্ণতা ভারি বিশ্রী জিনিস। বিয়ের রাতে বর-কনেকে উত্তম আসন দিয়ে গুরুজনেরাও নিম্ন আসনে বসেন, সুন্দর রসের নায়ক-নায়িকার স্থান অধিকার করে বলেই তারা দুটিতে বরেণ্যদেরও বরেণ্য হয়ে বর্তমান হয় সে রাতে।

বিশ্বের তাবৎ জিনিসের সংস্থানের মধ্যে এই উত্তমাধম বিচারের নিদর্শন স্পষ্ট ধরা যায়। যে আলো দেবে তার স্থান হল উচ্চে, যে সেই আলো পেয়ে সুন্দর হবে তার স্থান হল নীচে। সকল দেশের রঙ্গমঞ্চ থেকে ফুটলাইট এখন উঠে যাচ্ছে যে তার একটা কারণ নীচের আলোতে অভিনেতাদের মুখ ভারি অসুন্দর ঠেকে, সত্যই চোখে পীড়া দেয় ও সৌন্দর্যহানি ঘটায়। তাই আলোককে উত্তম স্থান দিতে চাচ্ছেন অভিনেতারা। প্রকৃতির দৃশ্যের মধ্যে এই উত্তমাধম ইত্যাদির সম্বন্ধে বিচারের ভুল দু’-এক জায়গায় ঘটতে দেখা যায়। সূর্য যখন আপনাকে খুব অনেকখানি সরিয়ে রেখে জল স্থল আলোকিত করছেন তখন বিশ্বরচনা একটা অপরূপ সৌন্দর্য ও সুষমা নিয়ে চোখে পড়ছে, কিন্তু নদীর জলে সূর্য যখন নিজেকেই প্রখরতর করে ফোটাচ্ছেন তখন চক্ষের পীড়া উৎপাদন করছেন তিনি। চাঁদ সুন্দর আলো ফেলতে জানে জলে স্থলে বলেই কখনো এমন ভুলটা করে না। প্রদীপের আলো তারার আলো এরা জানে নিজেদের অপ্রধান রেখে আলো দেওয়ার রহস্য, বিদ্যুতের আলো যাকে মানুষ ঘরে আনলে সে এ রহস্য জানে না, চক্ষের পীড়া দেখতে দেখতে জন্মিয়ে দেয়—কাজেই সেই অসুন্দর আলোকে সুন্দর দেখবার জনে, মানুষ তার উপরে নানা রকম ঘোমটা পরিয়ে দিয়ে চলেছে।

বাজারের ছবিগুলির রং চং ও কায়দা-কানুন ছবিটাকে পিছনে ঠেলে ফেলে এগিয়ে আসে, সেই কারণে আর্টিস্টের কাছে ভারি অসুন্দর ঠেকে সেগুলো, কালোয়াতি আসলে গান সুর ইত্যাদিকে ঠেলে কালোয়াতটিকেই ঘাড়ের উপর ঠেলে দেবার চেষ্টা করে, সেইজন্যেই তা অসুন্দর। পাতাটি ফুলটি গাছ থেকে খসে পড়েছে,—তারা নিজেদের পড়ার ছন্দটি বাতাসের ছন্দে লুকিয়ে রেখে পড়ছে, তাই সুন্দর ঠেকে তাদের গতি। গাছের তাল বাতাস ছিঁড়ে ধুপ করে পড়ে জানাচ্ছে 'আমি পড়লেম', তাই ভারি অসুন্দর ও বেতালা তার ছন্দ। জলের মধ্যে ঢিলটা পড়ল, ঢিলটার কেউ খোঁজ রাখে না, কি সুন্দর ছন্দে জল দুলে চলল, তাই দেখে লোকে। বায়স্কোপের মধ্য দিয়ে ফুল ফোটার ফুলের ঘুমের ফুলের জাগরণের ছবি দেখেছি—ভারি বিস্ময়কর দৃশ্য—কি সহজে প্রত্যেক পাপড়ি একটির পর একটি খুলল, বন্ধ হল, কত সহজে শিকড়গুলো দৌড়ে চলল জলের সন্ধানে, সুন্দরী নর্তকীর মতো চমৎকার তার হাব-ভাব, সবই ভাল লাগল, কিন্তু আসল ফুল ফোটানোর বেলায় ঝরানোর বেলায় সেগুলো গোপন রইল। সেই চলাচল ও কৌশলগুলোই বেশি করে পড়ল বায়স্কোপের মধ্য দিয়ে চোখে, কাজেই আর্ট হিসেবে অসুন্দর ঠেকল সমস্তটি আমার কাছে।

বিশ্বরচনার মধ্যে দেখতে পাই সুন্দর আছে অসুন্দরও আছে—ওদিকে কাকচক্ষু নির্মল জল, এদিকে পানা পুকুর। মানুষ এ দুটোকে আলাদা করে দেখে বলেই তুলনায় দেখে একটা সুন্দর অন্যটা অসুন্দর, কিন্তু বিশ্বরচয়িতা এ দুটিকেই সৌন্দর্য ফোটানোর কাজে লাগাচ্ছেন। রূপদক্ষদের কারবার দেখি সুন্দর অসুন্দর দুইকে নিয়ে। গত বছরের গ্রহণের দিনে শান্তিনিকেতনের পূর্ণিমা উৎসব ফেলে একা চলে আসছি, রসিকের হাত ধরে সুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল না মনে এই দুঃখ বাজছে সারা পথ, কিন্তু যিনি কবিরও কবি তিনি হঠাৎ এক সময়ে রেলের ধারে ধারে যতগুলি খানা ডোবা ছিল সবাইকে চাঁদের আলোর শাড়ি পরিয়ে আমার চোখের সামনে উপস্থিত করলেন। এই বিস্ময়কর ঘটনা অসুন্দরকে কেমন করে সুন্দর করে তুলতে হয় তা আমাকে এক মুহূর্তে শিখিয়ে গেল। তারপর দেখলেম আর্টিস্ট তিনি চাঁদের মুখের সমস্ত আলো মুছে নিলেন, ধরিত্রীর আঁধার-করা ঘরে দেখলেম তাঁর কত কালের হারানো কন্যা ফিরে এল, সূর্যের দেওয়া আলোময় সাজ ছেড়ে শ্যামাঙ্গিনী সেই ঘরের মেয়েটির দিকে চুপ করে অন্ধকারে চেয়ে রয়েছেন দেখলেম আমাদের জননী যিনি তিনি। সুন্দর-অসুন্দরের রাসলীলার এই মুহূর্তগুলি কি অপূর্ব স্বাদই রেখে গেল মনে।

জাতি ও শিল্প

সব মানুষ এক রকমের নয়। এক এক জাত এক রকমে খাচ্ছে পরছে চলছে এবং ভাবছেও। এক এক জাতির বাইরের চালচোল রকম-সকম এবং জাতির অন্তরের ভাবনা-চিন্তা—এই দুয়ের যোগে উৎপন্ন হল শিল্পের মধ্যে দেশীয়তা, জাতীয়তা। নানা ছন্দে লেখা নানা ভঙ্গিমায় গড়া অন্তরে বাইরে একে অন্যে যে ভিন্নতা তারি ফলে আসে শিল্প, আর তা একভাবে এক ভঙ্গিতে চলে আসে জাতিগত সংস্কারগত ঐক্য থেকে। যখন জগতের মধ্যে মানুষগুলি বালুকণার মতো স্বতন্ত্র দলে ধরা সেখানে জাতীয় শিল্প নেই কিন্তু একের শিল্প আছে, ভিন্নভিন্ন রকমের শিল্পও আছে। মাঠের মধ্যে একটা গাছ রইল, মাঠের শেষে একটা গাছ রইল, এইভাবে যখন সমস্ত অরণ্যটা ছড়িয়ে রইল দিকবিদিকে তখন গাছগুলি তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের রূপ ও রূপের ছায়া স্বতন্ত্রভাবে গেল ধরে, যখন এক হয়ে একটা দেশ জুড়ে দাঁড়াল তখন আর এ গাছের সঙ্গে ও গাছের রূপ ও রূপের ছায়ায় যে ভিন্নতা তা ধরা গেল না। তেমনি একের শিল্পে অন্যের শিল্পে এক জাতির ভাবনায় অন্য জাতির ভাবনায় এবং একের আচারে অন্যের ব্যবহারে এইভাবে একতা ও ভিন্নতা দেখা দিলে যখন, তখন প্রথা রীতি ইত্যাদির বিভিন্নতা ও একতা দেখে বলা চলল এটি ভারতীয় ওটি ইউরোপীয় সেটি চীনের অন্যটি জাপানের। এই যে শিল্পের মোটামুটি জাতিবিভাগ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঘটেছে, সেই দিক দিয়ে শিল্পচর্চা করে দেখার মানে হল শিল্পের সঙ্গে ইতিহাস পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে একেবারে বাইরে বাইরে পরিচয়। আর-এক দিক দিয়ে পরিচয়—সেহল রসের দিক দিয়ে, সেখানে জাতিবিভাগ ঐতিহাসিক রহস্য ইত্যাদি না হলেও কাজ চলে যায়।

এক দেশের মানুষে অন্য দেশের মানুষে যেমন একদিক দিয়ে স্বতন্ত্র, তেমনি অন্য দিক দিয়ে এক। সঙ্গীতের চাল দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন কিন্তু সঙ্গীতের প্রাণ যেটি সুরের দোলায় দুলছে সেখানে ভেদাভেদ নেই। কালানুগত প্রথা আচার বিচার ধরে সৃষ্টি হয় চালচোলের—যেমন বাঙলা কীর্তন এবং পশ্চিমের ওস্তাদী গান। এখানে চালদুটোকে স্বতন্ত্রভাবে দেখাচ্ছে কিন্তু যখন রসের দিক দিয়ে দেখি তখন বিষয়ের উচ্চ-নীচ চালের রকম-সকম দিয়ে এতে ওতে যে ভিন্নতা তার হিসেবের খাতার দরকারই হয় না—বীণা বাজছে, কি পিয়ানো, না বাঁশি, বিলিতি সুর বাজছে, না দেশি বাউল, না দরবারী এটা ভুল হয়ে যায়। রসটি পাওয়াই হল আসল কাজ কাব্যে শিল্পে সঙ্গীতে এবং মানবজীবনে।

এই যে রসের প্রাধান্য এই নিয়ে জগতের তাবৎ শিল্প এক, এই নিয়ে যা শিল্প এবং যা শিল্প নয় তা যে সম্পূর্ণ আলাদা তাও প্রমাণিত হয় রসিকদের কাছে এবং এই নিয়ে দেবশিল্প (Nature) ও মানবশিল্প (Art) দুই নয়, এক—এও বলেন তাঁরা। ফুলের যেমন পরিমল শিল্পের তেমনি রস। ফুলটি কোন জাতীয়, তার রূপ কেমন, সেটি বড় না ছোট, এ জ্ঞান এক ফুলে অন্য ফুলে পার্থক্য জানায়, ফুলের পরিমলটুকু সেও জানায় কি ফুলের বাস পাচ্ছি, কিন্তু এইসব ব্যাপারের বাইরের জিনিস হল ফুল দেখে এবং পরিমল পেয়ে মন মাতল

যখন তখন যে অনির্বচনীয় বস্তুটি পাই সব ফুল থেকেই সেই বস্তু; সেই একমাত্র বস্তু নিয়ে রসিকের রসচর্চা চলে।

বীণার কটা তার কটা ঘাট এবং বীণাতে যা বাজছে তার স্বরগ্রামের শ্রুতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিভাগ-জ্ঞান নিয়ে রসভোগ তো বর্ধিত হয় না, বীণা বাঁধার কৌশল সেটা বাজাবার কৌশল যখন আপনাকে হারিয়ে দিলে রসের তলায়, জানলেম বীণা যথার্থ ভাল বাজল গানও ঠিক হল; কিন্তু বীণা যেখানে আপনার খুঁটিনাটি খটখটি দিয়ে প্রমাণ করতে থাকল আমি রুদ্রবীণ আমি সরস্বতী-বীণ আমি শ্রুতিবীণ, কিংবা কালোয়াত যেখানে প্রকাশ করতে থাকল আমি দক্ষিণী চাল আমি নারদ আমি বিলাতি কিছু, সেখানে গান শুনে আনন্দ নেই গানের ভঙ্গি দেখে আনন্দ, সঙ্গীতশাস্ত্রের কথকতা শুনে আনন্দের মতো আনন্দ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, জাতির সঙ্গে জাতীয় শিল্পের জ্ঞান এক জাতিগত প্রথা ধরে দেখা, জাতি থেকে আলাদা করে নিয়ে শুধু তার কারিগরি ও শিল্প হিসেবে দেখা, এবং রসের বিচার করে দেখা—এই তিন রকম দেখার পথ। যারা পড়ে শুনে শিল্পকে জানতে চায় তারা চলে প্রথম পথে, কারিগর শিল্পী এরা চলে দ্বিতীয় পথে, এরা কাজের বাহাদুরি দেখে, এবং রসিক তারা চলে শেষের পথ ধরে শিল্পকাজের প্রাণের সন্ধানে। নিজের রুচি অনুসারে দেখার সঙ্গে রসিকের দেখার পার্থক্য এই যে রসিক তিনি গন্ডির হিসেব জেনে গন্ডি পেরিয়ে জিনিসটিকে প্রাণ দিয়ে ধরার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন, আর যে নিজের রুচি অনুসারে এটা ওটা দেখে সে গন্ডির হিসেব একেবারেই অগ্রাহ্য করে, সেটা তার ভাল সেইটেই সবার ভাল ঠাউরে নেয়। নিছক নিজত্ব নিয়ে আছে, কোনো জাতির সঙ্গে কোনো কালানুগত প্রথার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন শিল্প বিশ্বের কোথাও নেই, সুতরাং একেবারে আপ্‌রুচি নিয়ে রসের জগতে রচনার জগতে বিচরণ করতে গেলে এমন হতে পারে যে, হয়তো হাতে মণি উঠল কিন্তু ফেলে দিলেম সেটা ঢেলা বলে, কিংবা শবরীর হাতের গজমুক্তার মতো নিজের কাছে রাখলেম দিব্যি খেলার জিনিস বলে, মর্মটা অজ্ঞাত রইল।

নিজের রুচি খাবার জিনিসের বেলায় চলে, পেট আপনার সেখানে আপ্‌রুচি খানা, কিন্তু হৃদয় নিয়ে যেখানে কথা সেখানে আপ্‌রুচি চালাতে গেলে চলে না। হৃদয়কে কেবল আপনার করে রাখলে নিজেই ঠকি, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মেলানোতেই রস পাই, সুতরাং বলতে পারি যে, রস হল দুইকে মিলিয়ে সেতু, রুচি হল দুইকে পৃথক করে প্রাচীর।

মানুষের অন্তর অন্যের সঙ্গে মিলতে চায়, ভাব করতে চলে, কিন্তু ভাবের লোকটি সহজে তো খুঁজে পায় না, ফলেই সেখানে একের রুচি অন্যের রুচিতে ভিন্নতা নিয়ে দুটি মানুষ পৃথক। এইভাবে মানুষ এককালে দলে দলে পাশাপাশি থেকেও ছিল রুচি দিয়ে পৃথক, ক্রমে মানুষ নিজের বড় সমাজ বড় ধর্ম এমনি সব বাঁধন নিজের সৃষ্টি করে দলে ভারি হয়ে একটি কৃত্রিম ঐক্য পেয়ে বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন জাতি হয়ে উঠল, এবং সেই জাতির কুলানুগত আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষার ধারা ধরে চলতে চলতে অন্তরের ভাবনা-চিন্তাতেও দেখতে এক হয়ে উঠল দুটি ভিন্ন রুচির মানুষ—এ যেন বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতে থাকল। এই কৃত্রিম ভাবের মিলন থেকে উৎপত্তি হল জাতীয় শিল্প যাকে বলা যায় তা—সেখানে গড়ে তোলার ধরন ধারণ শিল্পী বিশেষের উপরে ছাড়া রইল না, শিল্পশাস্ত্রের কুলপঞ্জিকার মধ্যে শক্ত করে বাঁধা রইল সব।

আমাদের এক শ্রেণীর মূর্তিশিল্প অনেকটা এই শক্ত করে বাঁধা পাথর; তারপর সঙ্গীত অভিনয় ইত্যাদি, সেখানে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এবং নিজের নিজের রুচি অনুসারে যেসব রাগ-রাগিণী রচনা হয়ে গেল, তার

থেকে সময়ে সময়ে নানা বাঁধুনি ও কায়দার হিসেব জড়ো করে আইন প্রস্তুত হল,—সঙ্গীতশাস্ত্র হল ছন্দশাস্ত্র হল নাট্যশাস্ত্র হল। নতুন যখন মানবসমাজ, তখন এই বেড়া খুব কাজে এল তার শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখতে, কিন্তু গাছ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আল ও বেড়া দুই বাড়িয়ে চলতে হল, না হলে জাত বাঁচে কিন্তু গাছ বাড়ে না। এই বেড়া বাড়ানো বা জাত না বাঁচিয়ে গাছের জীবন বাঁচানোর কাজ রসিকেরা সময়ে সময়ে এসে এদেশে ওদেশে করে গেলেন, এ গাছের সঙ্গে ও গাছের এ জাতের সঙ্গে ও জাতের মিলন সেও ঘটালেন রসিকেরা—জাত শিল্প-ফল ধরিয়ে ফুল ফলিয়ে ফসল বৃষ্টি করে চলল এবং জাতি রাজার ভাঁড়ারে সেসব জমা হতে থাকল, জাতি খাজনা নিলে জাতীয় শিল্পের, দিলে খাজনা দু-চার রসিকের মারফত দু-চার কবি দু-চার শিল্পী দু-চার গাইয়ে দু-চার বাজিয়ে নাচিয়ে তারা। জাতির সঙ্গে জাতীয় শিল্পকলা সমস্তর সম্বন্ধ কালিদাসের রাজার প্রজার 'স পিতঃ' গোছের নয়, 'পরের ধনে পোদ্দারি' করার সঙ্গে তার মিল আছে।

সমঝদারে কারিগরে রসিকে গুণীতে দরদ দিয়ে করে গেল গান বললা ছবি বলো কবিতা বলো সব নিয়ে উৎসব। তাদের ক'জনের উৎসবের শেষে পড়ে রইল যা ফুলশয্যা কিংবা ময়ূরসিংহাসন তারি উপরে জাতের কর্তা এসে মিল বসিয়ে দিয়ে গেল—হঠাৎ-নবাব জাত নিলেমে সেগুলো কিনে নিয়ে সস্তায় নবাবী আমলের একটা অভিনয় করতে থাকল, সভাকবির দল শিল্পীর দল সৃষ্টি হয়ে কবির লড়াই গানের লড়াই ইত্যাদি শুরু হল; স্বভাবকবি কল্কে পেলে না সে সভায়, কেননা সে আসল বস্তু দিতে চায়, কোনো এক বড় আসলের নকল দিতে পারে না একেবারেই। নবাবী আমলের পরে এল যখন সাধারণের আমল তখনি জাতীয় শিল্পের খোঁজ পড়ে গেল দেখি; সাধারণ অসাধারণ রকমে রসিক হয়ে উঠল তখন। এই ভাবের জাতীয় যুগ ইতিহাসের পাতায় চিহ্ন রেখেছে যেমন, তেমনি কবিতায় গানে শিল্পকলায়ও ছাপ রেখেছে। এই সাধারণ সভা বা জাতীয় সভায় কবির লড়াই দিতে দিতে প্রাণান্ত হয়েছে কত কবির তার ঠিক আছে কি? শিল্পের সঙ্গে জাতির বিবাহ রাক্ষস-বিবাহ, জাঁতার সঙ্গে মণিমুক্তার বিবাহ দিলে যা ফল হয় সেইরকমের বস্তু হচ্ছে জাতীয় শিল্প; তাতে রস থাকে না, ছাতুর মতো ভারি শুকনো জিনিস থাকে জাতীয় শিল্পে—অনেকখানি গুড় না হলে সেই জাতীয় পুষ্টিকর জিনিস রোচে না একেবারেই।

জাতীয় উৎকর্ষ এবং শিল্পের উৎকর্ষ সমাজের মতো একভাবে একসঙ্গে হয় না, এ এক হিসেব ধরে বাড়ে ও আর এক হিসেব নিয়ে বাড়ে—একের বাড় অন্যের বাড়ের সাপেক্ষে নয়। ধন বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও বাড়বে এ যেমন ভুল, জাতির উৎকর্ষ বলতে শিল্পীর উৎকর্ষ ভাবাও ঠিক তেমনি ভুল। জাত যে হিসেবে বড় হয় সে হিসেবে তার সঙ্গে শিল্পকলাও যে বড় হয়ে ওঠে এমনটা ঘটে না। জাত বলতে বলি—নেশন। আজকের জাপান জাত হিসেবে মস্ত কিন্তু শিল্পের দিক দিয়ে আমাদের কবির সেই 'অসভ্য জাপানে'র কাছে আজকের জাপানের হার হয়েছে। নেশন হিসেবে এই উৎকর্ষ আজ পেলে জাপান, সেদিনের জাপান নেশন হিসেবে উৎকর্ষ পায়নি কিন্তু আর্ট হিসেবে বড় ছিল প্রাচীন জাপান।

জাতি আর্টের জননী নয়, হতেও পারে না; জাতির সঙ্গে আর্টের তো গান্ধর্ব বিবাহ হয় না, আর্টিস্টের সঙ্গেই সেটা হয়ে থাকে বরাবর। বসন্তকালে বাগানের গাছে ফুল ধরে, তাই দেখে ফুল-সৃষ্টিকর্তা বাগানের মালিককে ভেবে নেওয়া ভুল, বসন্তদেবতা বলে মাতা ধরিত্রী বলে দক্ষিণ বায়ু বলে কতকগুলো যে আছে। জাতির ফুঁয়ে জাতীয়তার গৌরব জ্বলে কিন্তু ফুলের মুখ খোলে না। জাতির গড়া ন্যাশনাল পার্ক—সেখানেও ফুল ফোটে না ফুঁয়ে।

জাতির কোলে শিল্পী এবং শিল্পও ধরা থাকে, দাস দাসী জ্ঞাতি কুটুম্বের মাঝে যেভাবে থাকে মা ও ছেলে। মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান জন্ম নিলে, দাসীর কোলে সে ঘুমোল, হয়তো মরল—তেমনি শিল্পীর অন্তরে শিল্প জন্ম নিলে, জাত দাসীর দলে সে নানা লীলা বিস্তার করলে, দাসীর দল আনন্দ পেয়ে বললে—ওগো জাতীয় শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়ে আমাদের ছেলেটির জাতের সঙ্গে জাতীয় শিল্প কবিতা ইত্যাদির যেটুকু যোগ তাও বাইরে বাইরে ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে। জাত গেলে জাতির বিপদ গণে, কিন্তু শিল্প গেলে গান বন্ধ হলে কবিতা বন্ধ হলে চঞ্চল হয় জাতের মধ্যেকার দু-চার জনের মন। জাতীয় শিল্পের কত মন্দির ভাঙল, তার জন্যে চাঁদা তুললে কয়েকজন, জাতীয় কংগ্রেস বসল, তাঁতশালা বসল, পাঠশালা খুলল। চাঁদামামার ছড়া আউড়ে বার হল জাত পথে পথে এক তালে এক সুরে এক প্রাণে, একটা হারমোনিয়াম বাজিয়ে খুশি করে চাঁদা তুলতে। জাতীয় নাট্যমন্দিরে, কলাভবনে বা ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা, তাতে করে আজকের ভারতবাসীর সঙ্গে কালকের ভারতবাসীর কলাবিদ্যার বাইরে বাইরে কতকটা পরিচয় হল, যেন সেকালের রূপকথা শোনার কাজ হল, মনের কল্পনা উত্তেজিত হল খানিক, কিন্তু এতে করে আজকের আমরা আমাদের শিল্পকে নিজের করে যথার্থভাবে পেলেম না। যে রসবোধ তখনকার তাদের নানা সুন্দর সৃষ্টির বিষয়ে নিযুক্ত করেছিল তাকে আবার ঘরে আনতে হলে এ ভাবের জাতীয় আয়োজন চলবে না। জাতি যে উপায়ে শিল্পকে জীবন-প্রদীপের আলোয় বরণ করে ঘরে আনতে পারে নতুন বধূরূপে তারি আয়োজন করা চাই, নতুন করে উৎসব লাগুক ঘরের মানুষটির প্রাণে কলাবৌটির সঙ্গে, ঘরেবাইরে লক্ষ্মী বিরাজ করবেন তখন এসে, শ্রী ফিরে যাবে জাতির।

আমাদের জাতির বাস্তুভিটে সেখানে পুরাকালের ঘরে ঘরে সৃষ্টির তৈজসপত্র জমা করে যেমন বুড়ো কর্তা গিন্নিরা চলে গেলেন, সব দেশে সবার ভিটেয় তেমনি ঘটনাই ঘটে। কিন্তু আমার দেশে আর এক আশ্চর্য কান্ড ঘটল; সেই বুড়োবুড়ি ছেলে-বৌ হয়ে নাতি নাতবৌ হয়ে বারেবারে ফিরে ফিরে পুরোনো বাসায় ঠিক অতীত কালের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে এল। সাজে তেমনি কাজে তেমনি—সেই নাচ গান সেই ছবি সেই ঝাড়লণ্ঠন, শুধু কালটা এই। একে বলতে পারি অতীত-বর্তমানে ভয়ঙ্কর রকম একটা রাক্ষস-বিবাহ, এতে করে অতীত বাঁচল বর্তমানকে মেরে—এই সৃষ্টিছাড়া বিবাহের ফল শুভ হল না শিল্পসৃষ্টির পক্ষে।

কালচক্র ঘুরতে ঘুরতে জাতীয় জীবনযাত্রার রথখানি পৌঁছে দিলে যদি আজকের আমাদের সেই নৈমিষারণ্যে, তবে সে জীবন নিয়ে সত্য ত্রেতা দ্বাপরের যা কিছু তার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া আমাদের তো আর কোনো কাজ রইল না।

জাতি বর্তে থাকে যেখানে সেকালের সঞ্চয়ের উপরে, সেখানে হয়তো তার জাত থাকে, কিন্তু শিল্প প্রভৃতি নানা রচনা ও সৃষ্টির দিক দিয়ে তার মান বজায় থাকা ক্রমেই দুষ্কর হয়। বর্তমান ধরে তবে বর্তে থাকে শিল্পকলা, অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয় কিন্তু অতীতমুখীও নয় শিল্প। যে দিক দিয়েই চল আজকের জাতি ও তার মানুষগুলির সঙ্গে সেকালের যোগ স্বাভাবিক না হলে আজ আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠানে সার্থকতা ভূত নামানোতে গিয়ে ঠেকে। রেলগাড়ি স্টেশন ছেড়ে বার না হয়ে স্টেশনের দিকে পিছোতেই যদি থাকে ক্রমান্বয়ে, তবে যাত্রীদের সে গাড়ি চড়ে গম্য কোথাও পৌঁছোনো মুশকিল হয়। পুরোনো ঘরে নতুন বর-বধূ তারা ইচ্ছামতো সেকালের কতক জিনিস সংসারের কাজে লাগালে, কতক জিনিস দিয়ে নিজেদের 'ড্রয়িং রুম' সাজালে, এইভাবে যখন সেকালকে একালের সঙ্গে যুক্ত করা হল তখন হল নতুন কালের উপযোগী সেকাল।

আবার যেখানে সেকালের সঞ্চয় ভাঁড়ারঘর থেকে সোজা পুরোনো পিতলের দোকানে চলে গেল কিংবা ভাঁড়ারেই রইল এবং তার স্থানে বিদেশীয় দোকান ও হোটেল এসে ভর্তি করলে ঘরখানা, সেখানে নতুন পুরোনো দুয়ের মিলন একেবারেই হতে পেলে না।

বক্তৃতা দিয়ে প্রদর্শনী খুলে নানা উপায়ে সেকালের শিল্পকলার আদর বাড়ানো গেল আজকের জাতির কাছে; এতে করে উত্তরাধিকার সূত্রে জাতি এবং দেশ যদি কিছু পেয়ে থাকে তাকেই ধরে রাখা চলল। প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণের আইন করে লাট কর্জন এ কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু রক্ষণ ও বর্জন দুটো কথার অর্থে তো কিছু অর্জন করা বোঝায় না।

আমাদের জাতি স্বভাবত অতীতমুখী, এই বৃত্তি আমাদের কুলানুগত প্রথা ধরবার দিকে চালাতে চাচ্ছে। এই বৃত্তি নিয়ে আমরা আজ যদি ছবি আঁকি মূর্তি গড়ি ঘর তুলি, তবে সব দিক দিয়ে আমাদের কাজের ধারা অতীতকে স্বীকার করে চলতে বাধ্য। শিল্পের কৌলীন্য রক্ষা করে চলতে চলতে আমরা পৌঁছেছি এমন অবস্থায় যখন আমাদের গান-বাজনা সমস্তই হয়ে গেছে আজকের নয়—আকবর ও তাঁর পুর্বের আমলের। আমাদের সঙ্গীত ও শিল্প প্রাচীন কৌলীন্য বজায় রাখতে গিয়ে আজকের জীবনধারার সঙ্গে এক হয়ে মিলতে পারছে না, কাজেই শখের জিনিস হয়ে রয়ে গেছে। ঠিক যেভাবে অসংখ্য মানুষ জাদুঘরে ধরা নানা ভারত-শিল্পের জিনিসগুলি দেখে বেড়ায় ও তার নানা রকম সমালোচনা করে, ঘোরাঘুরি করে জাদুঘরের ঘরে ঘরে, নাচ গান ইত্যাদিকেও ঠিক সেইভাবেই আমাদের অধিকাংশ লোকেই গ্রহণ করেছে তাদের জীবনে—গান শুনি, নিজে গাই না; নাচ দেখি, নিজে নাচি না।

নৃত্যকলা গীতকলা চিত্রকলা এসবকে জাতীয় শিক্ষার মধ্যে স্থান দিতে বারংবার বলা সেই থেকে শুরু হয় যখন থেকে গাইতে গলা চায় না, নাচতে পা সরে না, আঁকতে লিখতে হাত চায়ই না। তখন সঙ্গীতসভাই করি, নাট্যমন্দির শিল্পশালা এসবই বা খুলে বসি জাতিকে জাগাতে, দেখা যায় তাতে করে দেশে ও জাতির প্রাণে যে সুর পৌঁছোয়, যে রং ধরে, তার ছন্দ ছাঁদ সমস্তই পুরাকালের গানের টানটোন ভাবভঙ্গির ব্যর্থ অনুকরণ। তখন মনে আসে যে পুরোপুরি অতীতমুখী শিক্ষা নিয়ে বর্তমান জাতিকে অতীতের আবছায়াবাজির তামাসা দেখাতে পারা ছাড়া সত্যি কাজের লোক করে তোলা যায় না।

দেবী বীণাপাণি কালে কালে নিজের হাতের বীণা একটির পর একটি তাঁর বরপুত্রকে দিয়ে আসছেন, প্রত্যেক বার গুণী কবি তাঁর একটি একটি নতুন তার চড়িয়ে তবে বাজাচ্ছেন সেই বীণা—পুরোনো তারে পুরোনো বীণা ভাল বাজে না, নতুন তারে বাজে চমৎকার! সরস্বতীর বীণার তার প্রত্যেক বারে বদল হল, বিচিত্র সুর দিয়ে চলল নতুন নতুন গুণীর হাতে। নারদের বীণায় নারদ ছাড়া কারো হাত পড়ল না, সেই পুরোনো তার, সুরও সেই সেকালেও যা ছিল একালেও তাই রয়ে গেল।

সেদিন আমার এক ছাত্র তার মামাতো প্রমাতামহের প্রপিতামহের আঁকা একখানা ছবি নিয়ে এল, আমি কাজটা ছাত্রের হাতের বলে ভুল করে বসলেম, এতে আমার ছাত্র ভারি খুশি হয়ে উঠল তার নামের আগে আমি যে একটা চন্দ্রবিন্দু টেনে দিলেম সেটা সে দেখতে পেলে না।

এমনি আর একদিন আমার সামনে আর এক ছাত্র একখানি বিলাতি ছবি এনে বললে সেটা তার কাজ, আমি তার নামের আগে 'শ্রী যুক্ত' কথাটি উড়িয়ে দিয়ে ছোট করে বসিয়ে দিলেম 'মিস্টার', এবং দু-একটা মিষ্টি কথা দিয়ে খুশি করে বিদায় করলেম। ঘরের ছেলে ঘরে গেল আনন্দে।

একদিকে যখন আমার দেশের পদ্মফুল কেবলি আউড়ে চলল দাশরথি রায়ের পদ্য আর ভ্রমরের পাঁচালী, অন্যদিকে হয়ে গেল আকাশ স্কটল্যান্ডের ব্লুবেল ফুলের নীল সুরে বিদেশিনীর চোখের প্রায় নীল, অথচ লোকে বললে 'ভালই হল', 'ভালই হল', ভাল হল না একথা গোপনে কিন্তু লেখা হয়ে গেল যমরাজের দরবারে চিত্রগুপ্তের খাতায়।

কাক এক কৌশলে বাসা বাঁধছে, বক স্বতন্ত্র রকমে বাঁধছে বাসা। এই কৌশল নিয়ে কি কাকে বকে এ-জাত ও-জাত বলে আপনাদের পরিচয় দিচ্ছে। কোকিল বাসা বাঁধেই না, কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, অথচ তার সন্তান কোকিলই থাকে। আমাদের এই জাতিটা আগে তুলোট নয় তালপাতায় সংস্কৃতে পুঁথি লিখত, এখন লিখছে বিলিতি কাগজে বিলিতি শ্লেটে ইংরেজিতে, এতেই রচনার জাতিপাত হল এটা ভাবা ভুল। হীরের ধাঁচটা চেপটা কি গোল এ নিয়ে তার জাতিভেদ হয় না, তার জ্যোতির হিসেব ধরে হয় বিচার। রচনার প্রাণটি হচ্ছে আসল জিনিস যা থেকে পরিচয় পাই এটি ভারতীয় না অ-ভারতীয়।

মস্ত একটা সোলা টুপির মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবন ধরা পড়ে পালিত হচ্ছে, তুলো নেই কাঁথা নেই ঝুলননা নেই কপাটি খেলা নেই সরিষার তেল নেই ক্ষীরের ছাঁচ নেই, পুরোনো চুষিকাঠির বদলে 'বেবি প্যাসিফায়ার' ধরা হয়েছে তার জন্যে; কিন্তু তবু তার ডাক যদি না সে বদলায়, সাড়া যদি ঠিক না দেয়, তবে জানব সে জাত হারায়নি। জাতীয় ছবি মূর্তি কবিতা সবার ডাক আছে, সাড়াও আছে, সেই সাড়া নিয়ে তাদের জাতিভেদ ধরা পড়ে রসিকের কাছে। প্রাণে পুবের সাড়া পৌঁছোল না পশ্চিমের, আজকের না কালকের, অথবা বর্তমান অতীতের সাড়া দিলে কি না এই নিয়ে জাত বিচার হয় রচনার। শিল্প বলো, সাহিত্য বলো, ধর্ম কর্ম যাই বলো, সবার জাতীয়তা প্রাণের সাড়ার সঙ্গে যুক্ত, বাইরের ভৌতিক বা আধিভৌতিক জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জামের ধুমধামের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই।

সোনাকে বিশেষ কোনো একটা রূপ দিতে হলে ছাঁচে ঢালতে হয়, কিন্তু সেই ছাঁচের এমন গুণ নেই যে রূপোকে সোনা করে; তেমনি জাতিকে বিশেষ একটা গঠন দিতে হলে জাতীয় শিক্ষার ছাঁচ দরকার, কিন্তু সেই ছাঁচকে কিছু সৃষ্টি করার স্বাভাবিক উপায় বলে ভুল করা সোনা গালাবার মতিটাকে সোনা সৃষ্টি করার উপায় বলে ধরে নেওয়া! সোনা আপনি তৈরি হয় স্বভাবের নিয়মে, মানুষের হাতে-গড়া সোনা সে জাত সোনা নয় —সে কেমিক্যাল সোনা।

কাঁচা সোনার রঙ পায় পিতল, কিন্তু সোনার গুণ তাতে পৌঁছোয় না হাজার বার সোনা জাতীয় শিক্ষার ছাঁচে ঢাললেও। পুড়িয়ে পিটিয়ে লোহাকে ইস্পাত করা যায়, পিতলকে ছুরির আকার দেওয়াও চলে কিন্তু ইস্পাতের গুণ পিতলে পৌঁছোয় না। মানুষ অদ্ভুত কৌশলে লোহাকে বাতাসের উপরে উড়িয়ে দিয়েছে পাখির মতো, কিন্তু সেই লোহাতে পাখির প্রাণ পৌঁছে দেবার সাধ্য মানুষের কোনো যুগে হবে বলে বিশ্বাস করে কি কেউ?

'স্বভাবো মুর্দ্ধণি বর্ততে'। চিরাগত কতকগুলো প্রথা ধরে জাতির বা মানুষের মন বুঝে মনগড়া শিক্ষালয়ে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা গেল তাকেই বললেম জাতীয় শিক্ষা। সার্কাসের জানোয়ারগুলো এক রকমের শিক্ষা পেয়ে প্রায় মানুষের মতো চলা-ফেরা বলা-কওয়া করে, কিন্তু সে শিক্ষার মূলে স্বাভাবিকতা নেই। বেরাল স্বভাবের নিয়মে যে জাতীয় শিক্ষা পায় তাতে ইঁদুর ধরতে মজবুত হয়ে ওঠে, দুধ খেতে শেখে, মুড়ো চুরি করতে শেখে; প্রাণের দায়ে এসব স্বাভাবিক শিক্ষার ফলে ঘটে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে নেয় বেরাল। কিন্তু যে

শিক্ষায় বেরাল বসতে শেখে চৌকিতে খেতে শেখে টেবিলে বাজাতে শেখে হারমোনিয়াম, সেই মনুষ্যজাতীয় শিক্ষা বেরালের পক্ষে জাতীয় শিক্ষা বলা যেতে পারে না।

জাতীয় শিক্ষা স্বভাব বুঝে যেখানে চলল সেখানে ঠিক শিক্ষা হল, আর যেখানে সে শিক্ষা সার্কাসের ঘুরপাক ধরে চলল সেখানে জাতি বড় একটা কিছু লাভ করতে পারলে না, সার্কাস বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে তারও কাজ ফুরিয়ে গেল এবং এমন উপায়ও রইল না যাতে করে সে আবার স্বাভাবিক অবস্থা পেয়ে যায়।

আমাদের জাত যদি সেকালের মধ্যে ধরা থাকত—যেমন বেরাল জাত ধরা আছে এখনো সেই পুরাকালের ষষ্ঠী মাতার পায়ের কাছে, তবে কোনো রকম শিক্ষা দিলে এদেশের কলাবিদ্যার পুনরাবির্ভাব হতে পারে এসব কথা ভাব্বার অবসরই হত না। কিন্তু মানুষজাত যে কালে কালে তার বাইরের সঙ্গে ভিতরটাও বদলে চলেছে, এক কালের নরপিশাচ আর কালে হচ্ছে নরদেব;—কাজেই দেখি সেকালের শিক্ষা তা একালে চালাতে পারা যায় না অটুটভাবে। জাতীয় শিক্ষার মধ্যে নানা শিল্পকলার স্থান আছে এটা এখন আর কেউ অস্বীকার করে না, যদিও জানি যে, তপস্যা সাধনা প্রতিভা এসব না হলে কবিও হয় না শিল্পীও হয় না কেউ। কাজেই আমার দেশের চিত্র মূর্তি কবিতা গান নাটক খেলাধুলো ইত্যাদির যে কুলানুগত নানা প্রথা কালে কালে জমা হয়েছে এবং দেশাচারগত যে সমস্ত ব্যবস্থার ছাপ তাতে পড়েছে, সেগুলো দেখে শুনে হিসেব ঠিক করে তবে আজকের আমাদের জাতিকে শিক্ষার ব্যবস্থা করে নিতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা জায়গায় এসে সমস্ত ব্যাপারটা ঠেকে—সেটি হচ্ছে একাল। প্রাচীন জাতির কুলানুগত আচার-ব্যবহার আজকের কানানুযায়ী হল কি না সেইটেই দেখবার বিষয়। সেকালের অনুকরণে একালের ছেলেরা মেয়েরা ছবি আঁকলে পাঁচালী গাইলে চরকা কাটতে বসে গেল—এ হল জাতীয় প্রদর্শনীতে মেডেল পাবার মতো করে শিক্ষা দেওয়া, একে জাতীয় শিক্ষা নাম দেওয়া যেতে পারে না, একজাতীয় এবং এককালীন শিক্ষা বললেও বলা যায়। কোনো জাত এবং কোনো জাতের কোনো কিছু এমন করে বড় হয় না। জাতীয় শিক্ষা সত্য হয়ে ওঠে তখনই যখন কালের সত্যকে সে মেনে চলে। যে জাত শিক্ষায় দীক্ষায় সে-কালকেই মেনে চলল সে জাত কোনো দিন স্ব-কালের মধ্যে জাগল না—দেশজোড়া অ-কালের মধ্যেই তার যথাসর্বস্ব ক্ষয় হয়ে গেল।

আগে গাছ বাড়লে তবে তো তার ফল-ফুল, তেমনি আগে জাত বাড়লে তবে তার শিল্পকলা ইত্যাদি কথা তর্কের মুখে বক্তৃতার জোরে প্রায়ই শুনি এবং হয়তো বলেও থাকব; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল যে, ফলন্ত ফুলন্ত বীজ বলে একটা পদার্থ আছে এবং সেই পদার্থটিই তাল তমাল বট অশ্বত্থ হয়ে বাড়ে। মালি না থাকলেও ফলন্ত বীজ গাছ হয়ে বাড়তে থাকে আপনার রস আপনি খুঁজে নিয়ে, কিন্তু অফলন্ত বীজ যদি হয় সার-মাটিতেও নিষ্ফলা রয়ে যায় সেটি।

শিশু দাঁত নিয়েই জন্মায়, শুধু দাঁত ফোটে ছেলে একটু বড় হলে, জাতির মধ্যে তেমনি জাতিটার যেসব বিকাশ ভবিষ্যতে হবে তা ধরা থাকে, কালে সেগুলো ফুটতে থাকে ভাল-মন্দ আবহাওয়ার বশে। কোনো ছেলের কথা ফোটে আগে, কোনো ছেলে কথা বলে দেরিতে, কিন্তু যে ছেলে বোবা তার কথা বড় হয়েও ফোটে না, বুড়ো হয়েও ফোটে না—যতই কেন ভাল আবহাওয়ায় সে থাকুক না।

বয়সে দাঁত পড়ল চুল পাকল, দাঁতও বাঁধালেম চুলও কালো করলেম; দুটোই শৌখিন জিনিসের মতো, শিকড় গাড়ল না জীবন্ত মানুষের রক্ত চলানোর ক্ষেত্রে। এইবাবে জাতীয় শিল্প সঙ্গীত কবিতার রং ধরানো যায়

একটা বড় জাতির গায়ে কিন্তু সেই কৃত্রিম রং তো টেকে না বেশি দিন এবং সেটা দিয়ে জাতির জরা এবং মরার রাস্তাও বন্ধ করা চলে না একদিনও।

যেখানে জাতীয় জীবন বলে একটা-কিছু নেই সেখানকার মানুষগুলির সঙ্গে কতকগুলো শিক্ষাগার পাঠাগার কর্মশালা ধর্মশালা আখড়া আড্ডা আশ্রম ভবন ইত্যাদি যেন তেন প্রকারেণ জুড়ে দিলেই যে ঠিক ফলটি পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই। মরা আমগাছে নাইট্রোজেন বৃষ্টি করে আঁকশি হাতে বসে ফল পায় কি কেউ?

জাত দু-তিন রকমের আছে; যেমন, ক্ষুপ্ জাত অর্থাৎ জাতে বড় গাছ কিন্তু এক বিঘতের বেশি তার বাড় নেই, ডালপালাগুলো চীনের পায়ের মতো বিষম বাঁকাচোরা, দেখতে গাছের মতো ঝাঁকড়া কিন্তু ফল দেয় না, ফুল দেয় না, ছায়া দেয় না, টবে ধরা থাকে। আর এক রকমের জাত ক্ষোপ্ জাত, মৃত জাত, শুকনো গাছ, অনেক কালের মরা কাঠ, দেশ বিদেশে পাখি কাঠবেরাল বনবেরাল কাগাবগার খোপ আর দাঁড়ের কাজ করছে। ক্ষুপ্ জাতের সুবিধে আছে যে কোনো গতিকে টব থেকে ছাড়া পেলে সে তেজে বেড়ে উঠতে পারে, ক্ষোপ্ জাতের সে সুবিধে নেই, ক্ষোপে খাপে ফোঁপরা কাঠ তাতে টেবিল চৌকিও তৈরি হয় না, জ্বালাতে গেলে ধুঁয়া হয়, শুধু সেটা নিয়ে দেহতত্ত্বের এবং জাতিতত্ত্বের নানা গভীর কথা সমস্ত আলোচনা করা চলে। একদিকে বাড়-হারানো বড় জাত, অন্য একদিকে বাড়-দাবানো বড় জাত, ভারতবর্ষী জাত বলতে এ দুটোর কোনটা বলা শক্ত। আমি দেখি আমাদের আজকের জাতীয় জীবনটা এই দুয়ের খিচুড়ি। ছিল জাত হবিষ্যান্নজীবী, হল ক্রমে খেচরান্নজীবী। আগের জাত ভাল ছিল এখন হল মন্দ একথা আমি বলিনে। জাতীয় জীবনের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না, কালের উপযোগিতার নিয়ম মেনে তবে বাঁচে জাত। আর্যজাতি এককালে ছিল আমমাংসভোজী, তারপর খেতে শুরু করলে আমানি, এবং এখন খাচ্ছে আম আমানি দুই-ই—একই জাত শুধু কালের পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে ভিন্ন চেহারা ধরছে। এটার জন্যে ভাবনা নেই, শুধু ভাববার বিষয় এই যে, জাতটির জীবনীশক্তির দৌড় বাড়ের দিকে না তার উল্টো দিকে। আজ যদি কেউ আমাকে বলে হবিষ্যান্ন ধরলেই তুমি ঠিক তোমার আগেকার তাদের শিল্পকলায় বিশুদ্ধি ইত্যাদি সমস্তই পেয়ে যাবে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত কবিতা বিশুদ্ধ সাহিত্য এবং বিশুদ্ধ কর্মকান্ড সমস্তই এসে যাবে দেশ ও জাতির কবলে, তবে তাকে এই কথাই তো বলব যে, কালকের মতো হয়ে পড়ার জন্য মাদুলি ধারণ করে নিতে ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? সেকালের রক্ষাকবচ একালের জীবন-সংগ্রামে তো কাজের হবে না, সেকাল রাখলে যে একাল যায় তার কি? নদীর জাত বাঁচাতে গিয়ে নদীর চলাচল বন্ধ করায় কোন লাভ? চীন দেশ ভোজনবিলাসী, তারা তিন শত বছরের হাঁসের ডিম খেয়ে রসনা তৃপ্ত করে, কিন্তু তা খেয়ে প্রাচীন চীনের শিল্পসম্পদ পাবে বলে তারা বিশ্বাস করে না একেবারেই—শখ হয় তাই খায়, সুস্বাদু বলে।

পুরোনো চাল ভাল, পুরোনো শাল ভাল, পুরোনো কাঁথা তাও ভাল, সকল জিনিসের ভান্ডার বলতে পারো আমাদের প্রাচীন আমলকে, তথাপি পুরোনো হয়ে যাওয়া যে ভাল একথা তো কেউ বলছে না আমরা ছাড়া!

আজকের কালে প্রাচীন শিল্পের আদর যথেষ্ট দেখে আমরা দলে দলে কেউ বৌদ্ধ যুগের মতো কেউ মোগল আমলের মতো ছবি মূর্তি গান-বাজনা ইত্যাদি করতে বসি; শুধু এই নয়, পুরাণের পাতা থেকেই কেবল ছবি মূর্তি হাব ভাব ইত্যাদিও হুবহু নিয়ে কাজ করতে লেগে যাই। তা হলেই বা কি হবে? এইভাবে সাময়িক

আদর বা অনাদরের বিচার করে চলায় ব্যবসার বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় কিন্তু এতে করে রসবোধ জাগে না জাতির অন্তরে এবং জাতিটাও এতে করে নিজের শিল্পসম্পদ পেয়ে ধন্য হয়ে যায় না।

জাতিটাকে যখন চৌরঙ্গীবাতে ধরল তখন তার হাতে পায়ে বুকে পিঠে পুরোনো ঘি মালিশ করে দেখা গেল বেশ চলে ফিরে বেড়াতে লাগল সে, তাই বলে পুরোনো ঘিয়ে লুচি ভেজে তাকে তুষ্ট ও পুষ্ট করা তো চলল না, যে কবিরাজ পুরোনো ঘিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই তখন বললেন টাটকা গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজতে।

আজকের হাঁস তিনশো বছর আগেকার ডিম পাড়বার সাধনা করবার আয়োজন করে বসলে পরমহংস বলে তাকে ভুল করে না কেউ, তেমনি আজকের জাত কালকের ভূত নামাতে শবসাধনার আয়োজন করছে দেখলে তার সিদ্ধিলাভের পক্ষে সন্দেহ অনেকখানি থেকে যায়।

আজকের সঙ্গে কালকের নাড়ির সম্বন্ধ আছে। আজকের শিল্প কালকের শিল্পের উপরে বসে পদ্মাসনা শবাসনা—এটা সত্যি কথা, কিন্তু এই শবাসনার সাধনায় অনাচার ঘটলে ভূত প্রেত এসে সাধকের ঘাড় ভাঙে, সিদ্ধিদাত্রী বরদা আসেন না, —এটা জানা কথা।

শবাসনার জন্যে ব্যস্ত নই, শব খুঁজছি কেবলি, এতে করে অতীতের ভূতের কবলে পড়ে কর্ম পন্ড হওয়া বিচিত্র নয়। সাধাসাধি করে হাতে পায়ে ধরে লোককে দিয়ে কাজ হয়, মেরে ধরেও কার্যসিদ্ধি করিয়ে নেওয়া চলে, কিন্তু সে কাজ কার কাজ, সে সিদ্ধি কার সিদ্ধি? —যে সাধছে বা যে মারছে কেবল তারি নয় কি? আমার কথায় ভুলে বা ধমকানি শুনে যদি আজ দেশসুদ্ধ ছবি মূর্তি গড়তে লেগে যায় আমি যেমনটি চাই তেমনি করে, তবে তার ফল দেশ পাবে, না, দেশের যারা আমার কথায় উঠলো বসল তারা পাবে? আমার খেয়ালমতো আমি লোক লাগিয়ে ঘর বাঁধলেম, সে ঘর আমার ঘর হল, আমি তার আশ্রয় পেলেম, ছায়া পেলেম, মিস্ত্রী মজুর তারা ঢুকতেই পেলে না বৈঠকখানায়। যে গুরু হাত ধরে নিয়ে গেলেন শিষ্যকে শিল্পজগতে তিনিই যথার্থ গুরু; যে গুরু ঘাড় ধরে শিষ্যকে বললেন, ‘আমার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে যেমন বলি তেমনি চল’, সে গুরু গুরুমশাই, তিনি নিজের বেতন বাড়িয়ে গেলেন ছাত্রের দৌলতে।

আগেও ছিল এখনো আছে এক এক শ্রেণীর লোক জাতের কর্তা হয়ে ওঠে তারা, যার জাত নেই তাকে জাত দিতে জানে না, যে জাত ঘুমোচ্ছ তাকে জাগাতে হলে কি করা উচিত তাও জানে না, জাত মারবার ফন্দিই তাদের মাথায় ঘোরে, পাশাঙ্কুশহস্তে তারা যমরাজের মতো বসে থাকে জাতকে বাঁধবার পাশ আর জাতকে মারবার অঙ্কুশ দুই অস্ত্র সর্বদা উঁচিয়ে।

আগেও ছিলেন এখনো আছেন অন্য এক এক শ্রেণীর লোক যাঁরা বরাভয়হস্তে বুদ্ধদেবের মতো দ্বারে দ্বারে হেঁটে বেড়ান, সমস্ত মানবজাতির হাতে ভিক্ষা নিয়ে তাঁরা জগৎবাসীকে ধন্য করে যান, অভয় দিয়ে নির্ভয় করেন, বর দিয়ে শক্তিমান করেন। ঘুমন্ত জাতির মুমূর্ষ জাতির আশার প্রদীপের শিখা এইসব জাগ্রত মানব আত্মা যাঁরা রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলো বহন করে আনেন।

কালসূত্রে ধরা রইল কালকের সকালের সঙ্গে আজকের সকাল, কালকের জাতির সঙ্গে আজকের জাতি, কাব্যকলা সঙ্গীতকলা শিল্পকলা জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনটিও তেমনি কালসূত্রে গাঁথা রইল—বেজোড় মুক্তা! আজকের আমাদের জাতির উপরে সবচেয়ে যে বড় দায়িত্ব তা হচ্ছে এই অতীত কালের মালায় যে বেজোড় মুক্তা দুলছে তার সঙ্গী আর একটি কালসূত্রে গেঁথে যাওয়া। আমাদের জীবন কেমন জিনিসটা ধরে গেল আগেকার জীবনের পাশে এই নিয়ে আমাদের পরে যারা আসবে তারা আমাদের গুণপনা

বিদ্যা বুদ্ধি সমস্তেরই বিচার করবে। অতীতের পাশে আজ আমরা যাই ধরি, কাঁচই ধরি মাটির ঢেলাই ধরি কালে সেই আজকে ধরা তুচ্ছ জিনিস তাও মালার একটা অংশ ধরে থাকবেই—চাঁদের কোলে কলঙ্কের মতো। পরবর্তী কেউ এসে অনুকূল সমস্ত প্রবন্ধ লিখে কিংবা মাটির ঢেলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে হয়তো আমাদের আজকের তুচ্ছ কাজ সমস্তের গভীর অর্থ বার করে ভবিষ্যতের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবে; কিন্তু এমনো লোক থাকবে সেদিন যে সজোরে এই ঘোরতর রকমে মালা মাটি করাটাকে অভিসম্পাত দিয়ে আজকের আমাদের জাতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে চলবে ক্রমাগত। এইভাবে হয়তো কত কাল ধরে তা কে জানে মালা ফিরবে অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবে জাতিতত্ত্ববিদ জাতীয় ঐতিহাসিক জাতীয় শিল্পসমালোচক প্রভৃতির হাতে, মাটির ঢেলার পাশে আর একটি দানা তারা গাঁথবে না, শুধু হাওয়াই গেঁথে যাবে দিনের পর দিন, তারপর হঠাৎ একদিন সারা দেশ সমস্ত পৃথিবী দেখতে পাবে হয়তো মাটির ঢেলার পাশেই আর একটি অপূর্ব সুন্দর জীবনবিন্দু ধরা পড়েছে কালসূত্রে। এই জীবনবিন্দু জাতীয় কোনো রকম শিক্ষাগার হাসপাতাল ল্যাবরেটরি লাইব্রেরি ইউনিভারসিটি কিংবা সিটি ফাদারদের চা খাবার পেয়ালায় কিংবা আর্ট স্কুলের রঙের বাটির মধ্যে জন্মায়নি, মহাকাল একে সবার অসাক্ষাতে জন্ম দিয়েছে কোনো এক লোকের বুকের ভাষায়, তারপর একদিন সেই একটি লোকের জীবন ও বিন্দু মহাকালই নিংড়ে নিয়ে ধরেছে নিজের বিজয়মালার মধ্যে।

এই যখন হল তখন এল জাতি, বিচার করে ভেবে চিন্তে একটা মহাসভা ধুমধামে বসিয়ে সকলে জাতীয় কবি জাতীয় শিল্পী জাতীয় যে কেউ তার মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা তুলতে বার হল এবং জাতীয় গৌরব অনুভব করার আয়োজন সার্থক করার চেষ্টায় কোথায় ন্যাশনাল কনসার্ট, ন্যাশনাল থিয়েটার, ন্যাশনাল হোটেল আছে সেখানে বায়না দিতে ছুটল, ও কাজটা যাতে ন্যাশনাল রকমে হয় তার জন্যে একটা রেজোলিউশান পাস করিয়ে নিয়ে খেটেখুটে অকাতরে গিয়ে নিদ্রিত হল নিজের কেল্লায়। মহাজাতি রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে মহাকাল দৈত্যের মতো তাকে ধরতে এসে কেল্লার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে, কে জাগে? রাজকুমারী সাড়া শব্দ দেন না, সাড়া দেয় যে পাহারা দিচ্ছে মহাজাতির শিয়রে। কে জাগে?—সওদাগরের পুত্র জাগে। কাল নিরস্ত হয় আবার আসে দ্বিতীয় প্রহরে, কে জাগে?—মন্ত্রিপুত্র জাগে। তৃতীয় প্রহর যায়, কাল ফিরে এসে বলে, কে জাগে? —কোটালের পুত্র জাগে। রাত-শেষে অন্ধকার পাতলা হয়, কাল ছুটে এসে বলে, কে জাগে? কে জাগে? —রাজপুত্র জাগে!

বারেবারে এইভাবে মানবজাতি ঘুমোয়, জাতির শিয়রে জাগরণ বসে থাকে কালের কবল থেকে তাকে বাঁচাতে, সকাল হলে এদের কাজ শেষ হয়ে যায়। এদের রাতের গাঁথা অসমাপ্ত মালা রাজকুমারীর ঘরের দুয়োরে পড়ে থাকে, সে মালা মহাজাতি শাহাজাদীর হাতে গাঁথা মালা নয়, সে চাহার দরবেশ তাদের জপমালা। রাজকুমারী তাকে অনেক সময় মাড়িয়ে চলে যান নিজের গরবে, হয়তো বা রাজকুমারীর দাসী সে পেয়ে যায় সে মালা ঘর ঝাঁট দিতে, কিংবা ঘরের দুয়োরে আলপনা টানতে বসে অথবা এমনি চলে যেতে যেতে!

জাতির সঙ্গে শিল্পী কবি এদের যোগ জাগ্রতের সঙ্গে ঘুমন্তের যোগ। জাতির চোখে ঘুম আসে, এদের চোখে ঘুম নেই, জেগে থাকে এরা একলা, একলা বসে খেলে এরা, একলা মালা গেঁথে চলে, বীণা বাজায়, গান গেয়ে বলে—

"ছিল যে পরাণের অন্ধকারে
এল সে ভুবনের আলোক পারে।
    স্বপন বাধা টুটি
    বাহিরে এল ছুটি
    অবাক আঁখি দুটি
        হেরিল তারে।

মালাটি গেঁথেছিল অশ্রুহারে,
তারে যে বেঁধেছিনু সে মায়া হারে
    নীরব বেদনায়,
    পুজিনু যারে হায়
    নিখিল তারি গায়
        বন্দনা রে!"

—রবীন্দ্রনাথ

জাতীয় অনুষ্ঠানের ফলে দেশে বড় শিল্প বড় কাব্য আসে না—বড় বড় বাড়ি আসে, মন্দির আসে, মস্ত জনতা আসে, মস্ত কোলাহল, সবই মস্ত প্রকান্ড ধুমধামের সঙ্গে সঙ্গে আসা-যাওয়া করে, কিন্তু যা কিছু সত্য বস্তু জাতির ভান্ডারে সঞ্চিত হয় তা ফুলের মধ্যে মধুর মতো স্বাতী নক্ষত্রের চোখের জলের মতো গোপনে নেমে আসে অদৃশ্য লোক থেকে; তার আসা-যাওয়ার পথের চিহ্ন পড়ে না দেশের বুকে। যার কাছে আসে তার বুকেও সে গোপনে আসে দেশ কালের অতীত এক দেশ থেকে, সে ডাক দেয় কবির প্রাণে, সে সাড়া পৌঁছে যায়।

কবি বলেন—

"ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওয়ত ছাতিয়াঁ।"

এ কোন ডাক পাখি, এ কোথা থেকে আসে যার ডাক শুনে প্রাণ ফাটে। এ কি জাতীয় খালের কাদায় বাসা বাঁধে? স্বদেশী পাখি ধরার ফাঁদে একে কি ধরা যায় না? হেনরী মার্টিনের বন্দুকে একে আকাশ থেকে পাড়া চলে খানার টেবিলে? একের প্রাণে যে বসন্তকালের সমীরণ বইল তাই ধরে এ আসা যাওয়া করলে কালে কালে দেশে দেশে বারেবারে, দেশের কবি গাইলে এই ডাক পাখির উদ্দেশে—

"তুমি কোন পথে যে এলে পথিক
        দেখি নাই তোমারে,
হঠাৎ স্বপন সম দেখা দিলে
        বনেরি কিনারে।"

—রবীন্দ্রনাথ

লোকারণ্যের একধারে হঠাৎ আগমনী বেজে উঠল, জাত জানেও না সোনার তরী এসে গেছে পসরা বয়ে নতুন অতিথিকে বয়ে, সমস্ত জাতির বিনা বেতনের চাকর কবি শিল্পী এরা ছুটে গেল অতিথির অভ্যর্থনা

করতে, অতিথি তাদের ধন্য করে গেল, জাত তার কোনো খবরই নিলে না। বিদায়বেলায় দেশের কবিই একা তাকে বললেন—

"তোমার সেই দেশেরি তরে
আমার মন যে কেমন করে,
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস
আমার প্রাণে বিহরে।"

অষ্ট্রেলিয়ার ঘোড়ার আড়গোড়ার একটা সাহেব সমুদ্রের উপরে সূর্যাস্তকে তাদের বিদেশী সন্ধ্যা বলে বর্ণন করেছিল আমার এক বন্ধুর কাছে; সে হিসেবে আর্টকে বলা চলে ন্যাশনাল কিন্তু আসলে আর্ট তা নয়, সে পথিক, তার বাসা জাতীয় আগারে নয়, তার পথ জাত দেবতার রথচক্র-লাঞ্ছিত বড় রাস্তাও নয়, ছোট গলিও নয়, ঠিক ঠিকানা সব নিশানা-হারানো পথে,—বিস্ময়কর অপূর্ব-দর্শন। সে কবিকে বলায়—

"কোন দেশে যে বাসা তোমার
কে জানে ঠিকানা,
কোন গানের সুরের পারে, তার
পথের নাই নিশানা।"

—রবীন্দ্রনাথ

অরূপ না রূপ

"অরূপ বীণা রূপের আড়ালে।"

বীণা দেখা যায় কিন্তু সুর তাকে দেখা যায় না; কিন্তু চেনা যায় সেই সুর দিয়ে যে এটি বীণা বাজছে, ঢাক নয় ঢোল নয় গ্রামোফোনের বীণা নয়। দেখা বীণার সঙ্গে না-দেখা যে সুরটি জড়িয়ে রয়েছে, সেটি বীণার প্রাণস্বরূপ বীণার কাঠামো ধরে আছে প্রাণ।

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল,
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।"

একটি রূপের অশেষ প্রকাশ, দৃষ্টি খুঁজে খুঁজে রূপসাগরের পায়ে অরূপ বলে একটা কিছু ধরতে সাঁতরে চলল না, রূপের মধ্যেই তলিয়ে গেল। মন যৌবনের শেষ চাইলে না, নতুন থেকে নতুনতর আনন্দে আপনাকে হারিয়ে ফেলেই চলল। এই হল রূপদক্ষের কথা, রূপসাধনের চরম সিদ্ধি। একসঙ্গে রূপ-লাবণ্য ভাবভঙ্গি যা চোখে দেখা গেল তা এবং সেই সঙ্গে রূপের মাধুরী তাও পেয়ে গেল যখন মানুষ, তখন সে হল রূপদক্ষ।

রূপ সবারই চোখে পড়ে কিন্তু রূপের মাধুরী তো সবার কাছে ধরা দেয় না। ফুলটা দেখলেম, ফুলের আঘ্রাণ নিয়ে ফুলের সৌরভ কেমন তাও জানলেম, কিন্তু এই হলেই যে ফুলের মাধুরীটিও পেয়ে গেলেম এমন নয়।

রূপের মধ্যে তিনটি জিনিস—একটি তার আকার প্রকার, একটি তার অন্তর্নিহিত ভাব আর দুই জড়িয়ে যে মাধুরী ফুটল সেটি। পর্বত যে পর্বত এবং সে যে বিরাট ভাব নিয়ে বিরাট, এটুকু সাধারণের পক্ষে ধরা শক্ত নয়, কিন্তু পর্বতের নবীন নীরদ শ্যমরূপের মাধুরী সবার ধারণার বিষয় তো হয় না। তেমনি একটা কবিতা ছবি গান এরা যা দেখালে তা পেলেম, অথচ এদের মাধুরী মনকে একেবারেই স্পর্শ করলে না এমন ঘটনা সাধারণ। রূপদক্ষ যাঁরা তাঁরা এই মাধুরীকে পেয়ে যান, তাই সব রূপই তাঁদের কাছে কালে কালে পুরাতন হয়ে যায় না, কোনোকালে এই আকাশ-পর্বত নদ-নদী জল-স্থল এরা পরিচয়ের দ্বারা ঔদাসীন্য এনে দেয় না তাঁদের মনে, পলে পলে বারেবারে এরা মনের সঙ্গে এসে লাগে, চোখে এসে লাগে এরা নতুন হয়ে মধুর হয়ে।

পর্বত একবার দুবার দেখলে তাকে দেখার তৃষ্ণা মিটে গেল আমাদের, কিন্তু রূপদক্ষ তাঁরা আমাদের চেয়ে সৌভাগ্যবান, তাঁরা তো শুধু রূপ বা ভাবটাই পেলেন না পর্বতের বা অরণ্যের বা ফুলের বা কবিতার বা ছবির অথবা গানের—তাঁরা রূপের সঙ্গে রূপের ভাব এবং তাদের মাধুরী যা রূপকে চিরযৌবন দেয় তা পর্যন্ত পেয়ে ধন্য হলেন।

যাঁরা সত্যি রূপদক্ষ তাঁদের আনন্দের শেষ নেই, চোখ মন সব দিয়ে একটি রূপকে তাঁরা বিচিত্রভাবে দেখে যাচ্ছেন নতুন নতুন—চিরকাল ধরে নতুন। হিমালয় পর্বত সেও রূপের রঙের সঞ্চয় নিয়ে পুরোনো হয়ে শেষ

হয়ে গেল যাদের কাছে এমন মানুষ খুব কম নেই, কিন্তু হিমালয়ের একটা পাথর একটি গাছ মাধুরী পেয়ে অফুরন্ত হয়ে রইল, চিরনতুন হয়ে গেল যার কাছে এমন মানুষই কম দেখা যায়।

গানে যে রূপ ফুটছে, কবিতায় যে রূপ, ছবিতে যে রূপ এবং বিশ্বের এই বিশ্বরূপ— সবারই কাজ মাধুরীতে মনকে তলিয়ে দেওয়া। এই মাধুরী স্পর্শ করে চলেছে তাবৎ জীব, কেউ এতে তলিয়ে যাচ্ছে, কেউ সমুদ্রের জলে তেলের মতো উপরে উপরে ভাসতে থাকছে তলাতে পারছে না।

চন্দ্রোদয় দেখে 'আহা সুন্দর' বলে না এমন লোক কম, কিন্তু তারা সবাই চাঁদের মাধুরীকে পেয়ে যায় না। এই ধরনের সাধারণ ভাবপ্রবণতা চন্দ্রকান্তমণির মতো চাঁদ উঠতেই ভিজে ওঠে, কিন্তু কিছু উৎপন্ন করে না মনের সামগ্রী। অসাধারণ ভাবপ্রবণতা হল মাটির মতে, রসে ভেজে, বীজে ফল ধরায়, শক্তি গজায়, ফুল ফোটায়, ফল দেয় নানা রকম।

জিনিসটাকে বার থেকে বেশ করে চেনা হল এবং তার ভিতরের ভাবটাও যাহোক নিপুণভাবে বার করে দেখা হল কিন্তু বাকি রইল তখনো আসল যেটা পাবার সেটি পাওয়া—রূপের মাধুরীটুকু।

আর্টের সঙ্গে আর্টিস্টকে পাই তাই আর্টের আদর করি, রূপের আড়ালে অরূপকে দেখি তাই রূপের আদর করি, এমনি কতকগুলো বচন আর্ট-সমালোচনাতে প্রচলিত হয়ে গেছে। আর্টিস্টের এবং অরূপের কাছে পৌঁছে দিতে রূপ এবং আর্ট যেন আমাদের সোপান। রূপ সিঁড়িও নয় প্রহরীও নয় আর্ট exhibitionএর, যে তাকে ধরে আর্টিস্টের সঙ্গে পরিচয় করতে চলবে, বা অরূপ অদ্ভুত একটা বাজি দেখবে তার কাছে ছাড়পত্র নিয়ে!

মাধুরী দিয়ে রূপের সাগর ভাসিয়ে নিতে তলিয়ে নিতেই রূপ আছে, রূপ আছে আর্টিস্টের কথা অরূপের ধ্যান ভুলিয়ে দিতেই। সুরূপাদের শিরোমণি তাজবিবি সে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে, কিন্তু তার রূপ সে এসে বললে, 'এই রইলেম আমি রূপের স্বপ্নে বাঁধা এই পাথরের ভিতরে বাহিরে সুপ্রত্যক্ষ, অরূপে মিলাল না রূপ আমার, রূপের সঙ্গে মিলল এসে আমার নতুন রূপ।' তাজমহলের দর্শন শিল্পীর নাম ও পরিচয় বা ইতিহাসের এক অধ্যায় পড়ে নেওয়াতে তো নয়, তাজমহলের রূপের মাধুরী পাওয়াই হচ্ছে দেখার শেষ। রূপ থেকে মাধুরীকে পেয়ে যাওয়াতে রূপের এবং রূপদক্ষের সার্থকতা। দেহতত্ত্ব আধ্যাত্মিকতত্ত্ব এমনি শক্ত রকমের একটা তত্ত্ব পেয়ে রূপ বা রূপদক্ষ ধন্য হয় না কোন কালে।

বর-কনের বিয়ের দিনে অনেকগুলো লোক থাকে যারা কেউ 'তত্ত্ব' বয়, কেউ শাস্ত্র কয়, কেউ বর-কনের দাম কত যাচাই করে, —এমনি নানা ঘটনা নিয়ে উৎসব একটা রূপ পেয়ে বসে সবারই কাছে। কিন্তু উৎসবের মাধুরিমা পেয়ে যায় শুধু দুটি তিনটি লোক— বর-কনে কনের মা এমনি দু-চার অন্তরঙ্গ, যারা হাসে কাঁদে একসঙ্গে।

বিশ্বজোড়া রূপ মাধুরী-সাগরে টলমল করছে,—বাতাসে মাধুরী, সাগর জলে মাধুরী, আকাশে মাধুরী, ধরিত্রী মাধুরী বহন করছে, অরণ্যে মাধুরী, পথের ধূলা তাতেও মাধুরী। এত মধুরী ধরা রইল দশ দিকে কিন্তু এর উপভোগের উপযুক্ত হল না মানুষ ছাড়া আর কোন জীব। এই যে শ্রেষ্ঠ দান কবির কবি রচয়িতার রচয়িতা আর্টিস্টেরও আর্টিস্টের কাছ থেকে এল, একে পেয়ে মানুষ পরিতৃপ্ত হবে, না এতে খুশি হয়ে দাতারই কথা স্মরণ করবে—এই ভাবনা হিমালয়ে বসে আমার মনে উঠেছিল। আমার দেবতাকে আমি প্রশ্ন করেছিলেম, দান দেখেই যে ভুলে থাকি তোমায়, দেখতে চোখও চায় না মনও চায় না— এ কেমন দান তোমার!

সত্যই যে দান দাতাকে ভুলিয়ে দেয় সেই তো বড় দান, যে দান ঠেলে দাতা আপনি এগিয়ে আসেন সে দান তো তুচ্ছ দান। রূপদক্ষতার চরম তো সেইখানে যেখানে রচনার রূপ রং সমস্তই ভুলিয়ে দিলে রূপদক্ষকে, শুধু তার দান করা রূপের মাধুরী মনকে পরিপূর্ণ করলে।

ছবির কবিতার সঙ্গীতের উদ্দেশ্য রচয়িতাকে সুপরিচিত করা—এ হতেই পারে না। রচয়িতা যেখানে গোপন, রূপদক্ষের পূর্ণ দক্ষতা সেখানে। ছবির সঙ্গে আর্টিস্টকে জানছি এ নয়, আর্টিস্টকে জানলেম না শুধু জানলেম রচনাকে এবং পেলেম তা থেকে মাধুরী যা পাবার তা—এই হল ঠিক ভাবে রূপের উপভোগ। কিন্তু এ না হয়ে ছবি নিয়ে কবিতা নিয়ে সঙ্গীত নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে চললেম কোথায় তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা দার্শনিকতা প্রভৃতি নানা তত্ত্বের সিংহাসনে আর্টিস্ট বসে আছেন—এতে রূপকে কোনো দিক দিয়ে দেখা শোনা কিছুই হল না। ভোলাতেই রূপের সৃষ্টি হয়েছে যখন, তখন রূপকে অতিক্রম করে অরূপ প্রভৃতির সন্ধান কতকটা যেন বর-কন্যার যুগল মূর্তির সামনে বসে দুজনের কুলপঞ্জী এবং তাদের আয়-ব্যয় ও ধর্মকর্মের হিসেব দেখে খুশি হয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

মধুভরা আকাশে বাতাসে আলোর মধ্যে ফুলের কুঁড়ি প্রাণের পাত্র খুলে ধরলে, মধু সঞ্চিত হল সেখানে, তেমনি রূপদক্ষ রচনার সামনে হৃদয় পেতে দিলেন, মধুতে পরিপূর্ণ হল পাত্র—রূপের সবখানি এতেই পাওয়া হয়ে গেল। এটা কবিকল্পনা নয়, সৃষ্টির রূপের রহস্য এই নিয়ে এবং এই নিয়ে আর সব জীবের চেয়ে মানুষ আমরা বড় হলেম— 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। বর্ষার আকাশ জলই ঝরায় তাদের কাছে যারা মেঘের পেছনে মেঘবাহন ইন্দ্র নয়তো মেঘনাদ নয়তো বৃষ্টিতত্ত্ব গোছের একটা কিছু দেখার চেষ্টা করে, আর সেই মেঘ অমৃত বর্ষণ করে তার প্রাণে যে মেঘের রূপ দেখেই ভুলে থাকে, কার দেওয়া মেঘ কোথাকার মেঘ কি দরের মেঘ এসব খোঁজই নেয় না।

মধুকরের সঙ্গে রূপদক্ষের তুলনা দেওয়া হয় কখনো কখনো, কিন্তু রূপদক্ষ ফুলের মাধুরী ফুলের রূপের সঙ্গে পায়, মধুকর শুধু পায় ফুলের মধু, ফুলকে পায় না। রূপের মধ্যে মধুকর ছাঁকা অরূপ রস পেয়ে বঞ্চিত হল, আর রূপদক্ষ মানুষ রূপে সমান অধিকার পেয়ে চরিতার্থ হয়ে গেল।

রূপ কি তা বোঝাতে হয় না কাউকে, রূপ চোখে পড়লেই জানায় আপনি কি বস্তু; কিন্তু রূপের মাধুরী সে যে অন্তরের জিনিস, তাকে বোঝাতে গেলেও বোঝানো হয় না, রূপদক্ষ যারা তারা তা জানে কিন্তু জানাতে পারে না। যাকে জানা গেল কিন্তু জানানো গেল না তেমন বস্তু নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া চলে না, কাজেই রূপ সম্বন্ধে চর্চা করি শুকনোভাবে, মাধুরী তোলা থাক কিছু কালের জন্য।

মাধুর্য এবং রূপ দুটোর বিষয়েই 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে লেখা আছে কিন্তু রূপ যে দেখলে না, রূপের মাধুরী হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করলে না, সে হাজার বার 'নীলমণি' উল্টে পাল্টে পড়েও কিছুই পেলে না। রূপ দেখে ভুলে যাওয়া যার হল না সে পড়েই চলল পুঁথি। রূপ যে নিজের দৃষ্টির বিষয় এবং তার মাধুরী নিজের মনের বিষয়, অন্যের— এমনকি খুব বড় কবিরও—পিছনে পিছনে গিয়ে তাদের চোখে দেখলে রূপ দেখা হয় না, অন্যের দেখার মতো করে দেখা হয়।

মহাকবি কালিদাস একরূপে হিমালয় পর্বত দেখে খুব সম্ভব কল্পনা করেই লিখলেন—

"অস্তুারস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ।

পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য।
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদন্ডঃ॥"[১]

বড় কবির দেওয়া এই মানদণ্ড, এ দিয়ে হিমালয় পর্বতের রূপের পরিমাপ করে দেখতে গেলে দেখব এই শ্লোকের দুটো ছত্র এবং এরি প্রতিরূপ। এ ছাড়া আর কিছু ভাল মন্দ চোখে পড়বেই না এবং দেখব মনও এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি ধরে চলছে চোখের সঙ্গে পাহাড়ে ও অরণ্যে পরের দেওয়া রূপ ও রসের ভাল মন্দর মধ্যে—রেলের উপরে গাড়ির মতো বাঁধা পথে।

মহাকবির চশমা নিজের চশমার চেয়ে বড় চশমা, কিন্তু বৃদ্ধের চশমা যুবা চোখে পরলে অথবা যুবার চশমা বুড়োয় পরলে কি দশা হয় সেটাও তো দেখা চাই! আমি যদি কালিদাসি করে লিখি যে—গিরিচূড়ার মতো উন্নত নাসা, তার উপরে ধরা রয়েছে সোনার তারের দুই ধারে ধরা দুখানি মোতিয়াবিন্দু, সে তো চশমা নয়, সে রূপ অরূপ দুই সমুদ্রের জলের পরিমাণ করে নেবার দাঁড়িপাল্লাখানি!—তবে হয় লোকে বলবে আমার চোখ খারাপ কিংবা উল্টো চশমা পরেছি। এর চেয়ে বেশিও বলবে। হিমালয়কে একটা মাটির ঢেলা ওজন কবরার দাঁড়ি পাল্লার মতো দেখায় মজা আছে, রসও একরকমের আছে, কিন্তু তাই বলে সেটা হিমালয়ের উপযুক্ত বর্ণনা একেবারেই নয়। বলতে সাহস হয় না, তাই বলি যে মহাকবি কালিদাসের ভুল বর্ণন চাঁদের কলঙ্ক, আর চশমা চোরা অকবির ভুল বর্ণন তার নিজের মুখের চুনকালির প্রায়। এ কথাটা সহজ সত্য কথা, কিন্তু এ কথামতো চলা অত্যন্ত কঠিন সেইজন্যে জগতে অনেক কবি নেই, অনেক আর্টিস্ট নেই, অনেক রসিকও নেই, ঋষিও নেই—যাঁদের আর্য প্রয়োগ মাপ করা চলে। তিন মাস আমি নিজের লাঠি ধরে পাহাড় প্রদক্ষিণ করেছি, কোনোদিন পর্বতের কাছে বকশিশ পেয়েছি, কোনোদিন পাইনি। মহাকবির চাদরের খুঁট ধরে গেলে হয়তো পদে পদে কিছু-না-কিছু প্রসাদ পেতেম। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে, কবির বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পর্বতকে পাওয়া অকবির বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পাওয়ার চেয়ে ভাল হলেও নিজে খুঁজে পাওয়ার আনন্দের একবিন্দুর সঙ্গে তার পরিমাপ হয় কি? মহাজনের সঙ্গে চলা নিরাপদ এটা সবাই বলে, কিন্তু মহাজন নিজের চোখের চশমা অন্যের চোখে পরিয়ে যে সহজ দেখার পথ বন্ধ করেন এ তো মিছে কথা নয়। রূপ নিজের দৃষ্টির বিষয়, সে মধুর কি মধুর নয় তা নিজে দেখে বুঝি। 'রূপের পর্দা পরিয়ে অরূপকে দেখ'—এটা মহাজনদের কথা, কিন্তু রূপ রূপ দেখাতেই তো আছে এটা সহজ মানুষের কথা।

পূর্ণচন্দ্রের আলোকে পরাস্ত করে পর্বতের উপরের তারাটি জ্বলছে, তার রূপ দেখেই আনন্দ, তারাটা কোন তারা, তারার অন্তরে কোন দেবতার দীপ্তি—এসব মনে নাই বা এল। যার রূপ আছে সে রূপ দিয়েই মন টলায়, নকিবের দরকার তার যার নিজের রূপগুণাদির পরিমাণ যথেষ্ট নয়। ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভায় রূপ নকিবের দেওয়া সাজ না পেয়েই বরমাল্য লাভ করলে। রূপের দর্শন করে আনন্দিত হওয়াতেই তার পরিণতি, রূপ থেকে স্বতন্ত্র রং থেকে স্বতন্ত্র বর্ণহীন রূপহীন অরূপের প্রতীক হওয়াতে রূপের সার্থকতা নয়। প্রতিমার মর্যাদা প্রতীক হয়ে পড়াতে নয়, রূপের আসনই তার গৌরবের আসন। গৌরীশঙ্কর হিসেবে বরফের পাহাড় দেখা পাহাড়কে সত্য দেখা বলে তো মনে হয় না। একটা সমুদ্রের তরঙ্গ ঘোড়া হিসেবে দেখে কবিদের আনন্দ হয়, কেননা কবি ভাবুক কিন্তু আর্টিস্ট তিনি যে রূপদক্ষ।

দেশলাইয়ের বাক্স একটা, সিগারেটের টিন একটা, লোহার সিন্দুক একটা এবং কালীঘাটের কৌটো একটা—এদের ভাল-মন্দের হিসেব এদের রূপের মধ্যেই রয়েছে। দেশলাইয়ের বাক্সর কবি বাক্সটার রূপ বড়

উপমার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে হয়তো কালীঘাটের কৌটোর চেয়ে তাকে ভাল বলে প্রমাণ করতে পারেন কারো কাছে, কিন্তু আর্টিস্ট রূপ দিয়েই রূপের পরিমাপ করে দেখবে, উপমার ভাল-মন্দ দিয়ে নয়।

কি প্রাচীন কি আধুনিক ভারত-শিল্পের একটা রূপ আছে শুধু তাই দিয়েই ভাল-মন্দ উচ্চ-নীচ বিচার। আধ্যাত্মিকতার প্রশংসাপত্রের উপরে তাকে বসালে সে যে জগৎশিল্পে বড় জিনিস বলে চলে যাবে একথা ভাবাই ভুল। গুণের অপেক্ষা না রেখেই রূপবান সহজেই প্রমাণ করে যে সে রূপবান। অষ্টাবক্র তিনি ঋষি হয়েও একটা ছেলের কাছে ধরা পড়লেন যে তিনি রূপবান একেবারেই নন, নির্দোষীকে কিন্তু তিনি অভিসম্পাত দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন তিনি বড় ঋষি।

ইন্দুমতীকে নিয়ে সহচরী সুনন্দা এক এক রাজার রূপগুণের বর্ণনা কত ব্যাখ্যানা দিতে দিতে চলল, মালা পড়ল না কারু গলায়। অজ রাজার সামনে এসে সুনন্দা শুধু বলল, 'আর্যে ব্রজামোহন্যতঃ'। অজ রাজা যে রূপবান ছিলেন সুতরাং সেখানে সুনন্দার ব্যাখ্যানার প্রয়োজন একেবারেই রইল না। রূপের পর্যাপ্তির মধ্যে রূপের একটু আধটু খুঁত যেমন, তেমনি গুণেরও বাহুল্যের মধ্যে কুরূপের সবটা তলিয়ে যায়। পয়সার পর্যাপ্তি রূপ গুণ সবার দোষ ফিল্‌টার করে পাত্রটিকে বিয়ের সভায় হাজির করে, কিন্তু তাই বলে কালো কোনো দিন সাদা হয় না, যা কুরূপ তা অরূপের ছাড়পত্র পেয়েও সুরূপ হয় না।

অনেক সময় দেখি কুরূপ সেও সয়ে গেছে চোখে। যেমন দেখতে দেখতে সয়ে গেলে রূপের খুঁত চোখেই পড়ে না, তেমনি রূপ অনেক সময়ে অতি পরিচিত হয়ে মর্যাদাও হারায় আমাদের কাছে। হিমালয় পর্বত তার দিকে ফিরেও দেখে না পাহাড়ি মানুষ, আর তিন মাস ধরে প্রতি মুহূর্তে তার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ আমার তৃপ্তি আর মানল না।

হারমোনিয়ামের শব্দ অত্যন্ত বদ কিন্তু কেমন করে আমাদের কানে সয়ে গেছে বুঝতেই পারিনে যে দেবী বীণাপাণির কান লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে সেটা দেখা মাত্র। আমি সেদিন একটা ছদ্মবেশের সভায় চীনের জুতো আর কোর্তা পরে গেলেম, বন্ধুরা আমায় দেখে চাপা হাসি হাসলেন, কিন্তু আমার পাশেই আধখানা ধুতি আধখানা কোট পরে কত লোক এল গেল, কারু চোখে তার কদর্যতা ধরা দিলে না; সয়ে গেছে বলেই তো!

রূপ সম্বন্ধে বলবার সময় অরূপের কথা ওঠে প্রায়ই দেখি এবং অরূপের আধার রূপ এও বলা হয় এবং অরূপের সাধনার জন্যই আর্টে রূপের অবতারণা এমনো বলা প্রচলিত হয়ে গেছে চিত্র-সমালোচনাতে, সুতরাং গত তিন মাস ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ছবিতে এই রূপ-অরূপের ঠিক যোগাযোগটা কি ভাবের তা ধরার চেষ্টায় রইলেম। দেখতেম পর্বতের সামনে যখন কুয়াশা তখন অরণ্য নেই, পাহাড়ের ঝরনা নেই, চোখের কাজ ফুরিয়ে গেছে তখন, মনের এবং কানের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। জলের শব্দ শুনছি, পাখির গান শুনছি আর ভাবছি কত কি, কিন্তু এটা যে পাখি গাইছে ওটা যে ঝরনা ঝরছে তা মনে-ধরা রূপ সমস্ত কুয়াশা হবার আগে থেকেই জানিয়েছে আমাকে। আবার পর্বতের উপরে অমাবস্যার রাত্রি যে কি ভয়ানক অন্ধকার তা পাহাড়বাসী মাত্রই জানেন, পায়ের তলা থেকে মনের কাছ থেকে পথ সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, অরূপ ঘিরে নেয় চারিদিক, দূরত্ব নৈকট্য আর থাকে না, বিষম ভ্রান্তির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে খুঁজে বেড়ায় চোখ আর মন দুজনেই হারানো রূপ আর তার স্মৃতি।

যার কোনো পরিচয় আমার কাছে ধরা পড়ল না সেই রইল আমার কাছে অরূপ হয়ে বর্তমান। বড় সভায় বক্তার সামনে দুই-একজন পরিচিত এবং নিকটবর্তী অপরিচিত মানুষ ছাড়া বেশির ভাগ শ্রোতাই নিজের

নিজের রূপ না দেখিয়ে লোকে পরিপূর্ণ ঘর এইটুকু মাত্র জানাতে থাকে;—এ একভাবে রূপ অরূপের যোগাযোগ, এর ধারণা ছবিতে পৌঁছে দেওয়া চলল। অবগুণ্ঠিতা সুন্দরী সবাই আঁকে, পর্দানশীন সবাই আঁকে, সেখানে মানুষটি ছেড়ে দেওয়া গেল দর্শকের কল্পনার উপরে, শুধু অবগুণ্ঠন এঁকেই খালাস চিত্রকর। যন্ত্রসঙ্গীত আরো এগোল, গোটা দুই সুরের টান কানের কাছে দিয়ে এক-একটা রূপ জাগালে, সকাল বিকাল কত-কি'র কবিতার ব্যঞ্জনা সুরের রঙের রেখার রেশ দিয়ে যা বলতে পারলে না, দেখাতে পারলে না, তা দেখালে শোনালে। ইশারায় বলা হল যা তাকে আর যাই বলি অরূপ বললে ভুল হয়। এক রূপ আর এক রূপের, এক রঙ আর এক রঙের, এর সুর অন্য কিছুর ইঙ্গিত করলে—এ পর্যন্ত চলে আর্টে, বেরঙ দিয়ে বোঝানো চলে বাদলা, কিন্তু বেরং দিয়ে রং, বিনা রেখার ছবি এসব তত্ত্বকথার কথা। পর্বতে বসে রূপ-অরূপ দুয়েরই হিসেব দিয়ে ছবি দেখে আমি অনেকগুলো নোট খাতায় টুকে এনেছি, তাই নিয়ে এ সমস্যাটা আর একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করব।

"সকালে ফোটা সূর্যমুখী ফুলটিকে নীল আকাশ আলোর খবর এনে দিতে না দিতেই প্রথম পৌষের দুরন্ত কুয়াশা দিক বিদিক ঘিরে নিলে।"

কিংবা যেমন—"পাহাড় তলিয়ে যাচ্ছে হিমের প্লাবনে, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সকালের আলো—কূল-হারানো একলা হাঁস।"

অথবা যেমন—"সন্ধ্যার আকাশ চেয়ে দেখছে দিনের শেষে আলোর জয়পতাকা শীতের কুয়াশা নামিয়ে রাখছে ফুলের বনের পায়ের কাছটিতে।"

তিনটি ছোট ছোট স্থান, চিত্রও নয় কবিতাও নয় গল্পও নয়। হাতের লেখায় ধরা দিলে ছবি কটা সহজে কিন্তু তুলির আগায় এদের আটকাতে গেলে দেখব—দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুটিই ছবি হয়ে রূপ পেয়ে বসে আছে কিন্তু প্রথমটির বেলায় মুশকিল, সেখানে রূপ সাদা কাগজ থেকে পিছলে পড়তে চায়, ঘন কুয়াশা পটের সবটা অধিকার করতে চায়। বাদলের আকাশ যেমন শুধু রং দিয়ে জানায় জলের ধারা আছে তার বুকে, তেমনি এখানে কুয়াশা না-দেখা ফুল পাতা ইত্যাদি রূপের পরিমল বহন করে সার্থক একখানি ছবি হতে চাইলে। সাদা রঙের একটা প্রলেপ দিয়ে পাহাড় পর্বত ফুল পাতা সব ধরে দেওয়া পটের উপরে—এ মানুষের কর্ম নয়। ছবি করতে হলেই তাকে হয় রূপ নয় রূপের আভাসের মধ্যে বদ্ধ থাকতে হবেই। পর্বতের আভাস না দিয়ে পর্বতের কুয়াশার ঠিক রূপ এবং মাঠের আভাস না দিয়ে পাহাড়তলার কুয়াশার ঠিক রূপ দেওয়া বিশ্বকর্মার কাজ, মানুষের ক্ষমতায় কুলোয় না।

রূপ যতটুকুই হোক না কেন সে রূপ ছাড়া অরূপ নয়। জলের মতো হাল্কা রং দিয়ে পাহাড় লিখি, গাছ লিখি, কুয়াশায় গাছ পাহাড় তলিয়ে গেছে তাও লিখি—সে হল ছবি নয় ছাপ। রেখা মাত্রেই রূপবান, রেখা ছেড়ে ছবি কোথায় এবং রং ছেড়েই বা রেখা কোথায়? এই রং আর রেখার যোগাযোগ ছবিকে সুনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট ভাবে ধরে চোখে।

রূপের বাঁধন ছেঁড়া রং সেই শুধু অরূপের কতকটা আভাস দিতে পারে, যেমন আকাশের গভীর নীল, রঙিন কাপড়ের নিথর রং কিন্তু তারা ছবি নয় ভাবের বাহন, রঙের একটা একটা স্ফূর্তি দিয়ে মনে এক এক ভাব ও রস জাগায় রূপের অপেক্ষা না রেখেই। সুর কতকটা যে কাজ করে, রং কতকটা সেই কাজই করে;

বসন্তবাহার সুর আর বাসন্তী রঙের আলো দুই-ই অনির্দিষ্ট রূপের ধ্যানে মগ্ন করে দেয় মনকে, কিন্তু বাঁধা রং ও রূপের পাথারে মনকে তলিয়ে নিয়ে চলাই রেখার কাজ।

ছবি যারা লেখে তারাই জানে রূপ রং ইত্যাদি দিয়ে সম্পূর্ণ ফুটতে দিলে এবং সম্পূর্ণ না ফুটিয়ে দিলে একই বস্তুর দুটো ছবি দুরকম রস দেয় দর্শককে। পটখানির মধ্যে তলিয়ে আছে যে রূপ, আর পট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে যে রূপ—দুটি দুরকম জিনিস, কিন্তু দুটিই রূপের বাইরের জিনিস নয়, দুটিই রূপ, একের ঘোমটা আছে অন্যের ঘোমটা নেই এই তফাত। জগৎ-শিল্প এই তলিয়ে থাকা রূপ এবং ফুটে ওঠা রূপ—এই দুই তটের মধ্যে ধরা। সব দেশের সব শিল্পের ধারা ধরা গেছে এই দুই কিনারার মধ্যে। এই দুই পারের হিসেব নিয়ে কলা-রসিকদের মধ্যে দুটো দল সৃষ্টি হয়েছে Idealist ও Realist নামে এবং ছোটখাটো দঙ্গলও সৃষ্টি হচ্ছে যে কত তার ঠিকানা নেই, যথা Futurist, Cubist ইত্যাদি ইত্যাদি, দলে দলে দলপতিতে দলপতিতে ঝগড়ারও সীমা নেই। Impressioist বলে একটা কথা চলেছে শিল্প-সমালোচনায়; mystic কথা তাও ভারত-শিল্পের পরিচয়-পুস্তকে স্থান পেয়েছে। ছবিকে নাতিস্ফুট না অতিস্ফুট, নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট হতে হবে এই নিয়ে তর্কের সীমা ছাড়িয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর গালাগালির বন্যায় গিয়েও ঠেকবার জোগাড় হয়েছে। এই তর্কজাল কুয়াশার মতো যখন সরে যায় তখন দেখি পর্বতে পর্বতে শুধু স্ফুট-অস্ফুট দু রকমের ছবি ঝরনা দিয়ে বয়ে আসছে দৃষ্টিপথে এবং এও স্পষ্ট দেখি যে, যে খাত বেয়ে স্বভাবের দৃশ্যাবলী সেই খাত বেয়েই ভারত-শিল্পও চলেছে কি পুরাতন কি নূতন, অথচ সেটা হল অস্বাভাবিক কারো কারো কাছে এবং এই অস্বাভাবিক শব্দটার কর্কশতা মেটাতে গিয়ে ভারত-শিল্পকে আধ্যাত্মিক বলে সুখানুভব করার চেষ্টাও করছেন দেখি কেউ কেউ। ভারত-শিল্প সত্যিই যদি ছেঁড়া পকেট হয় তো তাকে উল্টে ছেঁড়া বালিসের খোল বলে প্রমাণ করে মজা করা যেতে পারে কিন্তু ছেঁড়া বটে এটা তো ঢাকা পড়ে না!

হীরকের প্রভা জ্বলজ্বল করছে, চন্দ্রকান্তমণির প্রভা কুয়াশার মধ্যে টলটল করছে— বাজারে দিলে একটাকে বহুমূল্য অন্যটাকে স্বল্পমূল্য বলে। অরূপের যে পক্ষপাতী সে চন্দ্রকান্তমণিকে প্রাধান্য দিয়ে বলবে, এ যে অরূপের ধ্যান ধরে আছে—অতি ভাল জিনিস, রূপের যে পক্ষপাতী সে হীরেকে হাতে তুলে বলবে, এর রূপের রঙের সীমা নেই, এর তুল্য ওটা নয়। অপক্ষপাতী শিল্পী মণি দুটোকেই এক সূত্রে গেঁথে বলবে এরা দুটি মাণিকজোড়—হীরকের সুপরিস্ফুট জ্যোতির মধ্যে হীরের মতো পলতোলা বা বাহ্য রূপ তলিয়ে আছে, চন্দ্রকান্তমণির নিটোল সুবিম্বিত রূপের মধ্যে তার জ্যোতি তলিয়ে আছে। অনুপমের মধ্যে রূপ, রূপের মধ্যে অনুপম, অনির্দিষ্ট জ্যোতির অবগুণ্ঠনে সুনির্দিষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট রূপের গর্ভে অনির্দিষ্ট জ্যোতি, রসিকের কাছে দুয়ের উচ্চ-নীচ ভেদ কোথায়? ভিন্ন দেখে তারাই যারা রূপের র'ও দেখে না, কেবল 'রূপ-অরূপ রূপ-অরূপ' করে মালা জপে।

ঘরের দেওয়ালে ঘেরা জীবনে যে মাধুর্য আকাশের তারাখচিত নীল ঘেরা-টোপে ঢাকা জীবনের মাধুর্যের চেয়ে তা কম জিনিস এটা বলা চলে না। এটা এতখানি ওটা ততখানি এও বলা নিরাপদ নয়, অনেক সময় ঠকতে হয়,—জীবনের স্বাদ বিচিত্রতা হারায়। তেমনি রূপের এক প্রস্থ অরূপের আর এক প্রস্থ ভাগ করে নিয়ে যারা দুটো দেখে, তারা রসের এক নদীর চমৎকারী রূপ দেখতে পায় না, নদীর থেকে সরিয়ে আনা দুটো খালের কিনারায় বসতি বেঁধে বসে যায়।

মাটির প্রদীপখানি মাটির ঘরের কোণে; আকাশের তারা চেয়ে প্রদীপের দিকে, প্রদীপ চেয়ে তারার দিকে—এই দুই চাওয়ার সূত্রটি কেটে দেখতে চায় যে সে পায় ছেঁড়া মালার এ-আধখানা নয়তো ও-আধখানা। রসের ও রূপের পূর্ণ পাত্র পড়ে না তার হাতে।

পর্বতে বসে দেখতেম এক পাহাড় কুয়াশাতে ঝাপসা, আর এক পাহাড় আকাশপটে সুস্পষ্ট টানা—কিন্তু দুয়েরই থেকে এক ঝরনা ঝরছে একই ছন্দে সুরে। তেমনি ইট পাথর ও কাঠের পাহাড় নগরের কোথায়ও রস নেই এটা মনে করলে অট্টালিকার অরণ্য আর পাহাড়ের ঝাউবন দুই-ই রহস্যময় ছবি দেখায়। পাহাড়ের বসতি আর আমার ঘরের পাশে সিংহির বাগানের বস্তি—রূপ হিসেবে কোনটা বড় কোনটা ছোট বলা শক্ত, রং আর সুর পেয়ে দুটোই মধুর লাগে চোখে। ঘরের মধ্যে এতটুকু টিপ পরা কালো মেয়েটি আর পর্বতের উপরকার অরণ্যের কোলে সন্ধ্যাতারা—দুজনেই সমান রূপবতী, দুজনেই প্রত্যক্ষ রূপ নিয়ে মধুর, অপ্রত্যক্ষের ইঙ্গিত না দিয়েও মধুর—এটা অস্বীকার করা তো যায় না। আবার পাটের শাড়ির মধ্যে ঘোমটা-টানা শহুরে নববধূ এবং পূর্ণ চন্দ্রিমার আলোর ঘোমটা-টানা পাহাড়ের কোলে চা-গাছের নতুন ফোটা ফুলের আড়ালে না-দেখা ঝরনা—দুজনের নূপুরধ্বনি মধুর হয়ে শুধু কানে বাজে না, প্রাণেও যে বাজে।

নগর তার এবং নগরবাসীর স্বভাবের অনুরূপ রূপটি যখন দিলে তখন সেটি স্বাভাবিক ছবি হল। স্বভাবদৃশ্য কথার অর্থই থাকে না যদি আর্টিস্টের নিজের ভাব দৃশ্যের মধ্যে অনুরূপ রূপটি লাভ করেছে—এটা ছবি প্রমাণ না করে। ভারতবাসীর পক্ষে যেটা স্বাভাবিক লন্ডনবাসীর পক্ষে তা স্বাভাবিক মোটেই নয়, কিন্তু তাই বলে ভারতীয় ছবি অস্বাভাবিক রূপ সমস্ত নিয়ে কারবার করলে এটা বলা বিষম ভুল। বানরের ডানা স্বাভাবিক নয়, বাদুড়ের ডানা স্বাভাবিক—এ তর্ক করে বানরকে বাদুড়ের চেয়ে কম স্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। রূপ যখন স্বভাবের নিয়ম ধরে ফুট অস্ফুট দুই সীমা মেনে চলল, সুর যেখানে স্বাভাবিক, চলা বলা সমস্তই যেখানে স্বাভাবিক ছন্দ পেলে সেইখানেই মাধুরী ফুটল, এর বিপরীতে বিশ্রী কাণ্ড হল। আমার পক্ষে ভারত-শিল্প স্বাভাবিক, ইংরেজের পক্ষে নয়। নূপুর পায়ের ছন্দে মধুর বাজে, পোষা কুকুর যখন সেটাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া করে তখন বিরক্তি উৎপাদন ছাড়া আর কিছু করে না।

আলোককে অন্ধকারের সঙ্গে পৃথক করে দেখা চলে না, প্রত্যক্ষ রূপকে অপ্রত্যক্ষ রূপের সঙ্গে পৃথক করেও দেখা চলে না। একের সঙ্গে অন্যের ঠিক যোগাযোগ না করতে পারলে ছবিও হয় না, সাদা পাথরে কাল পাথরে সাদা কাগজে কালো কাগজে যারা কিছু রচনা করে তারাই জানে যে এই যোগাযোগের কৌশলই হল রূপদক্ষের সাধনার বিষয়।

পর্বতে পর্বতে অপরিসীম রূপের সামনে বসে মন একটি দিন উঠেছিল রূপের পর্দার ওপারের না-দেখা আর্টিস্টের একটু পরিচয় পেতে। রূপকে প্রশ্ন করলেম, সে বললে, আর্টিস্টকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যেই তো আমি আছি, আমাকে এ প্রশ্ন করা মিছে, আমি রূপবান রূপের মাধুরী আগলে রেখেছি, আমার আড়ালে আমার মধু। বনফুলের বুকের মধুবিন্দু তাকে প্রশ্ন করি, সে বলে, আমি কমলা ফুলের মধু, আমার উপরে ফুলের প্রতিবিম্ব, আমার ভিতরে ফুলের পরিমল!

মন অধীর হয়ে বলে, ফুলের মধ্যে যে মধু ধরলে তার খবর পাই কোথা? ভ্রমর এসে বললে তুমি মধু নাও তো নাও, নয় আমার পথ ছাড়। নিরুপায় হয়ে আমি নিজেকে তখন প্রশ্ন করি, মন উত্তর দেয়—এই যে বসে

বসে নানারূপ ছবিতে নানা রস ধরছো, এগুলো মিথ্যা মায়া বলে যদি কোনো লোক ছিঁড়ে ফেলে তোমার সঙ্গে মিলতে আসে এবং তোমার একটা ফটো তুলতে চায় তুমি তাকে কি ভাবো?

কবির সঙ্গে তাঁর রচনা দিয়ে পরিচয় হল না, তাঁর নামটা লেখা Photograph দিয়ে পরিচয় হল—এ যেন একের লেখা পর্বত-বর্ণনা কিংবা রূপ-অরূপের সমস্যা দিয়ে মস্ত একটা বক্তৃতা নিয়ে হিমালয় দেখার কাজ হয়ে গেল বলে মনে করা।

ভূগোলের এক একটা পাতায় কত নদ নদী পাহাড় পর্বত সেইগুলো পড়েই তো পৃথিবী দেখার কাজ হয়ে যতে পারত। 'পরলোক ভ্রমণ' বলে একখানা বই আছে তাতে সেখানে পরিক্রম করবার আটঘাটের বর্ণন এমনকি সেখানকার অধিকারী আলোর পর্দা খাটিয়ে তার মধ্যে ঘুমোচ্ছন এও লেখা আছে। এই ভূগোল এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত দুখানা মুখস্ত করে দক্ষতা পাওয়া গেল বলে কেউ কি ভুল করে?

পাহাড়ে যাবার সময় উড়ো সাপের মতো রেল যখন এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে, এক মেঘ আর এক মেঘে আমাদের নিয়ে চলল সেই সময় পাশের একটা ছোট ছেলেকে বললেম, পাহাড় কি রকম ভাবতিস? তার কথার পুঁজি কম, সে শুধু পর্বতের দিকে হাঁ করে চেয়ে বললে, পাহাড় যে এরকম তা একেবারেই মনে হত না। ছেলের মনের পাহাড়ের রূপটা ছিল একটা ঢিবি যার এপার ওপার দৌড়ে ওঠা নামা যায়, তাতে গাছ ছিল না, ঝরনা ছিল না, পাথর ছিল না—রূপের মরুভূমির মাঝে বালির স্তূপ, কিংবা একটা বড় গাছের গুঁড়ি—তার বেশি একটুও নয়; ছেলের মনে আগের দেখা পাহাড় এবং পরের দেখা পাহাড়ে যে বিষম তফাত, ঠিক ততটাই তফাত চোখের দেখা থেকে বিচ্ছিন্ন অরূপ আর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ হচ্ছে যে রূপ তার মধ্যে। দাঁড়িপাল্লার বামদিকে রাখো লিখিয়ের কালি কলম কাগজ রং তুলি, বীণা-বাঁশি এবং রূপ-অরূপের জল্পনার ভার, আর দক্ষিণে চাপাও শুধু তার চোখে দেখা রূপের মাধুরী-বিন্দুটি, —জল্পনার বাটখারা ক্রমেই উঠবে আকাশে, চোখে দেখার বাটখারা ক্রমেই নামবে মাটির দিকে। ভারত-শিল্পে যেসকল দেবদেবী মূর্তি দেখি, যেসব ছবি দেখি, তার সবটাই ধ্যান এবং আধ্যাত্মিকতা এবং অরূপ—এটা আমি এক সময়ে কতবার বলেছি তা মনে নেই কিন্তু তাই বলে সেই ভুল আঁকড়ে ধরে থাকা চিরকাল তো সম্ভব হল না—রূপ যে চোখ ভুলিয়ে নিলে মন মাতিয়ে দিলে একথা তো আজ বলতে হচ্ছে।

পাহাড়-পর্বত নদী-নিঝর অরণ্য-আকাশ রূপের সত্তায় বলীয়ান, টোলের পণ্ডিতের রূপ-অরূপের তর্ক কিংবা বিশেষ কোনো ধর্মের ও জাতির আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করতে তারা নেই। বরফের চূড়া দেবীপুরাণের একটা শ্লোকের জন্য বড়, নিরুপম নীল আকাশ কৃষ্ণলীলার পদাবলীর ছাঁদ পেয়ে যে বড়—তা তো মনে হয় না! নানা রূপক উপমা অতিক্রম করে বিদ্যমান এই যেসব রূপ রং এদের সামনে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করা চলে না যে, রূপ নিজেতে নিজে স্বপ্রতিষ্ঠিত।

সেই স্বপ্রতিষ্ঠিত রূপের কথাই যেমন হিমালয়ের শিখরে শিখরে তেমনি সমস্ত ভারত-শিল্পেরও প্রত্যেক অঙ্গে দীপ্তি পাচ্ছে। আমাদের ঋষি চিত্রের ষড়ঙ্গ দিলেন, তার প্রথমেই লেখা হল 'রূপভেদাঃ'—বিচিত্র রূপের কথা নিরুপম রূপের কথা। অরূপের কথা সে দর্শনশাস্ত্রের কথা ধর্মশাস্ত্রের বিষয়, স্বপ্রতিষ্ঠিত নিরুপম রূপের কথা হল চিত্রের এবং মূর্তির বিষয়।

সুনির্দিষ্ট রূপ, সুব্যক্ত সুর এই নিয়ে প্রকৃতি চারিদিকে ঘিরে রইল মানুষকে। অনির্দিষ্ট সেও একটি রূপ, যাকে বলি অব্যক্ত তাও একটি সুব্যক্ত সুর নিয়ে বর্তমান হল। এই যে পর্বতের ছবি কুয়াশার মধ্যে তলিয়ে

যাচ্ছে আবার আলোর মধ্যে জেগে উঠছে—এ দুটি ছবিই রূপের সুনির্দিষ্ট সীমা কোনোদিন অতিক্রম করে চলছে না। কুয়াশা এখানে রূপ আবরণ করছে না, একটা রূপ থেকে আর একটা রূপ ফোটাচ্ছে—পাথরের কড়ি সুর মেঘের কোমল থেকে কোমলতর সুরে মিলে আর একটা নতুন সুরে পরিণত হতে চলেছে, রূপ রং এদের ছন্দে বিচ্ছেদ ফাঁক টেনে দিচ্ছে না, প্রলয় দিচ্ছে না টেনে চোখের এরং মনের উপরে-মাধুর্যহীন নীরস নিকষ-প্রলেপ।

রূপকে নষ্ট করে অরূপের স্বাদ দেওয়া রূপদক্ষের কাজ নয়। পাথরের মূর্তি রং বাদ দিলে অথচ রঙের স্বপ্ন ধরে রইল, সেই মূর্তিকে পুড়িয়ে এবং গুঁড়িয়ে চূর্ণ কর তাতে মূর্তিতে যা ছিল তা নেই। তেমনি সুন্দর পটখানি চুনের প্রলেপ দিয়ে সাদা করে দিই, কোথায় যায় ছবির রূপ কোথায় বা রং, কিন্তু সুন্দর দৃশ্যের উপরে রাত্রির কুয়াশা পড়ুক সে এক নিরুপম রূপ পায় দৃশ্যটি।

ছবির গায়ের চুনের প্রলেপ, রূপের রহস্য তাতে নেই। পর্বত ঢেকে কুয়াশার প্রলেপ—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ এবং মন বসে থাকতো, কিন্তু কোনোদিন দেখলে না সে রূপ নেই রং নেই, কেবলি দেখলে রং-ভোলানো রং, রূপ-ভোলানো রূপ এসে মিলল রূপের পাশে রঙের পাশে! বুদ্‌বুদ্‌ ফেটে গেল, রূপ মিলিয়ে গেল, রং মুছে গেল—এ ঘটনা নিয়ে গভীর তত্ত্বকথা লেখা চলল, আধ্যাত্মিক দেহতত্ত্বের কবিতা ও গান লেখা চলল, কিন্তু ছবি লেখা চলল না। ক্ষণভঙ্গুর রূপ মিলোতে চাচ্ছে, রূপ-হারানো অকূলের কিনারায় রূপ রঙে ভরে উঠে বুকের বেদনায় কাঁপছে—এটা ছবির বিষয় হল।

মানুষ যদি কেবল চোখ নিয়েই চারিদিকে রূপ সমস্ত দেখত তবে ফটোগ্রাফের ক্যামেরা যেভাবে দেখে সেইভাবে তুলতে কেবলি রূপের ছাপ—ছবি নয়—শুধু দেখত রূপ আর রূপ। জলের উপর তেল যেভাবে ভাসে দৃষ্টি সেইভাবে পিছনে চলত, দৃষ্টি রূপের গভীরতা অনুভব করতেই পারত না মানুষ যদি তার চোখের সঙ্গে মন নিয়ে না দেখত চেয়ে। চোখের দেখা রূপের বাইরে দৃষ্টির স্পর্শ দিয়ে ক্ষান্ত হয়, মনের দেখা রূপের মধ্যে যে রস তাকে পেতে চলে চোখ মন দুই মিলে, তবে দেখায় রূপের মাধুরীখানি।

খুব প্রাচীনকালে মানুষ যখন গুহাবাস করছে, তখন তারা কি দেখছে এবং কেমন ভাবে দেখছে তার ছবি এখনো গুহার দেওয়াল এবং ছাদে লেখা রয়েছে। এই ছবিগুলোর মধ্যে এক প্রস্থ ছবি দেখি যেগুলো শুধু চোখে দেখা রূপের নমুনা—হরিণ বসে আছে, গরু চরছে, মানুষ লড়ছে, সবগুলোই কিন্তু চক্ষুহীন; একটাতেও চোখ দেয়নি চিত্রকর, শুধু রূপ—দেওয়ালের গায়ে ছায়া পড়লে যা দেখায় তাই (SPEARING, *The Childhood of Art*, P. 114. Fig.74)। আর এক প্রস্থ ছবি চোখের সঙ্গে মন জুড়ে দেখার নমুনা— হরিণ চেয়ে আছে সামনের বনের দিকে, হরিণ হরিণীর সঙ্গে যাচ্ছে আর ফিরে ফিরে দেখছে,—এই দুই ছবিতে চোখ এঁকেছে যত্নে মানুষ, শুধু হরিণের ছায়াচিত্র নয় তার রূপ এবং ভাব এক হয়ে পুরো ছবি হয়েছে তখন (*The Childhood of Art*, Pp. 104-108, Figs. 65 and 70.)।

অনেকে দেখি শুনতে বেশ পায় অথচ সুর বিষয়ে একেবারে বধির; তেমনি রূপ দেখছে অথচ রূপ দেখছে না এমন লোক বিস্তর। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দুয়ের সমস্যা শাস্ত্রকার যেভাবে মীমাংসা করেছেন তার জটিলতার মধ্যে যাবার সাধ্য নেই।

শিল্পের দিক দিয়ে এর একটা মীমাংসা উপস্থিত হবার চেষ্টা হয়েছিল আমরা দেখতে পাই, সেটা থেকে ব্যাপারটা হয়তো আমরা সহজে বুঝব। চীন দেশে 'তাওইষ্ট' সাধক— শিল্পের দিক দিয়ে অপ্রত্যক্ষ সাধনার

অনেকগুলো উপায় এঁদের ছবি থেকে পাই। তাঁদের প্রধান কথা হল এই যে, পটের ধৌত অংশ (সাদা জমি) এবং লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত অংশের যথাযথ হিসেবের উপরে ছবির ভাবের বিস্তৃতি নির্ভর করছে; তাঁরা বলেন যে, ঘর সাজানোর বেলায় নানারূপ জিনিস দিয়ে ঘর ভর্তি করা মানে ঘরের প্রসার ও সঙ্গে সঙ্গে মনের এবং দৃষ্টির প্রসার নষ্ট করা। এই হল তাঁদের মত এবং এইভাবে অপ্রত্যক্ষের স্বাদ শিল্পকাজে পৌঁছে দেবার উপদেশ তাঁরা দেন।

আমাদের দেশের শিল্পসাধক এর উল্টো দিক দিয়ে রূপের বিস্তারের পথ নির্দেশ করলেন—"দাক্ষিণাত্যের মন্দির ধারণাতীত সংখ্যাতীত রূপে ভরে উঠে একটা বিরাট বিপুলতা এবং অনির্দিষ্টতায় গিয়ে মিলল, লক্ষ্য হারাল গিয়ে দুর্লক্ষ্যতার মধ্যে, রূপ থেকেও রইল না!" চীনের ছবিতে ছবিতে যেটি সাদা অংশ সেটি রূপ না থেকেও রূপে ভর্তি হল, আমাদের মন্দিরের চূড়া সেটি রূপ থেকেও রূপ না থাকা দিয়ে পরিপূর্ণ হল।

জয়পুরী আঁকা ছবি সেখানে কড়া রঙের তলায় কড়া রেখা তলিয়ে দিয়ে শিল্পী অপ্রত্যক্ষের সমস্যা মিটিয়েছে।

মোগল আমলের আঁকা ছবি কোমল থেকে অতিকোমল রেখাকে প্রায় দুর্নিরীক্ষ্যতার কাছাকাছি টেনে নিয়ে তার উপরে রঙিন ওড়নার আড়াল টেনে এই সমস্যা মিটিয়েছে।

আফ্রিকার শিল্প সেখানে রেখার রঙের সরল টান অদ্ভুত কৌশলে কাটা, সমস্ত রূপের দুনির্দিষ্টতা অরূপের দিকেও যায় না, সেখানে শুধু রূপ আর রূপ, কিন্তু সেখানেও চোখের দেখাকে অতিক্রম করছেন শিল্পী ভীমকান্ত কল্পনার পথ ধরে।

পাহাড়ের ঘরে বসে থাকততম, সামনের খোলা জানালায় দুটি পাহাড় একখানি আকাশপটে ধরা ছবির মতো ধরা থাকতো, কিন্তু সেইটুকু পলে পলে নতুন রূপ নতুন ভাবে ভরে উঠতে দেখতেম। পাহাড় পথে চলতেম, দেখতেম—এক স্থানে পথ শেষ হয়েছে অপার রূপের কূলে, এক স্থানে থেমেছে মন-ভোলানো কুয়াশায় ঢাকা শূন্যের পাশে, এক স্থানে বা পথ আপনাকে হারিয়েছে গভীর অরণ্যে আলো-ছায়ায় নিবিড় রহস্যের অন্তরালে। ঝরনা রূপ ধরে কোথাও এসে পড়ত কাছে, ঝরনা রূপ হারিয়ে কোথাও শোনাত সুরটুকু —এইভাবে গেছে দিনরাত হৃদয় এবং দৃষ্টি দুজনে মিলে একদিনও একথা ভাবতে পারেনি যে রূপ নেই, রহস্য নেই, অরূপ আছে; দিনরাতের মধ্যে রূপ ও রহস্য এরা হরগৌরী যুগলমূর্তির মতো বিরাজ কচ্ছে—এই কথাই বলেছে বারবার। আনন্দে পূর্ণ পাত্র পেয়ে চোখ এবং মন কবির ভাষায় বলেছে, ছবির ভাষায় বলেছে—

"আমার নয়ন ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন ভুলানো এলে!

আলোছায়ার আঁচলখানি

লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করব হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ।
দু হাত দিয়ে ফেল ঠেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে!

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে।
শুনি গভীর শঙ্খ ধ্বনি,
আকাশ বীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে
নয়ন-ভুলানো এলে!"
—রবীন্দ্রনাথ

পর্বতের পাষাণের কামনা পাষাণ-গলানো রূপের ঝরনা হয়ে রইল—সে এক রূপ সে এক ভাব সে এক সুর দিলে, মরুভূমির বুক জুড়িয়ে ঝরনা নদীরূপে বইল—সে আর এক রূপ আর এক ভাব আর এক সুর দিলে। নদী সমুদ্র হয়ে কূল হারাল, নীল ছন্দে দুলতে থাকল—সে এক,—সমুদ্র ঘন মেঘের দিক-ভোলানো রূপ ধরে নীল পর্বতের কোলে এসে লুকোলে বৃষ্টি জলের ঝরনা বইয়ে,—সে অন্য। এই এক থেকে অন্যে, অন্য থেকে আর একে—এদেরই ধরে ধরে মন-ভোলানো পাষাণ-গলানো কামনাসূত্রে গেঁথে গেঁথে রচনা করলেন যিনি রূপদক্ষ তিনি অদৃষ্টপূর্ব মনোরম রূপের মালাগাছি।

টীকা

১. ১/১ কুমারসম্ভবম্ (কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ)

রূপবিদ্যা

অরুচি নেই! এতকাল ধরে মানুষ বিশ্বের সৌন্দর্য রূপ ভাব সমস্তই উপভোগ করছে কিন্তু কই অরুচি তো নেই দেখায় শোনায়! তাছাড়া আর এক রহস্য এই—মানুষ যা দেখলে শুনলে শুধু তাই পেয়ে সে চুপ করে বসেও নেই, নিজে দেখাতে শোনাতে চলেছে অক্লান্তভাবে যুগ যুগ ধরে। সে ছবি লেখে মূর্তি গড়ে গান গায় কথা বলে— চোখ-জুড়ানো মন-ভোলানো কত সৃষ্টি! বনের কোলেই প্রথম মানুষ ফুলের সঙ্গে পাতার সঙ্গে পশু-পক্ষী, জল-বাতাস এদের সঙ্গে রূপের মধ্যে সুরের মধ্যে ডুবে থাকল, কিন্তু শুধু দেখেই সে তৃপ্ত হল না, শুনে শুনেও সে বললে না যে যথেষ্ট হল! মানুষ তখন ঘর বাঁধতে শেখেনি, গুহায় থাকে, বনে ঘোরে, জীবন্ত হরিণ খেলে বেড়ায় চোখের সামনে, দিনের পর দিন পাখি গেয়ে চলে, ফুল ফোটে পাতা খোলে পাতা ঝরে—অশেষ ছবি অশেষ সুর। তাই দেখে মানুষ গাছের ছবি লেখে, ফুল লেখে, পাতা লেখে, হরিণের ছায়ামূর্তি লেখে—ঘরের দেওয়াল ভর্তি করে লেখে। ময়ূর নাচে কোকিল ডাকে কিন্তু মানুষ ঐটুকু দেখেই খুশি হয়ে নকল নিতে বসে না—সে নিজের নাচ নিজের সাড়া খুঁজে খুঁজে বার করে। তার নাচ ময়ূরের নাচের তার সাড়া কোকিলের সাড়ার প্রতিধ্বনি করে না, নতুন সুরে নতুন ছন্দে প্রকাশ পায়। ক্রমে বিশ্বের রূপ সমস্তকে বিরাট ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে মানুষ চালাতে চলে, স্বর সমস্তকে নিয়ে খেলতে খেলতে সুরের সৃজন করতে থাকে, চরাচরের চলাচল নাট্যরূপে নতুন করে দেখিয়ে যায় সে, চোখ-জুড়ানো মন-ভোলানো ষড়্‌ঋতুর সৌন্দর্য ছবিতে মুর্তিতে নাচে গানে ধরে রেখে যায়। মানুষ কোন আদি যুগ থেকে এই খেলা খেলছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, আজও তার খেলা বন্ধ হল না—এ কি রহস্য এ কেমন খেলা! মানুষ কোন কালে ছবি লিখে লিখে খেলতে শুরু করেছে—আজও সেই সেই খেলাই চলল; মানুষের এ খেলায় অরুচি হল না কেন? সুরের যত রকম খেলা হতে পারে মানুষ তা খেললে, নাচের ভঙ্গি কথার ছন্দ রঙ রেখার ছন্দ সব নিয়ে খেললে মানুষ; কিন্তু সে খেলেই চলল, থামল না। শুধু এই নয়, মানুষ নিজের এক কালের খেলার সব খেলেও আবার সেই খেলার রস পেতে চলল—নতুন নতুন উপায়ে নয়, সেইসব পুরোনো উপায়েই। সেই বাঁশি আজকে বাজছে নতুন সুরে, সেই তুলি আজ লিখছে নতুন কথা, সেই লোহার তার—তারি সুর বাজছে কিন্তু আজকের সুরে। আদি যুগের মানুষ তার হরিণ যেমন করে আঁকতে হয় তা এঁকে গেল, কিন্তু আজকের মানুষ তেমনিভাবেই হরিণ গাছ আরো কত কি নিয়ে নিজের খেলা খেলতে লাগল! কালোয়ত যেমন গাইতে হয় গেয়ে গেল, নট-নটী তারা যেমন করে নাচতে হয় নেচে গেল, কিন্তু 'ও সব হয়ে গেছে এখন স্থির হয়ে বসে থাক মৌনী বাবা হয়ে', কিংবা 'আগের যা তাই পুনরাবৃত্তি করা যাক'—এ তো বললে না মানুষ। হঠাৎ মনে হয় এই যে ছবি মৃতি কবিতা গান নাট্য নৃত্য এসব মানুষের ছেলেমানুষির মতো, মানুষের একটা নেশার মতো। কোনো কোনো পণ্ডিত তাবৎ রূপবিদ্যা এই ছেলেখেলার ভিতে দাঁড় করিয়ে আর্টকে দেখতে চলেছেন এবং একদল মানুষও এদেশে আজকাল দেখি যাঁরা নেশা এবং খেলার কোঠায় রূপবিদ্যাকে ফেলে এসব থেকে মানুষকে নিরস্ত

করতে চাচ্ছেন। ছবি লেখার বিষয়ে একদিন মুসলমান ধর্মে কঠিন শাসন ছিল, মানুষ-লেখার বিরুদ্ধে আমাদের শাস্ত্র শুধু নয় দলে দলে মানুষের নিজের মনেও একটা বিষম ভয় এক-এক সময়ে উদিত হয়েছিল। রূপ-বৈরাগ্য রস-বৈরাগ্য এরও প্রমাণ যুগে যুগে দিয়েছে মানুষের ইতিহাস, কিন্তু রূপবিদ্যাকে তো মানুষ ছাড়তে পারলে না এ পর্যন্ত। যদি এসব সত্যিই ছেলেখেলা হত তবে লোকের ধমকানির চোটে নয়তো আপনা হতেই এসব খেলা কোন কালে বন্ধ হত! ছেলেখেলায় ছেলের অরুচি হয়—সে আজ খেলে ফুটবল, কাল খেলে হাডু-ডু-ডু; বয়স হলে দেখি অনেক ছেলে খেলতেই চায় না, এমনকি ফুটবল খেলতেও তার অরুচি হয়, কিন্তু কতক ছেলে সত্যি ফুটবল খেলছে তো বটে! ছেলে শেলেটে ছবি লেখে, মাস্টারের তাড়ায় আঁকা বন্ধ করে আঁক কষতে লেগে যায় এবং অঙ্কবিদ্যায় পণ্ডিত হয়ে যায়—তখন আঁকাকে ছেলেখেলা বলেই ভাবে সে। এই যে সমস্ত রূপ নিয়ে ব্যাপার এ যে খেলা নয়, লীলা মানুষের—এ বললেও তখন সে চটে ওঠে। এই দুই রকমের ঘটনা যে মানুষে নেই তা বলিনে কিন্তু মানুষের লীলার ইতিহাস যুগে যুগে সাক্ষ্য দিচ্ছে—মানুষ প্রথম থেকেই এই রূপবিদ্যাকে তার লীলার সহচরী বলেই গ্রহণ করেছে এবং এখনো এইভাবেই একে দেখছে। "গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ" একথা রূপসীর বেলায় যেমন, তেমনি রূপবিদ্যার বেলাতেও বলা চলে।

রূপবিদ্যাকে যারা শখের দিক দিয়ে দেখতে চলে তারা নেশা ছুটলে অন্য কিছুতে লেগে যায়, কিন্তু রূপবিদ্যা যার কাছে সত্য হয়ে উঠল, সে-ই বললে এ খেলা নয়, এ লীলা—

"এ তো খেলা নয়
এ যে হৃদয়-দহন জ্বালা।"

—রবীন্দ্রনাথ

অন্তহীন রসের জন্য অফুরন্ত রূপের জন্য জ্বালা আর তৃষ্ণার শেষ নেই মানুষের, সমস্ত রূপ-রচনা এরি সাক্ষ্য দিয়ে চলল। রূপের জ্বালা রসের জ্বালা বহ্নির সমান জ্বলেছে সব উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে, রূপদক্ষের জীবন লীলাময় জ্বালাময় হয়ে উঠছে, প্রদীপ্ত সমস্ত রূপ ও রসের তপস্যায় মানুষ জীবনপাত করছে রূপবিদ্যার সাহায্যে এই জ্বালাকে এই তৃষ্ণাকে রূপের পাত্রে ধরতে; মানুষের এই তপশ্চরণ তাকে শখের ব্যাপার বলে যারা ভাবে তারা রূপবিদ্যাকে কি ছোট করেই না দেখে! বৈদূর্যমণি নিজের অন্তরের জ্বালা নিয়ে বাইরের বিরাট আলোক-রূপকে স্পর্শ করে দীপ্তি দিয়ে চলল, মানুষের প্রতিভা তেমনি গিয়ে মিলল বিশ্বের দিকে দিকে ধরা ভাস্বর সমস্ত রূপের ও রসের সঙ্গে,—এই ঘটনা নিয়ে রূপবিদ্যার সূত্রপাত; প্রতিভাবানের লীলা তারি সাক্ষী রূপ-রচনা সমস্ত, রূপ নিয়ে ছেলেখেলা নয়, প্রাণের জ্বালা নিয়ে রূপের জ্বালাকে গিয়ে স্পর্শ করা,—রূপের সঙ্গে চোখ-ফোটাকুটি খেলা একেবারেই নয়।

খেলার নেশা ছুটলে খেলা থেমে যায়—কিন্তু লীলার অবসান নেই; লীলা করে চলায় অবসাদ নেই, আজীবন রূপদক্ষ মানুষের কাছে লীলাময়ী মায়াময়ী বিশ্বরূপিণী। তিনি আসছেন যাচ্ছেন অনন্ত লীলা দেখিয়ে, তারি ছন্দ ধরছে মানুষ রূপবিদ্যা দিয়ে নিজের রচনায়, সে নিজের ও বিশ্বের লীলার পরিচয় ধরছে যুগ যুগ ধরে প্রতিভার প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি হচ্ছে অফুরন্ত রূপরসের দেবতার। মানুষ জগতের প্রাণী মাত্রের সঙ্গে সমানভাবে প্রাণবন্ত অথচ শক্তি নিয়ে প্রতিভা নিয়ে সবার বড় হল সে। রূপ-রচনা ধরে মানুষের প্রতিভা প্রকাশ করলে আপনাকে।

রূপবিদ্যা একে তো, একদিন কোনো এক মানুষ আবিষ্কার করেনি, কালে কালে রূপদক্ষ এবং প্রতিভাবান সমস্ত এসে এই বিদ্যার এক এক সত্য ও তথ্য আবিষ্কার করে গেলেন, মানুষের রূপজ্ঞান ধীরে ধীরে বিকাশ পেতে পেতে ক্রমে রূপবিদ্যার সকল দিক পরিপূর্ণ করতে থাকল। মানুষ যখন পাথরে-পাথরে কাঠে-কাঠে ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালাতে শিখছে মাত্র এবং তারও পূর্বে যে সেখানেও দেখি মানুষ রূপ লিখছে—গুহার দেওয়ালে রূপবিদ্যার প্রথম পাঠ নিচ্ছে যেন; রূপের নকল রূপের ধারণা নামতা তার মুখস্থ এবং কাপিবুক লেখার মতো করে চলেছে তখন থেকে মানুষ। যে প্রতিভা নিয়ে মানুষ আগুন জ্বাললে শুকনো পাতার রাশিতে সেই প্রতিভা নিয়েই মানুষ জ্বাললে রঙের আগুন, যে প্রতিভা নিয়ে মানুষ লিখলে প্রথম অক্ষর সেই প্রতিভা নিয়েই মানুষ টানলে প্রথম টান ছবিতে প্রথম টান সুরে প্রথম টান তার বাঁকা ধনুকে। রূপবিদ্যা এইভাবে আশৈশব মানুষের সহচারিণী হয়ে প্রতিভাবানের ঘর আলো করে মানবজাতির কল্যাণে নিযুক্ত রইল।

সঙ্গীত নাট্য নৃত্য ছবি কবিতা নানা-বিভূষণ শিল্প এ সমস্তই প্রতিভা থেকে উৎপন্ন— এসবই একই রূপবিদ্যার অন্তর্গত বলে ধরা যায়, কেননা এরা সকলেই নানা ভাবের রূপই দিচ্ছে, নানা উপাদান নিয়ে প্রতিভাবান রূপ সৃষ্টি করছে। এইসব রচনা মানুষের কি কাজে এসেছে এ পর্যন্ত এবং এখনো এসবের দরকার আছে কি না মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে, এ নিয়ে সত্যই তর্ক ওঠে মানুষের মনে। শুধু এই নয়, রূপকর্ম সমস্ত নিয়ে নাড়াচাড়া করলে একদল মানুষ আছে যারা সত্যি ভয় পায় পাছে মানবসমাজ ও সেই সঙ্গে কচি-কচি মানবকগুলিও সুপথভ্রষ্ট হয়! এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; রূপবিদ্যার সাধনাপথে চলতে অনেক সময়ে অনেক মানুষ অনেক ছেলে বিগড়েছে—যেমন ধর্মসাধনের পথে চলতে গিয়ে মানুষ বকা-ধার্মিক হয়ে উঠেছে; সেই ভাবের বকা দেখা দিয়েছে রূপবিদ্যা-সাধকের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু ধর্মের পথ রুদ্ধ করলে কে, রূপের পথই বা রুদ্ধ করলে কোথায়? এসব তর্ক-বিতর্ক নতুন নয়। অতি পুরাকালেও এইসব তর্ক উঠে চুকেছে, প্রতিভাবান রূপদক্ষকে জাদুকর ডাইন ইত্যাদি বলে পুড়িয়ে মেরেছে মানুষ, তারও কথা ইতিহাস খুঁজলে পাই। কিন্তু এততেও রূপের আকর্ষণ মানুষের প্রতিভাকে কম্পাসের কাঁটার মতো টানছে তো টানছেই। মানুষের প্রতিভাকে রূপকর্মের পথে আকর্ষণ করে চলেছে যেসব রূপ তাদের বিরাট শক্তিতে বাধা দেয় এমন দৈত্যের দল সৃষ্টি হয়নি হবে না কোনো কালে।

প্রতিভা মানুষের চিরকালই আছে, রূপকর্ম সমস্ত ধরে চিরকাল থাকবেও; তর্ক করে তাকে ঠেকানো যায়নি যাবেও না। প্রতিভাবানের উপর নির্যাতন যারা করলে পুরাকালে তারা বিলুপ্তির তলায় চলে গেল, কিন্তু নির্যাতিতের প্রতিভা দিয়ে রচিত অতৈলপুর-প্রদীপ রূপলোকে একটা-একটা ধ্রুবতারার মতো জ্বলে বইল যুগ যুগ ধরে আলো দিয়ে সৌন্দর্য দিয়ে।

মানুষ নিজেকে নিজে আবিষ্কার করতে পারে না, নিজেকে অপরের নিকটে প্রকাশ করতে পারে না, চোখে-দেখা রূপ, কানে-শোনা রূপ, মনে-ভাবা রূপ সমস্তই—তার কাছে অর্থহীন যার কাছে রূপবিদ্যা নেই। প্রতিভাবানের রচনা সমস্ত অর্থহীন বলে যারা উড়িয়ে দিতে চলে, জগতে কোনো কিছুর অর্থ কোনো কালে তাদের কাছে আবিষ্কৃত হবে এ তো বিশ্বাস করা যায় না।

বিশ্বজোড়া এই যে সমস্ত রূপ, প্রতিভার আলোয় এদের স্বরূপ যুগে যুগে আবিষ্কৃত হতে থাকে, তবেই তো মানুষ বিশ্বের দেবতাকে দেখলে জ্বাজ্জ্বল্যমান এই সৃষ্টির ভিতরে। জীবনের অর্থই অনাবিষ্কৃত থাকতো যদি না রূপদক্ষ মানুষের প্রতিভা জীবন্তরূপ সমস্তকে স্পর্শ করতো। অনাবিষ্কৃত যা তা প্রতিভার আলোকে আবিষ্কৃত

হল—নিউটনের আবিষ্কার যেমন। তেমনি রূপের জগতে প্রতিভাবান এল এবং ধরে গেল নানা সত্য। প্রতিভা রূপের জগতে যে সমস্ত অঘটন ব্যাপার ঘটিয়েছে তার মধ্যে কত দৃষ্টান্ত দেব? একটা ঘটনা যা ঘটেছে রূপজগতে তার কথা বলি। রূপের জগতে বসে মানুষ পাখি আঁকে—যুগের পর যুগ যায়—কল্পনার পাখি, গাছের পাখি, ডালের পাখি রঙে রেখায় ধরে রূপ বিষয়ে ধীমান মানুষ। বসা পাখি হয়, ভাসা পাখি হয়, ঘুমন্ত পাখি হয়, চলন্ত পাখি হয় না, দূর আকাশের উড়ন্ত পাখি হয় না। ধীমানের হাতের রেখা হার মানে রং হার মানে যুগে যুগে এই পাখিকে ছবিতে ধরতে। ডান-মেলানো পাখি হয়, কিন্তু নীল পটে সে স্থির নিশ্চল—যেন লাগিয়ে দেওয়া ভাবে থাকে। হঠাৎ কোনো দেশে একদিন একজন প্রতিভাবান এল,—হয়তো ছিল সে নিউটনের মতোই বালক মাত্র, হয়তো বা ছিল সুলেমান বাদশার মতো প্রকাণ্ড শক্তিমান—উড়ন্ত পাখিকে তুলির একটি টানে ছবির আকাশে উড়িয়ে দিয়ে গেল সে। যেমন আলোর কম্পন বিজ্ঞানজগতে, রূপের জগতে, এই উড়ন্ত পাখির ডানার ওঠা-পড়া বুঝিয়ে জীবন্ত রেখার একটু কম্পন একটা মস্ত আবিষ্কার, —রেখা প্রাণ পেলে।

রত্নাকরের মুখে দুটি ছত্র শ্লোক প্রতিভার প্রভায় যেদিন ঝলমল করে উঠল, সাহিত্যে ও কাব্যজগতে সে একটা মহাদিন, ভাষা নতুন ডানা মেললে আলোর ছন্দে। সঙ্গীতকার তাঁরা চটবেন—যদি বলি গানের সাত সুর দেবতার কাছ থেকে না এসে মানুষের প্রতিভার কাছ থেকে পাওয়া; কিন্তু মানুষের ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে তিন পাঁচ এবং পরে সাত যুগ ধরে একটির পর একটি প্রতিভার আলো এসে ধ্বনিকে বাতাসের ফাঁদে ধরেছে তবে পেয়েছি আমরা সঙ্গীতবিদ্যাকে পূর্ণভাবে।

সহজ কথা কিন্তু টীকাকারের বোঝানোর চোটে শক্ত হয়ে উঠল, এটা তো সংস্কৃত টীকসুদ্ধ একটা বই পড়লেই বোঝা যায়। প্রতিভাবান কবি একছুত্রে সহজে বললেন কিছু, ধীশক্তিমান সেটাকে এতখানি করে পেঁচিয়ে বলে গেলেন। প্রতিভার বিশেষণ হল যেমন 'সর্বতোমুখী' তেমনি ধীশক্তির বেলাতেও নানা বিশেষণ এল 'সূচ্যগ্র' 'সুতীক্ষ' প্রভৃতি। বালকের প্রতিভা আর বয়স্কের প্রতিভা দুয়ের ভিন্নতা কেমন তা বোঝাতে হলে প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রতিভা জ্বলছে সূচ্যগ্র পলতেটি থেকে আসছে যে বুদ্ধি বা ধী তা নিয়ে; স্বল্পতৈলের প্রদীপ আর অনেক তৈলের প্রদীপ, অপরিকৃত তৈলের আলো আর সুপরিষ্কৃত তৈলের আলো। নানা দরের আলো নিয়ে যুগে যুগে মানুষের ঘরে জ্বলল প্রতিভা এবং তারি খবর নানা রূপরচনায় এবং লীলায় ধরা রইল। যুগে যুগে মানুষের উৎকর্ষের ইতিহাস এই প্রতিভা ও ধীশক্তির ক্রিয়ার ইতিহাস। প্রতিভার আলো ধরে কোন দেশের মানুষ কোন দিকে কতটা এগোল তার হিসেব রূপবিদ্যা দখল না হলে তো ঠিক ধরা মুশকিল। কলাবিদ্যার চর্চার আনন্দই যেখানে সেখানে প্রতিভার আলোয় দেখছি মানুষের অন্তর্জগৎ-বহির্জগৎ দুই নতুন নতুন দিকে বিস্তৃতি পাচ্ছে, কর্মজগৎ ও ধর্মজগৎ রসের দ্বারায় আপ্লুত হচ্ছে, শ্রান্তিহারা নব রসের ধারা বর্ষিত হচ্ছে চিত্তক্ষেত্রে মানুষের।

রূপবিদ্যার চর্চা তো তুচ্ছ করবার মতো নয়। এ সেই আদি যুগ থেকে মানুষের সহচর, এর ব্যাপার সমস্ত যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষের অন্তরে বাহিরে যা ব্যাপার ঘটছে তার পথ দেখায় অভ্রান্ত পরিষ্কারভাবে।

আলোর কম্পন ইথরের সাড়া প্রভৃতি ব্যাপার কোন কালে কোন মানুষের মধ্যে কোন দেশে কোন বছরের কোন মাসের কোন তারিখে প্রথম ধরা পড়ল এটা জানা যেমন দরকারী ঠিক ততখানি দরকারী রূপবিদ্যার চর্চা করতে করতে খুঁজে-পাওয়া কোনো একটা রূপসৃষ্টির আদ্যন্ত ইতিহাস। রেখার নানা কম্পনকে কিভাবে

মানুষের প্রতিভা একটা পর একটা আবিষ্কার করে গেল তার কথা সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়লে একটা বিস্ময়কর ইতিহাস খুলে যাবে আমাদের কাছে। শুধু ছবি মূর্তির দিক দিয়ে রূপবিদ্যার চর্চা, তার মধ্যেও এত অদ্ভুত রসহ্য মানুষের ইতিহাসে রয়েছে যে বলবার নয়।

টেলিগ্রাফের বিনা তারের খবরের ব্যাপার যে কিভাবে সারা পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে চলল দেশের পর দেশ সাগরের পর সাগর অতিক্রম করে তার ইতিহাস যেমন বিচিত্র তেমনই অদ্ভুত। এমনি একটা নয় অনেকগুলো কাণ্ড রূপজগতে ঘটে গেছে।

দাঁড়ি আর কষি এই নিয়ে এতটুকু স্বস্তিক চিহ্নটি কালচক্রের সঙ্গে সঙ্গে এক ধর্ম এক সভ্যতা এমনি এক-এক দেশের সংস্পর্শে কিভাবে এল নানা দিক দিয়ে তা জেনে নিতে হলে পৃথিবী ব্যেপে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে হয়; একটি শঙ্খলতা এই বাঙলার রূপবিদ্যার ইতিহাসের একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে রেখেছে। প্রাচীনকালের গ্রিক স্পাইরাল প্যাঁচ আর বাংলায় ব্রতচারিণীদের শঙ্খলতা একই, কিন্তু এদের উৎপত্তি এক সময়ে নয়, এক সভ্যতা থেকে নয়, দুই বিভিন্ন দেশ দুই বিভিন্ন কালে একে ফুটিয়ে গেল—এ কেন হল কেমন করে হল, জানতে হলে যুগ-যুগান্তরের মধ্য দিয়ে চলে যেতে হয় কত দেশের কত শিল্পের আচারের ব্যবহারের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তার ঠিক নেই।

রূপবিদ্যার দিক দিয়ে যুগ-যুগান্তরের মানবজাতির কর্মকাণ্ডের ইতিহাস ও রহস্য প্রত্যক্ষগগাচর হয় যেমন, এমন কোনো দিক দিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। কেননা রূপ প্রথম থেকে মানুষের সব কর্মকে নিরূপিত করে ধরে গেল শুধু এই নয়, রূপের মধ্যে মানুষের অন্তর-বাহির দুয়ের হাব-ভাব সমস্তই অভ্রান্তভাবে আটকা পড়ল। মানুষ যখন প্রথম আরম্ভ করলে মানুষের মুখ আঁকতে—ইতিহাসের ঠিক ঠিকানার বাইরের যুগের সেকথা—সে সময়ের অনেকগুলো ছবি অল্পদিন হল ইউরোপ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও আবিষ্কৃত হয়েছে। এর প্রত্যেক ছবি দেখাচ্ছে মানুষকে মানুষ এঁকেছে হয় একেবারে সামনে থেকে, নয় তো পিছন থেকে,—দু-এক জায়গায় দেখি মানুষের দেহটি আঁকা একপাশ থেকে কিন্তু মুখের বেলায় সামনের বা পিছনের গোলাকৃতি ছাড়া পাশের মুখ আঁকা সাধ্য হচ্ছে না। জন্তু-জানোয়ার আঁকার বেলায় তখনকার মানুষ কিন্তু দেখি সম্পূর্ণ পাশ থেকেই আঁকছে তাদের। কত যুগ-যুগান্তর গেল, এইভাবে আঁকতে আঁকতে, তারপর ঈজিপ্টের সভ্যতার সূত্রপাত হল, সেইখানে প্রথম দেখি মানুষ মানুষকে আঁকছে একেবারে পাশ থেকে। এখন সহজে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক আর ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে পাশের মুখ আঁকার হিসেব সম্বন্ধে মানুষের প্রতিভা ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু তা নয়; সেই ইতিহাসের যুগের পূর্বেকার মানুষের মধ্যে একজন প্রতিভাবান এল সে অভ্রান্তভাবে গুটিকতক রেখায় লিখে গেল পাশ থেকে দেখে একটি মানুষের মুখ (Spearing, *The Childhood of Art*, P.74, Fig. 76)। এই কাণ্ড ঘটল Aurignacian যুগে স্পেন দেশের গুহাবাসী মানুষের মধ্যে! এর পরের একটা যুগ সে সময় দেখি ঐসব মূর্তি গড়তে শুরু করেছে ছবি আঁকা রেখে। এই যুগকে Solutrian নাম দেওয়া হয়েছে। সেখানেও দেখি প্রতিভা কাজ করছে, থেকে থেকে মূর্তি-শিল্পকে উৎকর্ষ দিচ্ছে (Spearing, *The Childhood of Art*, P.74, Fig. 12)। তার পর এল Magdalenian যুগ। সেখানে আর একজন প্রতিভাবানের দেখা পাই। সে শুধু একটা দুটো কি দশটা হরিণ পটে নিয়ে বোঝাতে চলছে না হরিণের দঙ্গল ও পাল, সে গতিমান রেখা দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে হরিণের পাল চলেছে এইটে বুঝিয়ে দিচ্ছে (Spearing, *The Childhood of Art*, P 123, Fig. 76)।

এমনি কত শত দিক দিয়ে কত প্রতিভা রূপ দিয়ে চিহ্নিত করল এক একটা যুগ-পরিবর্তন, তার বিচিত্র ইতিহাস রূপবিদ্যার দ্বারা অধিকার করা ছাড়া তো উপায় নাই!

আমরা দেখতে পাই স্পেন দেশের গুহাবাসী যে কালে মানুষের সম্মুখ দৃশ্যই এঁকে চলেছে, ঠিক সেই কালেই অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলবাসী (ব্যুসমেন) তারা আঁকছে তাদের প্রত্যেক মানুষ একেবারে পাশ থেকে, এবং এই যুগের পর কত যুগ কত সভ্যতা এল গেল তার ঠিক-ঠিকানা নেই, তারপর মানুষ না-পাশে না-সামনে এইভাবে আধ-ফেরা অবস্থায় আঁকতে শিখে নিলে কোনো এক দেশের প্রতিভাবানের কাছ থেকে। অজন্তার ভিত্তিচিত্রণের মধ্যে এই ভাবের আধ-ফেরা মূর্তি সমস্ত পাই। সেখান থেকে আরম্ভ করে কত যুগ ধরে চলতে চলতে কোনো দেশে কোনো কালে দেখি একজন প্রতিভাবান এইভাবে আঁকার সূত্রপাত করলেন।

সুলেমান বাদশার একটা কবচ ছিল সেটা ধারণ করলে পৃথিবীর গোপন রসহ্য সমস্তই অবগত হতে পারতেন তিনি। এই রূপবিদ্যা সেই কাজই করে মানুষের সমস্ত গোপন রহস্য ধরে দিতে আজকের দিনের আমাদের সামনে। ইউরোপ অক্লান্তভাবে এই রূপবিদ্যার চর্চা করে চলল, তাদের সামনে দিনের পর দিন রূপের সমস্ত রহস্য ধরা পড়তে থাকল, আমরা রূপবিদ্যাকে চাই না, কাজেই পাইও না এসব খবর, যতক্ষণ না ওদের কাছ থেকে খবরটা কাগজে ছাপা হয়ে আসে।

আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইনি এমন কিছু নেই বললেও চলে—কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত নাট্য বাদ্য নৃত্য চিত্র মূর্তি সবই। এত বড় ঐশ্বর্য কোনো দেশের মানুষ তার সন্তানের জন্যে রেখে গেল না। কিন্তু আমরা জানিনে যে এই সম্পদ এর কতখানি আমাদের প্রতিভাবানদের স্বোপার্জিত, কতখানি বা দেশ-দেশান্তর থেকে জয় করে সংগ্রহ করে ধার এমনকি চেয়ে আনা তাও!

একটা ছোটখাটো দৃষ্টান্ত দিই। সঙ্গীত নিয়ে আজকাল খুবই চর্চা চলেছে, কিন্তু খুব ভাল ওস্তাদ তাকে বল, ইমন কল্যাণের সঠিক বিবরণ দাও, বড় জোর শুনবে, একটা যানিক ও একটা হিন্দু দুটো সুরে মিলে একটা হয়েছে ব্যাপার, কিন্তু এও শুনবে হয়তো যে আমীর খশরু কি আর কেউ এটার আবিষ্কর্তা। তারপর যদি প্রশ্ন করো, কল্যাণ কোথা থেকে এল, শুনবে মহাদেবের কাছ থেকে, নয়তো নারদের কাছ থেকে বা ভরত মুনির কাছ থেকে। এ ভাবের চর্চাকে রূপবিদ্যার দিক দিয়ে চর্চা বলে না। কল্যাণ সুর কি ইমন সুর এদের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে মানুষের কিভাবে কোথায় কোথায় পরিচয় তা জানতে সাত বারের বেশি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে হবে, রূপবিদ্যার প্রদর্শিত পথ ধরে কত মানুষ কত সভ্যতা অসভ্যতার কোঠায় কোঠায় সন্ধান করতে হবে, তবে পাওয়া যাবে সঠিক খবর ইমন কল্যাণের।

মনে হয় শুনলে, এইভাবে সব জিনিসের চর্চা করে চলা শক্ত ব্যাপার। কিন্তু ইউরোপের মানুষ—তারা তো চলেছে এইভাবে, তারা তো মাটির তলা থেকে পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্বের এক-একখানি পাতা এক-এক অধ্যায় উঠিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ করছে পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তার রূপের নানা পরিবর্তনের ইতিহাস—উপন্যাসের মতোই বা মনোহর, রূপকথার মতোই যা অদ্ভুত।

রূপবিদ্যা মানুষকে বিষয়টির সত্যে পৌঁছে দিতে চায়। যার কাছে রেখার সত্য রঙের সত্য সুরের সত্য ছন্দের সত্য ধরা রইল না, সে ছবিই বা জানবে কি, গানই বা গাইবে কি, কবিতাই বা লিখবে কি এবং এদের ইতিহাসই বা বুঝবে কি! একটা সোজা কষির মধ্যে প্রাণ কি অনিমেষভাবে জ্বলছে, একটা তরঙ্গিত রেখার প্রাণশক্তি কি উচ্ছাস নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, আর-একটা দপ্তরীর টানা রেখায় প্রাণ কিভাবে নিষ্পেষিত হয়ে গেছে,

— রূপবিদ্যার সাহায্য ছাড়া এ কেমন করে জানা হবে! সুরের অভিমতে সমস্ত কি রূপ ধরছে, ছন্দের দোলা সব কেমন ভঙ্গি ধরে ধরে নৃত্য করে চলেছে রূপবিদ্যা দখল না হলে কে তা বুঝবে!

বাতাস ঝড়ের উন্মাদ রূপ ধরে আসে, বাতাস বসন্তের ছন্দ ধরে বয়, বাতাস শীতের শিহরণ দিয়ে দিয়ে চলে, জলে স্থলে আকাশে তার রূপ নিরূপিত হয়ে যায়, মেঘের বিস্তারে ফুলের ছন্দে জলের কম্পনে ধরা থাকে তার কথা সুর রূপ ভাব ভঙ্গি সমস্তই— রূপবিদ্যার জ্ঞান যার নেই সে দেখে সব শোনে সব অবাক হয়ে, দেখাতে পারে না শোনাতে পারে না বলতে পারে না কিছুই।

ধীশক্তি প্রতিভার আলোর অনুগামী এবং ধীশক্তির অনুগামী নিপুণতা প্রভৃতি কতকগুলো। আলঙ্কারিকরা এইজন্য বলেছেন—"শক্তিনিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ কাব্যঞ্চশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুসমুভবে"[১]। প্রতিভার সঙ্গে ধীশক্তি নিপুণতা লোকশাস্ত্র ও কাব্যাদির আবেক্ষণ কবিজনের নিকট শিক্ষা এবং অভ্যাস— এতগুলো ব্যাপার জুড়ে থাকে, তবে হয় রূপবিদ মানুষ।

প্রতিভা হল অতেলপুর প্রদীপ, দৈবাৎ কোনো কোনো মানুষ আসে রূপের জগতে সেটি বহন করে এক কালের থেকে আর এক কালের মধ্যে জ্ঞান-অজ্ঞান উৎকর্ষ-অনুৎকর্ষ আচার-অনাচার সমস্তর হিসাব মিটিয়ে নতুন পথে চালিয়ে নিতে মানুষকে। প্রতিভাবান নতুন পথ খুলে দিয়ে গেল, মানুষের চিন্তাস্রোত সেই ধারার অনুসরণে চলল যুগ যুগ ধরে নতুন নতুন রূপসৃষ্টির পথে।

বাঙলা ভাষার সঙ্গে যার একটু মাত্র পরিচয় আছে সেই জানে বাঙ্গলা গদ্য পদ্য এ দুয়ের মধ্যে এক এক প্রতিভাবানের পরিচয় কিভাবে সুস্পষ্ট ধরা রয়েছে—ছন্দের দিকে বর্ণনার ধরন-ধারণ সমস্তেরই দিকে। ভাবপ্রকাশের বাধা সমস্ত প্রতিভাবান কাব্য ও সাহিত্যের দিক দিয়ে কালে কালে যেমন দূর করে চলেছেন, তেমনি সব প্রতিভাবানের আসা-যাওয়া চিত্রকলা সঙ্গীতকলার বেলাতেও ঘটছে এবং ঘটে গেছে কালে কালে। প্রতিভাবান নতুন নতুন যে পথ সৃজন করে তার সঙ্গে যার কোনো প্রতিভা নেই কিন্তু একটা কিছু নতুনতরো কাণ্ড করে বসল তার কর্মে তফাত রয়েছে।

কবি বাল্মীকির প্রতিভা যখন সাতকাণ্ড রামায়ণ সৃষ্টি করলে তখন কাব্যজগতে একটা নতুন রসের পথ খুলল, কালিদাসের 'মেঘদূত' 'শকুন্তলা' সেখানেও নতুন রসের ধারা ঝরল রূপজগতে; তারপর এল কবির লড়াইয়ের কালে ভ্রমরদূত হংসদূত এমনি কত দূত তার ঠিক নেই, কিন্তু কোনো দূত পাঁচালী কোনো দূত ছড়া কেটেই চলে গেল,—নতুন ফুল ফুটল না কাব্যজগতে, নতুন পথও খুলল না নতুন যুগের। বৈষ্ণব কবিরা এলেন, প্রতিভার স্পর্শে নতুন ছন্দে বেজে উঠল কাব্যলক্ষ্মীর নূপুর-কঙ্কণ।

এক কবির সঙ্গে অন্য কবির কাজের খুঁটিনাটি হিসেব নিয়ে দেখলে হংসদূতের ভ্রমরদূতের কবিদের মধ্যে কিছু যে পাইনে তা নয়, শুধু একটা যুগ-পরিবর্তনের মধ্যে বৈষ্ণব কবির কাব্যকলা আর ইতর কবিদের কাব্যকলার স্থান কিভাবে ধরা সেইটেই দেখানো উদ্দেশ্য আমার।

প্রতিভাশালী কবির রামায়ণ যে দেশকালের অতীত, আর যে কবি তা নয় তার রামায়ণী গান শুধু যে এক দেশের বা এক দলের,—এটা কালই প্রমাণ করে দিচ্ছে—অন্য প্রমাণের অপেক্ষা নেই এখানে। ধীশক্তিমানদের অগ্রণী বলে ধরতে পারি চাণক্য পণ্ডিতকে; তাঁর একটা শ্লোক আর প্রতিভাবান কবি কালিদাস তাঁর একটা শ্লোক—দুয়ের ইতর-বিশেষ আছে এবং ঠিক সেই রকমের ইতর-বিশেষ আছে আজকের যথার্থ কবির গানে এবং অসত্য কবির গানে—এ নিয়ে ঝগড়া তো নেই কারু সঙ্গে।

আমাদের প্রাচীন আমলের একখানা স্থান-চিত্র—স্থান-চিত্রের গভীর রহস্য সবটা তার মধ্যে যে নেই সেটা আজকের ইউরোপের বা চীনের বা জাপানের অপূর্ব একটি স্থান-চিত্রের পাশে ধরলেই বোঝা যায়। স্থান-চিত্র আঁকার প্রতিভা কখন কোন দেশে প্রথম জাগল, তার ইতিহাস জেনে আনন্দই পাই, এ দুঃখ তো মনে আসে না যে আমাদের দেশে স্থান-চিত্র সম্পূর্ণ বিকাশ পেলে না! রূপবিদ্যা আমাদের যে রাস্তা ধরে চালায় সেটা এত বড় রাস্তা যে সেখানে একটা জগৎব্যাপী রূপের প্রকাশবেদনার সামনে গিয়ে আমরা পৌঁছই—ভুলে যেতে হয় এ-দেশ এ-জগৎ এ-মানুষ সে-মানুষ এ-কাল সে-কাল। মানুষের রূপসৃষ্টি যেখানে বৃহত্তরভাবে চোখে আসে, দেখি যে মানুষের প্রতিভার আলো বিকীর্ণ হয়েছে সেখানে বৃহত্তম রূপের রহস্য প্রকাশ করে দিয়ে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা তা দিয়ে একটা জিনিসের স্থান কাল সবই ঠিক হল কিন্তু তখনও সেটিকে জানতে অনেকখানি বাকী থাকল। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। তাজমহলটা কখন হল, কারা গড়লে, কি ধাঁচে গড়লে, গড়তে কত টাকা পড়ল, কত মানুষ খাটলে, তারা কে কত তঙ্কা মাইনে পেলে, কোন কোন দেশ থেকে তার পাথর এল, কার ভাণ্ডার থেকে তাকে সাজাবার মণি-মুক্তা এল—এসবই জ্ঞান হল পুরাতত্ত্ব ইতিহাস দিয়ে, কিন্তু তবু অনেকখানি জানার বাকি রইল, রূপবিদ্যা দিয়ে সে খবর না নিলে কোনো উপায় নেই। সেদিক দিয়ে দেখি তাজমহল তো শুধু একটা বাড়ি মাত্র নয়, কবর মাত্র নয়, সে একটা কবিতা—মানুষের ভাষারূপ জগতের একটা যুগচিহ্ন, প্রতিভার আকাশ-প্রদীপ, হিন্দু-মুসলমান দুই সভ্যতার উৎকর্ষের পরিণয়ের সাক্ষী, এবং দেখি তার ইতিহাস ঈজিপ্টের পিরামিড, জগন্নাথের রথ, বৌদ্ধ স্তূপ এবং যুগ-যুগান্তরের মানুষের প্রতিভা দিয়ে রচনা করা সমস্ত স্মৃতিমন্দির এবং স্মরণীয় গীত ও কথার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে। চার মিনারের মাঝে দেউল, দুই পাশে দুই জওয়াব্-পার্শ্বদেবতার মাঝে এ কেন চতুর্ভুজা, এ কেন সপ্ততন্ত্রী বীণা! এই রহস্য রূপবিদ্যা না হলে ধরি কোথা থেকে?

রূপের যথার্থ পরিমাপ একমাত্র রূপবিদ্যার দ্বারা হওয়া সম্ভব, আর কোনো বিদ্যা রূপের তল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে না। দপ্তরী সোজা রেখা টেনে যায় বটে কিন্তু রেখার যে রহস্য তার তল তো পায় না কোনো দিন, রূপবিদের কাছে সামান্য আঁচড়টিও আপনার জীবন-রহস্য ধরে দেয়। রূপবিদ্যা নিয়ে যারাই চর্চা করছে তারাই জানে এতে করে একটা জিনিসের গুণটিও যেমন দোষটিও তেমনি সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় চোখে।

অজন্তা গুহার ছবির সামনে যদি এমনি একজন মানুষ, একজন পুরাতত্ত্ববিদ এবং একজন রূপদক্ষ গিয়ে দাঁড়ায়, তবে দেখবো ক'জনই বলবে চিত্রগুলো চমৎকার, কিন্তু কেন চমৎকার তার বেলায় ক'-জনই আলাদা আলাদা কথা বলবে। সাধারণ মানুষটি কেন যে চমৎকার তা ধরতে পারবে না—সেই ব্যাপারটির সামনে অভিভূত হয়ে থাকবে; পুরাতত্ত্ববিদ ছবির প্রাচীনতা তার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে এমনি কতক ইতিহাস কতক কুলপঞ্জী ইত্যাদি মিলিয়ে সুন্দর একটা বক্তৃতা দিয়ে চলবে এবং ঐ সাধারণ মানুষটির মতোই রসও গ্রহণ করবে জিনিসটার; কিন্তু সত্যি যে রূপদক্ষ সে ছবির খবর সব দিক দিয়ে পাবে। সে শুধু ছবির প্রাচীন ইতিহাস দেখবে না ছবিগুলো চিত্রবিদ্যার কতটা উৎকর্ষ দেখাচ্ছে সেটাও দেখবে। এককথায় সে দেখতে পাবে অজন্তার চিত্র যেন তার সামনে আজ আঁকা হচ্ছে,—কারু হাত নির্ভয়ে রেখা টানছে, কারু হাত ভয়ে কাঁপছে। শুধু এই নয়, এইসব চিত্রের পিছনে মানুষের চিত্রবিদ্যার ধারা কত যুগ ধরে বইতে বইতে কি রেখে গেল রঙের কুলে রেখার কূলে কি চিন্তার ছাপ—তাও দেখবে রূপবিদ।

পুরাতত্ত্বের বিষয় এক জিনিস রূপতত্ত্বের বিষয় অন্য—এটা বলা ভুল। একই অজন্তার ছবি তার পুরাতত্ত্বও রয়েছে তার রূপতত্ত্বও রয়েছে তার রসতত্ত্বও রয়েছে, সুতরাং বলতে পারি রূপবিদ্যার মধ্যে এ সবারই স্থান আছে।

রূপবিদ্যা নানা দিক দিয়ে রূপটির পরিমাপ করতে নিযুক্ত করে মনকে, তাই রূপের অন্তর-বাহিরের খবর এত করে ধরা পড়ে রূপবিদের কাছে। বৃহত্তরভাবে রূপকে দেখায় বলে রূপবিদ্যার দিক দিয়ে চর্চায় রূপরচনা সমস্তের বিস্তৃত ইতিহাস ধরে চলতে হয় শিক্ষার্থীকে। কোনো একটা তত্ত্ব ধরে চললে রূপের এক অংশ যেমন তার ঐতিহাসিক অংশ বা তার কোনো এক জাতি বা ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধের দিক পরিষ্কার হয়ে উঠল, কিন্তু বিশ্বজোড়া রূপ ও রসের রচনা সমস্তের সঙ্গে কি প্রকারের যোগ নিয়ে জিনিসটি রয়েছে মহাকালের মানদণ্ডে তার কি মূল্য নির্ধারিত হল—এর হিসেব রূপবিদ্যার অধিকারীর হাতে। রূপরচনা সমস্তকে সর্বাঙ্গীণভাবে বুঝতে বা বোঝাতে হলে রূপবিদ্যার দরকার। কোনো একটা রচনার রসতত্ত্ব পেতে হলে অলঙ্কারশাস্ত্রে নানা দিক দিয়ে রচনাটি আলোচনা করে দেখার উপদেশ সমস্ত রয়েছে, তেমনি রূপতত্ত্ব তারও আলোচনার পথ হয়েছিল এ দেশে। রূপতত্ত্ব সম্বন্ধে হেমচন্দ্র বলেছেন—

> "রূপতত্ত্বং স্যাদ্রূপং লক্ষণং ভাবশ্চাত্মপ্রকৃতিরীতয়ঃ।
> সহজং রূপতত্ত্বঞ্চ ধর্মসর্গোনিসর্গবৎ॥"

ললিতবিস্তরে কলাবিদ্যার যেসব হিসেব ধরা গেছে তার মধ্যে 'রূপম' এবং 'রূপকর্ম' এই দুয়ের কথা বলা হয়েছে। ইউরোপের একজন পণ্ডিত যিনি এই রূপতত্ত্ব ও রূপবিদ্যা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন তিনি শুনেছি আমাদের মেয়েদের হাতের আলপনার যে নক্সা আমি ছাপিয়েছি সেগুলো পেয়ে বলেছেন যে তাঁর দেশের অনেকগুলো ঐ ভাবের নক্সা কোথা থেকে কেমন করে উৎপত্তি হল তার ইতিহাসের সন্ধান তিনি পেয়েছেন বাঙ্গলার আল্‌পনা থেকে। এইভাবে দেখি সেকালে এবং একালেও রূপবিদ্যা রূপতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা চলেছে রূপ সমস্তের পরিষ্কার ধারণা পাবার জন্য।

রূপের রাজত্বে প্রবেশ রূপের রহস্যে অনুপ্রবেশ এসব রূপবিদ্যা নিয়ে চর্চা না করলে হবার জো নেই। ছাত্র যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তখন সমস্ত বিদ্যার সঙ্গে পরিচয় করে নেবার অধিকার পেলে সে, বিদ্যার ছাড় মুক্ত হল তার সামনে। তেমনি এই রূপবিদ্যার প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস হল শিল্পী তবে তার রূপের তথ্য রূপের তত্ত্ব জানার জন্য যেসব বিদ্যা রয়েছে যেসব শাস্ত্র রয়েছে তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা পেয়ে গেল সে, রূপ-রাজস্বের রহস্য-নিকেতন মুক্ত হল তার কাছে।

একটা বিদ্যা দিয়ে আমরা ফুলের রহস্য অবগত হচ্ছি, কোনো বিদ্যা আমাদের পশুপক্ষীর বিষয়ে জানাচ্ছে, কোনোটা মানবচরিত্র, কোনো বিদ্যা বা শিশুচরিত্র স্পষ্ট করে ধরছে আমাদের কাছে, রূপের তত্ত্ব তেমনি রূপবিদ্যা জানাচ্ছে—মানুষকে রূপটির রচনার দোষগুণ তার সমস্ত ইতিহাস কলাকৌশল সবই জানাচ্ছে।

আমরা যখন নিজেদের কিছুর চর্চা করতে চলি তখন অনেক সময় মা যে চোখে তার ছেলেকে দেখে সেই চোখেই দেখে চলি, এতে করে দোষ চোখে পড়ে না, দোষগুলোও গুণ হয়ে দেখা দিয়ে চর্চার বিষয়টি সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পৌঁছে দেয় মনে, কিন্তু রূপদক্ষের চোখে রূপের সামান্য খুঁতটিও এড়ায় না। যেমন গুণটি তেমনি, রূপটি ঠিক যা তা যথাযথভাবেই উপস্থিত হয় তাদের কাছে।

ধর, এই অজন্তার চিত্রাবলী কি অদ্ভুত কি অদ্ভুত এই কথাই শুনে আসছি ওর রং যেমন রেখ তেমন—সবই তখনকার সমস্ত রূপ-কল্পনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এ তো শুনে এলেম এবং মেনেও নিলেম তাই, কিন্তু অজন্তা চিত্রের একটা দিক আছে সেটা তখনকার শিল্পীর চিত্রকরণে অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে সুস্পষ্ট রকমে। এটা শুধু চোখে যারা দেখল কিংবা ইতিহাস পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিদ্যা দিয়ে আলাদা আলাদা দেখে গেল ছবিগুলো, তাদের চোখ এড়িয়ে গেল, অথচ সেই অক্ষমতা শুধু অজন্তায় নয় অজন্তার আগে অজন্তার পরে পৃথিবীর সব চিত্রকরদের মধ্যে ধরা যাচ্ছে। অনেক কাল মানুষ ছবিতে পাহাড় আঁকতে পারেনি, একটা স্থানচিত্র আঁকতে পারেনি, নদী আঁকতে পারেনি, আকাশ আঁকতে পারেনি, মেঘ আঁকতে পারেনি, বাতাস ঝড় উত্তাল তরঙ্গ সমুদ্র কত কি আঁকতে অক্ষম ছিল জগতের শিল্পী তার ঠিক নেই,—এসব পরিচয় অজন্তার গুহায় এখনো ধরা, ইউরোপের খুব উৎকৃষ্ট ছবিতেও ধরা রয়েছে। ইতালীর বড় বড় শিল্পী বাতাস আঁকছেন দটো গলাফুলো ছেলের মুণ্ডু ফুঁ দিচ্ছে মানুষের গায়ে। অজন্তার শিল্পীরা এত বড় ছেলেমানুষি করেনি সত্য, কিন্তু এক জায়গায় চিত্রবিদ্যার খুব বড় দিকের বিষয়ে তখনো তাদের চোখ পৃথিবীর প্রায় সব দেশের শিল্পীর সঙ্গে একেবারেই ফোটেনি দেখা যাচ্ছে।

সেকালে মানুষকে যদি বলা যেত—বুদ্ধ যাত্রা করেছে পথের দিকে—আঁকো, তবে সে ঘটনার মধ্যে তিন-চারবার একই বুদ্ধকে না এঁকে কিছুতে বোঝাতে পারত না ব্যাপারটা। একটা বুদ্ধ দিয়ে তিনি ওখান থেকে এলেন, আর একটি দিয়ে এখান দিয়ে চললেন সেখানে পৌঁছতে, এই যে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনাপরম্পরার ইঙ্গিত তিনটি বুদ্ধ না এঁকেও দেওয়া চলতে পারে তা তখনকার দিনে অজ্ঞাত ছিল। একটা প্রতিভার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করে ছিল পৃথিবী জুড়ে সমস্ত চিত্রকর এই কলাকৌশলটুকু লাভের জন্য। সেই প্রতিভা কোন দিন কবে কোন দেশে কার কাজের মধ্যে প্রথম দেখা দিলে, রূপবিদ্যার সাহায্যে এটা দেখতে পেলে একটা নতুনতরো দেখার চেয়ে যে কম জিনিস দেখা এবং দেখানো হয় তা তো নয়; একটা মূর্তি গুপ্ত রাজার আমলে না সেন রাজার আমলে এই তত্ত্বের চেয়ে একটা কম জিনিস আবিষ্কার করা হয় তাও তো নয়; ভারত-শিল্প সবই আধ্যাত্মিক এমনি একটা বড় গোছের রহস্যের চেয়ে কিছু ছোট রহস্য ভেদ করে যাওয়া হয় শিল্পবিষয়ে তাও তো নয়।

সমস্তখানি জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে তবে ফোটে একটি ফুল একটি ফল, তাই তো ফুল ফলের মর্ম এত বিচিত্র বিস্তার নিয়ে ধরা পড়ছে কবিতায় ছবিতে গানে নাচে, —কত ভাবে কত রূপে কত কাল ধরে কত রূপদক্ষের রচনায় তার ঠিক নেই। তেমনি মানুষের দেওয়া একটি রূপরচনা বিশ্বের মানবজাতির ভাবনা চিন্তা সুখ দুঃখ সভ্যতা ভব্যতা শিক্ষা দীক্ষা সমস্তেরই সঙ্গে লিপ্ত হয়ে আছে। মানবজাতির পূর্বাপর সমস্ত সংস্কার বাদ দিয়ে কোনো রূপদক্ষ তো ফোটায় না কিছুই সেইজন্যেই একটি রূপ কিন্তু তার ইতিহাস তার খবর জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে আছে, কালকের ছবি মূর্তি কবিতা সে ধারণাতীত কালের রহস্য সমস্ত বহন করছে। যেমন আজকের গোলাপ সেই প্রথম দিনের এবং তারপর থেকে সমস্ত গোলাপের সৌরভ ও বর্ণ ধরে প্রস্ফুটিত হল, আজকের চাঁদ সে যেমন আজকের সে যেমন কালকের সে যেমন যুগ-যুগান্তরের চাঁদনী আর স্বপ্ন ধরে রইল, তেমনি প্রতিভাবান রূপদক্ষের রূপসৃষ্টি সমস্ত মানুষের পূর্বাপর যা-কিছুর সাক্ষী স্বরূপে বর্তমান হল—এই প্রকাণ্ড রহস্য ভেদ হয় রূপবিদ্যার শক্তিতে।

টীকা

১. ১।৩ কাব্যপ্রকাশ—মন্মটভট্ট

রূপ দেখা

প্রত্যেক রূপের সঙ্গে রূপের ডৌলটি কতকগুলো রেখা দিয়ে সুনির্দিষ্ট আকারে আমাদের চোখে পড়ে এবং তাই দিয়ে আমরা বুঝি এটি এ, ওটি তা। ইনি অমুক তিনি অমুক এটা মানুষের মুখ না দেখেও খুব দূরে থেকে চিনি, মানুষটি যে কে তা বুঝি এই সমস্ত রেখা দিয়ে যা তার রূপের সঙ্গে এক হয়ে আছে। রঙ্গমঞ্চের উপরে যখন মানুষটিকে চড়াতে হল তখন তার নিজের রূপটি নিয়ে বা রূপরেখাগুলো নিয়ে কাজ হল না—অন্য এক প্রস্থ রেখা দিয়ে তাকে ভিন্ন রূপ করে নিতে হল। এখন, যে রূপকার রঙ্গমঞ্চের চরিত্রগুলোকে নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে উপযুক্তভাবে সাজাবে সে যদি দক্ষ না হয় রূপরেখার বিষয়ে, তবে নানা অঘটন উপস্থিত হয় অভিনয়ের রস ফোটাবার কাজে, তেমনি ছবিতে রেখার রহস্য ভেদ করতে যে পারলে না, রূপকে দিয়ে রসও ফোটাতে সে পারলে না; রেখার ঘোরপেঁচ দিয়ে সে চমক লাগিয়ে দিলে, হয়তো যেভাবে তান মানের কর্তব দিয়ে চমক দেয় তাকথিত কালোয়াত সমস্ত শ্রোতার কান, কিংবা জমকালো সাজগোজ দিয়ে ভুলিয়ে দেয় যাত্রার অধিকারী দর্শকের চোখ—সেইভাবে বিস্ময় জাগালে; কিন্তু একে রূপদক্ষতা বলা গেল না। রূপদক্ষতা সেইখানে যেখানে রূপে-রেখায় রূপে-ভাবে সুরে-কথায় এবং এক রেখায় অন্য রেখায় এক রূপে অন্য রূপে এক সুরে অন্য সুরে একাত্ম হয়ে রস সৃষ্টি করে। রেখা ছাইল রূপকে, রূপ ছাইল রেখাকে এমনভাবে যে কেউ কাউকে মারলে না কিন্তু মিলল সহজ ছন্দে—তখনি হল রস, না হলে বিরস হল ব্যাপারটি।

বর্ষার ধারা সরু রেখা টেনে আকাশ থেকে পড়ে, হঠাৎ দেখে মনে হয় একটা আবছায়া, ছবির উপরে হাল্কা রঙের রেখা টেনে বৃষ্টির ছবি সহজেই দেখানো যাবে, কিন্তু আঁকবামাত্র বুঝি এ বৃষ্টি পড়ল না, রেখার জাল পড়ল ছবির উপরে। পদে পদে ঠেকি কেন এই জলের রেখা টানতে? বৃষ্টিধারা রূপরেখা দিয়ে সৃষ্টি; সেই এক-একটি রেখার মধ্যে বর্ষার ছায়া-করা রূপ, জলের ঝরে পড়ার সুর, বৃষ্টি থেমে রোদ ফোটার এবং মাঠের সবুজ হয়ে ওঠার নানা স্বপ্ন এক হয়ে আছে। রূপদক্ষতা না পেলে এই রেখা আঁকাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। অলঙ্কারের মধ্যে বৃষ্টিধারা ধরে নেওয়া চলে, মুক্তার ঝুরি থেকে আরম্ভ করে সোনার তার দিয়ে বর্ষার একটা প্রতীক ধরে নেওয়া যায় রেশমের পর্দায় কিংবা আর কিছুতে, কিন্তু এই অলঙ্কারশিল্পের উপরের জিনিস হল রূপদক্ষের হাতের টান। একথা তো মিছে নয় যে ভিজে মাটির সুবাসে ভরপুর জল ঝরার শব্দে মুখর রেখার টান কথার টান সুরের টান রূপদক্ষের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। যে রূপদক্ষ ওপারে বসে কাজ করছেন আর যে রূপদক্ষ আমাদের মাঝে বসেই কাজ করছেন—দুজনেই রূপরেখার অধিকারী।

প্রকৃতির লীলা যা চলেছে আমাদের চোখের সামনে তা নিরীক্ষণ করে দেখলে দেখি তার মধ্যে কারিগর এবং রূপদক্ষের হাত একই সঙ্গে কাজ করছে। কারিগর বাঁধলে নানা রেখা দিয়ে গাছের কাঠামো, পাতার শিরা উপশিরা, জীবের অস্থিপঞ্জর এমনি কত কি একেবারে শক্ত করে বাঁধা রেখা দিয়ে, আর রূপদক্ষ লীন করে দিলেন এই বাঁধা-রেখার কষন এবং কর্কশতা, রূপরেখার আবরণ অবগুণ্ঠন পড়ল সবটার উপরে। নরকঙ্কালের

বাঁধা রেখা দিয়ে বাঁধা চক্ষু-কোটর তাকে ঢেকে রূপরেখা টেনে দিলে দুটি কালো চোখের হাসি-কান্নার সুরের টান, শক্ত রেখা দিয়ে টানা বাঁশপাতা তার উপরে রঙ আর আলো টানটোনের ঘোমটা ফেললে। একই সঙ্গে কারিগরি এবং রূপ-কর্ম এ মানুষের কাজেও দেখা দিয়েছে অনেক স্থলে; যে রেখায় বাঁধা গেল সেই রেখা দিয়েই ছাড়া পেলে রূপ— এই অভাবনীয় দক্ষতা যে লাভ করেছে মানুষ, এর পরিচয় ধরেছে তারা পাথরে ছবিতে কবিতায় গানে। দেশভেদে কোনো এক জাতি যে এই রূপরেখা প্রথম পেয়ে গেল তা নয়—যেমন ছোট ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় যে বড় হয়ে একটা কেউ হয়ে না উঠেও রূপকথা বলছে, বেশ গাইছে বেশ নাচছে, তেমনি সব দেশের মানুষের শিল্পচর্চা করে দেখি দেশে দেশে খুব আদি কালেরও মানুষ রূপরেখা বিষয়ে সম্পূর্ণ পাকা হয়ে গেছে। ইতিহাসে অখ্যাত যুগের মানুষ তাঁদের বাল্যে বিশ্বদেবতার রূপরেখা বিষয়ে কত উপদেশ দিলেন—রূপরেখা দিয়ে কেমন করে গড়তে হয়, লিখতে হয়, সুর বাঁধতে হয় তার সব শিক্ষা ধরে দিলেন জলে স্থলে আকাশে। আজও সে শিক্ষার পথ খোলা রয়েছে শুধু এইটুকু তফাত হয়েছে—আগেকার তারা শিখত রূপরেখাকে চোখের সামনে দেখে, আর আজ ছাত্র এবং মাস্টার দুই দলেই বক্তৃতায় শুনে বুঝতে চলি রূপরেখার আমূল তত্ত্ব! দুগ্ধফেননিভ বিছানার কথা শুনে শুনে বস্তুটির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আর বিছানাটায় একবার গড়িয়ে নিয়ে বস্তুটি কি জেনে নেওয়া—দুই রকমের জ্ঞানলাভের মধ্যে প্রভেদ আছে তো! একজন যে রূপরেখা টানলে বা রচলে সে এবং যে বই পড়লে রূপরেখার হিসেবের কিন্তু টেনে দেখলে না ব্যাপারটা কি—দুজনের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রইল। যে শুধু গান গাইতে পারে এবং যে গান রচতে পারে দুজনের মধ্যে যেমন স্বরজ্ঞান বিষয়ে বিষম অমিল, তেমনি অমিল কারিগরে আর রূপদক্ষে, তেমনি অমিল রূপরেখাকে যে জানে আর রূপরেখাকে যে জানে না কিন্তু রেখা দিয়ে রূপকে বাঁধতে জানে তাদের কাজের মধ্যে। একটি ছোট মেয়ে যে পল্লীগ্রামের দাওয়ায় বসে আলপনা টানছে, কাঁথা বুনছে, সে পেয়ে গেছে রূপরেখাকে কিন্তু একজন মস্ত ইঞ্জিনিয়ার যে রুল কম্পাস দিয়ে রেখা টানছে কিংবা কারখানা ঘরের শিল্পী যে বাঁধা চালে কার্পেটের ফুল তুলে চলেছে এ দুজনের মধ্যে কেউ পায়নি রূপরেখার সন্ধান—এ তো মিছে কথা নয়। তেমনি দেখি একজন বাউল পথে পথে ঘুরছে কিন্তু গলার সুরে সুরে রূপরেখার টান এসে গেছে তার কাছে, কিন্তু একজন তথাকথিত কালোয়ত যে হারমোনিয়ম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছে সভাস্থলে চাল দোরস্ত হিন্দী গান হিন্দুস্থানী সুর দিয়ে ঘাড়-মোচড়ানো বাঙলা কথা—তার ডাকাডাকির ত্রিসীমায় রূপরেখা আসছে না সুরের সূত্র ধরে। এ-গাছে ও-গাছে এ-ফুলে ও-ফুলে এ-পাখিতে ও-পাখিতে তোমাতে আমাতে শুধু রূপের বিভিন্নতা নয়, চলা বলা ভাবনা চিন্তা কাজ কর্মও আমাদের এক-এক রূপ।

এই যে রূপে রূপে ভিন্নতা এটা সবারই চোখে পড়ছে কিন্তু এই ভিন্নতাটুকু ছবিতে কি কবিতায় কি কথায় ধরে দেখানোর কৌশল সবার কাছে নেই। মানুষে পাখিতে যে একরূপ নয় তা ছোট ছেলেও জানে; তাকে মানুষ আঁকতে বললে সে একপ্রস্থ রেখা ব্যবহার করে যেগুলো পাখির বেলায় সে মোটেই ব্যবহার করে না। যেমন লিখে আমরা জানাচ্ছি মানুষ এই তিনটি অক্ষর দিয়ে, তেমনি ছেলেও বোঝাচ্ছে একপ্রস্থ রেখা দিয়ে মানুষ। ছেলের লেখা মানুষ যেমন কোনো বিশেষ মানুষ নয়, সে তার আপনার মানুষের প্রতীক তেমনি রূপদক্ষের লেখা রূপ সেও তার আপনার কল্পিত রূপ, দেখা রূপের ছাপ নয়। কিন্তু এক জায়গায় রূপদক্ষের সঙ্গে ছেলের লেখার পার্থক্য—রূপের বিভিন্নতা দিয়ে রসের বিচিত্রতা ছেলের দ্বারা হয়ে ওঠে না বড় একটা, তাছাড়া ছেলের হাতের সঙ্গে তার হাতে টানা রেখার একটা আড়ি থাকে—ছেলে জানে না রেখাকে বাগ

মানাতে হয় কি উপায়ে। এই রেখাজ্ঞানের রহস্যভেদ করে তাকে দিয়ে ইচ্ছামতো রূপ বাঁধা এবং রূপে ও রেখায় এক করে দিয়ে রসের পথ খুলে দেওয়া জেনে শুনে—এ হল রূপদক্ষের সাধনার বিষয়। চোখে দেখছি যে সমস্ত বাঁধা রূপ ধরে ধরা রূপ, বাইরে ধরা রূপ, এরা যদি রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটে আঁকা জিনিসগুলোর মতো সম্পূর্ণভাবে অনড় ও অপরিবর্তনীয় রূপে ধরা থাকত, তবে পৃথিবীতে এদের চিত্রিত করতে চাইত না বা কবিতায় গানে গল্পে এদের কথা বলতেও চাইত না মানুষ। খাড়া দাঁড়িয়ে রইল রেখা, মড়ার মতো পড়ে রইল রেখা—দুইটি অবিচিত্র সম্পূর্ণ নিস্পন্দ এবং অচল; এই দুই রেখা বেয়ে চলতে গিয়ে রেলগাড়ির দৌড়ের ধারে ধারে সাইনবোর্ডগুলো যেভাবে পড়তে পড়তে চলে যায় যাত্রী শ্রীরামপুর হুগলী বর্ধমান বোলপুর— সেইভাবে খালি দেখে যায় চোখ আম গাছ জাম গাছ লাল পাখি কালো পাখি এ-দেশ সে-দেশ এ-মানুষ সে-মানুষ,—মন খোঁজে চলাচলের বিচিত্রতা কিন্তু পায় না। সৃষ্টির কঠিন নিয়মে-বাঁধা সমস্ত রূপ, একের সঙ্গে অন্যের ভিন্নতা দিয়ে বন্দী করা, রূপসৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই রূপমুক্তি কামনা করে এরা মুখ তুলে চাইলে আলোর দিকে, হাত পেতে দিলে বাতাসের কাছে কবির কাছে চিত্রকরের কাছে জানালে এরা নানা ছন্দে মুক্তি পাবার কামনা—রূপ বাজল রূপের কান্না বাজল রূপদক্ষের মনে, রূপের বেদনার মধ্যে রূপ সমস্ত মুক্তি লাভ করলে; এ যেন পাথরে বাঁধা জল নির্বর দিয়ে ঝরল, নদী হয়ে বইল, রসের সমুদ্রে গিয়ে মিলল। বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে রূপ বাঁচল যখন ভাবকে সে বহন করলে আপনার মধ্যে।

যে পথকে নিরেটভাবে বেঁধেছে রেল কোম্পানী কিংবা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড সেই পথের রেখা আর যে পথকে বেঁধেও বাঁধেনি পথিক—সেই 'গ্রামছাড়া রাঙা মাটির পথ'—তার টানটোনে রূপে রসে সব দিক দিয়ে বিভিন্ন দেখা যায়। ইস্পাতে বাঁধা পথের রেখা আর সকাল সন্ধ্যার আলোতে সবুজ পৃথিবীর কোলে ছাড়া পাওয়া আঁকাবাঁকা পথের টান,— একে মনকে টেনে নিয়ে যায় দিগন্তরের শ্যাম শোভার মধ্যে, অন্যে আস্ত মানুষটাকেই ঝাঁকানি দিতে দিতে টেনে নিয়ে চলে বন্ধ খাঁচায় ভরে নিয়ে। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে পথিক চলল, তাদের কারু মনে থাকল না যে পথ রচনা করছি, অথচ চলার ছন্দে তাদের গাঁয়ের পথ আপনা হতেই তৈরি হয়ে গেল; কিন্তু বাঁধা পথের রেখা ইঞ্জিনিয়ার রুল কম্পাস প্লেন্ ধরে তৈরি করছি বলেই টেনে চলে, কাজেই সেটা ভয়ঙ্কর রকম ঠিকঠাক থাকে বলেই রয়াল রোড্ বা সাধারণ পথ হয়ে ওঠে। গাঁয়ের পথের চলার যে ছন্দ এবং মুক্তি সেটি সাধারণ সড়ক বেয়ে চলার হিসেব থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি ছবি মূর্তি এসবের যে রেখা তার কোনোটা বেয়ে মন চলতে গিয়ে দেখে মন রেলে-বাঁধা গাড়ির মতো গড়গড়িয়ে চলল কিন্তু রেখাকে অতিক্রম করে আর কোনো দিকে চলা তার সম্ভব হল না। আবার কোনো রেখা গাঁয়ের পথের মতো মুক্ত এবং স্বচ্ছন্দগতি, সেখানে পথের রেখাও যেমন মুক্ত পথের রূপও তেমনি সুবিচিত্র এবং মোটেই বদ্ধ সঙ্কীর্ণ নয়, বাঁধা রূপ দেখা থেকে মুক্তি পেয়ে মন সেখানে ডানা মেলে দিলে ভাবের হাওয়ায়। গাঁয়ের পথের রেখা সে বললে, আমি পথ বটে আবার পথ নয়ও বটে, আমি মুক্ত রূপ, আর রেল পথ সে কেবলি বলে চলল, আমি পথ ছাড়া আর কিছুই নয়, আমি বদ্ধ রূপ।

রেলপথের মতো কষে বাঁধা রেখা আর গাঁয়ের পথের মতো ঢিলে-ঢালা রেখা দুই ধরে মন কোন দিকে কিভাবে কতখানি পায় তার দু-একটা নমুনা যারা এই দুই পথ বেয়ে চলল তাদের দুটো লেখা থেকে বোঝাবার চেষ্টা করি; যথা—"পৃথিবী জোড়া প্রকাণ্ড রাত্রি ভেদ করে চলেছি, তখন কেবল শুনছি পায়ের তলা দিয়ে একটা ঝন্‌ঝনা লৌহ নির্ঝরের মতো ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে।" —এখানে রেল চলার শব্দ তার মধ্যেও

বৈচিত্র্য আসতে পাচ্ছে অল্পই, যুগ-যুগান্তর ধরে যেন একটানা শব্দের পথ কেটে চলেছে গাড়িগুলো উপর নীচে আশপাশ কোনো দিকের কোনো খবরই পৌঁছুচ্ছে না মনে, তাই বললে মন পুনরায়, "নিশাচর পাখিরা রাত্রির নীরব নীলের মধ্যে আপনাদের নিশ্চল পাখা মেলিয়ে নিঃশব্দে যেমন ভেসে যায় এ তেমন করে যাওয়া নয়—এ যেন একটা উন্মত্ত দৈত্য চাকা-দেওয়া লোহার খাঁচাটা পৃথিবীর বুক আঁচড়ে চারিদিকে অগ্নিকণা ছিটিয়ে অন্ধকুহরের ভিতর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে।" এইভাবে চলার ফল তাও আমার নিজের কাছে ধরা পড়েছিল সেদিন যেদিন এই বর্ণনা লিখেছিলেম রেল-রাস্তার; যথা—"সুদীর্ঘ অনিদ্রা, অফুরন্ত অস্থিরতা, তার পরে বিরাট অবসাদ—নির্জীব প্রাণ নিরুপায় অবোলা একটা জন্তুর মতো চুপ করে পড়ে আছে অপার অন্ধকারের মুখে দুই চোখ মেলে।' রূপ দিলে বটে একটা—এই বাঁধা পথের একটানা ভাবে চলা, কিন্তু সে হল অবিচিত্র নির্জিত রূপ, মুক্ত রূপ মুক্ত রেখার আনন্দ যা মালার মতো মনকে দোলায় তা এ লেখার মধ্যে ধরা গেল না; কিন্তু গাঁয়ের পথের মুক্ত রেখা ধরে চলতে চলতে এই গান যে কবি গাইলেন এর মধ্য দিয়ে মুক্তির স্বাদ আপনা আপনি সহজে পৌঁছল মনে; যেমন—

"গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।
ওরে—কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধূলায় রে॥
ও যে—আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—

কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে॥
ও সে—কোন্ বাঁকে কি ধন দেখাবে,
কোন্ খানে কি দায় ঠেকাবে
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে
ভেবেই না কুলায় রে॥"

—রবীন্দ্রনাথ

রেখামাত্র-শেষ যে চন্দ্রকলা সে যেমন পরিপূর্ণ রূপ ও রসের আধার, তেমনি পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডল—রেখায়-ঘেরা আলো-করা রূপ—সেও রূপে রসে ভরপুর। কিন্তু এই যে খাতার একখানি পাতা যা রেল লাইনের মতো রেখার পর রেখা দিয়ে ভর্তি—সাদা কাগজে রুল টানা হয়েছে এইটুকুমাত্র বোঝাচ্ছে—এই রুল-টানা রেখা সমস্ত চাচ্ছে আঁকা-বাঁকা অক্ষর মূর্তির তলায় আপনাকে লুপ্ত করে দিয়ে সার্থক হতে! রূপদক্ষের হাতে টানা রেখা এই ভাবের সার্থক রেখা, বিস্তীর্ণ পটখানির প্রসারের উপরে আকাশের বুকে ধরা চন্দ্ররেখার মতো—রূপে ভর্তি রেখা। ত্রিপদী চৌপদী নানা ছন্দ আছে যা দিয়ে কবিতার স্বচ্ছন্দ রূপটি বাঁধা হয়ে থাকে, সকোণ

নিষ্কোণ নানা রেখা আছে যা নিয়ে রূপের ছাঁদ বাঁধা হয়, সঙ্গীতে টানটোন তাল লয় ইত্যাদি নানা মাত্রার কষন আছে বা বেঁধে রাখে সুর ও কথা একত্রে, কিন্তু এই যে কথা বাঁধা পড়ছে ছন্দে রূপ বাঁধা পড়ছে রেখায় সুর বাঁধা যাচ্ছে তানে লয়ে—এদের সবারই দাবি রূপদক্ষের কাছে—ছন্দ যেন নিগড় না হয়ে নূপুর কাঞ্চী হয়ে বাজতে থাকে, রেখা যেন বেড়ি না হয়ে ফুলের মালা হয়ে দোলে, তাল লয় ইত্যাদি যেন ভয়ঙ্কর রকমে ঠিকঠাক একটা বেতাল হয়ে গলা জড়িয়ে না ধরে "তমালতালীবনরাজিনীলা" হয়। কাজলরেখার টানটোনের বেলাতেও এই কথা। বেহালার ছড়ি যখন খ্যেঁচ্ খ্যেঁচ্ করে সুর টানতে থাকে তখন সঙ্গীত কোথায় থাকে ভেবেই পাই না। ছাঁদনা তলায় কন্যা বাঁধা পড়ে বরের সঙ্গে একগাছি রক্তসূত্রে কিন্তু কন্যার দাবি থাকে—এই বাঁধন যেন নিগড় হয়ে গলার ফাঁসি হয়ে তাকে পীড়ন না করে। এমনি রূপ ধরা দেয় রেখার বাঁধুনির মধ্যে কিন্তু রূপের দাবি থাকে রেখার কাছে— রেখার বাঁধুনি যেন রূপকে পরিখার মতো ঘিরে না বন্দী করে, মেখলার মতো, নূপুরের মতো, কাজলের মতো, কূল উপকূলের মতো রেখা যেন রূপের সহচারিণী সহধর্মিণী হয়ে সুরের ছন্দে বাঁধা বীণার ঝকঝকে তারের মতো বাজতে থাকে, রূপের সঙ্গে এক হয়ে থাকে যেন রেখা, এককে না মারে অন্যে, রূপ ও রেখা দুজনের সত্তা এক হয়ে যেন রস জাগায়।

রূপদক্ষের হাতে টানা রেখা আর খবরের কাগজে যেসব সচিত্র বিজ্ঞাপন বার হয় তার রেখা— দুয়ের তফাত এইটুকু নিয়ে যে রূপদক্ষের রেখা সে রূপরেখা, সেখানে রেখা রূপ রং সমস্তই এক হয়ে আছে, কালীঘাটে পটে টানা রেখা সেখানেও এই হিসেব; কিন্তু বায়স্কোপের দরজায় যে সচিত্র মস্ত মস্ত বিজ্ঞাপন, মাসিক পত্রের মলাটে যে রঙ্গীন আবরণ—সেখানে রেখা রূপ রঙ সবই আলাদা আলাদা বর্তমান।

রূপ এবং রেখা দুয়ের যথার্থ মিলন সপ্রমাণ করে রূপবতী রেখা, সেখানে রূপকেও পাই রেখাকেও পাই রসকেও পাই একসঙ্গে মিলিয়ে। দপ্তরীর টানা খাতার রেখায় খালি রেখাকে পাচ্ছি; এই সোজা সোজা পাহারার মধ্যে একটা রেখা একটু যদি বেঁকে দাঁড়ায় কিংবা নেচে চলে তখনি খাতার পাতা শুধু আর রেখার সমষ্টি থাকে না, সোজা রেখা বাঁকা রেখায় মিলে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে নক্সা হয়ে উঠতে চলে। যেমন এই রেখায় রেখায় সম্বন্ধ তেমনি রূপ আর রেখার সম্বন্ধ নিয়ে তবে ছবিতে ফোটে ভাব রস ইত্যাদি। দপ্তরীর রেখা সে যা তাই বলে, পড়ে থাকে সোজা, লেখার বেলাতেও তেমনি খাড়া শব্দ। কাক বললে, আমি কাকই আর কিছুই নয়, কিন্তু যখন বললেম কাকচক্ষু জল তখন কথারূপী কাক এবং জল এবং চক্ষু এরা স্বকীয়তা ছেড়ে তিন সখীর মতো গলাগলি মিলল পুকুর পাড়ে। সা রে গা মা এরা প্রত্যেকে সম্বন্ধ স্থাপন করতে চলল প্রত্যেকের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য বর্জন করে অনেকখানি, তবেই হল গান। এমনি রূপে রেখায়, কথায় কথায়, সুরে ও সুরে, সুরে এবং কথায়, এমনকি বলতে পারি সুরে-বেসুরেও একত্র মিলে তাবৎ রসরচনার সহায়তা করছে। বাঁধন এবং মুক্তি এরি ছন্দ নিয়ে রেখা হল রূপবতী ছবির বেলাতে, কথার বেলাতেও এই কথা, গানের বেলাতেও ঐ কথা। এক অন্যেতে লীন এই লয়ে বাজছে রূপ-জগৎটাই একখানি বীণার মতো যেখানে এই লয় ভঙ্গ হল সেইখানেই ব্যাপারটি নীরস হল।

যেমন কথা সুর এবং লয় তেমনি রং রেখা ও রূপ তিনে মিলে এক হতে চায়, রূপদক্ষ সে এদের এক করবার উপায় জানে, কিন্তু যে মোটেই দক্ষ নয় সে এদের আলাদা আলাদা রাখে, নয়তো এদের কষ্টে সৃষ্টে এমনভাবে মেলায় যাতে করে এদের আপনার আপনার শ্রী ছাঁদ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে একটা বিশ্রী জিনিসের সমষ্টি গড়ে ওঠে।

এই যে রূপরেখা যা পরিখার মতো রূপকে আপনার মধ্যে বন্দী করে না, একে কারিগর নয়—রূপদক্ষেরাই খুঁজে বার করেছে। খুব প্রাচীনকালের মানুষ তারা দেখি একদল রেখাকে দিয়ে রূপকে বাঁধছে, হরিণের শিঙ কাঠের ফলক গায়ের কাপড় কত কি'তে রেখা টানছে তারা, কিন্তু রেখা সে থাকছে রূপের এবং রূপ সে থাকছে রেখার অটুট জালে বন্দী হয়ে। কিন্তু সেই অতকাল পূর্বেও মানুষের কারিগরিকে সার্থক করতে দু'একজন রূপদক্ষ দেখা দিয়েছিল যাদের হাতের লেখায় রূপ ও রেখা এক হয়ে রয়েছে দেখি এক অন্যের ধর্ম পেয়ে,—রূপের কুহকে সেখানে রেখা ভুলল, রেখার স্বপ্নে রূপ আপনাকে হারালে।

খুব প্রাচীন কালে ঈজিপ্টের ভাস্কর্য থেকে দেখি রেখাকে সত্যিই দুর্গের পরিখার মতো করে কেটে রূপকে তার মধ্যে বদ্ধ করেছে মানুষ। আমাদের তালপাতায় লেখা পুঁথির ছবি সেখানেও রেখার এই ভাব,—তারের খাঁচার মতো রেখা ধরে রেখেছে রূপকে। কিন্তু মানুষের মূর্তি-শিল্প যেখানে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা পেয়েছে সেখানে দেখি রেখা থেকেও নেই, রূপের হিল্লোলে ভাবের বাতাসে রেখা স্রোতের জলে মালার মতো ভরা পালের বাঁকটির মতো কখনো রূপের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে রইল কখনো বা রূপের গরবে ভর্তি হয়ে থাকল।

যেমন রূপটির সঙ্গে রেখা ঠিকভাবে মেলাতে পারলে রেখা হয় সুন্দরী তেমনি রূপও হয় সুন্দর যখন ঠিক রেখাকে সে পেয়ে যায়। খাতার পাতায় টানা রেখাগুলো রূপ না পেয়ে যেমন ভাবে আছে তেমনিই যদি থাকে তো আমরা পাতাটাকে বিশ্রী বলিনে, রেখাগুলোকেও বিশ্রী বলিনে; সাদা পাতায় সাদাসিধে রেখা তারা দুয়ে মিলে একটা সৌন্দর্য সৃষ্টি করলে—যেমন সাদা শাড়ির কিনারায় কিনারায় পাড়ের টান কিংবা বীণাদণ্ডের উপরে ঝক্‌ঝকে গুটিকতক তারের টান। এই ভাবের একাকিনী রেখা সে রইল যেন না-বাজা বীণা। খাতার রেখাগুলো তারা চাইছে অক্ষরমূর্তিকে পেতে, বীণার তার তারা চাইছে স্বরমূর্তিকে পেতে,—যখন সেই মিলনটি ঘটল তখন সার্থক হল বীণা এবং খাতা দুই-ই। এ না হয়ে শুধু দৃষ্টিসুখটুকু দিয়ে গেল মাত্র যে সুদৃশ্য রেখা ও টান সে শুধু চোখের বস্তু; অলঙ্কারশিল্পে এই সুদৃশ্য রেখা ব্যবহার করা হয়। সুশ্রাব্য ছন্দ ও সুর কিছু না বললেও যেমন শ্রবণ মাত্রেই তৃপ্তি দেয় তেমনি একটি নিখুঁত সোজা বা সুন্দর বাঁকা রেখার দ্বারা দর্শনসুখ পাই আমরা। অলঙ্কার দিয়ে মানুষ যখন চোখ ভোলাতে চাচ্ছে তখন চোখে পড়ে এমনই সব রেখা দিয়ে সে রূপকে বাঁধছে। অলঙ্কার গায়েই পরি বা তা দিয়ে একটা পুঁথির পাতা কি ঘরের দেওয়াল কি পাটের কাপড়ই সাজাই সেটা বাইরের জিনিস বাইরে বাইরেই রইল এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হল কাজ তার, কিন্তু মানুষের সুন্দর চোখের ভুরুর ঠোঁটের হাতের আঙুলের আগা থেকে পায়ের আঙুলটি পর্যন্ত যে সমস্ত রেখার টানটোন দেখি সেই রেখা সমস্ত তো শুধু মানুষটিকে দেখতে কেমন এইটুকু প্রমাণ করতেই থাকল না, সে সব রেখার ভঙ্গি দর্শকের মনের মধ্যে ভাবের তরঙ্গ তুলে দিলে, রেখা রূপ রস তিনে মিলল সেখানে এবং একেই বলতে হল রূপরেখা—বাইরে এর স্থান অন্তরে এর স্থান। গ্রিক-মূর্তিতে এই রেখা, বুদ্ধমূর্তিতে এই রেখা, চমৎকারী শুধু রেখা দিয়ে টানা চীন এবং জাপানী ছবিতে এই রেখা, শীতের গাছ মাঠের মাঝে একলা দাঁড়িয়ে নীল আকাশের কাছে সবুজ আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে— সেখানেও এই রেখা। একটুকরো পাথর একখানা কাগজ খানিকটা শুকনো কাঠ, এদের কি এমন শক্তি আছে যে রসিকের মন টানে কিন্তু এদের যখন রূপদক্ষ রূপরেখার সঙ্গে মেলালে তখন মানুষে পাথরে যোগ হয়ে গেল প্রাণে প্রাণে।

মাঠের ধারে পাতা-ঝরা গাছ আর তার ডালপালাগুলিকে বাতাস রেখার জাল পেতে ধরছে যখন, তখন আকাশের এবং মাটির সম্পর্কে এসে সুন্দর ঠেকছে তার আঁকা-বাঁকা টানটোন, কিন্তু কাঠুরে যখন তাকে কেটে

ধরে এনেছে তখন দেখা গেল ধরিত্রী ও আকাশের সঙ্গে যে সম্বন্ধটি নিয়ে শুকনো গাছের আঁকা-বাঁকা রেখাজাল সুন্দর ঠেকছিল সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গাছটি বিশ্রী হয়ে গেছে। বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন যে হতশ্রী গাছ তাকে জ্বালানি কাঠ করে কেউ আর কেউ বা সেই কাঠের টুকরো সমস্ত নিয়ে তাদের নতুন করে গড়ন দেয়, তখন আবার রূপলোকে তাদের স্থান হয়, রূপরেখার মন্ত্রবলে একখানা জ্বালানি কাঠ একটা ভাঙ্গা পাথর একটুকরো যেমন-তেমন কাগজ রূপে ও রসে ভর্তি হয়ে নতুন প্রাণ পেয়ে যায়।

রেখা নিরূপিত করে দিলে যাকে আঁকা হবে তার স্থানটি চিত্রপটে, ডৌল দিলে রেখা, সুনির্দিষ্ট ভঙ্গি দিলে রেখা—এককথায় রূপের পত্তন দিলে রেখা। ঘর বাড়ি টেবিল চৌকি, এদের পত্তন দিতে হল সুনির্দিষ্ট সমস্ত রেখা দিয়ে; কোথাও কষি—সে কষে বাঁধলে, কোথাও দাঁড়ি—দাঁড়িয়ে পাহারা দিলে রূপকে ধরে রাখতে। এই ভাবের বন্ধনীরেখা সমস্ত যা রূপদক্ষের হাতের কাছে হাজির রইল তারা সকলেই ভৃত্যের মতো—তালপাতার লেখা ছবি পাথরের ফলক এবং নানা ধাতুতে নকাশির কাজ করতে কাজে এল; এইসব স্থির রেখা পাহারা দিলে রূপকে, যেমন খাতার রুল-টানা অংশ লেখাকে আঁকতে দেয় না বাঁকতে দেয় না তেমনি এইসব বাঁধা রেখা ধরে থাকল শক্ত করে নানা রূপ। শ্রমজাত যে সমস্ত শিল্প তাতে রেখার বাঁধুনি প্রধান হয়ে উঠল, কিন্তু মানুষের মানস থেকে জাত হল যখন, তখন এ ধরনের রেখা নিয়ে কাজ চলল না, রেখাকে রূপের মধ্যে মেলাতে হল, রঙের তলায় তলাতে হল—এতে ওতে তাতে একত্রে গাঁথা হল। ভাল পাথরের মূর্তি সেখানে রেখা কি সুন্দরভাবে একদিকে বাতাসে মিলিয়ে অন্য দিকে রূপটির ডৌলের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে দেখ। এই যে রেখার সংযোগ রঙের সঙ্গে রূপের সঙ্গে—এর রহস্য রূপদক্ষ জানলে, কারিগর সে তো জানলে না, তাই দুটো থাক হল দুই রকমের শিল্পীর মধ্যে। কারিগর সুনির্দিষ্ট প্রকট রেখা দিয়ে বাঁধলে রূপকে যেন বিনিসুতোর হারে। গাড়ির চাকায় যে রেখাগুলো দাগলে সামান্য কারিগর এবং যে রেখা টানলে একজন অসামান্য রূপদক্ষ মাথার এক-এক গাছি চুলের টান দেখাতে—এই দুই রকমের টান থেকে পরিখা-রেখা আর রূপরেখার তফাতটা বুঝি।

খোন্তা দিয়ে খুঁড়ে চলল নানা রেখা মানুষ—যুগের পর যুগ গেল রূপের সঙ্গে মিলতে পারলে না সেসব রেখা—রূপের গায়ে গায়ে থাকে কিন্তু রূপের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না। বৃষ্টির ধারা যেমন এক হয়ে মেলে বর্ষার মেঘ বাতাস আলো ছায়ার সঙ্গে, সেভাবে মিলতে পারে না—টেলিগ্রাফের তার থেকে লট্‌কানো ঘুড়ির সুতোর মতো ঘরের কোণে ঝুলের মতো ঝুলতে থাকে রূপকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। খোন্তা ফেলে মানুষ তুলি ধরলে—যে তুলি রূপকেও টানে রেখাকেও টানে রঙকেও টানে, মানুষের মনের কথা রূপরেখায় ব্যক্ত হল চিত্রপটে; চারিদিকের আলো বাতাসের সঙ্গে পাথরের মূর্তির গায়ের রেখাগুলি মেলাবার অস্ত্র এবং মন্ত্র পেয়ে গেল মানুষ,—পাষাণ তখন তরল ভাষায় ব্যক্ত করলে মানুষের মনের ছবি। এমনি সঙ্গীতে ও ভাষায় সুর বার করলে মানুষ সাতটা, কথা বার কললে অসংখ্য, কিন্তু মেলাতে পারলে না কতকাল ধরে কথাকে সুরকে সঙ্গীতে; সুর রইল আকাশে ভেসে শকুনের মতো, কথা পড়ে রইল মাঠে, সুর শুধু কথার গায়ে আপনার কালো ছায়াটা বুলিয়ে যেতে লাগল। নক্সা করতে মানুষ অনেক অনেক রেখা সন্ধান করে বার করে আনলে—যে রেখা জেগে দাঁড়িয়ে আছে, যে রেখা ঘুমিয়ে আছে সটান অঘোরে, যে রেখা আলুথালু বেশে কাঁদছে, যে রেখা শিউরে উঠেছে ভয়ে, যে রেখা দুলে উঠেছে আনন্দে, যে রেখা নুয়ে পড়েছে ভাবের হাওয়ায়, যে রেখা ঢেউয়ে চলেছে তালে তালে—এমনি কত কি রেখা যার অন্ত নেই। এরা সবাই মিলে রূপকে ঘিরে দাঁড়াল সকোণ

নিষ্কোণ নানা ভঙ্গিতে, রূপের পেয়ালার গায়ে গায়ে এরা ছায়া ফেলে অলকা তিলকার মতো থাকল কারিগরের দ্বারা, রূপ ও রেখার মিলন ব্যাপার এই পর্যন্ত এসে থামল। রূপদক্ষ দেখে বললেন, 'এহ বাহ্য', রূপ যে পিঠে বইতে থাকল রেখাকে, একি হল! গোণা যায় না এত রেখা, রূপের বাঁশি শুনে মুগ্ধ তারা সখীর মতো ঘিরল রূপকে এ এক শোভা, কিন্তু রূপদক্ষ বললেন, 'এহ বাহ্য', রূপের সঙ্গে একাত্মা হয়ে এরা মিলল কই? রূপের সঙ্গে মিলতে পারে যে রেখা তাকে খুঁজতে চলল মানুষ, যুগ যুগ ধরে সাধনার ফলে পেলে মানুষ রূপরেখার দেখা প্রতিপদের চাঁদের মতো যার রূপ।

স্মৃতি ও শক্তি

"অন্তর বজে তো যন্তর বজে।" মনে বাজল যে সুর যে রূপ তারি ছন্দ ছাঁদ পেয়ে যন্ত্রীর যন্ত্র বাজল, রাগ-রাগিণীর রঙ ও রূপ ধরে। অহোরাত্র মনে রাখা অথবা না-রাখার ক্রিয়া চলেছে আমাদের মধ্যে। এখানে একটা লাইব্রেরি তো আছে, তার বইয়ের সংখ্যা কত কেবল লাইব্রেরিয়ান জানেন, হয়তো দপ্তরী সেও শুনে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছে। এই যেমন বইগুলোর সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় আর যেমন তাদের বিষয় নাম ইত্যাদি, তাদের রাখার স্থানের হিসেব ইত্যাদিরও মোটামুটি আন্দাজ—সেই ভাবের পরিচয় নানা রূপের সঙ্গে মানুষ করে চলে সারা জীবন ধরে। কিছুর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠভাবে হল, স্মৃতি রইল মনে ধরা পরিষ্কার কি আবছায়া কিংবা জলের রেখার মতো অস্থায়িভাবে।

আনন্দের ব্যাপার দুঃখের ব্যাপার কাজের ব্যাপার এবং নানা বাজে ব্যাপার নিয়ে একরাশ স্মৃতি—যেন নানা বিষয়ের বই একটা লাইব্রেরিতে। এর মধ্যে কতকগুলো ব্যাপার বিজ্ঞাপন নোটিস দৈনিক ঘটনার সঙ্গে মনের একটা কোণে জমা হতে থাকল, কতক চিরকুট কাগজের মতো যেমন এল তেমনি গেল, ধরা রইল না মনের ফাইলে গাঁথা হয়ে। এমন লোক যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যারা খুব চেনা মানুষের ছবি দেখেও মোটেই ধরতে পারে না ছবিটা কার। আঁকা ছবির কথা ছেড়ে দিই, ধর জগন্নাথের মন্দিরের একটা ফটোগ্রাফ,—একজন যে শ্রীক্ষেত্র করে এসেছে তাকে ফটোখানা দেখাও, বুঝতেই পারবে না সে দৃশ্যটা কোথাকার, সেটা যে একটা স্থানের চিত্র এ বিষয়টাও বোঝে না, একটা হেঁয়ালির মতো ঠেকে তার কাছে চিত্র মাত্রেই। গাছ দেখে যে বলতে পারে গাছ, সে গাছের ছবিকে দেখে গাছই যে বলবে এমন কথা নেই। ছবি দেখতে অভ্যস্ত নয় এমন চোখের পরীক্ষা ঘরের দাসী চাকর বেহারা এমনকি ভদ্রলোকদেরও অনেককে নিয়ে করে দেখতে পারো। এই তো গেল সহজ দেখার বেলায়, তারপর নিরীক্ষণ করে দেখা, মন দিয়ে দেখা, ভালবেসে দেখা ইত্যাদি নানা রকম দেখার হিসেব আছে যা অনেকের কাছে একেবারেই ধরা নেই।

এই যে সেনেট হাউস এলেম, কিন্তু আসার পথে কি দেখলেম, কি কি ঘটনা, কোন কোন মুখ—তার কারো মনে আছে হয়তো একজন বন্ধু গেছে পাশ দিয়ে তারি একটুখানি, নয়তো কেউ মটর চাপা পড়ছিল তার একটু, কিংবা একটা বরাত চলছিল তারই ঝকমক ঝমঝম এমনি খানিক—যেগুলো জোর করে মনের মধ্যে এল তাদেরই একটু ছাপ রইল মানসপটে, তার বেশি একটুও নয়।

কাল কি দিয়ে ভাত খেয়েছি মনে পড়ে, কিন্তু পরশুর কথা মুছে যায় মন থেকে যদি না সেদিন একটা বিশেষ রকম ভোজ খেয়ে থাকি। বড় ভোজের সন্দেশ কেমন, দই কেমন, রান্না কেমন, কে কে খেতে বসলেন, কি কি কথা হল, তার অনেকখানিই মনে রইল।

চোখ নিরীক্ষণ করে দেখলে একটা কিছু, তার আকার প্রকার ধরা রইল মনে, চোখের সঙ্গে মনও দেখলে—না হলে দেখাই হল না, চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেল রূপটি। মন দিয়ে অভিনিবিষ্ট হল মানুষ কিছুতে

—ধারণা হল তবে সম্পূর্ণরূপে পদার্থটির বা বিষয়টির।

অনেকবার এককে দেখার ফলে মানুষ না দেখে তাকে আঁকতে, না বই খুলে তার কথা মুখস্থ বলতে, নির্ভুল করে নামতা তাড়াতাড়ি বলতে, অঙ্ক এবং অঙ্কন করতে বেশ সক্ষম হয়ে ওঠে। এই ভাবের রূপচর্চায় রচনা করার মালমশলা যথেষ্ট দখল হয়, কিন্তু রচনাশক্তি পাওয়া হয় একথা বলা চলে না। অদ্ভুত শক্তিবলে বেদ বেদান্ত ইতিহাস পুরাণ সবই একজন না হয় মুখস্থ রাখলে, কিন্তু সেইটুকু হলেই কথক হয় না তো কেউ, কবি হয় না তো কেউ! মুখস্থ বিদ্যে কণ্ঠস্থ সরস্বতী নিয়ে অনেকখানি বিস্ময়কর ব্যাপার করেও দেখানো যায়, একভাবের দক্ষতাও প্রকাশ করা হয়, কিন্তু প্রবন্ধ করে কিছু বলা, ছন্দে-বন্ধে কিছু বলা লেখা—এসবের দক্ষতা অন্য পথে লাভ করে মানুষ। মনঃকল্পিত যা কিছু তার প্রকাশ মুখ্যত মানুষের কল্পনা ও স্মৃতিশক্তির উপরে নির্ভর করে। এককে ঘিরে ঘিরে স্মৃতি ঘোরে ফেরে, কল্পনা অনেককে ধরে ধরে উধাও হয়ে চলে। একের স্মৃতি কল্পনার শতদলে ধরা—এই হল রূপদক্ষের রূপকর্মের উদ্দেশ্য।

ফটোগ্রাফ যন্ত্র তার তো কোনো কিছু কল্পনা করার শক্তি নেই, সে শুধু আকার মাত্র পুনরুক্তি করে চলে হাজার দু' হাজার বার—যেভাবে নামতা বলে ছেলে। আর কবি যখন তাঁর মনের একটি কিছুর কথা বলছেন তখন নানা কল্পনা নানা জল্পনা নানা বর্ণনা ধরে ধরে ফুটেছে সেখানে মনে ধরা স্মৃতি।

রূপদক্ষ মাত্রেরই মধ্যে প্রখর স্মরণশক্তি কাজ করছে দেখা যায়—'The great writer is one who has profusion of words at his command, together with a great stock of observation.' এখন একটা কথা হচ্ছে এই যে, স্মৃতির ভাণ্ডারে না হয় নানা জিনিস সংগ্রহই হল, কিন্তু সেগুলো কিভাবে কাজে খাটানো গেল তারি উপরে সমস্তটা নির্ভর করছে। জমা টাকা অনেক রইল কিন্তু ভোগে এল না মানুষটির এমন ঘটনা বিরল নয়, কিংবা জমা টাকা অপচয় হয়ে পাঁচ ভূতের পেট ভরালে এও হয়। এইখানে রূপদক্ষের দক্ষতার কথা ওঠে—কথা বেছে বেছে নেবার, ভাব বেছে নেবার। এইজন্য অলঙ্কারশাস্ত্রে শক্তির কথা বলেই নিপুণতার কথা বললেন পণ্ডিতেরা—শক্তি নিপুণতা অবেক্ষণ শিক্ষা অভ্যাস এমনি পরে পরে বলা হল।

একটা শক্তি যা রূপরচনার বিশেষ সহায় হয় তা হচ্ছে এই অভ্যাস। চলার অভ্যাস যার আছে সে সহজে স্বচ্ছন্দ গতি পেলে, লেখার অভ্যাস যার আছে, ছবি লেখার মূর্তি কাটার নানা কৌশল যার অভ্যাস আছে, সে রচনা সহজে নিষ্পন্ন করলে। হাত পা সব থাকতেও অচল থাকি শুধু চলার অভ্যাস নেই বলেই। অক্লান্তভাবে নানা শক্তি একটা ছবি কি একটা কবিতার রচনার বেলায় প্রয়োগ করতে হয় রূপদক্ষকে। এর সব শক্তিগুলোই বহু সাধনাসাপেক্ষ কিন্তু এমন আস্তে আস্তে নিজের অজ্ঞাতে রূপদক্ষ মানুষ এইসব শক্তি অর্জন ও প্রয়োগ করে চলেন যে রচনা যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। কষ্টকল্পিত রচনা এবং সহজ রচনা দুটো পাশাপাশি রাখলেই কোনখানে রচয়িতা নিজের শক্তি প্রয়োগ বিষয়ে বেশ একটু সজাগ এবং কোনখানে তিনি একেবারেই তা নন, এটা ধরা পড়ে। ইঞ্জিন যখন চলে তখন শক্তি বিষয়ে সজাগ একটা দৈত্যের মতো চলে, আর নৌকা যখন চলে পাল ভরে বাতাসের প্রচণ্ড শক্তিকে ধরে চলে সে, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন স্রোতের উপর আপনার সবখানি এলিয়ে দিয়ে ভেসে চলেছে। ঝড়ের বাতাস জানলা দরজায় ঝাঁকানি দিয়ে বলে, শক্তি কাকে বলে দেখ। দক্ষিণ বাতাস দিকে দিকে ফুল পাতার মধ্যে এমন গোপনে নিজের দিগ্‌বিজয়ের ইতিহাস ধরে যায় যে সকালে উঠে দেখি ফুল যেন আপনি ফুটে উঠল আপনার কথা বলতে, পাতা সব সবুজ হয়ে উঠল আপনা আপনি। অথচ কি প্রচণ্ড শক্তির প্রেরণা বসন্ত ঋতুর মধ্য দিয়ে পৌঁছয় গাছের শিকড় থেকে গাছের আগার ফুলের কুঁড়ির প্রতি

পাপড়িতে তার একটু আভাস পাওয়া যায় বায়স্কোপের ফুল ফোটার নানা ব্যাপার লক্ষ্য করলে। আমরা শুধু চোখে ফুল ফোটার সবটা তো দেখতে পাইনে, ধরতেও পারিনে যে একটা ফুলের পাপড়ি কেমন করে বিকাশ-শক্তির তাড়নায় আলোর দিকে বন্ধ চোখ মেলছে, কিন্তু একটা কল প্রচণ্ড শক্তির ঘূর্ণন নিয়ে মূর্তিমান করে ধরে যখন ব্যাপারটা আমাদের চোখে, তখন ফুলের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব সেখানে দেখি না, কেবল ফুলটির বিস্ময়কর বিপুল শক্তির গতিবিধি লক্ষ্য করে অবাক হয়ে থাকি। মানুষের রচনাতেও এই শ্রেণীর কাজের ধারা লক্ষ্য করা যায়।

কবিতা সঙ্গীত ছবি যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত নয়, কিন্তু যন্ত্রশক্তির পরিচয় দিয়েই বিস্ময় জন্মায়, সেখানে মন অভিভূত হল। কালোয়াতের গানে প্রায়ই এই যন্ত্রশক্তির ব্যাপার সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং গীতটা মাধুর্য হারিয়ে বসে খানিক শোনার পরেই। অনেক কবিতাও দেখি যার বাঁধুনি চমৎকৃত করে, কিন্তু মন টানে না। এই তাক্ বানিয়ে দেওয়া শক্তির কাজ, স্মৃতির নয়। স্মৃতিসভায় গেলেই দেখা যায়, কেউ কবিতা কেউ বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের তাক্ বানিয়ে চলে গেল, আবার একজন হয়তো মানুষটির স্মৃতি পরিষ্কার করে মনোহর করে দু কথায় ধরে দিয়ে গেল মনে। যার সঙ্গে যার স্মৃতি তার সঙ্গে সেই স্মৃতিটুকু মধুর করে নানা কথায় নানা ভাবে ফলিয়ে মনে ধরানোর শক্তি ধরা আছে।

মানুষের সব রচনাকে মোটামুটি দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা চলে: একটা হল শক্তিমন্ত আর একটা হল শ্রীমন্ত রচনা। শক্তিমন্ত রচনা তারও অবশ্য শ্রী আছে এবং শ্রীমন্ত রচনা তারও মধ্যে শক্তি যে নেই তা নয়; যেমন রূপবান এবং রূপসী বলতে ভিন্ন বুঝি, তেমনি এখানে শক্তিমন্ত রচনায় একটা পুরুষভাব আর শ্রীমন্ত রচনায় একটা সুকুমার ভাব লক্ষ্য হয় বলেই দুটো আলাদা ঠেকে।

মানুষ যখন তার বাইরের কোনো শক্তিকে বাধা দিতে চেয়ে কিংবা নিজেরই গঠনশক্তি ধীশক্তি ইত্যাদির পরিচয় দিতে চেয়ে রচনা করলে কিছু, তখন সেই কাজ শক্তির পরিচয় না দিয়ে থাকতে পারে না, যেমন, চীনের প্রাচীর, ঈজিপ্টের পিরামিড, একটা যুদ্ধজাহাজ, একজোড়া গোরার বুট,—এরা সব কেউ শক্ত, কেউ পোক্ত, মানুষের স্মৃতিক্ষেত্রের ফসল এরা নয়, এরা শক্তির শক্ত মাটি ও পাথরের সন্তান—যদি কোনো স্মৃতি এদের সঙ্গে জড়ানো থাকে তাও শক্তিমন্ত রূপের স্মৃতি। জগদ্দল পাথরের স্তূপের স্মৃতি শক্ত করে চাপা দিয়েছে ঈজিপ্টের রাজারানীর শ্রী ও স্মৃতির সৌন্দর্য, প্রকাণ্ড বিপুলকায় শক্ত চামড়া-মোড়া অজগর যেন কত কালের কোন একটা যক্ষের ধনভাণ্ডারের প্রহরী,—এই তো হল চীনের প্রাচীরের শক্ত রূপ! যুদ্ধজাহাজ সব দেখি আগাগোড়া শুধু ইস্পাত আর শক্তি দিয়ে সাজানো, বৃহৎ বিরাট শক্তির প্রাচুর্য এদের কল্পনায়। তাজবিবির কবর, মন্দিরের গোপুর ও প্রাচীর সেখানেও শক্তিমান শিল্পীরা কাজ করছে, কিন্তু সে কাজ তাদের মনে-ধরা নানা স্মৃতি দিয়ে গড়ে গেছে সুকুমার স্বপ্নমণ্ডিত করে। চীনের ফুলদানি—বড় কম শক্তির দরকার নয় সেটা গড়তে, কিন্তু ফুলের স্মৃতি ফলের স্মৃতি ধরে শ্রীমণ্ডিত হল। একটি লোহার চিমটে কোন একটা পাখির স্মৃতি ধরলে কে জানে! একখানি বাঁকা তলোয়ার—সে দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মনোহরণ স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া আর কি! একটা লোহার বেড়ি—কিন্তু ফুলের ফাঁস কি বাহুপাশ বলে তাকে ভুল ক্বচিৎ হয়, হাতুড়ি সেখানে শক্তি শক্ত হয়ে বসেছে, শাবল আর সূঁচ একটা সবল আর একটা সবলের স্মৃতির অবশেষ ঝিক ঝিক করছে শরতের জলধারার প্রায়। ঝরনা পাথর ঠেলে চলে এত শক্তি তার, কিন্তু সে আনে স্মৃতি—ফুলের মঞ্জরীর চাঁদের আলোর সাদা একখানি শাড়ির এমনি কত কি'র। স্মৃতির আবরু ঢাকলে গঠনশক্তি—শক্ত করে বাঁধা কঙ্কালের

কথা মনে রাখে না কেউ, রাখতে চায়ও না, কঙ্কাল ঢেকে যেটুকু স্মৃতির ঘোমটা তারি কথা মনে রাখলে সবাই। গ্রিক শিল্পের একটা বীরমূর্তি আর একটা কুস্তিগীরের ফটো—দুটোর প্রথমটাকে কারিগর ভীমকান্ত রূপ দিলে অদ্ভুত কৌশলে, আর ফটোগ্রাফ সে শক্ত রূপটাই দেখিয়ে চুকল। যেমন ভিতরের কঙ্কাল তেমনি বাইরের আকৃতির কঙ্কাল মাত্র পেলেম ফটোতে, ফটোযন্ত্রের স্মৃতিশক্তি কল্পনাশক্তি তো নেই যে ছবি দেবে! লাবণ্যের আবরণ পড়ছে শক্ত পাহাড়ের উপরে যেমন, সেইভাবেই স্মৃতির আবরণ সৌকুমার্য দিচ্ছে দেখি মানুষের রূপরচনায়। একেই বলেছেন শাস্ত্রকার—নিপুণতা, শক্তি গোপনের নিপুণতা, রচনাটিকে শক্ত হয়ে না উঠতে দেওয়ার নিপুণতা।

চাঁদের যে মণ্ডল আর লোহার কলের চাকার যে মণ্ডল—এই দুয়ের মধ্যে একটা শক্ত অন্যটা সুকুমার। সকালের সূর্য আলোর সৌকুমার্যে ঢাকা দিলে আপনার তেজ ও শক্তির ইতিহাস; সকালে ফোটা সূর্যমুখী ফুল তাকেও এই হিসেব দিয়ে রচেছেন বিশ্বশিল্পী কিন্তু একটা মোমের ফুলের রচনা শক্তি ধরে হল! কোর্টের পেয়াদা যখন সূর্যের মতো লাল গালার সীলমোহর ছেপে যায় বাড়ির দুয়োরে, সেটাকে তো রূপসৃষ্টি বলে ভুল হয় না — সেই আইনের নিছক শক্তিকেই প্রকাশ করতে থাকে রক্ত বর্ণ নিয়ে, কিন্তু একখানি সুন্দর করে গড়া তাম্রশাসন—সেখানে শাসনশক্তি ঠেলে দেখা দেয় জিনিসটির সৌন্দর্য। একটা প্রাচীন মুদ্রা—সেখানেও এই হিসেব, কাজের কথা ঢেকে দিতে সেখানে অনেকখানি কারিগরি। কিন্তু এই আজকের কালে আমাদের বাজারে চলতি যে এক টাকার নোট আধুলি সিকি দুয়ানি, এদের তো রূপসৃষ্টির হিসেবেই গড়ন দেওয়া হয়, কিন্তু রাজশক্তির সীলমোহরের ছাপ পেয়ে এরা কাজের উপযুক্ত হল, বাজে ঠিক, কিন্তু বাজে কাজ ওর মধ্যে যতটা সম্ভব কম রইল। পুরোনো টাকা দেখতে হল সুন্দর, কিন্তু কতখানি বাজে, সোনা তামা কাজকর্ম তার মধ্যে থাকল তার ঠিক নেই, রাজশক্তির চেয়ে রাজ-ঐশ্বর্যের শোভা সেখানে ধরা পড়ল অনেকখানি সোনায় রূপায়। একটা বুটজুতো—যে ছয়টা ব্যাপার নিয়ে চিত্র লেখা মূর্তি গড়া কবিতা লেখা গান গাওয়া হয় তার সব কয়টাই বুটের নির্মাণে লাগল—রূপ-ভেদ প্রমাণ ভাবলাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ কারিগরি নৈপুণ্য সবই প্রয়োগ হল ওখানে, এ সত্ত্বেও জিনিসটা সুকুমার রূপসৃষ্টির অন্তর্গত হল না, শক্তির পরিচয় ধরে শক্ত একটা কাজের জিনিস হল; আর সেদিন ঈজিপ্টের এক রাজার পায়ের দু পাটি চটিজুতোর ছবি দেখলেম, কারিগর কি সৌকুমার্য দিয়েই জুতোপাটি গড়েছে— কত স্মৃতি তাতে ধরেছে, সুন্দর দুখানি পায়ের ভূষণ—কাজের জুতো নয়—ধুলো আর পায়ের মাঝে দুখানি লঘুভার যেন পদ্মের পাপড়ি, একটা কবিতা, একটা গানও বললে, বলা যায় জুতোপাটিকে। রূপসৃষ্টির নিয়ম ধরে গড়া হল অথচ এই যে দুটো জুতো দু'রকম ভাব জানালে, এই যে একটা কেল্লার প্রাচীর আর মন্দির বা রাজপ্রাসাদের গোপুর দুটো একই স্থাপত্যবিদ্যার বলে তৈরি হল, অথচ দিলে দু'রকম রস মানুষের মনে এবং রূপও দেখালে দু'রকম, —এর রহস্য কোনখানে? চীনের রাজার অর্থাভাব হয়েছিল, সেই কারণে চীনের প্রাচীর তাজমহলের প্রাচীরটার মতো সুন্দর হল না, কঠোর শক্ত রূপ ধরে রইল, অথবা চীনের কারিগর ভারতবর্ষের কারিগরের চেয়ে গেঁথে তুলতে কম ওস্তাদ ছিল বলে এমনটা হল—এ কথাই নয়, মানুষের ইচ্ছা কোন পথ ধরলে কাজ করার বেলায়, সে শক্তি দিয়ে আর একটা শক্তিবেগ প্রতিহত করতে চাইলে, অথবা নিজের মনে-ধরা স্মৃতির মাধুরী দিয়ে পাষাণ গলাতে চাইলে—এই নিয়ে তফাত হল দুটো রচনায়। আগুন যখন আতসবাজিতে লাগালেম, তখন আকাশ থেকে আগুনের পুষ্পবৃষ্টি ঝরে পড়ল, আবার আগুন যখন কামানের বারুদে দিলেম তখন একটা প্রাণঘাতী বিরাট শক্তির আবির্ভাব হল।

আতসবাজি যে আবিষ্কার করেছিল সে তার স্মৃতিকে আগুনের ফুল দিয়ে বরণ করবে এই তার মনে ছিল; আর যে কামান রচনা করলে, সে মনে রেখেছিল দূর থেকে বিরাট শক্তিকে অন্যের উপরে নিক্ষেপ করার শক্তির ভাবনা। মানুষের প্রতিভার প্রেরণায় তার যত কিছু শক্তি সমস্তই চালিত হয়ে এই দুই পথ ধরে শক্তিরূপ ও স্মৃতিরূপ পেয়ে চলেছে ভাষা সুর রং রেখা নাট্যভঙ্গি এমনি নানা উপাদানের সাহায্যে।

ছেলেদের মধ্যে দেখি একটা-দুটো খেলুড়ে থাকে তারাই খেলার সর্দার, অন্য ছেলেরা তার দেখাদেখি খেলে। এই যে খেলুড়ে সর্দার এ প্রতিভাবান, সারাদিন ধরে নানা খেলা কল্পনা করে চলে, খেলার নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে। এই রকম বয়স্কের মধ্যেও দু’-একজন দেখা দেয় রচয়িতা লোক—রূপবিষয়ে এদেরই বলা যায় রূপদক্ষ, এরা কথা দিয়ে সুর দিয়ে রং রেখা ইত্যাদি দিয়ে রূপ ফোটায়, রচনার অপূর্ব কৌশল সমস্ত আবিষ্কার করে চলে, নতুন নতুন সব রূপসৃষ্টি নিয়ে যেন খেলে চলে।

ছেলেখেলায় থাকে ছেলেটির অফুরন্ত কল্পনা, নতুন নতুন সমস্ত খেলার রূপ সে রচনা করে চলে কোনো একটা পূর্বেকার খেলার স্মৃতি ধরে, ছেলে যে খেলে চলল সব সময়ে তা নয়, অপরূপ সমস্ত ব্যাপার কল্পনার দ্বারায় মূর্তিমান করে তুললে ছেলে। রূপদক্ষের মধ্যেও এইরকমের প্রবৃত্তি প্রবৃত্ত করায় তাকে নতুন নতুন সৃষ্টি করার দিকে। অসামান্য শক্তি পেয়ে রূপদক্ষ সে রূপকল্পনায় দক্ষ হল, আর যে মানুষটি শুধু সামান্য রূপ দখল করলে, রূপ কল্পনা করতে পারলে না—যেমন হাতি যেমন ঘোড়া যেমন মানুষ যেমন গাছ তেমনিই দেখিয়ে চলল,—সে হল সামান্য রূপকর্মী। সঙ্গীত এবং হরবোলার বুলি— স্বরের রূপ দু’জন দু’রকমে দিয়ে গেল,—একজন অসামান্যভাবে আর একজন সামান্য রকমে এমনি লেখার বেলায় কথা বলার বেলায় সামান্য অসামান্য ভেদাভেদ হল রূপকল্পনার ক্ষমতা এবং রূপকল্পনা করার অক্ষমতার দিক দিয়ে। কবি তাঁর একটা রূপকল্পনা আর যার কাছে শুধু কবিতা লেখার হিসেব আছে কিন্তু যে শক্তি নিয়ে মানুষ রূপকর্মে দক্ষতা পায় তা মোটেই নেই, এমন দুই জনের দুটি রচনা পাশাপাশি ধরলেই এক রূপকর্মের অসামান্যতা ও অন্যের সামান্যতা ধরা পড়ে। জলতরঙ্গ আনাড়ির হাতে বাজল অর্থাৎ জলতরঙ্গের সঙ্গে মানুষটির নাড়ির সম্বন্ধ নেই, শুধু হাতের কৌশলের সম্বন্ধ রইল এবং জলতরঙ্গ গুণীর হাতে পড়ল—বিষম তফাত হল দুই বাজানোর মধ্যে, যেমন তরঙ্গের রূপকল্পনা ধরা হচ্ছে এক কবির লেখায়—

(তরঙ্গবালাগণের গীত)

“মোরা তরঙ্গবালা পরি তরঙ্গমালা
তরঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গে করি গো খেলা।
সমীরণ সঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে
(খেলি) করি নানা রঙ্গে লহরী লীলা॥

শিকর সিঞ্চিত চন্দ্রমা-কিরণে
সুষমা শাভিত তটিনী-পুলিনে
কুলু কুলু তানে আকুল পরাণে
ঢালি সুধাধারা নিবারি জ্বালা।

তারকিত অম্বরে সম্বরি সরমে
বহিয়া চলেছি সাগর সঙ্গমে
সুর তরঙ্গিণী জাহ্নবী সঙ্গিনী
ফেনিল সলিল চুমিছে বেলা॥"

কোনো ভাল-মন্দ সমালোচনা না করে এরি পাশে আর-একটি লেখা ধরি, আপনিই বুঝি কোনটা তরঙ্গের সামান্য আর কোনটা অসামান্য রূপকল্পনা। পূর্বেকার লেখায় যেমন দেখছি তরঙ্গ সব সাগর সঙ্গমে চলেছে, এখানেও সেই কথা বলা হচ্ছে—

"অবিনাশী দুলহা কব মিলিহৌ
আদি অন্ত কমাল॥
জল উপজী জলহী সোঁ নেহা
রটত পিয়াস পিয়াস।
সৈঁ ঠাঢ়ী বিরহিল মগ জোউঁ
প্রীতম তুমরী আশ॥
ছোড়েব গেহ নেই লগী তুম সোঁ
ভঈ চরণ লব লীন।
তালাবেলি ঘট ভীতর
জৈসে জল বিন মীন॥"

আদি নেই অন্ত নেই, অপরিসীম পরিপূর্ণতার সমুদ্র তারি সঙ্গে মিলতে চায় জীবন। জলের তরঙ্গ জলের সঙ্গেই তার প্রেম, জলের জন্য কত না তার পিয়াস সাগর-বিরহিণী নদী সে পথ চেয়েই থাকল—প্রিয়তমের আশাপথ। সাগরের প্রেম চেয়ে নদী ছাড়লে আপন ঘর, সাগরের ধ্যানে নদী রইল স্বপ্নে মগ্ন, জল জল করে তার অন্তরের অন্তর জলহারা মীনের সমান কাতর থাকল।

যা দেখছিলে, যাকে দেখা হয়নি, তার কল্পনা ধরে মন চলতে থাকে নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি করে, আর যাকে দেখা হয়ে গেল মন তার স্মৃতি বহন করে নতুন নতুন রস পেতে পেতে একই স্মৃতিকে নানা ভাবের মধ্যে বিচিত্র করে দেখে চলে। কল্পনার ক্রিয়া আর স্মৃতির গতি দুয়েরই কাজ একেকে বহু করে দেখা,—কল্পনা দেখায় রূপের দিক দিয়ে বিভিন্ন এবং বহু, স্মৃতি দেখায় ভাবের দিক দিয়ে বিভিন্ন এবং বহু। অজ্ঞাত রূপের কল্পনা আর জ্ঞাত রূপের স্মৃতি—এই হল দুই পথ রূপজগতের যাত্রী শক্তিমান মানুষের সামনে ধরা এবং এই দুই পথের খবর এঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

শিশুর জীবনে অনেকখানি পথ অজ্ঞাত, সেখানে কল্পনার অবাধ গতি দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক শিশু এই অজ্ঞাতকে নিজের নিজের চরিত্র ও শক্তি অনুসারে নানা বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে চলে। বড় হলে মানুষের অনেক জিনিসকে জানা হয়ে যায়—স্মৃতি কাজ করতে থাকে তখন তার মনে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ নিজের চরিত্র

ও শক্তি অনুসারে এই স্মৃতি সমস্ত নিয়ে ব্যবহার করতে থাকে এবং এইভাবে কল্পনার সঙ্গে স্মৃতি, স্মৃতির সঙ্গে কল্পনার মেলামেশা সম্পন্ন হয় মানুষের রচনায়।

সোনার কর্ণফুল তার সঙ্গে দেখা ফুলের স্মৃতি এবং না-দেখা-ফুলের রূপকল্পনা এক হয়ে সেটিকে সুন্দর রূপ দিলে, জলতরঙ্গ চুড়ি সেটি দেখা এবং না-দেখা নদীর রূপ একসঙ্গে মিলিয়ে দেখালে। তাবৎ অলঙ্কার শিল্পের মূলের কথা হল কল্পনা এবং স্মৃতির যথাযথ মিলন।

একটা কথা আছে—কণ্ঠস্থ করা। স্মরণশক্তি এখানে বিনা ভাবনা বিনা কল্পনায় নামতা কণ্ঠস্থ করিয়েই চুকল। কোনো জিনিস দু'-একবার দেখে ঠিকঠাক এঁকে দেওয়া গেল; এখানে স্মরণশক্তি কণ্ঠস্থ মুখস্থ করিয়ে দিয়ে থামল। এই ভাবের স্মরণশক্তি দিয়ে ছবি লেখা কি কবিতা লেখা যায় না তো। মুখস্থ কথা, কণ্ঠস্থ সুর, করতলগত রূপ—রূপসৃষ্টির লোকে যাবার একটা একটা ধাপ সত্য, কিন্তু শুধু ধাপ নিয়ে ওঠানাম করলেই ধাপ অতিক্রম করে পৌছোন হল, কোথাও এটা বলিনে।

যে কিছুই মনে রাখতে পারলে না, এই দেখলে শুনলে, এই ভুললে, তাকে কোনো কিছুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সে চুপ করে থাকে নয়তো স্বকপোলকল্পিত একটা উল্টোপাল্টা জবাব দিয়ে বসে। যার প্রখর স্মরণশক্তি সে বিষয়টির যথাযথ হুবহু বিবরণ দিয়ে যায়। এই যে হুবহু দেখানো শোনানো এদের রূপসৃষ্টি তো বলা যায় না—কাক হুবহু আঁকলে, ফটোযন্ত্র ও মানুষ দু'জনেরই করা হল প্রায় একই রকমের এ ক্ষেত্রে, কিন্তু এই হলেই যে কাকের আকৃতির ছাপ পেয়েই কাগজের টুকরো একটা ছবি হয়ে রূপসৃষ্টির শ্রেণীভুক্ত হল তা নয়। কাকের আকৃতির ছাপ এবং কাকের ছবি দুটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। গান্ধার সুর একটা কোন জন্তুর ডাক থেকে নেওয়া—এটা শাস্ত্রের কথা, এবং এর মধ্যে খানিকটা সত্যও আছে। এখন একজন যদি নিজের স্মরণশক্তির জোরে ঐ জানোয়ারের ডাকটুকু ঠিক মনে রেখে বারবার ডেকে চলে, তবে সে গান্ধার সুরই গাইলে একথা কেউ বলে না। ঠিক এইভাবেই একটা কিছুর ছাপ যখন কাগজে ধরা গেল তখন সেটি সেই কিছুর ছবি হল না, ছাপ হল বলতে পারি।

এটা অট্টালিকা, এটা কুটির, এটা শহর, এটা শহরতলী কিংবা এ অমুক ব্যক্তি সে অমুক লোকটি—দেখে আঁকার শক্তি নিয়ে এ পর্যন্ত ধরা চলল। এইভাবে যা রইল তার কাজ রূপটাকে ধরে দেওয়া মাত্র, চিনিয়ে রাখা মাত্র, কথাটাকে ধরে রাখা জানিয়ে রাখা মাত্র। দরকার হলেই যাতে সেটাকে ঠিকঠাক পায় এইজন্যই রইল তারা ধরা হাতের মুঠোয়, কণ্ঠে গাঁথা বা মস্তিকে বন্ধ করা—ঘরে ধরা দরকারি বে-দরকারি নানা জিনিসের মতো, অভিধানে ধরা নানা কথার মতো।

অভিধানে ধরা কথা—তাই নিয়েই তো কবিতা নভেল রূপকথা সবই লেখা হয়, কিন্তু তাই বলে অভিধানকে রূপকথাও বলা চলে না, কবিতা নভেল কিছুই বলা চলে না। ব্যাকরণ ধরে কর্তাকর্ম ইত্যাদি নিয়মে কথা সাজিয়ে গেলে কিংবা ঘটনাপরম্পরার অন্তর্গত করে সব কথা বলেও দেখি সেটা খবরের কাগজের প্রবন্ধ হয়, সাহিত্য হয় না, রূপ-রচনা হয় না। উত্তমাধম ভাবে এক দল লোক বসিয়ে তার ফটো—সে তো একটা নিপুণভাবে লেখা চিত্রের লোক-সন্নিবেশের সমান হয়ে উঠতে পারে না।

কথা সুর আকৃতি স্মরণশক্তি এদের শক্ত করে ধরলে—তালাবন্ধ ঘরে যেভাবে জমা। টাকা ধরা থাকে লোহার বাক্সয়,—খরচের বেলায় কথা উঠল মানুষটা কিভাবে কেমন করে তা খরচ করলে! কেমন ভাবে রূপ প্রকাশিত হল কথায় সুরে রঙে রেখায় নানা অঙ্গভঙ্গিতে—এইখানে এল মানুষের মন নিয়ে কথা, ভাব নিয়ে

কথা, শুধু বাক্স খুললেম আর টাকা দিলেম তা নয়, কিসের কি মূল্য দিলেম, কোন কথার সুরের রঙের রেখার বা অঙ্গভঙ্গির বিনিময়ে কতখানি রস ভাব সৌন্দর্য ইত্যাদি রূপরচনার জন্যে পেয়ে গেলেম এ বিচার বিতর্ক ওঠে। রূপ-সংগ্রহের মুহূর্ত—সেখানে স্মরণশক্তি কাজ করছে, আর রূপ-রচনার মুহূর্ত—সেখানে মানুষের মনে ধরা নানা বিষয়ের নানা জিনিসের স্মৃতি কাজ করছে।

রাস্তায় যেতে দেখলেম একজনকে, অচেনা লোক, মনে তার কোনো স্মৃতি ধরে গেল না কিন্তু স্মরণশক্তির দ্বারা তার চেহারা ধরা গেল আমার কাছে, বৃদ্ধ কি যুবা কি শিশু মাত্র হয়ে, কালো কি সুন্দর কি শ্যামবর্ণ হয়ে লম্বা কি খাটো কি গোলগাল মাঝারি মানুষটি হয়ে রইল সে ধরা—এর বেশি একটুও নয়। পথ চলতে হাজার হাজার রূপ-সংগ্রহের মধ্যে সেও একটা সংগ্রহ—তলিয়ে রইল, হয়তো তার কথা মনেই পড়ল না আর। কিন্তু ঐ একজনের সঙ্গে ভাব হয়ে যাক, ঘরে বাইরে ওর স্মৃতি জড়িয়ে যাক মনে, তখন বুকের কৌটোয় সে যত্নে ধরা রয়ে গেল, বিশ্বের জিনিসের যত্নে ধরা স্মৃতির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল সে। একটি মুখের স্মৃতি—সে যে ফুলের স্মৃতি চাঁদের স্মৃতির সঙ্গে সমান হয়ে ওঠে, একটুখানি মুখের হাসি, একটি কথার একটু সুর—সে যে আকাশের আলো জলের কলধ্বনির সঙ্গে সমান হয়ে যায়, তা এই স্মৃতিশক্তির জাদুমন্ত্রে। স্মরণশক্তির মধ্যে বদ্ধ রূপ সে সসীম এবং চিরকালেরও নয়, কিন্তু স্মৃতির মধু যাকে স্পর্শ করলে সেই রূপটি জলে স্থলে আকাশে অসীম রূপের সঙ্গে কালের অতীত জিনিস হয়ে দুলতে থাকল। জগতের যে কেউ এবং যা কিছু মন বিঁধলে তারই স্মৃতি রইল মনে, সেই স্মৃতি যখন রূপ পেতে চলল, তখন মনোহর পথ ধরে প্রকাশ করতে চলল আপনাকে। বড় দুঃখের সঙ্গে জড়ানো কোনো স্মৃতি মনোহর, বড় সুখের সঙ্গে জড়ানো স্মৃতি সেও মনোহর, কবিতায় গানে নাট্যে নৃত্যে ছবিতে মূর্তিতে, এর অজস্র সাক্ষী ধরা রয়েছে।

তাজবিবির স্মৃতি বড় দুঃখের, কিন্তু সেটা তো একটা দুঃখের বিমলিন প্রকাশ হল না, কত সুখ বিলাস কত মধুরতা কত সৌন্দর্যের স্মৃতির সঙ্গে এক হয়ে বাজল সেই বেদনার সুর। বাঁশির গান সকরুণ সুখের স্মৃতি দিয়ে বাজে বুকে, "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে",— এসব তো মিছে কথা নয়!

স্মৃতি একেরই কিন্তু ছন্দে-বন্ধে নানা প্রবন্ধে বারেবারে তার কথা বলে শেষ করা গেল না,—আর-একটা কিছু স্মরণ করে রাখা গেল, সময়মতো সেটা উচ্চারণ করে দিলেম ঠিকঠাক,—এ অন্য জিনিস।

চীনের প্রাচীর আর তাজমহল পৃথিবীতে দুই আশ্চর্য রচনা বলেই বিখ্যাত, কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে রচনা-মুহূর্তের দুটো আশ্চর্য রহস্য ধরা পড়েছে। চীনের প্রাচীরের বেলায় স্মৃতি কাজ করছে না। রাজশক্তি জোর হুকুম জোর তলব দিলে গঠনশক্তিকে শত্রুকে বাধা দিতে প্রকাণ্ড শক্তিমান অজগরের মতো, প্রাচীর সেখানে পর্বত ঘিরে দেখা দিলে দুই দেশের মানুষের মধ্যে;—স্মৃতি ধরলে না মানুষ, পাথরের প্রাচীরের শক্তিকেই ধরে গেল। তাজমহলে সেখানে স্মৃতির স্পর্শ অম্লানভাবে পড়ল। বর্মার একটি মন্দিরের প্রাচীর সেও সাপের মতো আঁকাবাঁকা, কিন্তু চীনের প্রাচীরের মতো শক্ত ব্যাপার নয়, কোনো কালের রূপকল্পনা তারি স্মৃতি ঢেউ দিয়ে এল মন্দির ঘিরে নিতে। পদ্মার পুল সেখানে শক্তি এবং হয়তো বিলাতের কোনো একটা শক্ত বাঁধুনির স্মৃতিও আছে একটু একটু, কিন্তু চীন দেশের বাসন্তী নদীর (Yellow River) একটি শাখার এপার-ওপার এক করে একটা মনোহর সেতু দুই তীরের মাটির বুকের একটুখানি স্পন্দনের স্মৃতি ধরে প্রকাশ পেলে সুন্দর বাঁকা নিয়ে, তার সঙ্গে তুলনায় পদ্মার ব্রিজে শক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই বললেও চলে, কিন্তু রূপদক্ষ এই পদ্মা ব্রিজ

আঁকুক স্মৃতির মাধুরী মিশিয়ে—সে হবে একটি অপূর্ব ছবি, —ফটোগ্রাফ যা দিতে পারে না, আসল ব্রিজ যা দিতে পারে না।

রূপের সংক্ষেপ, রূপের বিস্তৃতি, এমনি নানা ব্যাপার যা রূপকর্মের অন্তর্গত—সবই নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের স্মরণশক্তি এবং স্মৃতি দ্বারা। স্মৃতির প্রেরণা না স্মরণশক্তি ধীশক্তি এমনি নানা শক্তির প্রেরণা এই নিয়ে রচনা সমস্ত নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে আপনা আপনি। রূপকর্মের খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে সহজ উপায়ে রূপের সঙ্গে পরিচয় করে নেওয়া হতে পারে এই স্মৃতির এবং যাকে বলতে পারি যান্ত্রিক শক্তির পথ ধরে। যা নিজের মনে ধরা রইল না, সে মুঠোতেই থাক গলাতেই থাক বা মাথাতেই থাক তা নিয়ে মনোহর কিছু করা মুশকিল। আমার যা মনে ধরল সেইটিকেই অপরের মনে ধরানোর পক্ষে কত যে বাধা তার ঠিক-ঠিকানা নেই, স্থান কাল পাত্র এরা নানা বাধা নিয়ে দাঁড়ায় রসদাতা ও রসপিপাসুর মধ্যে। রূপরচনার মর্ম উদঘাটন সেও স্থান কাল পাত্র সাপেক্ষ হয়ে পড়ে—এ বিপত্তি নিবারণের উপায় তো রচয়িতার হাতে নেই, সে আছে রসিক সমালোচকদের হাতে। সমালোচনা একটা শক্তির কাজ, তার দ্বারা তাই সব সময়ে রসের ব্যাপারের ঠিক যাচাই হয় না, রচনার শক্ত দিকের কথাই জানিয়ে চলে সমালোচনা। স্মৃতির প্রকাশ সে পথের মতো বিকাশের পরিপূর্ণতা পেয়ে থামে, পরিমল তার বাতাস বয়ে আনে, যারা ফুল দেখছে না তাদের কাছে জানায় ফুল ফুটল। রসিকের সমালোচনার শক্তি যেখানে বাতাসের পরিমল বহনের মতো কাজ করে, সেখানে রচনার রস বিস্তৃতি পায়, তখন রসিকের স্মৃতির সঙ্গে রচয়িতার স্মৃতির মিলনে রস-ভোগের বাধা সমস্ত দূর হয় এক মুহূর্তে। বাতাস একাধারে সু-কু দুয়েরই খবর দেয়, সে সংবাদবাহক, কিন্তু রসিক সে শক্তিধর জীব, রসের খবরই নেয় ষট্‌পদের মতো।

মক্ষিকার সমালোচনা সে রূপের ও রসের বিপরীত সমালোচনা। রচয়িতার ইচ্ছার সঙ্গে যেমন রচনার যোগ তেমনি মক্ষিকা ও ষট্‌পদ দুই সমালোচকের ইচ্ছার সঙ্গে রচনার উপভোগেরও যোগাযোগ, কাজেই একই কথা নানা রকমে বলে মানুষ এবং সেই একই কথার নানা ব্যাখ্যা দেয় মানুষ। কাল হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিচারক এ ক্ষেত্রে, সে দেখি কোনো রচনাকে স্মৃতির মধু দিয়ে অমর করে রাখলে, কোন কিছুকে একেবারে লোপ করে দিয়ে গেল।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এইভাবে কত জিনিস কালে কালে স্মৃতির ও সৌন্দর্যের ভাণ্ডারে ধরা রইল, আবার কত জিনিস একেবারে লোপ পেয়ে গেল, তার হিসেব নিলে দেখা যায় যে, যা স্মৃতির বিষয় হল সেই রইল ধরা, আর যা তা না-হল সে গেল মরে। স্মৃতি জাগিয়ে রাখার হিসেবের মধ্যে রচনার নিত্যতা এবং অনিত্যতা অনেকখানি ধরা আছে দেখি।

'মত্ত দাদুরি' এরি ডাকটুকু যদি কোনো শক্তি ও কৌশলে ধরে কানের কাছে বাজানো যায় তবে সেটা বিষম ব্যাপার হয়ে ওঠে, কিন্তু বর্ষারাতের নানা স্মৃতির দ্বারা মধুর হয়ে যখন সে ডাক আসে কানে, তখন কবিতা লেখা হয়ে যায় দাদুরির ডাকের উপর।

"মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওয়ত ছাতিয়াঁ।"

সানায়ের পোঁ এমন কিছু মিষ্টি নয় কিন্তু স্মৃতির স্পর্শ হল তাতে, তাই মধুর লাগল।

একটা চন্দ্রোদয় কি সূর্যোদয় কি সমুদ্র কি পর্বত দেখে কোনো একটা কবিতার দু'-তিন ছত্রের স্মৃতি মনে জাগে, সেখানে কবির স্মৃতি পথ খোলে একভাবে সাধারণের দর্শনের। নিজের চোখ এবং মন দিয়ে জিনিসটাকে ধরা হল না এখানে; তা যদি হত তো সবাই রূপদক্ষ হয়ে যেত।

একই জিনিসের বর্ণনায় রচয়িতাতে রচয়িতাতে বিভিন্নতা দেখি যখন, তখন জানি রূপটিকে দুয়ের স্মৃতি দুইভাবে ধরলে। সাধারণ মানুষের বেলায় এ হয় না। তারা সবাই দেখে মাঠকে মাঠ পাহাড়কে পাহাড় সমুদ্রকে সমুদ্র মাত্র,—যেমন ভূগোলের ক্লাসের সব ছেলেই পর্বতের চিহ্নটাকে পাহাড় ছাড়া সমুদ্র বলে না। কিন্তু ওর মধ্যে একটা ছেলে যদি তার রচনাশক্তি থাকে তবে হয়তো সে পাহাড়ের চিহ্নটাকে এক সাপ বা বিছে দেখে ফেলে এবং মাস্টারের ধমক খায়, সহপাঠীদেরও টিটকারি পায়, অথচ এই স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেবার ক্ষমতা রূপদক্ষের সাধনার বিষয় এ তো অস্বীকার করা চলে না।

একটা পর্বতের রূপ যে প্রকাশ-বেদনার কথা জানায়, একটি ফুলের রূপও সেই প্রকাশ-বেদনার কথা বলে। মানুষের হাতে এত বড় ভাষা নেই যে এই বেদনা পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে, তাই মানুষের বুকে রূপের জন্য বেদনা বাজে, 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে'। সেই বেদনায় স্মৃতি বয়ে চলে মানুষ, সেই বেদনার কথা নানা সুরে ছন্দে নানা রঙে রেখায় ধরে উল্টেপাল্টে প্রকাশ করতে চায় মানুষ। রূপদক্ষ চায় মানুষ যে বেদনা ধরলে বুকে তারি স্মৃতিকে উল্টেপাল্টে নানা ভাষায় প্রকাশ করতে। রূপের অন্তরে যে বেদনা বাজছে তারি সাক্ষী রূপ রচনা। স্মৃতির করুণ স্পর্শ দিয়ে যে সমস্ত রচনা মানুষ করে চলে তা মধুর হয়ে ওঠে, মনোহর হয়ে ওঠে, আর শুধু রূপকে দৃষ্টিশক্তি বাকশক্তি এইসব দিয়ে যেখানে ধরলে মানুষ সেখানে রচনাতে শক্তির পরুষ ছাপ পড়ল। রূপের সঙ্গে ভাব হল তখনি, যখন রূপের বেদনার স্মৃতি রূপদক্ষের প্রাণে গিয়ে পড়ল; রূপের সবটা জয় করে নেওয়া হল তখনি, যখন স্মৃতির বিষয় করে নেওয়া গেল রূপকে। মানুষের রচা তাবৎ সুকুমার শিল্প বিশ্বে ধরা রূপের সঙ্গে এই ভাবের অন্তরের সম্পর্ক পাতিয়ে বসার সাক্ষ্য দেয়।

অন্তরের সবটুকুর স্পর্শ পেয়ে কোথায় মধুর হয়ে ফুটল রূপের নিবেদন, কোথায় শক্তির স্পর্শ পেয়ে রূপ সে হয়ে গেল স্থির নির্বাক, রূপচর্চার বেলায় এই দুই রকমের প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে চলা চাই—না হলে দুটো রচনার রসের তারতম্য ধরা পড়ে না।

রূপ বেদনা জানাচ্ছে, আকাশ বেদনা জানাচ্ছে, বাতাস বেদনা জানাচ্ছে, জল চলেছে বেদনা জানিয়ে, মাটি কাঁপছে রঙের বেদনায়, আলোর বেদনায়। বড় মধুর এই বেদনার স্মৃতি সমস্ত—দুঃখের বেদনা, সুরের বেদনা, সুরূপের বেদনা, কুরূপের বেদনা। সবাই মিনতি জানাচ্ছে, সবাই বলছে 'মনে রেখো মনে রেখো'। সকালে পূর্বদিক বলছে— 'আজকের প্রকাশ মনে রেখো', সন্ধ্যার সূর্যাস্ত বলে যাচ্ছে—'এই শেষ, মনে রেখো, ভুলো না, ভুলতে দিও না—এই নিবেদন'। শুকতারা আসে, সন্ধ্যাতারা আসে, ঋতুর পর ঋতু আসে মনে ধরাতে মনে পড়াতে ধরা পড়তে, মানুষের মাঝে তারা বুকের বাসা খুঁজে বেড়ায়। মানুষের মধ্যে কারো প্রাণে তারা স্থান পায় এই আশায় চেয়ে থাকে জল স্থল অন্তরীক্ষে ধরা রূপ সমস্ত। সামান্য মানুষ সন্ধ্যাতারার কথা বোঝে না, শুধু দেখে বলে, কি সুন্দর! কিন্তু রূপদক্ষের প্রাণে তারার কথার স্মৃতি জাগে সুর দিয়ে কথা দিয়ে—

"তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।

* * *

যদি থাকি কাছাকাছি

দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি
তবু মনে রেখো।”
—রবীন্দ্রনাথ

একথা আজকের কবি শুধু নয় প্রাচীন কবিরাও বলেছেন বারবার করে। শ্রীরাধিকাকে দিয়ে তাঁরা মিনতি জানিয়ে দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। এর মধ্যে দুই কথা নেই,—রূপ চাচ্ছে স্মৃতির অমৃত পরশ, স্মৃতির মধ্যে জাগতে চাচ্ছে রূপ! রসের ঝরনা বিরাট শক্তির প্রেরণা স্মৃতির মাধুর্যে ডুবিয়ে দিয়ে বইছে। স্মৃতিশক্তি হচ্ছে সোনার কাঠি, ঘুমন্ত রূপকে জাগিয়ে তোলে, লাবণ্য আনে, ভাব ভঙ্গি সবই আনে রূপে, আর শুধু রচনাশক্তি বাচনশক্তি তা নিয়ে রূপ কাঠামো পায় সুন্দর, ভাব ভঙ্গি সবই পায়, কিন্তু বেঁচে ওঠে না। একপাটি জুতো সে যতক্ষণ স্মৃতির স্পর্শ পেলে না ততক্ষণ জুতো মাত্র পূর্বেই বলেছি, কিন্তু এই জুতোপাটি কিংবা একটুখানি ছেঁড়া কাঁথা যখন কারু স্মৃতির স্পর্শ পেলে তখন সিন্ডারিলার জুতো এবং আমাদের ঘরের ছেলেভোলানো ছড়ায় যে দু’পাটি অপূর্ব জুতোর খবর পাই, সেই লাল জুতুয়া হয়ে দেখা দিলে।

আর্য ও অনার্য শিল্প

ভারত-শিল্পের ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব, ছবি মূর্তি মন্দির মঠ ইত্যাদির সঠিক ছাপ ও ফটোগ্রাফ দিয়ে হাজার হাজার বই ছাপা হল। চোখ এবং মন দুই নিয়ে এই বিরাট সংগ্রহের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে করতে একটা কথা বারবার আমার মন বললে— কই, এ তো সম্পূর্ণ ইতিহাস পেলেম না, এ যেন একখানা পুঁথির শেষ গোটাকতক অধ্যায় মাত্র পেলেম, পূর্বের অধ্যায়গুলো হারিয়ে গেছে। চোখ চলতে চলতে বৈদিক যুগের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলে সামনে হিমালয়-প্রমাণ কুয়াশার প্রাচীর, তার ওপারে ভারত-শিল্পের ধারা শব্দ দিয়ে ঝরছে কিন্তু দেখা নেই সে ধারার। ভারত-শিল্পীদের রচনা সমস্ত ধারাবাহিকভাবে যেমন যেমন প্রকাশ পেয়েছিল তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন তো আমাদের চোখের সামনে ধরা নেই আজ,—এখানে গোটাকতক টুকরো, ওখানে খানিক, মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত ফাঁক,—এইভাবে দেখা দিচ্ছে সব। সুতরাং খানিকটা কল্পনার সাহায্য দরকার হয়ে পড়ে বিষয়টা চর্চার বেলায়। চোখের দেখা গাছের শাখা পত্র পুষ্পের মতো ভারত-শিল্পকলার তিন-চার যুগব্যাপী এলমেলোভাবে ছড়ানো প্রত্যক্ষ নিদর্শন কেবলি যদি দেখে চলা যায় অপ্রত্যক্ষ মূল্যের রহস্য বাদ দিয়ে, তাতে করে তার আগাগোড়া জানা হল বা দেখা হল তা বলা তো যায় না। চোখ এবং মনকে পাঠাতে হবে সেখানে মহাকালের মধ্যে যেখানে ইতিহাসের অখ্যাত যুগের ভারতবাসী আরণ্যক ঋষিরা যাঁদের নাম দিলেন অন্যব্রত—তাঁরা কাজ করেছেন।

তত্ত্ব অনুসন্ধানের জায়গায় কল্পনার প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু শুধু চোখে দেখা যাচ্ছে যা, তা তো বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারে না আমাদের। ধর, পুষ্পকরথের কথা পড়ে যদি সত্যিই কল্পনা করি আর্যদের পূর্বপুরুষ তাঁরা আকাশে উড়তেন তবে ভুল কল্পনা করা হয়, কিন্তু আজকের দিনে প্রত্যক্ষ হচ্ছে যেসব মন্দির মঠ তা থেকে আর্যপূর্ব জাতি কাঠ ও বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে ঘর বাঁধতেন এটা কল্পনা করা অন্যায় হয় না; কাজেই যুক্তিসঙ্গত কল্পনার স্থান আছে তত্ত্বানুসন্ধানের বেলায়। কি শিল্পের দিক দিয়ে কি ধর্ম-কর্মের দিক দিয়ে, আমাদের সব চিন্তা যেখানে গিয়ে ঠেকে, সেই বৈদিক যুগে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যাক। সেখানে গিয়ে দাঁড়াই যেখানে আরণ্যক ঋষিরা যজ্ঞক্রিয়া করছেন; এই হল আর্য সভ্যতার জ্ঞাত যা কিছু তার প্রাচীনতম সীমানা, এর পরেই আবছায়া—সমস্ত অন্যব্রত এবং অকর্মা বলা যায় যাঁদের, তাঁরা কল্পনা ধরে মনের সামনে আসা-যাওয়া করেন।

যাঁদের আমরা আর্য বলছি তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ড কেমন ছিল, তাঁদের মধ্যে কি কি শিল্প প্রচলিত ছিল, কি ভাবতেন তাঁরা, এবং কিভাবে চলতেন তাঁরা, তার ছবি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে আজকের কালে, জানবার বিষয় অল্পই আছে বললেও হয় এই আর্যগণের সম্বন্ধে। কিন্তু এইসব অন্যব্রত ও অকর্মা যাঁদের উদ্দেশ করে ঋষিগণ বারবার নানা মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন তাঁরা ঋষিদের মিত্র ছিলেন না এটা ঠিক। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন আদিতম যুগ থেকে এইসব অন্যব্রত এবং অকর্মা আরণ্যক ঋষিদের আশেপাশে কেউ ঋষিদের অনুষ্ঠিত ব্রত

থেকে স্বতন্ত্র ব্রত নিয়ে রয়েছেন, কেউ একেবারে ক্রিয়াকর্ম যাগযজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছেন, এঁরা ভারত-শিল্পচর্চার বেলায় কোন স্থান অধিকার করেন এসে সেটা দেখার বিষয়।

নিজেদের সঙ্গে সকল বিষয়ে ধর্মে কর্মে পৃথক যাঁরা, তাঁদের বলেছেন ঋষিরা অন্যব্রত। অকর্মা বলা হল তাঁদের যাঁরা ক্রিয়াকাণ্ডহীন জীবনযাত্রা ধরে রয়েছেন। অন্যব্রত—তাঁরা ব্রতধারী, কিন্তু আর্যদের সমান ব্রত পালন করছেন না—যেমন আজকের হিন্দু এবং ক্রীশ্চান দু'জনেই একই আর্যজাতি, কিন্তু ব্রতের দিক দিয়ে উভয়ে উভয়ের কাছে স্বতন্ত্র ও অন্যব্রত বলে পরিচিত হচ্ছে।

ঋষিরা যাদের বলেছেন অকর্মা, নিশ্চয়ই তাদের কোনো জীবলীলার কোনো চিহ্ন ধরা নেই কোথাও—তারা খেয়েছে, বেড়েছে, মার খেয়েছে ও মরেছে। তাদের ভাবনা চিন্তা ছিল নিশ্চয়, কিন্তু সেগুলো পাথরে মন্দিরে সাজে সজ্জায় নাচে গানে নিরূপিত হতে পেলে না। মানুষের ক্রিয়াবান অবস্থারই প্রকাশ হল শিল্পকলা, অকর্মা তারা অশিল্পী, শুধু তারা বর্বরের মতো অন্যের ক্রিয়া পণ্ড করেছে। নিষ্ক্রিয় এরা সব ছায়ামূর্তির মতো কেবল বাসই করেছে ভারতবর্ষে, ভূ-ভারতের ইতিহাস গঠনের মধ্যে এদের স্থান হয়নি, জীবনব্রত-ক্রিয়ার মধ্যেও এদের আসন পড়েনি, মরার পরে এদের হাড় মাংস ভারতের মাটিকে খানিক রসিয়ে দিয়ে গেছে মাত্র। এই সমস্ত নিষ্ক্রিয় মানুষ ক্রিয়াবান অন্যব্রত এবং যাজ্ঞিক আর্যদের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা এবং হয়তো আরণ্যক ঋষিদেরই পূর্বতন যুগের বর্বরাবস্থার কথা জানাচ্ছে। জন্মায় না মানুষ একেবারেই ঋষি হয়ে, আগে বর্বর তারপর অনেকগুলো অবস্থা অতিক্রম করে তবে তো আর্যাবস্থা! একই মানুষ যেমন জাগার আগে ঘুমিয়ে থাকে, আজকের ক্রিয়াকর্মে পটু ছেলে একদিনের অকর্মণ্য শিশু অবস্থায় যেমন পড়ে আছে দেখছি, তেমনি এই সমস্ত অকর্মা তারা যে কর্মঠ ব্রতক্রিয়াশীল অন্যব্রত এবং আর্যদের একটা আদিম অবস্থার কথা জানায় না, তাই বা কে বলবে! ঘুমন্ত, অর্ধজাগরিত এবং জাগ্রত এই তিন অবস্থা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট, অপেক্ষাকৃত ক্রিয়াশীল এবং পরিপূর্ণ ক্রিয়াবান—এই নিয়মে সব দেশের সব মানুষই উন্নতির পথে এগিয়েছে, ভারতবর্ষের আর্যগণের বেলাতেও যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি সেটা ধরে নিতে পারি। ছেলেটা অকৃতকর্মা, পড়লে না, শুনলে না, সংসার পাতলে না—আর এক ভাই সংসার পাতলে অফিসে গেল, রোজগারী হল, এবং আর এক ভাই সে প্রকাণ্ড চিন্তাশীল মহাপুরুষ ঋষি হয়ে বসল। একটি পরিবারের মধ্যে সহোদরে সহোদরে এই পার্থক্য যখন স্বভাবের নিয়মে ঘটছে দেখি, তখন একই জাতির কেউ পেলে আর্য আখ্যা কেউ পেলে অন্যব্রত, কেউবা অকর্মা দস্যু ইত্যাদি বদনাম—এতে আশ্চর্য হবার কি আছে!

জীবতত্ত্ববিদ যাঁরা তাঁরা মানুষের জাতিবিভাগ করেছেন মুখাকৃতি ও দৈহিক মাপজোখ দিয়ে, তাঁরা কাউকে বলেছেন আর্য, কাউকে অনার্য। সেদিক দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে যে আর্যজাতি এসে ভারতবর্ষে অনার্যদের মধ্যে বসতি করলেন এবং অনার্যদের ক্রমে সকল দিক দিয়ে জয় করে আর্যাবর্ত বলে প্রকাণ্ড একটা রাজত্ব স্থাপন করলেন। এ ঘটনার অনুরূপ ঘটনা আজও ঘটছে দেখব—আজকের মিশনারি তারা এইভাবে আফ্রিকা ফিজি প্রভৃতি জায়গায় ধর্মবল এবং বাহুবল নিয়ে ক্রিয়া করে চলেছে অকর্মা ও অন্যকর্মীদের মধ্যে; শুধু এই নয়, অপেক্ষাকৃত সুসভ্য কিন্তু অন্যব্রত অথচ একই আর্যজাতি তাদের মধ্যেও পশ্চিমের আর্য সভ্যতার দূত সমস্ত নানা ভাবে নানা ক্রিয়া করে চলেছে আজকের ভারতবর্ষে। এ ছাড়া আকৃতির হিসেবে দেখছি আর্য ছাঁদের মানুষ, কিন্তু বৃত্তির হিসেবে দেখছি রাক্ষস বা দস্যু এবং বুদ্ধির হিসেবে একেবারে বর্বর—এরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পৃথিবী জোড়া আর্যদের মধ্যে আজও ছড়ানো দেখতে পাই। সুতরাং যদি বলি ভারতের মধ্যে একটা জাত

আর্যব্রত, অন্যব্রত এবং অকর্মা এই তিন থাকে বিভক্ত ছিল ভারত-শিল্পের উৎকর্ষের শৈশবাবস্থায়, তবে একেবারে যে অসঙ্গত কল্পনা করা হল তা নয়।

আর্য যাঁরা ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে বাস করেছেন, তাঁদের মধ্যেই আমরা নানা শ্রেণীর নানা থাকে বিভক্ত মানুষ দেখি—একদল আরণ্যক, তাঁরা বনে বাস করেছেন, একদল বণিক, একদল যোদ্ধা, একদল চিকিৎসক ও জাদুকর, এঁরা সবাই একটা জাতিরই ভিন্ন ভিন্ন থাক—এঁদের মধ্যে কারিগরদের নাম পাই যাঁরা স্পষ্টভাবে অন্যব্রত।

হঠাৎ একদল মানুষ সিঁড়ি না ভেঙে তেতলায় উঠে এল, উড়োকল সৃষ্টি না করে উড়ে পড়ল আকাশে—এ অসম্ভব কল্পনা আর্টিস্ট হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে বলা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। আর্যরা পেয়ে গেলেন এবং নিয়ে এলেন এদেশে সকল সভ্যতা, সকল বিদ্যা হঠাৎ—এ বললে অনেক আপদ এড়িয়ে যাওয়া চলে কিন্তু নিজের মনের কাছ থেকে খোঁচার শেষ হয় না।

আর্যজাতি বলতে মস্ত একটা দল যা পৃথিবীর অনেকখানি জুড়ে বসবাস করছিল। তাদের উপরে পণ্ডিতেরা নানা দিক থেকে আলো ফেলে আমাদের দেখিয়েছেন যে, যেমন এদের চেহারায় মিল তেমনি ভাষাতেও মিল—এই মিলটা ক্রিয়াবান, এবং ক্রিয়াহীনে একেবারেই লক্ষ্য করা যায় না। এ-দল ব্রত করে, যজ্ঞ করে, ও-দল ব্রতভঙ্গ করে যজ্ঞনাশ করে; এ-দল গড়ে, ভাষা দিয়ে গড়ে, সুর দিয়ে গড়ে, হাত দিয়ে গড়ে, মন দিয়ে গড়ে, বুদ্ধি দিয়ে গড়ে; আর ও-দল তারা গড়তে পারে না—ছেলেরা যেমন তেমনি—কেবলি গড়া জিনিস পেলেই ভাঙে; এরা কালো ওরা সাদা। এই শেষের দলকে অকর্মা বলে ধরে চলল, কিন্তু এই আর্য এবং অন্যব্রত এদের দুটো জাত বলে না ধরে যদি একই জাতির দুটো থাক বলে ধরা যায়, তাহলে আর্য শিল্প সাহিত্য ভাষা ইত্যাদির ক্রমবিকাশ পরিষ্কারভাবে ধরার পক্ষে অনেকখানি সুবিধা পাওয়া যায় বলে মনে হয়।

অকর্মা যারা ছিল তারা সাদাই থাক বা কালোই থাক কোনো চিহ্ন ধরেনি নিজ নিজ কর্মের, শুধু এরা অন্যের ক্রিয়া পণ্ড করেছে—এইটুকু ঋষিদের কথা থেকে পাচ্ছি, সুতরাং এদের আর্য ও অন্যব্রতদের থেকে সম্পূর্ণ অন্য বলে ধরলে বিশেষ কাজ আটকায় না। কিন্তু অন্যব্রত অবস্থার মানুষের আচার ব্যবহার ক্রিয়াকাণ্ড সমস্তর হিসেব যা আজকের ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সন্ধান করে বার করেছেন, তার সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ আর্যজাতির ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে মিল দেখা যাচ্ছে এবং সেই রাস্তা ধরে ইউরোপে যে সকল আর্যগণ বসতি করছেন তাঁদের শিল্প ধর্ম কর্ম সমস্তেরই নতুন পন্থায় চর্চা হচ্ছে, ভারত-শিল্পের বেলায় এর ব্যতিক্রম করা ঠিক নয়।

আর্য বলতে একটা পদবী বোঝায়, কিন্তু এই পদবীতে উপনীত হবার আগের ধাপ যে আর্যের অতিক্রম করেননি, এমন তো নয়! এক সভ্যতার এক ভাবের পরিক্রম ও আন্দোলন বহু দেশ বহু জাতি বহু যুগ ধরে হয়েছে। আর্যাবর্তের ঠিক রূপটি কি এই? না বলব অনেকখানি বিস্তার নিয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চক্রে যা রয়েছে তার পরিণতি হল একে? একটা আবর্তের দুটো গতি আছে, সে দুটি হচ্ছে বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী, তলিয়ে রয়েছে যেটুকু তা বিস্তার পেতে চাচ্ছে, উঠে আসতে চাচ্ছে, ছড়িয়ে রয়েছে যতখানি তা ঘূর্ণিপথে তলিয়ে চলেছে একটি দিকে। যাগযজ্ঞে ব্রতী হল যারা সেই সব আরণ্যক মানুষ এবং তাদের থেকে বাইরে বাইরে নানা ব্রতধারী—এরা হয়তো ভিন্নজাতীয়, হয়তো নয়, কিন্তু আর্যাবর্তের আগাগোড়া গঠন এরা দুয়ে মিলে দিলে,—তলার জল

এবং উপরের জল যেভাবে রচনা করে আবর্ত, সেইভাবে কাজ করলে আর্যধর্ম আর্যশিল্প আর্যভাব—এক কথায় আদ্যন্ত মহাভারতের সবটা, এ যেন স্পষ্ট দেখি।

যজ্ঞাদি কর্মনিরত একটি মণ্ডলী, এরি বাইরে যারা তাদের সম্বন্ধে ঋষিরা বলছেন— "আমাদিগের চতুর্দিকে দস্যুজাতি আছে, তাহারা যজ্ঞ করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়, তাহাদের ক্রিয়া ভিন্ন রকমের। হে ইন্দ্র, তুমি তাহাদিগকে বিনাশ কর।" যারা মানতে চায় না এই সমস্ত আরণ্যক ঋষিদের ক্রিয়াকাণ্ড, হঠাৎ মনে হয় তারা সত্যিই কেউ ছিল না আর্যদের, না হলে এমন করে অভিসম্পাত? গোঁড়ার দল, তারা বৈদিক যুগেও ছিল এখনো আছে, জ্ঞাতিবিবাদ তখনো ছিল এখনো আছে, এ-দল শাপ দেয় ও-দলকে, অথচ জাতে এক তারা—এও দেখি জগতে। এমন কোনো সভ্যতা কোনো ধর্ম নেই যেখানে একে ও অন্যে বিবাদ ও মনান্তর নেই; পণ্ডিতদের মতে আমরা আর্য, ইউরোপীয়রাও আর্য, কিন্তু ব্রত নিয়ে মারামারি তো ঠেকেনি এতে করে। হিন্দু ব্রাহ্ম দুই দলই আর্যজাতি অথচ ব্রত এক নয়। সুতরাং আর্য ও অন্যব্রত দুটো জাতি না বলে একই জাতির দুটো থাক বলে কল্পনা করলে একেবারে ভুল যে হয় তা নয়—ক্রিয়ার দিক দিয়ে ভিন্ন, চিন্তার দিক দিয়ে উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীতে বদ্ধ এ বললেও বলা চলে। চেহারায় চেহারায় ভিন্নতা, বর্ণে বর্ণে ভিন্নতা, ভাষায় ভাষায় ভিন্নতা প্রকৃতির নিয়মে ঘটছে দেখি, তাই দেখে জাতিবিভাগ স্থির করি মানুষে মানুষে; এক দেশের শিল্পে অন্য দেশের শিল্পে যে ভিন্নতা তাও এইভাবে স্থির করতে যাই আমরা। কিন্তু এই বাহিরে বাহিরে ভিন্নতা এটা কি মানবতত্ত্বের কি মানবের শিল্পতত্ত্বের চরম কথা নয়—তাবৎ মানুষ যা নিয়ে এক, তাবৎ শিল্প আর্য অনার্য নির্বিশেষে যা নিয়ে এক, তাও চোখের এবং মনের সামনে এসে পড়ে।

আমের মঞ্জরী সকালের কুয়াশার মধ্যে রয়েছে, আম রোদের দিনে পেকে টুসটুস করছে, —কি রসের দিক দিয়ে কি আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গি সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এরা দুটি। গুটিপোকাতে আর প্রজাপতিতে এক জাতি বলে কিছুতে ধরা যায় না—এ চলে মাটি আঁকড়ে, ও চলে বাতাসে আলোতে গা ভাসিয়ে, খেচরে ভূচরে যতটা তফাত ততটা এই একই জীবের দুই অবস্থায়। একই মানব এবং সেই মানবজাতির মধ্যে একমাত্র আর্যগণকে নিয়ে প্রকৃতিদেবী যে ওলট-পালট খেলেননি এইভাবে তা কে বলবে? মাটি হল সোনা, জল হল মেঘ, কাচ হল হীরক, কালো হল সাদা, যুগ-যুগান্তর বহে এই খেলার স্রোত চলে আসছে এটা তো অস্বীকার করা যায় না। আজকের সৌরজগৎ একদিন এক টুকরো নীহারিকার বাষ্প ছিল একথা যদি মানতে পারি, তবে আর্য-শিল্পের গোড়াপত্তন আর্যেতর শিল্পে একথা মানতে দ্বিধা হবে কেন!

নিকৃষ্ট অবস্থা, উৎকৃষ্ট অবস্থা, আর্য অবস্থা, অনার্য অবস্থা এ বললে কোনো গোল নেই। ছোটয় ভাষা নেই, বড়য় ভাষা আছে, ছোটয় ঢেলা খেলা, বড়য় পাথরের মূর্তিকে কেটে লীলা, ছোটয় চলি চলি পা পা, বড়য় নটরাজের লাস্য ও তাণ্ডব, ছোটয় মা মা, বড়য় সা রে গা মা—এই দাঁড়ায় ব্যাপারটা। গাছের শিকড় মাটি থেকে জল টানে, ডাল সেই রসে বাড়ে, পাতা গজায়, ফল ফলায়, ফুল ফোটায়;—এমনি ঘনিষ্ঠতা আর্যে অনার্যে। কেবলি আর্যগণের সম্বন্ধে নয়, আর্যেতর যাঁরা তাঁদেরও সঙ্গে আর্যগণ কিরূপ সম্বন্ধে বদ্ধ তারও সাক্ষ্য দিচ্ছে চতুর্বেদ। আর্য-শিল্প সাক্ষ্য দিচ্ছে আর্যেতর অবস্থার শিল্পের, আর্যচিন্তার প্রবাহ বহন করছে আর্যেতর অবস্থার চিন্তার ধারা। বেদ যদি আর্য বলে একটি মাত্র দলের হত তো একটা বেদই হত, চারখানা মিলে একটা হত না। যেমন চতুর্বেদ, তেমনি চারিদিকের সভ্যতা শিল্পকলা এসব নিয়ে এক আর্য-শিল্প। অতীতকালে আর্যেতর অবস্থাকে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল আর্যদের পক্ষে, কেননা তাঁরা সেই মানব

সভ্যতার উৎকর্ষের প্রাতঃসন্ধ্যায় বর্তমান ছিলেন যখন নতুন আলোয় পূর্ব রাত্রির অন্ধকারকে জড়িয়ে রয়েছে, দিনের গায়ে জড়িয়ে রয়েছে রাতের কৃষ্ণসার মৃগচর্ম।

সব দিক দিয়ে—ভাষায় শিল্পে গীতে নাট্যে সাহিত্যে—তপস্যার সূত্রপাত হচ্ছে তখন, মানবাত্মা নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে প্রজাপতির মতো অজ্ঞতার আবরণ কেটে। এই সন্ধিক্ষণে যখন আর্যেরা তাঁদের অনার্য অবস্থা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি সেই সময়ে আলোর সঙ্গে অন্ধকারকে, নিজেদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে অতীতকেও স্বীকার করতে বাধ্য তাঁদের সমস্ত শিল্পরচনা। ঊষাদেবীর মূর্তি পাথরে বা কাঠে তাঁরা কেমনতরো করে কেটেছিলেন তার উদ্দেশ এখন তো পাওয়া যাবে না, মূর্তিশিল্প নিশ্চয়ই খুব বেশি দূর এগোয়নি তখন আজকের আফ্রিকানদের শালভঞ্জিকার চেয়ে, কিন্তু ভাষা দিয়ে যে মূর্তি তাঁরা ঊষাদেবীকে দিলেন তা আলো-অন্ধকারের ছন্দে তাঁদের অতীত এবং বর্তমানকে চমৎকার রূপ দিয়ে ধরলে আমাদের কাছে।

"কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হইতে পূজনীয়া, বিচিত্র গতিমতী ও মনুষ্য আবাসের রোগনাশিনী ঊষা উদয় হইলেন, বিচিত্র রূপবতী অহোরাত্র দেবতাদ্বয় ব্যবধানরহিতভাবে চলিতেছেন। একজন গমন করেন আর একজন আইসেন। পর্যায়গামিনী দেবতাদ্বয়ের মধ্যে একজন পদার্থসমূহ গোপন করেন, অন্য জন (ঊষা) অত্যন্ত দীপ্তিমান রথ দ্বারা তাহা প্রকাশিত করেন।...ঊষা দিনের প্রথম অংশের আগমনের সময় জানান। তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ হইতে তাঁহাদের উদ্ভব...।" অথবা যেমন বলা হল — "স্বসা (রাত্রি) জ্যেষ্ঠস্বসাকে (ঊষাকে) উৎপত্তিস্থান (অপর রাত্ররূপ) প্রদান করিয়াছেন এবং ঊষাকে জানাইয়া স্বয়ং চলিয়া যাইতেছেন, ঊষা সূর্যকিরণ দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করিয়া বিদ্যুৎরাশির ন্যায় জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল স্বসৃভাবাপন্ন পুরাতনী ঊষাগণের মধ্যে প্রথমা অপরার পশ্চাৎ প্রত্যহ গমন করেন। নবীয়সী ঊষা পুরাতন ঊষাসমূহের ন্যায় সুদিন আনয়ন করতঃ আমাদিগকে বহুধনবিশিষ্ট করিয়া প্রকাশ করুন।" —ঋগ্বেদ সংহিতা (রমেশচন্দ্র দত্ত)

অতীতের আর বর্তমানের মধ্যে একজন কালো অন্যজন সাদা, এ ওর ভগ্নী, শুধু রং ভিন্ন ভিন্ন,—এ একেবারে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে আর্য অনার্য অবস্থার কথা। সঙ্গীতশাস্ত্রের দিক দিয়ে এই মূর্তির তুলনা পাই দিনের বেহাগ আর রাতের বেহাগে, মূর্তিশিল্পের দিক দিয়ে এই সাদা-কালোর রূপকে রূপ পেলে হরি-হর শিব-শক্তি কৃষ্ণ- রাধা এমনি অসংখ্য জায়গায়,—চিত্রকলায় আজ আমরা যাকে বলছি Light and Shade. আলো ছায়া ইত্যাদি তা এই পুরাতনী ও নবীয়সী ঊষার প্রকাশ—"দেবতাদ্বয়ের মধ্যে একজন পদার্থসমূহ গোপন করেন, অন্যজন (ঊষা) অত্যন্ত দীপ্তিমান রথ দ্বারা তাহা প্রকাশিত করেন।" অজন্তা গুহার ছাদের চন্দ্রাতপ তার মাঝখানে যে মস্ত পদ্ম আঁকা হল তারি কোণে কোণে এই সাদা আর কালো দুই ঊষাদেবতার রূপ লিখে গেল শিল্পীরা। যুগ-যুগান্তরের কল্পনা এইভাবে যুগ যুগ ধরে আর্য-শিল্পের নানা কৌশলে ধরা রইল।

মানব মনের, তার ভাষার, তার শিল্পকলার উন্মেষ কত যুগ যুগ ধরে হচ্ছিল আলো-ছায়ার নিবিড় ঊষার মধ্য দিয়ে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আর্য অবস্থায় পৌঁছতে একটা আর্যেতর অবস্থা কল্পনা করে নেওয়াতে ভুল নেই, ভুল করি তখন যখন কল্পনা করি যে পথ না চলেই আর্যেরা পথের শেষে উপস্থিত অতৈলপুর আশ্চর্য প্রদীপ হাতে!

ঊষাদেবতার মূর্তি ঋষিরা ভাষায় ফোটালেন এবং তার পরে কালে কালে কিভাবে সেই একই ঊষার কল্পনা পাটায় পটে ইটে কাঠে পাথরে সাহিত্যে সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত হল তা দেখলেম, কিন্তু ঐ ঊষা ও স্বসা এবং ঐ যে

কৃষ্ণবর্ণোদ্ভবা শ্বেতবর্ণা এদের প্রতীক আর্যেতর এবং অন্যব্রতদের দেওয়া নয় এটা ভাবাই ভুল।

রেড ইন্ডিয়ান—ইন্ডিয়ান হিসেবে যে আর্যগণের জ্ঞাতি ভ্রাতা—তা ঠিক করে এখনো বলা চলে না, কিন্তু এটা অভ্রান্তভাবে স্থির হয়ে গেছে, এই রেড ইন্ডিয়ান তারা খুব প্রাচীনকাল থেকেই নানা রং দিয়ে ব্যক্ত করেছে সকাল-সন্ধ্যা জল-হাওয়া আকাশ-বাতাস এবং নানা ঋতুপর্যায় এবং জীবন-মৃত্যুও। ঐ রেড ইন্ডিয়ান তাদের কাছে শ্বেতবর্ণ মানে বোঝাচ্ছে—White innocence, awakening, disclosing the first glimpse—ঊষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাত্রিকে কৃষ্ণবর্ণা ঊষার স্বসা বলেছেন আর্য ঋষিরা। রেড ইন্ডিয়ানরা সায়ংসন্ধ্যা বোঝাতে এবং বৃষ্টি বোঝাতে ব্যবহার করছে পীত ও কৃষ্ণবর্ণ—Yellow streak crossed with black lines symbolise rain and the evening sky, rain is commonly represented by eight vertical lines painted black. ঋষিরা বলছেন, "বিচিত্র রূপবতী অহোরাত্র দেবতাদ্বয়, এই পর্যায়গামিনী দেবতাদ্বয়ের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণা যিনি তিনি পদার্থসমূহ গোপন করেন, অন্যজন তাহা প্রকাশিত করেন। এই কালো রং সম্বন্ধে রেড ইন্ডিয়ানদের ধারণা হল—Black covers and hides, কালো গোপন করেন, আবরণ করেন; it is a line seldom seen in nature, for her days and years are full of promise. ভারতের আর্যগণ এবং আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান এ দুয়ের জাতিগত ঐক্য প্রমাণ হল না তাতে বড় আসে যায় না, এক চিন্তা আর্যে অনার্যে, এক শিল্প আর্যে অনার্যে, এর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হতে পারে না আর্য সভ্যতারই ইতিহাস চর্চার বেলায়।

আমাদের দেশেই আর্যেতর জাতি এখনো বিদ্যমান যারা অন্য ব্রত পালন করছে। গারো এবং খাসিয়া পাহাড়ের এই আর্যেতর জাতির এক কবি তার সামনে নবীয়সী ঊষার মতো যখন প্রেয়সী এসে উপস্থিত হল তখন ঋষিদেরই মতো সেও বর্ণনা করলে ছন্দে—

"মরি মরি রাতের দেআ
রাতারাতি গড়তে ছিল
এই পুতলি!
আসতে দিবা—আদুল গায়ে
জড়িয়ে দিল তাড়াতাড়ি
নীলাম্বরী!
ঘুমঘোরে বা ভুল করে বা
রঙ ধরালো এমন নীলি
উজল নীলি।"

"Before the Sun shouldst thou have been created,
Thou art as the blue of the new drawn indigo."

MAJOR PLAYFAIR : *The Garos.*

এখানেও সেই ঋষিবর্ণিত অহোরাত্র দুই দেবতায় মিলে গড়া সুন্দরী—কালো এবং আলো করা রূপ মিলে এক প্রতিমা।

আর্যেরা এবং আর্যেতর তারাও বহু দেবতার উপাসনা করতেন—সূর্য অগ্নি জল মেঘ নদনদী বনস্পতি কত কি যে দেবতা তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এই তেত্রিশ কোটি দেবতাকে উত্তরাধিকারসূত্রে আর্যেরা যে পেয়েছিলেন তাতে ভুল নেই। ভাষার দিক দিয়ে দেখতে গেলে আর্যে এবং আর্যেতরে বড় একটা মেলে না, কিন্তু দেবতার নামে নামে এবং সেই সেই দেবতার কাজে কাজেও ভারি একটা মিল দেখি।

নিউজিল্যান্ডের মাওরীজাতি তাদের একজন বজ্রদেবতা আছেন; তাঁকে বলে তারা Waitari বা দৈত্যারি। দেবতাদের সঙ্গে দেবতাদের পূজার উপচার ও বিধি আর্যগণ যে পাননি আর্যেতরগণের কাছ থেকে তাই বা কে বলবে! বেদীনির্মাণ, অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে যথাযথ স্থানে বসে গান ও সোমপান যূপকাষ্ঠের পূজা পশুবলি সমস্তই প্রমাণ করছে আর্য এবং আর্যেতরে সকল দিক দিয়ে নিকট সম্বন্ধ।

ঋষিরা বাচ্যরূপে ধরে গেছেন আমাদের কাছে তাঁদের কল্পিত নানা দেবদেবী মূর্তি। এক এক রকম যজ্ঞক্রিয়ার জন্য নানা কোণ কাটা বেদী এবং যজ্ঞের ব্যবহার্য নানা উপকরণ থেকে তাঁরা কিভাবে কেমন করে নানা সামগ্রী গড়তেন তার আভাস পাই। কল্পিত দেবতাকে পাথরে কি কাঠে অথবা মাটিতে কিংবা চিত্রে তাঁরা ফুটিয়েছিলেন কি না তা জানার উপায় নেই। কিন্তু ইন্দ্রধ্বজ আর যূপ এই দুটির গড়ন এখনো আমাদের চোখের সামনে রয়েছে যা থেকে আর্যেতর জাতিগণের শিল্পকলার সঙ্গে আর্যদের শিল্পকলার সাদৃশ্য অনেকখানি ধরা পড়ে।

বৈদিক যুগের আর্যগণ শিল্পী হিসেবে তৎকালীন আর্যেতর জাতিগণের চেয়ে খুব যে বড় ছিলেন না তার প্রমাণের অভাব নেই, তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন সবই আর্যেতরগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ থেকে যায়। সেই বৈদিক যুগের ঋষিগণের চিন্তা এবং কল্পনা এবং ভাষা উৎকৃষ্টতর এ কথাও জোর করে বলা যায় না। সবেমাত্র সব দিক দিয়ে উন্মেষের অবস্থা তখন ফুটতে চাচ্ছে, কিন্তু ফোটেনি তখনো সবই। একেশ্বরের উপমা খুঁজতে গিয়ে তখনো আরণ্যক ঋষিদের মধ্যে অরণ্যদেবতার প্রাচীন বনস্পতি মূর্তিটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, তাঁরা বলছেন,—“বৃক্ষেব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ”। অনার্য অবস্থার সেই বনস্পতি দেবতার কথা! বৈদিক যুগ চলে গেল, নতুন নতুন চিন্তা কল্পনা করে চলল মানুষ, কিন্তু সেখানেও এল সেই অতি পুরাতন কল্পবৃক্ষ নন্দনের পারিজাত যার ছায়ায় তেত্রিশ কোটি দেবতার লীলা চলল। বৌদ্ধযুগ প্রকাণ্ড এক ওলট-পালট আনলে চিন্তায় ধর্মে কর্মে, কিন্তু সেখানেও প্রথমে পাথরে অটুট করে ধরা গেল অক্ষয়বটের স্মৃতি। খুবই আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম সেখানেও গাছ পূজা পেলে—গহন বনের তুলসী গাছ। সেই আর্যেতর অবস্থার অরণ্যদেবতা সে বারেবারে জানিয়ে দিলে আর্যগণ কোন দূর আরণ্যক অবস্থার স্মৃতি বহন করে চলেছে, — উত্তরের নদী যেমন তুহিনকণা বহন করে চলে দক্ষিণ সমুদ্রে। সৃষ্টির কথা স্রষ্টার কথা বলতে আর্যেরা বললেন —“ইদম্ বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিৎ আসীৎ” ইত্যাদি। নিউজিল্যান্ডের অনার্য তারাও এই সৃষ্টিরহস্য কিভাবে বর্ণন করলে দেখ—

"Io dwelt within the breathing space of Immensity.
The Universe was in darkness, with water everywhere
There was no glimmer of dawn, no clearness, no Light,
And he began by saying these words.—'That he
Might cease remaining inactive :

Darkness! Become a Light possessing darkness',

And at once Light appeared.

*   *   *

'Heaven be formed', then the sky became suspended

'Bring forth thou, Tupua-horo-nuku',

And at once the moving earth lay stretched abroad."

DIXON : *Mythology of All Races*, Vol. IX, P. 13.

ভারতবর্ষের আর্য ঋষিগণের চিন্তা কল্পনা ক্রিয়া কর্ম সবেতেই তাঁদের পূর্বতন আর্যেতর অবস্থার ছাপ কি সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান তা দেখছি—সুতরাং ভারত-শিল্পের ইতিহাস শুধু বৈদিক যুগ পর্যন্ত নয় তারো এবং আরো পূর্ব থেকে তার ধারা চলে আসছে—এইটেই বলতে হল। আত্মা এবং পরমাত্মা দুই কেমন যেমনি দেখাতে হল অমনি ঋষিরা তাঁদের সেই পূর্বতন অবস্থার দুটি পাখির উপাখ্যান দিয়ে ছবি দিলেন 'দ্বা সুপর্ণা'—একটি পাখি জেগে থাকে একটি পাখি ঘুমিয়ে থাকে। কোন অখ্যাত যুগের রূপকথার পাখি যখন আর্যদের পূর্বপুরুষরা সবেমাত্র কথা বলতে আগুন পোহাতে শিখেছেন তারি স্মৃতিছন্দের দ্বারা নিরূপিত হল, ঋষিদের গভীর তত্ত্বজ্ঞান তাকে তলিয়ে দিতে পারলে না। তারপর থেকে পাথরে ধাতুতে কবিতায় গানে রূপকথায় আর্যসভ্যতা কত বার কত ভাবে এই দুটি পাখি বেঙ্গমা-বেঙ্গমী এবং শুক-সারীর আকারে ধরে গেল তার ঠিক নেই—

"সাই সূয়া দুড পাখী গহিন নদী চরে
স্যাও গহিন শুকায়া গেলে শুন্যি উড়াল ছাড়ে
ধবল বরণ কবুতর চিরল বরণ আখি—"

এমনি সব কথা এ আর্য অনার্য দুয়ের আত্মীয়তার কথা, না জানিয়ে থাকতে পারছে না। কাজেই বলতে হয় আর্য-শিল্পের ভিত্তি অনার্য যুগের উপরে।

পাকা ফলের বুকের মাঝে যেমন শক্ত কষি, তেমনি আর্য-শিল্পের অন্তরে অন্তরে অনার্য-শিল্পের প্রাণ বীজের মতো লুকিয়ে রয়েছে—তাকে ফেলে হয়তো রস পেতে পারি, কিন্তু সে যদি বাদ যেত আরম্ভেই একেবারে তবে নিষ্ফলা হত আর্যসভ্যতা এটা নিশ্চয়।

আর্য-শিল্পের ক্রম

দেখা যায় যে আর্য অনার্য নির্বিশেষে এক সময়ে তাবৎ মানুষই নানা দেবতার কল্পনা ও উপাসনা করছে প্রাতঃসূর্য মধ্যাহ্নসূর্য অস্তমান সূর্য আকাশ অগ্নি গাছ পাথর ইত্যাদি ইত্যাদি। বৈদিক যুগেও আরণ্যক ঋষিরা দেখছি এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা করে নানা মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন এবং কোথাও কোথাও এই সব দেবতার মন্ত্রমূর্তি গড়ে তোলারও লক্ষণ দেখি,—যেমন ঊষাকে ভাষা দিয়ে একটি কুমারী মূর্তিতে ধরা হল, যেমন সূর্যকে তিন বর্ণের তিন মূর্তি দেওয়া হল, অগ্নিকে দেখা হল যজমানের কামনাবাহী দূতরূপে। এইভাবে তাবৎ দেবতা একটি একটি সুনির্দিষ্ট ধ্যানমূর্তি পেতে পেতে চলল আস্তে আস্তে। মানুষের কাছে অগ্নিদেব যূপকাষ্ঠ এরা প্রত্যক্ষ রূপ পেয়ে গেল, বৈদিক আমলে ঋষিরা নানা কোণবিশিষ্ট বেদীর মধ্যে অগ্নিকে ধরে এবং যুপ ও ইন্দ্রধ্বজকে নানা বর্ণের পুষ্পমালা চামর ইত্যাদিতে সাজিয়ে ধরলেন। ভারতবাসী আর্যগণের সঙ্গে এই বৈদিক যুগে ভারতের বাহিরে আর্য ও অন্যব্রতগণের দেবতার রূপকল্পনা ও রূপপ্রদানের মধ্যে একটা চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে দেখা যায়। ভারতের ঋষিদের কল্পিত ইন্দ্রকে আমরা নানা নামে নানা উপাখ্যানের মধ্যে খুঁজে পাই খুব আদিম মনুষ্যসমাজের মধ্যেও, এ ছাড়া দেবশিল্পী আছেন যিনি নানা অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি গড়েন। বেদে ত্বষ্টা এবং ঋভুগণ শিল্পী বলে কথিত হচ্ছেন—"যাঁহারা অশ্বিদ্বয়ের রথ নির্মাণ করেন, যাঁহারা অসংত্রা কবচ নির্মাণ করেন" ইত্যাদি নানা কারিগরির কথা। কারিগরের হাতের কাজের প্রশংসা এবং কারিগরকে সম্মান দেওয়া হয়েছে বারেবারে বৈদিক যুগে।

(১) "হে বলের পুত্র, সুধন্বার পুত্র, ঋভুগণ! তোমরা এখানে আগমন কর, তোমরা অপগত হইও না। এই সবনে মদকর সোম রত্নদাতা ইন্দ্রের পরেই তোমাদের নিকট গমন করুক।"

(২) "ঋভুগণের রত্নদাম আমাদের নিকট এই যজ্ঞে আগমন করুক। যেহেতু তাঁহারা শোভন হস্তব্যাপার দ্বারা ও কর্মের ইচ্ছা দ্বারা এক চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলেন এবং অভিযুত সোম পান করিয়াছিলেন।"

(৩) "তোমরা চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলে এবং বলিয়াছিলে, হে সখা অগ্নি, অনুগ্রহ কর। হে রাজগণ! হে ঋভুগণ! তোমরা কুশলহস্ত, তোমরা অমরত্বপথে গমন কর।"

(৪) "যাহাকে কৌশলপূর্বক চারিটা করা হইয়াছিল সেই চমস না জানি কি প্রকারেরই ছিল? তোমরা হর্ষের জন্য সোম অভিষব কর, হে ঋভুগণ! তোমরা মধুর সোমরস পান কর।"

*　*　*

(৮) "তোমরা সুকর্মদ্বারা দেবতা হইয়াছিলে, হে বলের পুত্রগণ! তোমরা শ্যেনের ন্যায় দুলোকে নিষণ্ণ আছ, তোমরা ধন দান কর, হে সুধন্বার পুত্রগণ! তোমরা অমর হইয়াছ।

(৯) হে সুহস্ত ঋভুগণ! যেহেতু তোমরা রমণীয় সোমদানযুক্ত তৃতীয় সবনকে সুকর্মেচ্ছা প্রযুক্ত প্রসারিত করিয়াছ, অতএব তোমরা হৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের সহিত অভিযুত সোম পান কর।" (বামদেব ঋষি) ঋভুগণকে বলা

হয়েছে—সুন্দরান্তঃকরণ—"হে সুন্দরান্তঃকরণ ঋভুগণ!" ঋভুগণ কিছু নকল করেন না তাও বলা হয়েছে—"তোমরা মানসিক ধ্যান দ্বারা সুবৃত ও অকুটিলগামী রথ নির্মাণ করিয়াছিলে।" ঋভুগণকে বলা হয়েছে রূপদক্ষ— "তোমরা শ্রেষ্ঠ ও দর্শনীয় রূপ ধারণ করিয়াছ।...তোমরা ধীমান, কবি ও জ্ঞানবান, আমরা তোমাদিগকে এই স্তোত্র দ্বারা আবেদন করিতেছি।"

এক আকারের হাতা কি চামচ ছাঁচে ঢালাই হয়ে চারখানা কেন দুশোখানা হাতা ও চামচ হচ্ছে এখন—এতে আমরা অবাক হইনে, কিন্তু শিল্পের যখন সূত্রপাত হচ্ছে ভারতবর্ষে তখনকার দিনের মানুষ কি বিস্ময়ের চোখেই দেখছে এই সমস্ত কারিগরদের ব্যাপার এবং কি সম্মানই বা দিচ্ছে তাদের, তা বেশ বোঝা যায় উপরের মন্ত্রগুলি থেকে।

ঋষিরা বললেন, মানুষের রচনা সমস্ত দেবতার রচনার কনিষ্ঠ—"দেবশিল্পানাম্ অনুকৃতিঃ"।

দেবতার কার্যের সতত সহায় হল শিল্পিগণ এই পর্যন্ত পাওয়া গেল বৈদিক যুগের যে হিসেব নিলেম তা থেকে। নির্মাণের কৌশলকে ও সমস্ত রূপ দেবার চেষ্টাকে আস্তে আস্তে পাচ্ছে মানুষ। মানুষ তপস্যা করছে উৎকৃষ্ট জ্ঞান পাবার জন্য, তপস্যা করছে সুন্দর সমস্ত শিল্পকলাকে পাবার জন্য—এরও প্রমাণ পাচ্ছি বৈদিক যুগে। জ্ঞানের উৎকর্ষ সব দিক দিয়ে পাবার জন্য ঋষিরা তপস্যা করছেন যখন তখন দেখি অন্য আর এক সমাজের মানুষ তারা অন্যব্রত হলেও মানবশিল্পের উৎকর্ষের হিসেবে আরণ্যক ঋষিদের চেয়ে একটু যেন উপরে রয়েছে—লোহার কেল্লা সুরক্ষিত নগর নির্মাণে পটু অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ ইন্দ্রেরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এমন সব অন্যব্রত তারা।

ইন্দ্রের দূতী সরমা যখন পণিগণের নিকটে এসে ইন্দ্রের বীরত্ব বর্ণন শুরু করলেন সেই সময়ে পণিগণ উপহাস করে বললে—ইন্দ্রের কথা কি বল? আমাদেরও অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং যুদ্ধবিদ্যায় আমরাও একেবারে অপারগ নই।

বৈদিক যুগে প্রধান দেবতা হলেন ইন্দ্র। এই ইন্দ্রের মূর্তি ঋষিরা যেভাবে কথায় ফুটিয়েছেন তাতে করে তাঁকে হিন্দু আমলের ঐরাবতে চড়া নধর মূর্তিতে আমরা দেখতে পাইনে। বেদের ইন্দ্র রথে চড়ে যুদ্ধে চলেন, ঘোড়ায় চড়ে যজ্ঞে আসেন। আমাদের সুপরিচিত সূর্যমূর্তির কিংবা কল্কি অবতারের সঙ্গে কতকটা মিল দেখি বেদের ইন্দ্রের— "অভিমুখবর্ত ইন্দ্র, আমাদিগকে আশ্রয় ও ধন দানের জন্য আমাদের নিকটে অশ্বে আরোহণ করতঃ আগমন করুন।...যিনি পর্বতের ন্যায় প্রবৃদ্ধ ও মহান, যিনি তেজস্বী, যিনি শত্রুর পরাভবের জন্য সনাতন কালে উৎপন্ন হইয়াছেন।"

ঋষিরা যাদের নাম মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন সেসব দেবতা সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র মেঘ জলরূপেই ছিল তাঁদের চোখের সামনে—সাক্ষাৎ অগ্নি সাক্ষাৎ সূর্য; সুতরাং খুঁটিনাটি মূর্তির ধ্যান তাঁরা দিলেন না—যদিও মূর্তিশিল্প বড় একটা এগোয়নি, কিন্তু অন্যান্য শিল্প ব্যাপার চলেছে দেখি—বস্ত্র অলঙ্কার রথ শকট এবং নানা তৈজসপত্র এসকল প্রস্তুত হচ্ছে দেখা যায়। বৈদিক যুগে মাটির বাসন হাঁড়ি-কুঁড়ি জাঁতা এবং লোহা ও নানা প্রকারের ধাতু ঢালাই করে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি গড়তে পড়তে এইভাবে কত যুগ কেটেছিল আর্যগণের প্রতিমাগঠনের শিল্প জানার পূর্বে তার ঠিক নেই।

রামায়ণ থেকে পাওয়া যায় স্বর্ণ-সীতার কথা। সেই যদি ধরা যায় প্রথম প্রতিমা গড়ার আরম্ভ আর্যজাতির, তবে বলতে হবে সেটাও রাক্ষসদের কাছ থেকে এসেছিল, কেননা লঙ্কায় মায়াসীতার খবর রামের অশ্বমেধের

আগের ঘটনা। রাবণের পুষ্পকরথ এবং রাবণের পুরীর যা বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে বুঝি যে, আর্যেতর সমস্ত জাতি তারা কলাকৌশলে ভারতবাসী আর্যদের অপেক্ষা অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

মহাভারতের যুগে ভারতীয় আর্যরা সভ্যতার প্রায় চরম শিখরে উপনীত দেখা যায়। কিন্তু তখনও দেখি যুধিষ্ঠিরের সভা প্রস্তুত করতে এল শিল্পকার ময়দানব, কিরাতের ঘর থেকে এল গাণ্ডীব অর্জুনের। এমনি সব খুঁটিনাটি কথা থেকে ধরা যায় আর্যেতর তারাই ছিল আর্টিস্ট এবং কারিগর, রূপ দিত তারা কল্পনাকে। এরা বিশ্বের তাবৎ রূপকে দখল করতে পারত বিদ্যার দ্বারা—সেইজন্য অনেক সময় এদের জাদুকর ভাবা হত। মায়াবী আর শিল্পী এ দুয়ের মধ্যে পরিষ্কার ভেদ অনেক দিন করেনি মানুষ।

ঋষিরা যেসব দেবতার কল্পনা করে গেলেন তাদের মধ্যে ইন্দ্রকেই তাঁরা প্রধান স্থান দিলেন কিন্তু ইন্দ্রের প্রতিমা তাঁরা গড়েননি, ধ্যানমাত্র দিয়েছিলেন। রামায়ণ মহাভারতের সময়েও ইন্দ্রের মূর্তি নেই। রাজার পর রাজা নরেন্দ্র যথার্থভাবে ইন্দ্রত্ব পাবার জন্য শতাশ্বমেধের আয়োজন করেছেন, সেখানে ইন্দ্রের বাহন অশ্ব এবং ইন্দ্রধ্বজ দুই-ই পূজা পায় কিন্তু স্বয়ং প্রতিমাটির দেখা নাই। সুমন্ত্র সারথি রথ নিয়ে আসেন নরেন্দ্রের জন্য, ইন্দ্রও আসেন পৃথিবীতে, কিন্তু তাঁর রূপ ধরা পড়ে না আর্টিস্টের কৌশলের মধ্যে। এইভাবে চলতে চলতে একদিন ইন্দ্রপূজা বন্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা আরম্ভ করে দেয়। বৃন্দাবনের গোপজাতি। তারপর আসেন আর্যেরা গোপজাতির অনুসরণে পূজা দিতে নতুন দেবতাকে। এইভাবে দেখি দুই যুগের দুই দেবতা শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক ইন্দ্রের স্থান পেয়ে বসেছেন। বৈদিক ইন্দ্রের পাশে ইন্দ্রাণীকে দেখিনে, মরুৎগণকে দেখি, কিন্তু রামের পাশে সীতা, শ্যামের পাশে রাধা—এও জানাচ্ছে আর্য অনার্য দুই সভ্যতার পরিণয়ের ইতিহাস।

মূর্তিপূজা এবং প্রতিমাশিল্পের সূত্রপাতেই বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তত্ত্বচিন্তার দিক দিয়ে ভারতবাসীর মন তখন উপনিষদের একেশ্বরবাদ থেকে শূন্যবাদে পৌঁছে গেছে, কিন্তু শিল্পকলার দিক দিয়ে ভারতবাসী তখন দেখি সবে কাটতে শিখছে পাথর। সেই পুরাতন যুগের বনস্পতি, কল্পতরু ইন্দ্রধ্বজ অশ্বমেধের ঘোড়া সূর্যরথের একটি চাকা—এমনি নানা প্রাচীনতম কল্পনা নতুনতরো প্রতীক দিয়ে ধরে চলেছে মানুষ পাথরের স্তূপের গায়ে।

সাহিত্যে জাতকের উপাখ্যান সমস্ত বলে চলেছে কোন আর্যপূর্ব যুগের বনবাসী অবস্থার নানা জন্তু-জানোয়ার সমস্তর উপাখ্যান। এই বৌদ্ধযুগে আর্যেরা যেন আর একবার পুনরাবৃত্তি করে চলেছে সব দিক দিয়ে সেই পুরাতনী ঊষার আলো-অন্ধকারে ঘেরা অবস্থা, রাবণ রাজার অশোকবনের স্মৃতি অনেকখানি। মায়াদেবীর অশোকতলার মূর্তিখানিতে দেখা গেল, বুদ্ধের কণ্ঠক ঘোড়া ইন্দ্রাদি দেবতা তাকে অনুসরণ করেছেন, ধর্মচক্র সে একচক্র সূর্যের আকারে দীপ্তি পাচ্ছে স্তম্ভের উপরে, সাঞ্চিস্তূপের কল্পতরুর ছায়ায় বুদ্ধের চরণচিহ্ন মনে পড়াচ্ছে শ্রীরামের পাদুকা কিংবা তারও আগেকার বনস্পতির পূজাটি।

নতুন ভাবের নতুন উন্মেষ, নতুন শিল্পের নতুন উন্মেষের লক্ষণ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে বৌদ্ধ-শিল্পের প্রথমাবস্থায়। যূপকাষ্ঠ নেই, হয়ে গেছে তারা পাথরের স্তম্ভ একটার পর একটা, এবং সেইসব স্তম্ভের শিখরে সিংহ হস্তী পশু পক্ষী যারা আর্যেতর অবস্থার দেবতা এবং পরে দেবতার বাহন হয়ে পড়ল তারা শোভা পাচ্ছে যূপে বাঁধা জন্তু। পাথরের সঙ্গে তখন নতুন ভাব করছে শিল্পীরা, কাঠের উপরের কারুকার্যের অভ্যাস সম্পূর্ণ ভুলতে পারেনি, চৈত্যবিহার গিরিগুহা সব জায়গাতে এরি ছাপ রাখছে শিল্পীদের হাত। বৈদিক দেবতার ধ্যানের অবশেষ তখনো মনে রয়েছে —ইন্দ্রের বজ্র বৌদ্ধযুগের অলঙ্কার-শিল্পে স্থান পাচ্ছে সুগঠিত রূপ পেয়ে, 'দ্বা

সুপর্ণ' তারা হংসমিথুন হয়ে দ্বারের উপরে উড়ে বসছে, অতি প্রাচীন ঋভুগণের নির্মিত রথের চাকা ধর্মচক্র এবং চাকা চাকা পদ্ম ফুলের রূপ ধরে নতুন শোভা বিস্তার করছে চৈত্যে বিহারে মঠে প্রাসাদে। মানুষের আর্য অবস্থার এবং তারও পূর্বেকার স্মৃতি ও কল্পনা বৌদ্ধ-শিল্পের প্রত্যেক পাষাণে আপনাদের ব্যক্ত করে চলল, তারপর একদিন বুদ্ধের ধ্যানী প্রতিমা গড়তে শুরু করলে শিল্পীরা। আর্যেতর জাতির শিল্প-চেষ্টা এবং আর্যজাতির উৎকৃষ্ট চিন্তা এক পরিণয়সূত্রে ধরা পড়ল বুদ্ধ-প্রতিমাতে। এই সময়ে গ্রিক শিল্পী কেউ গান্ধার দেশে বুদ্ধমূর্তি গড়তে চেয়েছিল কিন্তু ঠিক মূর্তি সঠিক প্রতিমা দিতে পারেনি—তারা কাপড় পরা কুঞ্চিত-কেশ নকল বুদ্ধ দিয়ে গেল, আসল বুদ্ধমূর্তি সম্পূর্ণ অন্যভাবে গড়া হল দেখি। অনুরাধাপুরের অরণ্যে এই বুদ্ধ-প্রতিমা পাওয়া গেল বুদ্ধের নির্বাণের অনেক শত বৎসর পরে— বহির্ভারতের এক শিল্পীর গড়া প্রতিমা। সেখানে ঋষিপ্রতিম একটি মহাপুরুষ, কোনো সাজসজ্জা না দিয়ে গড়েছেন শিল্পী, চোখভোলানো চাকচিক্য বা সৌন্দর্য মোটেই নেই ঐ মূর্তিতে। রূপবান পাথর ধ্যাননিমগ্ন—এইটুকুই দেখালেন শিল্পী। সেই যুগ-যুগান্তরের আরণ্যক অবস্থার কথা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে, বৌদ্ধ সভ্যতার চরম ক্ষণে আবার উচ্চারিত হল ভারতের বাহিরে সমুদ্র পারে—"যিনি পর্বতের ন্যায় প্রবৃদ্ধ ও মহান এবং যিনি তেজস্বী"।

বৈদিক কাল থেকে আরম্ভ করে অনেক যুগ ধরে 'অদ্বিতীয় ঈশ্বরের' ধারণাতে পৌঁছেছে যখন মানুষের মন গভীর জ্ঞানের ধারা ধরে, সেই সময় থেকে রসের ধারা ধরে চলতে শুরু করল শিল্পীদের মানস সারা বৌদ্ধযুগ অতিক্রম করে অদ্বিতীয় বুদ্ধমূর্তির ধারণাতে পৌঁছোতে। জ্ঞানীর পথে যেমন নানা জটিল ও বিচিত্র তর্ক-বিতর্ক, শিল্পীর পথেও তেমনি নানা কর্মের নানা রীতি-পদ্ধতির বিচিত্রতা গিয়ে মিলল একটি কেন্দ্রে; জ্ঞানী বললেন "বৃক্ষৈব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ", শিল্পী দেখালে—স্তব্ধ মূর্তি!

এই বৌদ্ধযুগ, আর্য এবং অন্যব্রত, কুরু এবং পাণ্ডবদের ইতিহাসের আর একবার যেন পুনরাবৃত্তি হতে দেখি বৌদ্ধভিক্ষু এবং ব্রাহ্মণগণের ধর্মসংঘর্ষে ধর্মরাজত্বে ইন্দ্রত্ব পাবার জন্য সংগ্রাম, একের জন্য অনেকের সমাবেশ। ধর্মে একাধিপত্য এবং কর্মে একাধিপত্য এই হল বৌদ্ধযুগের পরের ইতিহাস।

রাজতন্ত্রে যেমন, তেমনি ধর্মতন্ত্র শিল্পতন্ত্র সমাজতন্ত্র একই সঙ্গে বিধিবদ্ধ হতে চলল শিল্পের দিক দিয়ে। আরণ্যক ঋষিদের তেত্রিশ কোটি দেবতা নতুন করে বিধিবদ্ধভাবে গড়ে তোলবার কাজ আরম্ভ হতেই সেই আর্যেতর শিল্পীদের মতামত নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল—ময়শিল্প মতো, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের মত অনুসারে গড়া হয়ে মন্দিরচূড়া সমস্ত অরণ্য আর পর্বতের প্রতীক এবং প্রতিমা হয়ে দেখা দিলে—হিন্দু সভ্যতার উৎকর্ষের যুগেও মানুষ পাথরকে পর্বতকে অরণ্যকে তুলতে পারল না—ত্রিলোকের প্রতিমা দিয়ে লোকারণ্য হয়ে উঠল মন্দিরের আগাগোড়া প্রস্তর কল্পনার রাজ্য ছেড়ে রূপের রাজত্বে বেরিয়ে এল তেত্রিশ কোটির চেয়ে বেশি দিনের পুরোনো সমস্ত দেবতা!

নতুন নতুন দেবতার রূপে, বাহনের রূপে, প্রতীকের ছলে, প্রতিমার বেশে দেবলোক নেমে এল মর্তলোকের বুকের উপরে। শিল্পীর রচা রূপের পরিখা ও দুর্গপ্রাচীর তারি মধ্যে চিরদিনের মতো দেবতা সমস্ত বরাভয়হস্তে স্থির হয়ে বসলেন, শিল্পকৌশলের চমৎকারিতা পরিপূর্ণতা পেয়ে তাবৎ শিল্পকে একটি অদ্বিতীয় স্থান দিতে চলল জগতে।

এই যুগটাকে ভারত-শিল্পে অবতার-যুগ বলে ধরতে পারি। আর্য অনার্য সবাই মিলে কালে কালে যেসব কল্পনার সঞ্চয় কাব্যে সাহিত্যে ধর্মগ্রন্থে জমা করে তুললে মানুষ, সেইগুলোই রূপ পেয়ে অবতীর্ণ হতে থাকল

কলাকৌশলের রাস্তা ধরে। যা গল্পে কথায়, যা সুরে ও ছন্দে, যা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় অগোচরভাবে বর্তমান হচ্ছিল চোখের সামনে তা রূপ ধরে দাঁড়াল চিত্রপটে প্রস্তরের ও ধাতুর মূর্তিতে নাট্যে নৃত্যে যাত্রায়।

ইন্দ্রের বজ্র সে রূপ ধরে পূজার্হ হয়ে রইল তিব্বতের শিল্পীদের হাতে, ইন্দ্র রূপ পেলেন ইলোরা গুহার শিল্পীর হাতে, সূর্য রূপ পেলেন উড়িষ্যার কারিগরের হাতে, বাঙলা রূপ দিলে দেবীগণের, দ্রাবিড় সভ্যতা রূপ দিলে প্রলয় তাণ্ডবের ছন্দকে রূপের বিরাট ঢেউ। দুইভাবে মিলে রূপের রাগলীলা চলল। আর্যাবর্তের অন্তর বাহির দুই গতি মস্ত একটা চক্র সৃষ্টি করলে পৃথিবীর শিল্পীদের জগতে। কত ঊষা কত রাত্রি কত শীত কত শরৎ ও বসন্ত ক্ষণে ক্ষণে আলো ছায়া এবং মায়ায় রং বুলিয়ে গেছে এই যুগ-যুগব্যাপী আমাদের শিল্পচেষ্টার উপরে—পাথরে চিত্রে অলঙ্কারে ভূষণে কাপড়ে মন্দিরে দীনের কুটিরে রাজার প্রাসাদে—তার লক্ষণ সমস্ত সুস্পষ্ট বিদ্যমান দেখি আজও।

প্রত্নতত্ত্ববিদ তাঁরা যেভাবে এক একটা রাজবংশের সঙ্গে জড়িয়ে শিল্পের ইতিহাস টুকরো টুকরোভাবে বিচার করে চলেছেন তাতে করে আর্য-শিল্পের পরিপূর্ণ রূপটা চোখে পড়তে বিলম্ব হয়। মৌর্য শিল্প গুপ্ত শিল্প মোগল শিল্প এমনি গোটা কতক ভাগ দেখি কিন্তু শুধু এইটুকুর মধ্যেই শিল্প বদ্ধ নয়—নদীর একমুখে যেমন অনন্ত প্রস্রবণ, অন্য মুখে যেমন অনন্ত সমুদ্র, দুটি কূল যা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে যেমন বদ্ধ নয় নদী—তেমনি এই আর্য-শিল্পের ধারার এক মুখ অনার্য অবস্থার অদৃশ্য গোপনতার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, আর এক মুখ তার আর্য অবস্থার অপার বিস্তারের মধ্যে নিমগ্ন হয়েছে।

সমুদ্রের একটা বিন্দু জল থেকে সমুদ্রের বিরাট প্রসার কিছুই ধরা যায় না, সমুদ্রের জল নীল ও নোনা, মিঠা নয়, এটা এক ফোঁটা থেকেও বোঝা যায় —কিন্তু সমুদ্র কি ব্যাপার তার একটুও ধারণা হয় না একটি ফোঁটা দিয়ে। তেমনি মৌর্য বংশাবলীর এতটুক পাত্রে কি গুপ্ত রাজ্যের আমলে ধরে দেখলেম ভারত অভারত ব্যাপী বিরাট আর্য-শিল্পকে। এ যেন ঐরাবতকে দেখা সেইভাবে হল যেভাবে একদল অন্ধকারে কেউ ঐরাবতের পা, কেউ শুঁড়, কেউ লেজ, কেউ কান ছুঁয়ে ছুঁয়ে বললে—এর সর্পের আকৃতি, এর সূর্পের আকৃতি!

বঙ্গোপসাগরের তীরে মরুভূমির মাঝে কোণার্কের সূর্যরথ এবং বোম্বাই অঞ্চলের একটা সম্পূর্ণ পর্বতকে এক টুকরো পাথরের মতো কেটে কৈলাসপতির কৈলাস, এই দুই সীমানাতে আর্য-শিল্পের চলাচল বন্ধ হল, তারপর এসে পৌঁছল বাইরের একটা নতুন ধারা। এখন সহজেই মনে হল আর্য-শিল্পের শেষ করি অস্তমিত সূর্যের রথের এবং শূন্য কৈলাসের কাছে। ওদিকে মরুভূমি এদিকে পর্বতকন্দর—এ শুধু একটা অধ্যায় শেষ হল শিল্পের ইতিহাসে। মোগল আমলে আর্য-শিল্পই আবার নতুন রূপসৃষ্টির সূত্র ধরলে কিন্তু সেই পুরাতন ভারতীয় ভাব বইতে থাকল মোগল শিল্পের অন্তরে অন্তরে।

দেবতা নয় এবারে নরদেব—‘দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা’—তাঁর পুরী নির্মাণের জন্যে ডাক পড়ল শিল্পীর, মন্দির নয় কিন্তু সমাধি-মন্দির। সেই বৌদ্ধযুগের রামায়ণের যুগের কুরুপাণ্ডবের যুগের স্বপ্ন নতুন করে নতুন আকারে ধরা পড়ে গেল শ্বেত পাথরে রক্ত পাথরে নীল যমুনার ধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নতুনতরো ত্রিমূর্তি যার অপূর্ব সৌন্দর্য ও কলা-কৌশলের কাছে জগতের শিল্পরসিক তারা আর্য অনার্য নির্বিশেষে সসম্ভ্রমে কুর্নিশ দিচ্ছে প্রণাম দিচ্ছে আজ।

কলকাতার কাছেই দুটো তিনটে কবরস্থান রয়েছে, সেখানে অনেকগুলো নানা আকারের কবর আছে কিন্তু সেগুলো কবর মাত্র—কাগজ চাপা ঢেলা যেভাবে থাকে সেইভাবে মৃতদেহগুলোকে চেপে রয়েছে পাথর আর

ইট। কবরগুলো কারো কিংবা কিছুর প্রতিমা দেয় না, বলে মাত্র—আমি কবর, রূপকে আচ্ছাদন করেছি, রূপকে ফোটাতে আমি নেই। কিন্তু ঐ তাজবিবির কবর কত কবি কত যাত্রী তাকে দেখে মুগ্ধ হল ও বললে—এ কি সুন্দরী! এ কি সুন্দরী! এই বিচিত্ররূপে নানা লোকের কাছে দেখা দিচ্ছে অথচ একটি সে! বহুযুগের সন্ধানে ভারতবাসী শিল্পীরা পেয়ে গেল এই সত্য, ভুলবে কেমন করে? তাজমহলের পাথরের রক্ত শ্বেত এবং নদী ও আকাশের নীল এক করে আর্টিস্ট গোরস্থানের একটা সামান্য কবর গড়ে গেল বললে ভুল বলা হয়—অনেক বর্ণের পাথরের ত্রিমূর্তি নতুন ছাঁদে গড়া, শিল্পশাস্ত্রের বাঁধা নিয়মে গড়া নয় কিন্তু রসের আপন নিয়মে গড়া একটি প্রতিমা বলতে পারি একে। ইউরোপের শিল্পী তারা ভারতবাসী শিল্পীদের মতোই এক যুগে সুবিধা পেলে প্রতিমা গড়ে তোলবার, তাদের ধর্ম তাদের ডাক দিলে যিশুর প্রতিমা গড়ে দিতে। প্রতিমার মধ্য দিয়ে বুদ্ধকে যেভাবে সবার করে দিয়ে গেল ভারতবাসী শিল্পীরা, কই তেমন ভাবে ওরা তো গড়তে পারলে না, নিষ্ফল রইল ওদের চেষ্টা যিশুর প্রতিমার বেলায়। রাজাদের প্রতিমা তাও গড়তে পূর্ব পশ্চিম দুই ভাগ পৃথিবীর যে কেউ শিল্পী তাদের ডাক পড়ল—ভারতবাসী রাম রাজা রাবণ রাজা দেবরাজ থেকে আরম্ভ করে রাজরাজেন্দ্র সবই লিখনে রাজদেহের সাদৃশ্য দিলে অথচ ঠিক রাজাটি নয়, রাজশ্রীর প্রতিমা একটি একটি—এই দিলে ভারত-শিল্পী। কিন্তু সেই রোমক আমল থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপের রাজাদের ছবি দেখি—সেখানে এ রাজা সে রাজা কেউ বুড়ো কেউ যুবা সুন্দর সবাই সুবেশ সবাই, কিন্তু যেভাবে ঔরঙ্গজেবকে পাই, সাজাহানকে পাই, জাহাঙ্গীরকে পাই একটা একটা রসমূর্তিতে— সেভাবে পাই না তো ওদের রাজাদের! রসের প্রকাশ এই বিশ্বসংসার এটা ভারতের আর্য-শিল্পের কথা; ও-দেশের কথা স্বতন্ত্র রূপের জয়, দৃষ্টরূপের মানসরূপের নয়। ইউরোপের শিল্পী এবং ভারতের শিল্পী, একের কাছে অপরে অন্যব্রত বলে পরিচিত হচ্ছে শিল্পের দিক দিয়ে এখনো। এমন একদিন আসবেই যখন এই দুই অন্যব্রত এক হবে, যেভাবে এক হয়েছিল আর্যে অনার্যে বহুযুগ পূর্বে এই ভারতবর্ষে। এই যে দুই ভিন্নপন্থী এক হতে চলল এর লক্ষণ আমাদের ঘরবাড়িতে আমাদের বেশভূষায় চারিদিক থেকে ফুটছে যা দেখে দেখে আমরা সময়ে সময়ে ভয় পেয়ে বলি বুঝি আর্টের সঙ্গে আপনাদেরও হারাতে বসেছি আমরা। ঠিক এই কথাই একদিন হয়তো বলেছিলেম আমরা মোগল আমলে এবং তার পূর্বে ও তারো পূর্বে—'পরধর্মো ভয়াবহঃ'; কিন্তু ভয়ের মধ্য দিয়ে তবে আসে অভয়রূপ আশীর্বাদ—এই সত্য এখনো দেশের শিল্পীরা সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি দিয়ে ঘোষণা করছে, যুগ যুগ আগেও কৃষ্ণবর্ণোদ্ভবা শ্বেতবর্ণা ঊষা ভারতবাসী আর্য-শিল্পীদের রচনার মধ্যে দিয়ে ফুটেছে কতবার। রাধা শ্যাম ভিন্ন এবং এক, গোচর রূপ এবং অগোচর রসরূপ দুই মিলে এক—একথা বর্ণে বর্ণে অক্ষরে অক্ষরে সত্য করে তুলেছে আর্য এবং অনার্য দুয়ে মিলে নিজেদের শিল্পে। ভারত-শিল্পের সূত্র হল এই—রূপের সঙ্গে রূপাতীত এক হয়ে গাঁথা। যুগে যুগে একটি একটি যুগচিহ্ন যা আমাদের শিল্পের ধারা রেখে গেল ফেলে দেশের উপরে তার প্রত্যেকটি এই সূত্র ধরে রইল। "সব মূরত বীচ অমূরত", মূর্তের সঙ্গে মিলিয়ে রইল অমূর্তও। গাছের ফুল হাতের সুতোয় মিলে হল একগাছি মালা, মানবশিল্পী আর দেবশিল্পী দুয়ের মিলনে হল রসরচনা, এসব কথা কবীর যিনি মুসলমান হয়েও আর্য তিনিও বললেন, ঋষি যিনি আর্য হয়েও অনার্য তিনিও বললেন।

রূপ

রূপের ভেদাভেদ জ্ঞান ও রহস্য প্রকাশ হল আর্টিস্টের কাজ, এইজন্যে 'আর্টিস্ট' কথার ঠিক প্রতিশব্দ হল 'রূপদক্ষ'। কুঠার ঠিকরূপে গড়া হল তবেই সে কাটলে ঠিকমতো। প্রথম আর্টিস্ট যখন কুঠার গড়লে তখন সে কুঠারের বাইরের আকৃতিটা ও মান-পরিমাণ হয়তো একরকম দিলে, কিন্তু যে ধাতুতে কুঠার গড়লে ঠিক কাটবে কুঠার জলের মতো সেটুকুর জন্যে অনেক দিন ধরে অনেক রূপদক্ষের জন্মানো এবং মরার অপেক্ষা ছিল একথা ঠিক। শুধু এই একটি মাত্র কুঠাররূপ নয় নানা প্রহরণ তারি নানা রূপভেদ এও এক এক আর্টিস্ট এসে দখল করলে যুগে যুগে—ক্ষুরপ্র বাণ অর্ধচন্দ্র বাণ শিলীমুখ কত কি রূপের ভেদ। বাঁশপাতা গাছের কাঁটা পাখির পালক সবাই উপদেশ করলে রূপভেদের। রূপটি ঠিক হল তবেই চলল তীর ঠিক লক্ষ্যস্থান ভেদ করতে। রূপটি এমন হল সে এমন করে বিঁধলে, অমন হল রূপ বিঁধলে তেমন করে। সহজ কথা—সুরটি ঠিক বসলো গলায়, রাগটি পেলে ঠিক রূপটি, ছন্দ পেলে ঠিক কথা, কথা পেলে ঠিক ছন্দ—কবির কল্পিত রূপটি ঠিক ফুটল তখন। উপযুক্ত রূপ অনুপযুক্ত রূপ একথা আর্টে খাটে কিন্তু সুরূপ কুরূপ বলে স্বতন্ত্র দুটো রূপ আর্টিস্টের কাছে নেই; তার কাছে আছে শুধু নানা রূপ—কোনোটা এ কাজে উপযোগী সে কাজে অনুপযোগী এই রকম। যেমন বাঁকাকে নিয়ে তীর গড়া চলল না, তীরের অনুপযোগী সে, আবার ধনুকের বেলায় বাঁকাই যত বাঁকলো ততই দেখতেও হল চমৎকার, কাজও দিলে সুন্দর। তীর সোজা ধনুক বাঁকা—সোজাতে বাঁকাতে মিলন, একই ক্ষেত্রে রূপের ভেদ ও অভেদ। এমনি ভেদাভেদ সে সঙ্গীতে সে কবিতায় রূপ ধরে প্রকাশ পায় কথার মারপেঁচ সুরের ঘোরপেঁচ নিয়ে। বাঁকা দিলে এক রূপ, সোজা দিলে অন্য, বাঁকায় বাঁকায় মিলে এক রূপ, সোজায় বাঁকায় মিলে অন্য,—এমনি নানা ভেদ রূপের। মেঘের উপরে ইন্দ্রধনু—সে একটি মাত্র রঙীন আলোর বাঁক, তার সঙ্গে আর একটা উপযুক্ত রকম সোজা তীর তো জোড়া হল না, শুধু আলো অন্ধকার রৌদ্র ও মেঘের ভেদাভেদ নিয়ে সুন্দর ফুটল রূপটি বর্ণপ্রধান ও বাঁকা। সমুদ্রতীরে রূপের ভেদাভেদ শব্দ ধরে ফুটল আর স্থিতি ও গতি ধরে ফুটল ঠিক সঙ্গীতের মতোই আকাশ—নিস্তব্ধ নিথর নীল এবং সমুদ্র—সচল সশব্দ নীল।

সূর্যের কিরণচ্ছটায় বাঁকায় সোজায় মিলিত রূপ, গাড়ির চাকায় বাঁকার কোলে সোজা। ঢেউয়ের পরে ঢেউ সেখানে বাঁকায় বাঁকায় মিলন, সারি সারি তালগাছে বৃষ্টিধারা পড়ছে অবিশ্রান্ত—সোজায় সোজায় মিল। রূপের ঘেরে বন্দী আমরা গোড়া থেকেই, এই বাঁধন থেকে মুক্তি হচ্ছে রূপমুক্তির সাধনা রূপকারের।

যে রূপ সমস্ত নিয়ে রূপকারের কারবার তারা বাঁধা রূপ, আর্টিস্ট তাদের মুক্তি দিলে তবেই তারা পথ পেলে মন থেকে মনে চলাচলি করবার। রূপসাগরের তলায় সুপ্তি দিয়ে বন্ধ করা রূপকথার রাজকন্যা, রূপমুক্তির সাধনা হল তাকে জাগিয়ে আনা। রেখা মুক্তি পেলে তো রং ধরে বাঁধা রূপের প্রাচীর টপকে সে ভাবরাজত্বে পালাল বন্দী।

কথা থাকে অর্থ দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, কবি তাকে মুক্তি দেন তবে জানায় সে বেদনা গুঞ্জন করে ভ্রমরের মতো হৃদয়পদ্মের পাপড়ি খোলাতে, তখন আর শুধু থাকে না কথা আর তার অভিধান দোরস্ত মানেটা। যেমন এই 'বাচ্চা' কথাটিতে সে সর্বজীবে সর্বকালেই বাচ্চা এইটেই বুঝায়, কিন্তু এই বাচ্চারূপী কথাটি মুক্তি পেলে যেমনি বলা হল বাছা বাছনি! যেমন জুতো সে মুক্তি পেলে বাঁধা রূপ থেকে জুতুয়াতে, পাট—পট্ট—পট একই কথা কিন্তু রূপ দেখায় স্বতন্ত্র, তেমনি অসংখ্য কথা ছাড়া পেয়ে গেছে ও যাচ্ছে কবির হাতে বদ্ধ রূপের শিকল কাটা পাখি সমস্ত।

সঙ্গীতে স্বরমালা সাত রাজার ধন সাতটি মাত্র, কিন্তু সাতাশ লক্ষেরও বেশি রূপ পেয়ে ঝলক দেয় সাত সুর—গুণীর কণ্ঠে অপূর্ব সাতনরী হার! উৎসঙ্গে লীনা বীণা সে মুক্তস্বরা, তাকে পরিত্যাগ করে নিগুণ যখন চলেন একটা বাক্সে বাঁধা সারগমের অচল ঠাটের মধ্যে গলাটা বলিদান দিয়ে গান গাইতে, তখন রাগ রূপ সমস্ত তারা মুক্তির স্পর্শ পায় না কিন্তু ছাঁদ পায় বাক্সের ও সিন্দুকের, তেমনি এই অ্যানাটমির কিংবা ফটোযন্ত্রের বাক্সের মধ্যে হাতের টান ও মনের পরশ মিলিয়ে টানার কথা—সেসব রং রেখা তাদের যখন ঢালাই হতে দেখি তখন দেখি রূপ পাচ্ছে অ্যানাটমি ও পার্স্‌পেক্‌টিভ কিন্তু পরশ পাচ্ছে না একটুকুও মুক্তির।

যখন প্রাচীন প্রথার মধ্যে কিংবা আধুনিক কোনো বাঁধা প্রথায় রূপকে ঢালাই হতে দেখি তখন আমার আতঙ্কের সীমা থাকে না—জলের মাছকে বঁড়শি দিয়ে গেঁথে হাঁড়ির মধ্যে মুক্তি দেওয়ার মতো ঠেকে ব্যাপারটি। রূপসাধককে এই রকমের নিষ্ঠুর খেলা খেলতে হয় শুধু রূপবদ্ধ হলে কি হয় আর ছাড়া পেলেই বা কি হয় তা জানার বেলায়, কিন্তু রূপ সমস্তকে রসের স্পর্শে মুক্তি দেওয়াতেই রূপদক্ষের আনন্দ ও চরম সার্থকতা এ কে না বলবে!

একটা মাটির ঢেলা এক চাংড়া পাথর তাদের রূপ নিরেট করে বাঁধা নিয়তির নিয়মে—একেবারে সুনির্দিষ্ট রূপ, কিন্তু সেই ঢেলা আর পাথর রূপদক্ষের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে যখন আসে অপরূপ সব মূর্তি ধরে, তখন মানুষ তার পূজো দেয়, তাকে প্রেমালিঙ্গন দেয়, খেলা করে মাটি পাথর মানুষের সঙ্গে। পাষাণ দিলে বর অভয়, পাষাণ দিলে ভিজিয়ে মন—এ অঘটন কি ঘটতে যদি না সুহস্ত রূপদক্ষ তাঁরা পাষাণকে তার জড়ত্বের কঠিন কারাগার থেকে মুক্তি না দিতেন! অনড় পাথর নটরাজ মূর্তিতে নাচল, অচেতন পাষাণ সে চেতনার স্পর্শে আর এক জীবন্ত সুন্দর মূর্তির মতোই চমকে উঠল থমকে দাঁড়াল। নব জীবন দিলে রূপদক্ষ তাদের। যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার যেখানে সোজা সেখানে বাঁকা, জড় পাষাণের কাঠিন্যের সঙ্গে মেশা সজীবতার তারল্য, এই ছন্দ রূপের জগতে মানুষ প্রথম এসেই লাভ করেছে সহজে, এই বাতাসের মতো সহজে। এ ছন্দ ভাঙলেই সর্বনাশ! এই কাঠিন্য এবং তারল্যের ছন্দে গাঁথা মানুষের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবটাই। দূরের পাহাড় সে জানায় এই ছন্দটি। চাঁদ সে আলো অন্ধকারের ছন্দ ধরে সুন্দর, রাত্রি ঘিরে আছে তবেই পূর্ণ চন্দ্রের রূপ আছে, প্রতিপদের চাঁদ সে আর এক ছন্দ ধরে মনের আকাশে ভাবরূপে বিদ্যমান হল —সে আছে অথচ নেইও। এই ছন্দ। ছবিতে মূর্তিতে কবিতায় গানে শুধু ফুটন্ত রূপ নিয়ে কারবার নয় আর্টিস্টের—দেখা না-দেখা দুই রূপ মিললে তবে ছন্দোময় হয় কাজ। ফটোগ্রাফ শুধু দৃশ্য রূপের মধ্যে বদ্ধ, কাজেই ছন্দ ছাড়া রূপ দিয়ে চলে সে। রেখার কাঠিন্য ও রেখার তারল্য—এই নিয়ে অঙ্কনের ছন্দ, সুরের কাঠিন্য মিলল গিয়ে মীড়ের তারল্যে এই হল গায়নের ছন্দ। সবদিকেই রূপ দেবার বেলায় এই ছন্দ না ধরে উপায় নেই।

'চক্ষুর্গ্রাহ্যং ভবেদ্রূপম্' কিংবা 'ননু রূপাণি পশ্যন্তি'। দৃশ্য রূপের কঠিন অংশের সম্বন্ধে একথা খাটল, কিন্তু যেসব রূপ মনে গিয়ে পৌঁছচ্ছে চোখে পড়ছে না, কিন্তু অনির্বচনীয় স্পর্শটুকুর উপরে যার নির্ভর এমন সব তরল রূপ? তার বেলায় মনশ্চক্ষু প্রাণরসনা ইত্যাদি না নিয়ে সেখানে কাজ চলল না। রূপের এই রহস্য জেনেই বাউল কবি বলেছেন—

"চোখে দেখে প্রাণে ঠেকে ধূলো আর মাটি
প্রাণ রসনায় দেখরে চাইখ্যা রসের শাইখ্যাটি!"

চোখে দেখি এক রূপ প্রাণে দেখি অন্য রূপ এই হল রূপের দুই প্রকাশ। দৃষ্টির পথে যেমনি চোখাচোখি অমনি অভিসার রসরূপে মানসকুঞ্জে। হয়তো সে একটি রূপ যৌবনে পরিপূর্ণ, হয়তো সে একটি রূপ ন্যুব্জ কুব্জ জরাজীর্ণ, হয়তো সে একটি গাছের তলায় হরিণশিশু, হয়তো সে একটা ছাতামাথায় ব্যাঙ, কিন্তু দৃষ্টিপথ ধরে মনে পৌঁছল কি সেটি রসের বস্তু হল রূপদক্ষের কাছে—

"সই কিবা সে সুন্দর রূপ
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে
বড়ই রসের কূপ।"

মানুষের মন বা চিত্তপট তো ক্যামেরার প্লেট নয় যে চোখ খুললেই ধরলে ছবি বুকে, কার কাছে কি যে মনোরম ঠেকে, কোন রূপটা কখনই বা প্রাণে লাগে তার বাঁধাবাঁধি আইন একেবারেই নেই; কিন্তু মনে না ধরলে সুন্দর হল না, মনে ধরলে তবেই সুন্দর হল—এ নিয়ম অকাট্য। 'মনের মানুষ মনের মতো ঘরখানিতে'—এ তো কথার কথা নয়। রূপের ঠাট এক বাইরের মতো আর এক মনের মতো, ফটো দেয় বাইরের ঠাট রূপদক্ষ দেন মনোমতো রূপের ঠাট সমস্ত।

উটের কিংবা পেঁচার ও ব্যাঙের বাইরের ঠাট বিধাতার মনোমতো হলেও সাধারণ লোকে দূর দূর করলে দেখে। তবেই বলি সাধারণ মানুষের মনোমতো হবার মতো রূপ পেলে না তারা, কিন্তু রূপদক্ষের রূপসৃষ্টির নিয়ম—যা হল নিয়তিকৃত নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র—তার রসে উটের রূপ পেঁচার রূপ ব্যাঙের রূপ সুন্দর হল মনোমতো হল সুন্দর তাকে ব্যঙ্গ করলে না একজনও।

একটা ক্যামেরা সে রূপকে ধরে নেয় ঠিক কিন্তু রূপসৃষ্টির নিয়ম সে মানে না, পদার্থবিদ্যার জল বাতাস আলো ছায়ার অকাট্য নিয়ম মানে। তবুও সে কি ঠিক উট-পেঁচাটাই ঠিক ভাবে দেয়? —সৃষ্ট রূপের একটা একটা অপদার্থ নকল দেয় মাত্র। নিয়তির নিয়মে সৃষ্টির কিছুতে পুনরুক্তি হতে পারে না। কিন্তু কল সে বিজ্ঞানসম্মত নিয়মে এক জিনিসের হাজার হাজার পুনরুক্তি করে চলেছে সুতরাং এ হিসেবে সে নিয়ম লঙ্ঘন করছে কিন্তু স্বতন্ত্র কোনো এমন একটা নিয়ম নেই তার যার দ্বারা রূপসৃষ্টি করতে পারছে সে।

নিয়তিকৃত নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র অথচ নিয়তির নিয়ম থেকেই নেওয়া সমস্ত রূপকারের কারিগরির নিয়ম। পাষাণ তার একটা আকৃতি আছে বর্ণও আছে কাঠিন্য ইত্যাদি গুণও আছে কিন্তু চেতনা নেই, সুতরাং তার সুখ দুঃখ মান অভিমান কিছুই নেই—এই হল নিয়তির নিয়মে গড়া সে পাষাণ, কিন্তু রূপদক্ষের কাছে পাষাণী অহল্যা নিয়তিকৃত নিয়মের থেকে স্বতন্ত্র নিয়মে যখন রূপ পেলে তখনো সে পাষাণ কিন্তু তার সুখ দুঃখ মান অভিমান জীবন মৃত্যু সবই আছে। যে মাটির খেলনা গড়লে সে মাটিকে জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের খেলার সাথীরূপে ছেড়ে দিলে।

পাষাণে গাঁথা গোসাঘর তার মধ্যে ধরা রূপবান রূপবতী, হাতুড়ির ঘায়ে তবে ভাঙে সে গোসাঘরের দেওয়াল, তারপর পাথরের মান ভাঙাতে অসাধ্য সাধন। মাটির দেওয়াল, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে রূপ; সেও অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়ে সহজে কি বেরিয়ে এল? সোনা সে কি কম জ্বালালে আর্টিস্টকে? হীরক যাকে বল বজ্রমণি সে বজ্রের মতো দুর্জয়, তাকে মানিয়ে তবে দিতে হল হীরের ফুল ফুটিয়ে। বিধাতার নিয়মে বাঁধা রূপজগৎ তার মধ্যেই আর একটা জগৎ যেটা আপনার নিয়মে চলেছে অথচ সেটা সত্যকার রূপজগৎ—বিশ্বামিত্রের ব্যাসকাশীর মতো ভূয়ো জগৎ নয়, সেখানে সত্য রূপ সমস্ত বিধাতার নিয়মকে কোথাও মেনে কোথাও বা আর্টের নিয়মকে ধরে সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন এই গাছ একে দিলেন নিয়ন্তা এক রূপ, যেমন সেই গাছ তাকে দিলে কারিগর টেবিল কেদারা নৌকো বাড়ির কত কি রূপ, —একা নিয়তির নিয়মে গড়াই হতে পারে না মানুষের চৌকি টেবিল বাক্স তোরঙ্গ।

আলঙ্কারিকেরা এই রকমের শিল্পকার্য সমস্তকে বলেছেন বন্ধ-চিত্র। দুই সৃষ্টিকর্তার নিয়ম স্বীকার করে তবে হয়েছে টেবিল চৌকি সোনারূপার অলঙ্কার ইত্যাদি ইত্যাদি। উনি দিলেন মাত্র কাঁচা সোনাটুকু, ইনি দিলেন পাকা সোনার কর্ণফুলের রূপ লাবণ্য ভাব ভঙ্গি সবই; উনি দিলেন কাঁঠাল গাছ, ইনি দিলেন কাঁঠাল কাঠের রাজতক্ত। এমনি দুই আর্টিস্ট মিলে হল গঠন সমস্ত। এইজন্য বলা হল বেদে—আমাদের শিল্প দেবশিল্পীর অনুরণন দেয়। এ-শিল্পীর ও-শিল্পীর বন্ধুতার ফলে হল এইসব নানা প্রবন্ধে নানা ছন্দে দেওয়া রূপ সমস্ত, শুধু নিয়তির নিয়ম লঙ্ঘন করেই হয় না আর্টের জগতে রূপসৃষ্টি। মনে করো না যেই টেবিল চৌকি গড়ে সেই হয়ে ওঠে দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা; কেননা রূপসাধন সে সহজ সাধনা নয়। কোনো চৌকিতে বসলেই উঠি উঠি মন করে, কোনো কেদারা এমন আরামের যে বসতেই শ্রান্তি দূর, সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার আবেশ।

ফুটবল খেলা দেখতে মত্ত থাকি বলেই বুঝতে পারিনে ফুটবলের চার আনার বেঞ্চ একজন রূপদক্ষে গড়েনি—সে প্রায় সৃষ্টিকর্তার কাঠখানাই বেঞ্চ বলে চালিয়ে বঞ্চনা করছে দর্শকদের।

রূপদক্ষ নিজের মনোমতো রূপটি রচনা করেই খালাস, সে রূপ দেখবে তাদের কথা রূপদক্ষকে একেবারেই ভাবতে হয় না—এ একটা কথাই নয়। আমার যা খুশি বেঁধেই খালাস তুমি খেয়ে দূর ছাই কর তাতে এল গেল না।—এ কোনো ভাল রাঁধুনীই বলে না। আমার মনোমতোকে দশের ও দশ হাজারের মনোমতো করে দিলেম—এতেই আনন্দ হল রূপদক্ষের।

রূপ দেবার শত সহস্র নিয়মের যে দেখা পাই রূপবিদ্যার চর্চার বেলায় তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না যদি না রচনা সমস্তকে তোমারো মনে ধরাবার দরকার হত। ছেলে কাদা নিয়ে খেলে, কত গড়ন গড়ে সেও, কিন্তু রূপের কোনো নিয়ম তার কাছে নেই, সে যথেচ্ছা গড়ে চলে কিন্তু সেও থেকে থেকে কোনো একটি দর্শকের তারিফ পেতে কাজ হাতে ছুটে আসে। কাজেই দর্শক ও প্রদর্শক চাই-ই থাকা।

বড় বড় কবি ও রূপদক্ষ নট ও পট-রচয়িতা তাদের কথা ছেড়ে দিই, যে লোকটা ছেলে খেলানোর পুতুল গড়ছে—বাঘ ভালুক সাহেব মেম পশুপক্ষী হাঁড়িকুঁড়ি কত কি— সেই যে পুতুলওয়ালা সে তো যথেচ্ছা গড়ছে না, ছেলে ভোলে কিসে এ তার স্মরণে রয়েছে অথচ তাকে নতুন নতুন রূপ দিতে হচ্ছে নিজের মতে। ছেলের একটি ফোঁটা প্রাণ কিন্তু বিশ্বরূপকে নিয়ে খেলার ইচ্ছা তার,—সে হাতি চায়, ঘোড়া চায়, পাখি চায়, বাঘকে চায়, শেয়ালকে চায় খেলার সাথীরূপে পেতে, কিন্তু সত্যি জানোয়ার দেখে সে ডরায়, ভারি খেলনা হলে তুলতে ও টানতে হয় শিশুর প্রাণান্ত, কাচের পুতুল নিয়ে খেলতে গেলে সে হাত পা কেটে বসে, এক

খেলনা নিয়ে বেশিক্ষণও সে ভুলে থাকে না— নতুনের প্রেমে পাগল তার নতুন জীবন, সবই তার বিস্ময় জাগায়।

রূপ মান প্রমাণ ভাব ভঙ্গি সাদৃশ্য বর্ণ লাবণ্য কোনো দিক দিয়ে অনুকৃতির নিয়মকে মানা চলল না এখানে রূপদক্ষ খেলনাওয়ালার। বাঘ ঠিক বাঘ হলে চলল না, এমন একটি রূপ দিতে হল পুতুলকে যা বললে— আমি বাঘ বটে কিন্তু খেলাতে এসে যোগ দিতে পারব এমন বাঘ আমি। লঘুভার চমৎকার বাঘ যাকে দেখতে বাহার, খেলতে মজা যার সঙ্গে, —এই হল তো ছেলে ভুলল, নচেৎ নয়। আইনও হল এইসব ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ দিয়ে খেলনা প্রস্তুতের।

মূর্তিশিল্পের চরম হল যেখানে পাষাণে দেবতার আবির্ভাব হল। এইসব আর এক প্রস্থ বুড়ো বয়সের খেলনা। পুতুল গড়ার নিয়ম সেখানেও খাটল অনেকখানি, তফাত শুধু হল মাপের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কোথাও কোথাও। ছেলের খেলনা হালকা, বুড়োর খেলনা ভারি, এটা ছোট মাপ, ওটা নবতাল দশতাল এমনি তাল তাল রূপ—এই যা তফাত। বালির স্তূপ গড়লে ছেলেতে আর পাথরের স্তূপ গড়লে বৌদ্ধ রাজা—সাজের বাহুল্য এবং রূপের সমাবেশ ইত্যাদি নিয়ে আরো অনেকখানি পরিপূর্ণ হল বৌদ্ধ স্তূপ কিন্তু রূপটা রইল সেই ছেলের গড়া বালির স্তূপেরই।

প্রতিকৃতি অনুকৃতি এসবের স্থান আছে রূপবিদ্যার মধ্যে, এদের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম আছে—তারা হল রূপকে শত শত বার পুনরাবৃত্তির নিয়ম। রূপদক্ষের সৃষ্টি যার পুনরাবৃত্তি নেই তার নিয়ম সমস্ত স্বতন্ত্র নিয়তিকৃত নিয়মরহিত নিয়ম বা খেলনা গড়ার নিয়মও বলতে পারো তাকে।

নিয়তির নিয়ম হল বিধাতার নিয়ম, আর নিয়তির নিয়ম থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র নিয়ম হল আর্টের নিয়ম। কিন্তু একেবারে, যে নিয়তির নিয়ম লঙ্ঘন করলে সে আর্ট রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ নিরপেক্ষ আর্ট—হয়তো আছে হয়তো নেই। দুই সৃষ্টির নিয়মকে মানিয়ে যে আর্ট তাই নিয়েই রূপদক্ষের কারবার। একটা মাটির খেলনা তাকে ছেলের সাথী হবার উপযুক্ত করে ক্ষণিকের জীবন দিয়ে ছেড়ে দিলে আর্টিস্ট, একটা পাথরের দেবমূর্তিকে আরো বেশি পরমায়ু দিলে আর্টিস্ট—কেননা যুগ যুগ ধরে মানুষের সঙ্গে খেলার সম্পর্ক পাওয়া চাই তার। ঠিক এই নিয়ম দেখি বিধাতারও সৃষ্টির মধ্যে কাজ করছে। নক্ষত্র একটা গড়লেন বিশ্বকর্মা,—যুগ যুগ ধরে ফুলঝুরি জ্বালিয়ে খেলে চলল সে, একটা খদ্যোত গড়লেন তিনি—ক্ষণিক খেলার অবসর পেলে সে বিধাতার কাছে। আর্টিস্টও ঠিক এর জবাব দিলে, ঘরের মধ্যে তার সে ঘরের প্রদীপ তারার মতোই জ্বলল—শুধু রূপটি পেলে সে ক্ষণিকের।

বিধাতার গড়া প্রজাপতি সে খেললে ক্ষণিক, আর্টিস্টের গড়া পাষাণ সুন্দরী সে যুগ যুগ ধরে খেলতে লাগল, মানুষের ঘরে সোনার কাঁটায় বেঁধা প্রজাপতি শোভা ধরলে— একের পর এক যারা সুন্দরী জন্মাল তাদের খোঁপায় উড়ে বসল সে বিয়ের আগে। দেবতার সভায় বাজল মেঘের বাদল, আর্টিস্টের সভায় বাজল মাটির মাদল। গাছ সে ফুল সেজে ইশারায় জানালে—আমি গাছ নয়, আমি সবুজ শাড়ি পরে বনদেবী, আর্টিস্টের হাতের বীণা সে সুরের সাজে সেজে বললে আমি কি শুধু বীণাই, আমি পরিবাদিনী সুন্দরীও বটে। এমনি নিয়ন্তাতে আর রূপদক্ষের বাজিখেলা রূপসৃষ্টি নিয়ে। খেলার সময় যেমন তাসগুলো হাত বদল করে তেমনি এই রূপসৃষ্টির লীলা খেলতে নিয়তির নিয়মগুলো আসা যাওয়া করে আর্টিস্টের হাতে বারবার। এই

নিয়ম সমস্ত জানার জন্যই Nature study করতে হয় আর্টিস্টকে, না হলে শুধু নিজের নিয়মে চললে খেলা চলে না ঘুরে ফিরে অনেকক্ষণ।

অক্ষরমূর্তিতে কতক, শব্দরূপে কতক, স্পর্শরূপে কতক—এমনি ভাবে রূপ সমস্ত ধরা দিচ্ছে আমাদের চেতনায়, আবার এই তিনে মিলিয়ে একটা রূপ তাও পাচ্ছি আমরা। আকাশের তারা থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রের তলায় শুক্তির মধ্যেকার মুক্তা সবই বিধাতার স্বাক্ষরিত রূপ। মিশরের মরুভূমির মাঝে পিরামিড় সেখান থেকে সমুদ্রের বুকে যে লাইট-হাউস সমস্তই মানুষের স্বাক্ষরিত রূপ তারা। বিদ্যুল্লেখা একেবারে সোনার জলে টানা অক্ষররূপ, তার অনুগামী বজ্র একেবারে শব্দ দিয়ে গড়া সে। কোকিলের কুহু— শব্দরূপ মাত্রে বসন্তশ্রী রইলেন সেখানে, মলয় বাতাস স্পর্শরূপ পরিমলরূপ তার। বর্ণরূপা যাঁরা তাঁদের স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের হিসেবে অক্ষরমূর্তির কোঠায় ফেলা চলল। এইভাবে শুনে দেখা যায় ছুঁয়ে দেখা যায় চোখ বুলিয়ে দেখা যায় রূপ আর রূপের সমস্ত ইঙ্গিত ও আভাস।

পুতুলওয়ালা দুয়ারে পা দিয়েছে অমনি ছেলে ছুটেছে তার দিকে রূপের টানে,— সহজে গড়া পুত্তলিকা তাদের আকর্ষণ কতখানি! ছেলে কাঁদে পুতুল চেয়ে, ছেলে খায় না ঘুমোয় না পুতুল না পেলে, মায়ের কোল ছেড়ে পালায় শিশু—এমন আকর্ষণ রূপের। বিধাতার সৃষ্টিতে এক আগুনের এই ধরনের আকর্ষণ—পাখিকে টানে পতঙ্গকে টানে, দলে দলে মানুষ জড়ো হয় রূপ দেখতে। পুত্তলিকার আকর্ষণের মতো এমন বিরাট আকর্ষণ সেটা কি কুড়িয়ে পায় মানুষ? পুতুল গড়ার নিয়ম আর অগ্নিশিখার নিয়ম কিন্তু একটু স্বতন্ত্র। আগুনের আকর্ষণের শেষে ভীষণ নিরানন্দ, পুতুলের আকর্ষণের শেষে আনন্দ। যে পুতুল গড়ে সে বুড়ো, যে পুতুল খেলে সে ছেলে, রূপের ছাঁদে দুয়ের মিলন; আর ঐ বিশ্বকর্মা যিনি তারা গড়েন আর যে তারাবাজি পুড়িয়ে খেলে তাদের মিলন রূপের ছন্দে।

জগন্নাথের মন্দিরে একটা ঘর দেখেছি পুতুল দিয়ে ঠাসা—সৃষ্টির পশু পক্ষী জীবজন্তু গাছপালা গড়ে গড়ে ধরেছে সেখানে। পালপার্বণে এইসব পুতুলের ডাক পড়ে রাস দোল কত কি খেলার—দেবতায় মানুষে পুতুলে বেধে যায় রঙ্গ তারপর খেলার শেষে রূপ সমস্ত যে যার স্থানে চলে যায়। ছেলে যতদিন ঘরে নেই, ততদিন খেলনার আলমারিতে বন্দী সমস্ত পুত্তলিকা রূপ তারা বড় দুঃখেই আছে দেখি, যেমনি ছেলে এল আর রক্ষে নেই, পুতুলগুলো হাঁফ ছেড়ে বললে—যাক বাঁচা গেল, এইবার খেলে যাবার অবসর এল। এমনি রূপ সমস্ত দিকে দিকে জলে স্থলে আকাশে বন্দী থাকে—আর্টিস্টকে খোঁজে তারা সবাই, তাদের নিয়ে লীলা করবে এমন এক-এক জন খেলুড়ি আর্টিস্টকে খুঁজে ফিরছে বিশ্বজোড়া রূপ সকলে। সেই বিক্রমাদিত্যের আমলে একটা শুকনো গাছ— মাঠের ধারে সে অপেক্ষা করছিল যে তাকে নিয়ে একটিবার সত্যি সত্যি খেলবে তার জন্য। রাজা গেলেন পথ দিয়ে, দেখলেন শুকনো গাছ। রাজার সঙ্গেই রাজকবি—তিনি কবি নয় কিন্তু পদ্যে কথা বলেন—তিনি পদ্যে বললেন—'এ যে দেখি শুষ্ক কাঠ'। ভাগ্যি ছিলেন সঙ্গে সত্যিকার কবি ও খেলুড়ি, তিনি বলে উঠলেন—'কি কও শুকনো কাঠ?'

'ও সে তরুবর রসের বিরহে—
হুতাশে দহে!'

একটি ছেলে দেখলে শুকনো কাঠ নয়—সে ঘোড়া, সে মানুষ, সে কত কি? একজন কবি দখলেন শুকনো গাছ নয়—রসের পাত্র সেটি, ছেলে করে রূপের আরোপ, কবি করেন রূপের আবির্ভাব শুকনো কাঠে। ছেলে

রূপ আরোপ করলে যখন, তখন সে যা চায় তাই হল—সেই শুকনো কাঠের শুকনো কাঠ থাকা চলল না, ঘোড়া মানুষ কত কি হতে হল। ছেলে সে স্বমতে চলল, কাঠ রাখলে না গাছও রাখলে না—একে বলা চলল স্বারোপক রূপ। কবি যখন শুকনো গাছকে তরুবর বলে দেখালেন তখন তিনি একটা ইচ্ছামতো রূপের আরোপ করলেন গাছে একথা বলতে পারিনে, কেননা, 'রূপারোপাৎ তু রূপকম্'—এই কথা পণ্ডিতেরা বলেছেন। এখানে রূপের আরোপ হল না রূপের নষ্ট হয়েছিল যা তা পুনর্বার ফিরে এল রূপে। সুতরাং একে বললেম স্বরূপক রূপ। এই দুই নিয়মই খাটল রূপসৃষ্টির কাজে।

কথা দিয়েই লিখি ছবি দিয়েই কি সুর দিয়েই বলি গাছটিকে খানিক শুকনো কাঠ বলে জানালেম তো কাঠুরের কাজে এল খবর, রসিকের তাতে কি এল গেল? শুকনো গাছের আশা নিরাশা—কত বর্ষায় তার পাতায় পাতায় ভরে ওঠার স্বপ্ন, কত শীতে তার পাতা ঝরানোর গান, কত বসন্তে তার ফুলদোলের স্মৃতি সব কথা জড়িয়ে থাকে মরা গাছেও, কত পাখির আসা যাওয়ার খবর কত ছায়ার মায়া দিয়ে গড়া তার পরিপূর্ণ রূপ—তাই যদি না ধরা পড়ল রূপদক্ষের মায়াজালে তবে কি হল?

কাঠুরে এবং তুমি আমিও দেখব শুকনো কাঠ কিন্তু রূপদক্ষ যে সে দেখবে করুণ রসে সিক্ত বিরস বনস্পতিকে জীবন্তবৎ—এই হল নিয়ম। না হলে সমালোচক সেও যে পড়ে যায় রূপদক্ষের কোঠায়!

রূপ প্রকাশের পূর্বে তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলল—ঘট্টিত অবস্থা, লাঞ্ছিত অবস্থা, রঞ্জিত অবস্থা। চলিত কথায় আমরা বলি সাদামাটা অবস্থা, ছকা অবস্থা, রাঙ্গানো অবস্থা।

সাদামাটা অবস্থায় ঘটনা রয়েছে দ্রষ্টার অগোচরে আর্টিস্টের মনে এবং সাদা কাগজে সাদা পাথরে সোনার তালে মাটির স্তূপে। খানিকটা গোচর হল রূপ যখন নানা দাগদোগ মাপজোখ নিয়ে একটা কাঠামো পেলে ঘটনাটি, তারপর আলো ছায়া রঙ বেরঙে রঙিয়ে উঠল সমস্ত ঘটনাটি—এই নিয়ম ধরে রূপের প্রকাশ আর্টে। যেন বৃন্ত হল কলি জাগল ফুল ফুটল পরে পরে।

কিম্ভূতম্ আর কিমাকারম্—Grotesque আর Caricature—বৈরূপ্য শিল্পের এ দুটো প্রকাশ। কিম্ভূত যে সমস্ত রূপ এবং কিমাকার যে সমস্ত রূপ দুয়ের মধ্যে এক আইন কাজ করছে না। যেখানে রেখা সমস্ত আকৃতি পাবার বেলায় একটা নিয়ম ধরে বাঁকছে সোজা হচ্ছে—মানুষ পাচ্ছে গাছের রূপ, আধা মানুষ আধা গাছ রূপ, নরসিংহরূপ, অর্ধনারীশ্বর রূপ, কিন্নর রূপ—ভূষা ও মণ্ডন শিল্পের নিয়ম এবং ছন্দ ধরে রেখা রং সবই সেখানে প্রকাশ পাচ্ছে এবং রূপটি সেখানে একটা ভবিতব্যতা স্বীকার করছে, সেখানে সেটিকে বলা চলল কিম্ভূত রূপ বা Grotesque রূপ। Caricature বা কিমাকার যে এক আকৃতির বৈরূপ্য করা ছাড়া আর কোনো কিছু করছে না বা Grotesque অর্থাৎ কিম্ভূতের মতো মানানসই রূপও দিচ্ছে না। বেমানান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রেখা রঙ সমস্ত দিয়ে বেমানান রূপ প্রকাশ করাই হল Caricature। সাদৃশ্য সম্বন্ধে যখন বলব তখন এদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যাবে, এখন ভূষা-নিরপেক্ষ রূপ— রূপদক্ষের চরম দক্ষতা যার সৃষ্টি করার বেলায় দেখতে হয়—সেই বিষয়ে বলে আলোচনা শেষ করি।

'অঙ্গান্যভূষিতান্যের কেনচিদ্ ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ ভান্তি তদ্রূপমিতি কথ্যতে॥"[১]

রূপজগতে কেবলি রয়েছে 'সাজ সাজ' ধ্বনি—যেন নাচঘরের সাজঘর, সবাই সাজছে এখানে। কি সাজ কত সাজ এই বাঙলা দেশটার তাই দেখ না, ঐ যে আকাশ ও কি তারার মালায় সাজেনি, সমুদ্র কি নীলাম্বরী

পরে সাজেনি, নদী সে কি জলতরঙ্গ চুড়ি বাজিয়ে নেচে চলছে না? পাতার বাহার দিলে উপবন, কুঞ্জবন ফুলের মালায় সাজলে— অষ্ট অলঙ্কারে ভূষিতা সখী এরা রূপদক্ষকে ঘিরেই রইল—দিবারাত্রি সকাল সন্ধ্যা। বিচিত্র ছাঁদ বিচিত্র সজ্জা এদের। বিভূষিতা এই পৃথিবীতে কোথায় পাই নির্ভূষণ রূপটিকে?

নিরাভরণা নিরাবরণা সুন্দরী। রূপভোজের প্রমোদ উদ্যানের গিল্টির অলঙ্কারে বাঁধা Nude study তারাই কি নির্ভূষণা সুন্দরী বলে বলাতে পারে নিজেদের? রূপজীবীদের সহচরী বলে তাদের অনায়াসে চেনা যায়।

পর্বতদুহিতা উমা তিনি নির্ভূষণা রূপসী, শকুন্তলাও কতকটা এই ধাঁচের সুন্দরী, শ্রীরাধিকা নয় কিন্তু মথুরার কুব্জা তাকে ধরতে পারো নির্ভূষণা সুন্দরী বলে। অশোকবনের সীতা—ভূষা-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য ছিল তাঁর।

এ তো গেল কবিজনের সৃষ্টি করা নির্ভুক্ষণা রূপসী তাঁরা; বিধাতার সৃষ্টিতে ভূষা-নিরপেক্ষ রূপ কোথায় পাই দেখি। মরুভূমির নিঃসঙ্গ রূপ সে একেবারে বিরাটভাবে ত্যক্তভূষণ ও পরম সুন্দর! ময়ূরের সবটাই প্রায় ভূষিত, বাবু কার্তিকের বাহন হল সে। মরাল নির্ভূষণ ও সুন্দর মানস সরোবরে পেয়ে গেল স্থান।

বৌদ্ধ শিল্প তার মধ্যে একা বুদ্ধমূর্তিটিই কেবল নির্ভূষণ সুন্দর রূপ, আর চৈত্য বিহার স্তূপ সবই ভূষা-ভারাক্রান্ত রূপ। সিংহলের কপিল মূর্তি—রূপেতেই সেটি রূপবান, বাঙলার নিকোনো ঘর—ভূষা-নিরপেক্ষ রূপের বাসা। এমনি পৃথিবীর সর্বত্র আর্টের মধ্যে এই পরম রূপ জায়গায় জায়গায় ধরা রয়েছে দেখব অতি প্রাচীনকালে এবং একালেও।

রূপের অভাব দিয়ে ভূষা-নিরপেক্ষ রূপকে ফোটানো সম্ভব নয় এ সুনিশ্চিত। কলঘরের চিমনি সম্পূর্ণ ভূষা-নিরপেক্ষ, কিন্তু তার রূপ কি? ভূষোকালি মেখে সে একটি নির্ভূষণ অশোকস্তম্ভের কিমাকৃতি দিচ্ছে মাত্র। রূপদক্ষের হাতে তাকে সাজতে হয় অনেকটা তবে সে স্থান পায় রূপরচনার মধ্যে। চৈতন্য ছিলেন নিজের রূপেই রূপবান, কিন্তু চৈতনচুট্‌কিধারী বাবাজী যদিও ভূষণ পরলে না তবু সে ভেকধারী বাবাজী কি স্বামিজী এইটেই প্রমাণ করলে। জলের উপরে জেলে ডিঙ্গী ভূষা-নিরপেক্ষ সুন্দর সে। গাছের তলায় শুকনো পাতা শ্রীচৈতন্যের মতো নির্ভূষণ সোনার পুতুল সে। প্রভাতের চন্দ্রকলা আলোর সাজ ছেড়ে পরম সুন্দর; নির্ভূষণা সুন্দরী সে। আগ্রার তাজমহলের চেয়ে সুন্দরী দিল্লীর প্রাসাদে পাষাণ দিয়ে গড়া অন্দরমহলের গোপনতায় ঘেরা যে একটুখানি মোতি মসজিদ সে হল নিরাভরণা নির্ভূষণা সুন্দরীর প্রতিমা, কিন্তু ঐ তাজমহল সেও সুন্দরী কিন্তু নাতিভূষিতা। একেবারে নিরাভরণা সূচ সে একেবারে নির্ভূষণ—সরল রেখাটি পরিষ্কার ঝরঝরে, কাজের উপযুক্ত রূপ তার কিন্তু তার রূপ দেখে মন মাতে না, সূচে তোলা নানা কাজ দেখে কিন্তু চোখ মন সবই ভোলে। কুশ ও কাশ তারাও নির্ভূষণ সরল কিন্তু সূচের থেকে স্বতন্ত্র তাদের রূপ। টিনের জলপাত্র তার ভূষারিক্ততা আর সাদাসিধে অথচ সুন্দর চুমকি ঘটি তার ভূষারিক্ততা এক ধরনের নয় কাজেই তারা একরূপও নয়।

ভূষার অতিরেক এবং ব্যতিরেক এই দুয়ের নিয়ম অতি সাবধানে প্রয়োগ করতে হয় রূপ ফোটানোর বেলা। কতখানি সাজাব কতখানি সাজাব না, কাকে সাজাব কাকেই বা সাজাব না এর বিচার রূপদক্ষের হাতে। এই দুই মহাস্ত্র এরা রূপ ফোটায়—যদি রূপদক্ষের হাতে পড়ে এবং রূপকে মারে—যদি এদের নিয়ে কারবার করে রূপবিলাসী অথচ মোটেই রূপদক্ষ নয় এমন কেউ। যথাযথভাবে পুরোপুরি ভূষিত এবং অযথাভাবে ভূষণভার-গ্রস্ত দুটো কাজ পাশাপাশি রাখি, নারকেলডাঙায় পরেশনাথ টেম্পল রঙীন কাচ আর সোনার হলকারি দিয়ে মোড়া, ঠিক এমনি সোনা আর কাচে সাজানো আগ্রার শিশমহল। দুটোতে তফাত কতখানি হয়ে

গেল! একেও দেখতে লোক জমা হয়, ওকেও দেখতে লোক ছোটে। কিন্তু শিশমহল বইলে সার্থক রূপখানি, আর টেম্পল বইলে কাচ আর গিল্টির অনর্থক ভার মাত্র। গহনা কেড়ে নিলেও সে রূপবতী, রূপসীর আদর্শ তাকে বলতে পারো। ভূষা-নিরপেক্ষ রূপ হল প্রকৃত রূপ—লাখে এক রচনায় তার দেখা পাই শিল্পজগতে। রচনার কৌশলে বর্ণের ছটায় ভাবের সমাবেশে রূপ সমস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে আমাদের কাছে মূল্য পায়। চোখের দিক ঘেঁষা কোন রূপ, মনের দিক ঘেঁষা কোন রূপ। রূপের মোটামুটি ভেদ এই দুটো নিয়ে হয়, তারপর মন্দ নয়, পাঁচপাঁচি, মাঝারি— এমনি অসংখ্য রূপ তারাও আছে, একেবারে কাজের ও একেবারে অকাজের এমন সব রূপসৃষ্টি এও আছে—রূপের সংখ্যা করা যায় না এত রূপ, এবং তত নিয়ম রূপভেদের —এরি সাধন হল রূপ-সাধকের অসাধ্য সাধন বলতে পারি।

টীকা

১. ১৩ শ্লোক, উদ্দীপনাবিভাকপ্রকরণম্—উজ্জ্বলনীলমণি (শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রণীত, হরিদাস দাস প্রকাশিত)

খেলার পুতুল

একদঙ্গল ছেলেমেয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে—আর খাঁচায় ধরা কালো বাঘ মস্ত একটা কাঠের বারকোস নিয়ে খেলছে! এক ছেলে বলে—ও ভাই বেরাল দেখ!

সিংহের খাঁচা—সেখানে পশুরাজ, তাঁকে দেখে বলে আর এক ছেলে—সিংহীর মামা ভোম্বল দাস, বাঘ মেরেছে গণ্ডা দশ।

আর এক ছেলে—সে সবে কপচাতে শিখেছে—সমুদ্রতীরে প্রাতঃসূর্যকে দেখে বললে, চাঁদটা কি লাল দেখ!

পশুরাজ সেখানে বেরাল সেজে খেলতে আসে, উদয়াচলের সূর্য আসেন তেজ লুকিয়ে ছদ্মবেশে রং মেখে মন ভোলাতে; নির্ভয় খেলার জগৎ—সেখানে ভয় দিতে এল না বাঘ কিন্তু খেলে যেতে এল, অন্ধকার এল সেখানে লুকোচুরি খেলার রহস্যময় রূপ ধরে খেলতে, ভয় পাওয়াতে নয়, আলো এল কিন্তু স্বপ্ন ভাঙাতে নয়—ঝিলিমিলি রূপ রং নিয়ে নতুন নতুন স্বপ্নের জালে ঘিরে দিতে দিগ্‌বিদিক্! সেখানে কি ঘরের কোণে কি বাইরে বনের তলায়, কিবা আকাশে মেঘের ফাঁকে, নদীজলে ঢেউয়ের দোলায়, সব জায়গাতেই খেলাঘরটি রইল পাতা সকল সময়ে। পড়া সেখানে খেলা—পাখি পড়ে ঝুঁটি ঝাড়ে মাথা নাড়ে। কাজ সেখানে খেলা—

"আয়রে ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই,
দোলায় আছে ছ'পোণ কড়ি
গুণতে গুণতে যাই।"

লড়াই সেখানে খেলা, —

"ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার,
তালপাতার সেপাই নিয়ে যুদ্ধে আগুসার।"

সংসার সেখানে খেলা, মরণ বাঁচন সেও এক খেলা!

ভাবনা-শূন্য জীবনের একটি একটি কণা, —সব খেলুড়ি তারা, লঘুভার প্রজাপতির সমান উড়তে উড়তে খেলতে খেলতে হঠাৎ ডানা বন্ধ করে ঘুমিয়ে যায়—ঘরের প্রদীপ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র খেলাঘরের মাটির পুতুল ঠিকানা পেতে চায়; খেলুড়ির এ ওকে শোধায়—

"ভোর বেলা যে খেলার সাথী
ছিল আমার সাথে,
মনে ভাবি তার ঠিকানা
তোমার জানা আছে।"

খেলুড়ির রাজা হল মানবশিশু—নটরাজ সে, নিজে নাচে বিশ্বকে নাচায়। বিশ্বরাজের লীলা-সহচর রূপ সমস্ত—চন্দ্র সূর্য জীব জন্তু ফুল পাতা মেঘ বৃষ্টি—তারা সবাই এই খেলুড়ির রাজা মানবশিশুকে চিনলে, ঘিরে ঘিরে বললে তাকে—'হাঁসি কাঁদি যেমন নাচাও তেমনি নাচি।' মায়ের কোলে ধরা সেই মাটির ঘরের খেলুড়ি ছেলেমেয়ে দুটিতে ভোলে সে খেলনা পেয়ে। ফেলনা জিনিস দিয়ে তৈরি হল না সে সমস্ত খেলাঘরের হেলা-ফেলার পুতুল,—যে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয় প্রাণ, যে মাটিতে মাটি হয়ে মেশে প্রাণের পাত্র দেহ, সেই মাটিতে গড়া হল পুতুলখেলার পুতুল। মাটির ঘরের ধারেই বাইরের খেলাঘরখানি পাতা, সেখানে আতা গাছে তোতাপাখি উড়ে বসে ডাকে—এস খোকা খেলি এস। মা বলেন—যেয়ো না খোকা। খোকা বলে—যাব! খেলতে কাঁদে খোকা, ভোলানো শক্ত তাকে চাঁদমুখে রোদ লাগার ভয় দিয়ে। রোদও সে ডাকছে—গাছের পাতায় আলোর ফুলঝুরি জ্বালিয়ে আর মাটি দিয়ে নিকোনো উঠোনের একটি ধারে আলোছায়ার চাকাচাকা ফুল সাজিয়ে খেলো এসে খোকা।

বাইরের মাটির পুতুল তারা সব ডাক দেয় ঘরের পুতুলটিকে—হাতছানি দিয়ে ইশারা করে কথা কয়ে গান গেয়ে। মন ভোলাল ছেলের, সে এক মায়ের কোল ছেড়ে আর এক মায়ের ঘরে খেলতে ছুটল বাইরে। সেখানে চলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা জলে স্থলে ধরাতলে, মেঘে মেঘে আকাশতলে।

খোকা চলে তুলতে আলোছায়ার ফুল—তারা ছোঁয়া দেয়, কচি হাতের মুঠোয় আসে কিন্তু ধরা দেয় না। আকাশের পাখি ডাক দেয় কাছে আসতে, কিন্তু ডাকলে আসে না কাছে পাখি, আতা গাছের তোতাপাখি সে—আগ ডালে উড়ে বসে, আতাপাতার নৌকো বাতাসে ভাসানোর খেলা জুড়ে দেয় একা একাই। দড়ি-ছেঁড়া রামছাগাল—বাঁকা দুটো শিং যেন হিট্টিমাটিমটিম—আতাপাতার গন্ধে গন্ধে পায়ে পায়ে এগোয় সে, দাড়ি নেড়ে বলে—খোকা দেখবে মজা? এক গরাসে গোটা পাঁচ পাতার নৌকো খেয়ে খোকার দিকে চায় ছাগল—ন্যেঁকরে কাঁদে খোকা, ট্যেঁ করে টিয়ে তাকে ভেংচায়, ন্যাঁ-ন্যাঁ বলে ছাগল ভোলায় খোকাকে।

হুঁকো হাতে তামাকখেগো বুড়োরা বসে বসে গল্পই করে, পাঁড়েজি পড়েন সুর করে গীতার মাথামুণ্ডু ব্যাখ্যা, আহ্লাদী পিসি তাই শুনে হেসে যেন ফুটিফাটা হয়ে যান।

আতাতলার নাটশালার ধারে গোয়াল-পোরা গাই বাছুর, খোকা চলে সে দিকে, কুয়োতলার কুণো বেরাল এঁটোকাঁটা খেয়ে গোঁফ মুছে চায় টিয়েপাখির দিকে। খোকা ডাকে—আয় মেনি পুস্! ওদিকে টিয়ে ওড়ে ফুস্।

খেলার বেলা শেষ হয়ে আসে, তিন পহরের রোদ ছায়ার কাছেই মাদুর বেছায়, খেলা ভুলে খোকা শুয়ে পড়ে রোদের কোলে মাথা রেখে, চেয়ে থাকে নীল আকাশে, তালগাছের শিয়রে, বাবুইয়ের বাসার দিকে। দূরে ডাকে পুতুলওয়ালা—খেলনা চাই চুড়ি চাই। খুকি বার হল পরণে ডুরে শাড়ি খোঁপায় ফুল—যেন চলে পুতুলটি। খেলতে জানে সে পুতুল খেলা, চেনে তাকে পুতুলওয়ালা। খোকাতে খুকিতে চলে হাটে রাসের মেলায় খেলনা কিনতে।

দূর দেশের খেলনা—মাটির খেলনা, সোলার খেলনা। কেউ এল খোকার হাতে হাতে, কেউ এল খুকির কোলে কোলে, কেউ বা এল সাথীদের ঝুড়ি চেপে; খেলাঘরে বাসা নিলে অবেলার সব অতিথি তারা—মেলার ফেরত নতুন সাজ সবার। সকালের সেই পলাতকা টিয়ে তিনি পরেছেন কমলাফুলির ওড়না, বাঘা মামা হয়েছেন নামাবলী তিলক ছাপা বোষ্টম, ঘোড়া হয়েছেন পক্ষিরাজ, হাতি সেজেছেন ব্যাঙ, ব্যাঙ সেজেছেন হাতি, সাপ হয়েছেন ময়ূর, ময়ূর হয়েছেন সর্প, কুমির হয়েছেন নৌকা, নৌকা হয়েছেন কুমির; তার মধ্যে

জলজীয়ন্ত বেরালবউ আর খোকা খুকি তিনজনে খেলা করে, সূয্যি মামার বিয়ের ডুলি ঘরের কোণে ধরা, তারি কাছে খেলাঘরের পিদুম জ্বলে।

আগডুম বাগডুম
ঘোড়াডুম সাজে,
ডাং মৃদং ঝাঁঝর বাজে।

গভীর রাতে চাঁদের আলো চুপি চুপি খেলতে এসে দেখে খেলাঘরে ভাঙা পুতুলের ছড়াছড়ি, ঘুমে অচেতন খোকা খুকি তারা।

রূপের মান ও পরিমাণ

রসের আশ্রয় হল রূপ—“আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়”(—ভারতচন্দ্র)। হাওয়ার রূপ নেই, কিন্তু আলম্বন-ভেদে বাতাসের স্বাদ ও গতির ভেদাভেদ স্থির করে নিই আমরা,—যেমন তালপাখার হাওয়া কুলোর বাতাস ইলেকট্রিক ফ্যানের বাতাস চামরের বাতাস আঁচলের বাতাস বিলেতের হাওয়া ম্যালেরিয়ার হাওয়া উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম হাওয়া। রসশাস্ত্রকার তাঁরা এই আশ্রয়ভেদ নিয়ে রসের ভেদ স্থির করে বললেন আদি করুণ ভয়ানক বীভৎস—এই প্রকার নয় রস। এইসব নানা রসের পাত্র তারা নানা রূপ এবং তাদের গড়ার বাঁধাধরা মাপজোখ শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়; অঙ্কশাস্ত্রেও চতুষ্কোণ ত্রিকোণ দীর্ঘ হ্রস্ব বৃত্ত এমনি নানা রূপের সঠিক মাপ পাই আমরা। শাস্ত্রমতে রূপের আকার ও প্রকার হল ষোল রকম—“রূপন্তু ষোড়শবিধম্”, যথা—হ্রস্ব দীর্ঘ স্থূল চতুরস্র ইত্যাদি ইত্যাদি হল আকারের মাপজোখ নিয়ে, আকার রঙের মান পরিমাণ নিয়ে প্রকার ভেদ হল, আকার হয়তো রইল ঠিক, যথা—রক্ত আরক্ত পীত পাণ্ডু কৃষ্ণ নীলারুণ শুক্ল রজত,—তারপরে আবার বস্তুটির গুণাগুণ নিয়ে ভেদ হল—দারুণ পিচ্ছল চিক্কণ মৃদু ইত্যাদি ইত্যাদি।

একখানা লাল বনাতে একখানা লাল মখমলে সমান হল না স্পর্শে, একপাট সাদা খদ্দরে একপাট সাদা সিল্কে সমান হল না লাবণ্যে ও স্পর্শে। একটা তালগাছে আর একগাছা আখের ছড়ে সমান নয়, ডৌলে মাপে যদিও দুই-ই দীর্ঘ। একই আকাশ কিন্তু দিনের আকাশে রাতের আকাশে সমান হল না, রূপে গুণে রঙে ও স্পর্শে বিষম ভেদ রইল এতে ওতে। রূপের বহিরঙ্গীন অংশের মাপ ডৌল থেকে স্থির করা গেল এবং দেখা গেল সেখানে দুটো এক মাপের ডৌল নেই—বর ও কন্যা রূপে গুণে দুইজনে আলাদা আলাদা, এর ডৌলে ওর ডৌলে কোনো মিল নেই। স্বভাবের নিয়মে সবাই আলাদা মান আলাদা ডৌল পেলেম আমরা, বিয়ের মন্ত্র নিয়েও দু'হাত এক করা গেল না, দক্ষিণ ও বাম যে আলাদা সেই আলাদাই রইল।

সমান ডৌল সে সমপরিমাণ না হলে হয় না। স্বভাবের নিয়মে সমান সমপরিমাণ দুটো গাছ নেই। জগতে দুটো মানুষ সমান নয়, এমনকি হাত পা চোখ কান সেখানেও সমান মাপ দেখা যায় না। স্বভাবের গড়ন সমস্ত হল অসম বিষম ছন্দে প্রস্তুত—সবার স্বতন্ত্র মাপ। বিশ্বশিল্পীর রূপসৃষ্টির ধারা চলল অসম বিষম ছন্দে ও তালে। রূপের বৈচিত্র্য রসের বৈচিত্র্য এই লক্ষ্য ধরে গড়লেন বিশ্বকর্মা, একের সমান আরেক নেই, নিজস্ব মান পরিমাণ নিয়ে সবাই সেখানে রূপবান এবং পরস্ব প্রমাণ ধরে সবাই সেখানে কেউ ছোট কেউ বড়, কেউ দূরে কেউ নিকটে, এমনি নানা আকার প্রকারের হল। কাছের বন সবুজ, দূরের বন নীল রূপ। কাছের তালগাছ দেখায় বন সবুজ, দূরের বন নীল রূপ। কাছের তালগাছ দেখায় বড়, দূরের তালগাছ দেখতে ছোট। মানুষের পাশে কুকুরটি ছোট কিন্তু খরগোশের পাশে সে মস্ত বড়—পরস্ব প্রমাণ বলে। কেবল যা প্রতিবিম্ব প্রতিচ্ছবি সে ডৌলে মাপে সমানের নিয়ম ধরলে, কিন্তু সেখানেও ভেদ রইল দুয়ে—জলে পড়ল প্রতিবিম্ব, ফুলের সব

দিক দিয়ে দুটো দুটো এক হয়েও হল না—সত্য ফুলকে তোলা গেল, ফুলের প্রতিবিম্বটি তোলা গেল না, ফুলে রইল সৌরভ, প্রতিবিম্বে রইল—না মধু না সৌরভ।

"God created man in His own image." বিশ্বরূপ যিনি, বিশ্বরূপের কর্তা বিশ্বকর্মা যিনি, তিনি —"স্বয়ংরূপ দর্পণে ধরে মানবরূপ সৃষ্টি করেছেন" (—লালন ফকির); "যথাদর্শে তথাত্মনি"। বিশ্বকর্মা তিনি স্বয়ংরূপ, তাঁর কৃত যা কিছু তাদেরও স্বয়ংরূপ দিলেন তিনি। রূপসাধকের মনের দর্পণে ঠিক ঠিক প্রতিবিম্ব হয় রূপ এটা সুনিশ্চিত, কিন্তু সেই রূপই বাইরে প্রকাশ করলেন যখন সাধক তখন যেমনটি তেমনটি করে দেওয়া সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। কাচের দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ে কিন্তু সেই রূপের ভোগ নেই দর্পণের। আত্মার দর্পণে রূপের ভোগ হচ্ছে, ক্রিয়া চলেছে আত্মার। জলের ক্রিয়া আরম্ভ হওয়া মাত্রেই স্থির চন্দ্রবিম্ব যেমন ভেঙে হয় চাঁদমালা, তেমনি স্বয়ংরূপ সমস্ত প্রতিবিম্ব ফেললে আত্মার দর্পণে, আবার আত্মার ক্রিয়া তাদের দিলে স্বতন্ত্র ডৌল মাপ। যেমন পাই ভিজে কাদায় পায়ের ছাপ তেমনি ক্যামেরায় সমানকে পেলেম—কতকটা সঠিক স্বয়ংরূপের পুনরাবৃত্তি পেলেম একের মতো আর এক, কিন্তু তবু সেটিকে স্বয়ংরূপ বলা গেল না কারণ, অনেক দিক থেকে অনুকৃতি সে মিলল আসলের সঙ্গে আবার অনেক দিক থেকে মিললও না—আসল সাপ দংশন করে কুণ্ডলী পাকায় চলে ফেরে মরেও, ফটোর সাপ তা করে না, আসল ফুল ফোটে গন্ধ বিলায় শুষ্ক হয় ঝরে যায়, ফটোর ফুল তা করে না। কাজেই এ ভাবের প্রতিবিম্ব সে খাটোই রইল, স্বয়ংরূপের সমান হতে পারল না, অনুরূপ কিন্তু স্বয়ংরূপ নয় মোটেই। ফটোটা ঠিক মানুষটির মান পরিমাণ ধরে ছাপানো গেল রঙও করা গেল কিন্তু তবু দেখি মানুষটির স্বয়ংরূপের সঙ্গে অনেক খাটো থেকে গেল সে। ফটো এই কারণে প্রমাণ করতে পারলে না যে সে একটি স্বয়ংরূপ। স্বয়ংরূপ যে তার নিজস্ব মান পরিমাণ ও পরস্ব মান নিয়ে সলীল গতিশীল সশ্বাস সনিমেষ, জগৎ—রূপের সঙ্গে স্বতন্ত্র এবং একও বটে, সে কারু সমান নয়, কারু প্রতিধ্বনি প্রতিরূপ প্রতিবিম্বও নয়। ঠিক এর উল্টো হল ফটোগ্রাফ—এ একের অনুরূপ ও সমান। স্থির জলে উড়ন্ত পাখির প্রতিবিম্ব—সত্য পাখির মতো সে উড়ল চলল বটে কিন্তু পাখি গাইল কই! কলের পাখি চললে বললে কিন্তু খাঁচা খুলে দিলে পালাল না ধান ছড়ালে খেয়ে গেল না।

সমানের আদর আছে কাজের জগতে—একটি টাকা আর একটি টাকার সমান না হলে কাজ চলে না। স্বভাবের নিয়মে সমান দুটো কিছুই নেই কিন্তু দোকানে আফিসে স্কুলে সমান চেয়ার বেঞ্চ আলমারি দেখি। সমানের মাপকাঠি যেটা কাজের জগতে খাটিয়ে চলেছি আমরা তাতে করে শিল্পজগতে কলে ছাঁটা একরকমের জিনিস অনেকগুলো এসেছে দেখি। রেল গাড়ির চাকা, রেল লাইন, কাচের বর্তন, টেলিগ্রাফের তার, দ্বাদশ মন্দির, তার ঘাটের ধাপ ইত্যাদি একটার পর একটার সমান।

অসমানের কৌশল রইল স্বভাবের হাতে আর রইল রূপদক্ষের হাতে—দরজির হাতে দোকানির হাতে কর্মকারের স্বর্ণকারের হাতে। এমনি যারা রূপের ব্যবসাদার তার সপরিমাণ ও সমান মাপে গড়ে চলল রূপ, কেননা একটা জিনিসের সমান হাজারটা না হলে ব্যবসা চলে না এদের। মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট একটা ইউনিফরম মাপ দিয়ে দিলে দরজির হাতে এবং রিক্রুটিং অফিসার সেও এই সমানের মাপ ধরে বেছে চলল সেপাইগুলি, ইউনিফরম গায়ে ঢুকল সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে। ফৌজের জন্যে টোটা বন্দুক যারা প্রস্তুত করছে তাদের হাতে রয়েছে নানা ধাতু নানা পদার্থের সমান মাপজোখ ভাগ-বাঁটোয়ারা, দপ্তরীর হাতে আছে সমান মাপ

দেবার রুল ও ছুরি, চোখ বুজে দপ্তরী এমন সমান করে কেটে চলে পাতা যে অনেক সময়ে ছাপার লেখার উপর দিয়ে লেখা চলে যায় সমানের টান।

সমান মাপজোখ নিয়ে কাজের প্রতিরূপতার সৃষ্টি হল—একটা দশ নম্বরের বুট আর একটা দশ নম্বরের বুটের প্রতিরূপ হল, একটা চন্দ্রহার আর একটা চন্দ্রহারের সমান হল, একটি সিদ্ধিদাতা গণেশ মূর্তি অন্য একটি সিদ্ধিদাতার অনুরূপ হল। রূপ সৃষ্টি করছে যে সে একটা রূপকে দুটো করার দিকেই যাচ্ছে না কিন্তু তার দেওয়া একটা রূপ আর একটা রূপের সমকক্ষতা এবং প্রতিপক্ষতা একই সঙ্গে করছে—এমন চমৎকার মান পরিমাণ দিয়ে গড়ছে সব রূপ রূপদক্ষ।

এক রূপকে অন্য রূপের সমকক্ষ করার কৌশল ছাঁটে সমানের কৌশলে নয়—অগাধ জলের তলা থেকে উঠল পদ্মের মৃণাল, শতদল মেলিয়ে ধরলে আলোয় বৃহৎ মান পরিমাণ নিয়ে, অনেক মধু অনেক সৌরভ নিয়ে—এই যে পদ্ম ফুল এর কাছে এতটুকু একটি ঘাসের ফুল খাটো সব দিকে একথা বলা চলল না; ঘাসের ফুল সে সমকক্ষ সে প্রতিপক্ষ হল পদ্মের। মাপে খাটো নিশ্চয়ই একটা তারার কাছে খদ্যোত, কিন্তু তারার অনুরূপ নয় বলেই খদ্যোত সে হল রূপে সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ তারার, কাজেই কবির মনে রস জাগালে খদ্যোতও।

রূপজগতে দুটো মাপ রয়েছে দেখি—একটা রূপের বহিরঙ্গীন মাপ আর একটা রূপের আভ্যন্তরীণ মাপ। ভাব নিয়ে যখন আলোচনা তখন এই আভ্যন্তরীণ মাপের কথা ওঠে। অন্তর বাহির দুই মিলিয়ে স্বয়ংরূপটি সম্পূর্ণতা পায়। রূপসাগরের উপরের বিস্তার ও তলার রহস্য দুই-ই মেপে তবে পাই পরিপূর্ণ রূপটি; সুতরাং নিজস্ব, পরস্ব, বহিরঙ্গীন ও আভ্যন্তরীণ এই চার প্রকার মাপ হল।

সব মানুষই তার নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ, মানুষের নিজের মুখমণ্ডল তারি নিজের এক বিঘত,—এমনি কতকগুলি রয়েছে, প্রমাণসই মানুষের মান পরিমাণ যা সব মানুষের পক্ষেই সাধারণ মাপ, এ ছাড়া দেখা যায় যে মানবশিশুর বেলায় মাপ কিন্তু একটু আধটু তফাত হল—ছেলের মাথাটা ছেলের এক বিঘতের খানিক বেশি। এর উপর রোগা মোটা নানা মান পরিমাণ দিয়ে দেহের বৈচিত্র্য সাধন হল স্বভাবের নিয়মে।

জাতিগত আর একটা মাপ আছে, যেমন চীনেম্যানে ও আন্দামানে, আফ্রিকায় ও এশিয়ায়, এই ইন্ডিয়ানে ও রেড ইন্ডিয়ানে। একই জাতের আমগাছ কিন্তু অবস্থার গতিকে দুটো সমান বিস্তার সমান খাড়াই পেলে না, ডৌল পেলে না এক রকম। যখন বীজ অবস্থায় তখন ডৌল মায় ওজন ভার এক জাতীয় বীজে আর একটি সেই জাতীয় বীজে প্রায় সমান, চারা অবস্থাতেও কতকটা মাপজোখে সমান তারা, কিন্তু বয়সে বাড়ার সঙ্গে গাছেদের চেহারা ডৌল বিভিন্ন মাপ ধরলে। আবার নারকেল গাছ তালগাছ ধানের ছড় আখের গোছা—এরা সব বয়সের অসমান নিয়ম থেকে ছাড়া পেয়ে সমানের নিয়মে বদ্ধ হল। ইতর জীব—যেমন হাঁসের ছানা মুরগীর ছানা—শৈশবে সমান বড় হলেও ডৌল থাকে প্রায় সমান, শুধু রঙের ভেদ এবং স্ত্রী পুরুষ ভেদে স্বতন্ত্র রূপ পায় তারা। কাক কোকিল ময়ূর কাকাতুয়া টিয়ে এমনি আরো অনেক জন্তু তারা বয়সে এক ডৌল এক বর্ণ, শৈশবেও তাই। দুটো কাকের ও কাকের ছানার মধ্যে, দুটো এক জাতির বাঘেরও বাচ্চার মধ্যে বদল ভেঙে নেওয়া শক্ত।

সদ্য ঝরা দুটি শিউলি ফুল—ভারি শক্ত দুয়ের কোথায় অমিল সেটা ধরা। দুটো মুরগীর ডিম সমান মাপে ডৌলে, দুটি চোখ প্রায় তাই, কিন্তু কাকের ডিমে হাঁসের ডিমে মুরগীর ডিমে মাপে ও বর্ণে পার্থক্য সুস্পষ্ট। বাঘের চোখে হরিণের চোখে সমান নয় কিন্তু বেরালের চোখে বাঘের চোখে ডৌলের মিল আছে যদিও মাপে

ওটা বড় এটা ছোট। হাতির কানে ঘোড়ার কানে সমান করলে ছবিতে ভুল হয়ে যায়, কিন্তু গাধার কান ঘোড়াতে একেবারে বেমানান যে হয় তা নয়।

নানা ঢঙের মাপজোখ নানা রঙের ওজন এমনি সব ব্যাপার নিয়ে উল্টেপাল্টে খেলে চলেছেন যেন কোনো জাদুকর—নানা রং নানা ভাব নানা ডৌলের সংমিশ্রণে বিচিত্র হয়ে উঠেছে রূপজগৎ। বাঁধাবাঁধি ও স্থিরতা নেই বললেই হয় স্বভাবের মাপজোখে——কি বর্ণের কি ডৌলের কিবা ভাবের দিক দিয়ে সব দিকে আলগা। তেলাপোকার বেলায় দেখলেম এক জাতি এক ডৌল এক মান পরিমাণ পেয়ে সবাই এক রূপ এক রং, প্রজাপতিতে দেখলেম নিয়ম উল্টে গেল—এক জাতীয় অথচ বর্ণে ডৌলে ভেদ, মাপেও ভেদ। হনুমানের বেলায় হল সব হনুমানই সমান মুখপোড়া, মানুষের বেলায় নিয়ম একেবারে যতদূর ওলটাতে পারে—সাধারণ মাপ সমান রইল, জাতি ধরে ও ব্যক্তি ধরে মানুষের মান পরিমাণ বয়সে বয়সে হল অসমান। এক কাঠবেরালী পালালে রাতারাতি আর একটাকে খাঁচায় ভরে বুড়োকেও ঠকিয়ে দেওয়া চলল, কিন্তু এক মানুষ চেয়ার ছেড়ে সরে পড়লে সেই সে চেয়ারে অন্য একটি মানুষ এনে বসিয়ে আগের মানুষ বলে বালককেও ঠকানো গেল না —পোষা কুকুর বেরাল তারাও ধরে ফেললে মাপের পার্থক্য মানুষে মানুষে। রামের এক ডৌল এক মাপ এক ভাব, —এখন রামও দুই হাত দুই পা এক মাথার মানুষ, শ্যামও তাই, এই মিলটুকুর জোরে অযযাধ্যার সিংহাসনে বসেও শ্যাম বলতে পারে না আমি রাম,—রামের পরিমাপ সে রামেই শ্যামের পরিমাপ সে শ্যামেই নিঃশেষভাবে রইল, রামের গুণ যদি পেলেন শ্যাম তো বহিরঙ্গীন মাপজোখের কথাই উঠল না, প্রজারা বললে রাম রাজত্বেই বাস করছি।

গুণের সমতা নিয়ে অন্যের সঙ্গে মিলে যাওয়া এবং ভাবের সমতা নিয়ে অন্যের সঙ্গে সমান হওয়া—এর প্রমাণ রূপসৃষ্টির অনেক জিনিসেই দিচ্ছে। চাঁদ আর চন্দ্রবদনে বা চন্দ্রহারে, খদ্যোতে প্রদীপে তারায়, নীল জলে পদ্মের মালায় আর নীল আকাশে দোদুল বলাকায় যেভাবে সমান—নিজস্ব মান বজায় রেখেও কিন্তু দুটো দেয়াশলায়ের কাঠি ঠিক সেভাবে সমান নয়।

দর্পণে আমার প্রতিবিম্ব পড়ল—আমার সবই তাতে আছে অথচ আমার কিছুই তাতে নেই, সমান বলতে পারলেম না স্বয়ংরূপে আর তার প্রতিবিম্বে। আমারি তৈল-রং-করা প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবি—আমার সব রইল তাতে—ডৌল বর্ণ মান পরিমাণ, হলও ছবিটা জীবন্তবৎ—যেন বসে লেকচার দিচ্ছি, কিন্তু যে বস্তুটি বলছে আমার স্বয়ংরূপের অন্তরে থেকে "রইবো না বসে আমি চলব বাহিরে" সেই সত্য ও নিত্য বস্তুটুকুই বাদ গেল প্রতিকৃতিতে, কাজেই ভেদ রইল স্বয়ংরূপে রঙের সমতা পেয়েও। গোলাপ ফুলে আর গোলাপি আতরে কিন্তু প্রায় সমান সব দিক দিয়ে অসমান হয়েও। রূপে সমান কৃষ্ণনগরের ও লক্ষ্ণৌয়ের মাটির আমটি আতার্টি কলাটি কিন্তু মাটির স্বাদ আছে ফলের রস ফলের সুস্বাদ নেই, আসল ফল মাটিতে পড়লে ফেটে পড়ে রস, মাটির ফল সেও ভাঙে মাটিতে পড়লে—ছেলের মনে করুণরস জাগায়, বুড়োর মনে রাগ পৌঁছে দেয়, কিন্তু এত করেও সমান বলা গেল না। মাটির ফলে পিঁপড়ে লাগে না পোকা পড়ে না, পাখি ঠোকরায় যদি বা কিন্তু ঠোকর দিয়েই বোঝে মাটি।

রূপের অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, পরোক্ষ অপরোক্ষ, নিজস্ব পরস্ব, সমান ও অসমানের নিয়ম প্রমাণ দিচ্ছে—রূপ সকল প্রতিরূপ নয়, প্রতিবিম্ব নয়, তারা প্রত্যেকেই স্বয়ংরূপ। কায়ায় ছায়ায় মিলে আছে অথচ যেমন মিলে নেইও, তেমনি রূপের বাইরের সঙ্গে মিলছে রূপকারী কাজ—অথচ মিলছেও না।

রূপের বেলায় বহুবচন, প্রমাণের বেলাতেও বহুবচন রূপশাস্ত্রকার প্রয়োগ করে বললেন—"রূপভেদাঃ প্রমাণানি"। রূপের বহুভেদ যেমন, প্রমাণেরও তেমন বহুভেদ। রূপের বহিরঙ্গীন অংশ ও তার মান পরিমাণ রূপের আভ্যন্তরীণ অংশ ও তার মান পরিমাণ এবং ভিতর বাহির ইত্যাদি মিলিয়ে স্বপ্রমাণিত রূপ সকল—এই হল তাবৎ রূপরচনার মূল কথা। নির্দিষ্ট মান পরিমাণ আর অনির্দিষ্ট মান পরিমাণ ধরে দুই প্রকারের রূপ। বিধাতার দেওয়া রূপ সমস্ত আর আর্টিস্টের দেওয়া রূপ সমস্ত—দুয়ের স্বতন্ত্র মান পরিমাণ। আর্টিস্টের মানস যেখানে আপন রাস্তা ধরলে সেখানে চোখে দেখার অপেক্ষা নেই, মনোমতো মান পরিমাণ ধরে রূপের গঠন হল সেখানে; স্থিরতা নেই রূপের প্রমাণের ভাবের লাবণ্যের সাদৃশ্যের বর্ণের হিসেবে, প্রবল ভেদনীতি ধরে বিধাতার সৃষ্টির সমকক্ষ সমতুল্য হতে চলল সেখানে রসসৃষ্টি মানুষের।

দাঁড়ি ও মাঝি দু'জন রূপে গুণে অসমান। নৌকাটি চালাবার ভার কিন্তু দু'জনেরই উপর। দাঁড়ি মাঝি সমান নয় দু'জন—তরী চলল, দুয়ের ক্রিয়ার বৈপরীত্য লক্ষ্যের একত্ব ধরলে। দাঁড়ি চলল দাঁড় টেনে ঝুপ ঝাপ, মাঝি রইল হাল ধরে চুপ চাপ, কিন্তু পারঘাটের দিকে মন রাখলে দু'জনেই সমানভাবে। খালে বিলে যে মাঝি সেই দাঁড়ি একই লোক সমানে অসমানে মিলিয়ে ডিঙ্গি বেয়ে গেল ঝাঁকি দিয়ে। প্রতি নায়কের প্রতি নায়িকার অনুকূল প্রতিকুল ভাব ও রসের স্রোত এসব মিলে একটা নাটক যেমন সম্পূর্ণ রূপটি পায়, বাদী বিবাদী সংবাদী এমনি নানা সমান অসমানকে নিয়ে যেমন রাগ-রাগিণী রূপ পায়, কবিতায় ছবিতে মূর্তিতেও তেমনি নানা সমান অসমান একত্র হয়ে রূপরচনা মানানসই হয়ে ওঠে।

অলঙ্কারশাস্ত্রে তিন জাতীয় নায়ক নায়িকার কথা বলা হল—দিব্য, অদিব্য এবং দিব্যাদিব্য। এই তিন রূপের কথা শিল্পশাস্ত্রেরও কথা—দেবতা, মানুষ, এবং দেবতা ও মানুষে মিলিত রূপ। দেবলোক, মর্তলোক এবং গন্ধর্বলোক এই তিন লোকের রূপ নিয়ে হল কথা এবং মান পরিমাণ ও লক্ষণ দেওয়া হল শিল্পশাস্ত্রে কিন্তু কাজের বেলায় দিব্যাদিব্য রূপের মান পরিমাণ এবং অদিব্য মান পরিমাণই কাজে এল—রূপ হল অদিব্য, রস হল দিব্য, অদিব্য পাত্রে পরিবেষিত হল দিব্য রস। সব দেশের প্রতিমাশিল্পের দৌড় এই পর্যন্ত হল—সমান অসমানের মিলন, নিত্যে অনিত্য মিলন, মর্তরূপের সঙ্গে মিলে গেল দিব্য রস ও ভাব, মাটির পাত্রে স্বর্গসুধা এই সীমা ধরে রইল মানুষের আর্ট রচনা।

শিল্পশাস্ত্রের প্রতিমা-লক্ষণে যে মান পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে দেবতা ও দেবতাদের বাহনাদির জন্য—তা এই গোচর রূপ সমস্তেরই মাপ কমিয়ে বাড়িয়ে স্থির করা হয়েছে যথা—নবতাল দশতল কৌমার বামনী রাক্ষসী ইত্যাদি। মানবদেহের বিরাটত্ব ও বৈরূপ্য নিয়ে হল রাক্ষসী মূর্তি, বরাহ আর মানুষের মান পরিমাণ বড় করে নিয়ে হল বরাহ অবতার, পাখি আর মানুষে মিলে কিন্নর, মানুষের মাপের বিরাটত্ব ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাহুল্য এই নিয়ে হল দেবদেবীদের মূর্তি সমস্ত—কেউ চার হাত কেউ দশ হাত কেউ চতুর্মুখ পঞ্চমুখ দশমুণ্ড গজানন নরসিংহ নরনারায়ণ হরিহর হরপার্বতী এমনি কত কি! পাখি আর চোখে মিলে খঞ্জনচোখ যখন তখন বললেম দুই অসমান হল সমান, হরিণচোখ—সেখানে কিন্তু দুই চোখে চোখে মিলে হল এক; এখানে বলতে পারি সমানে সমানে মিলন। পাখিতে মানুষে মিলে হল কিন্নরী, এইভাবে সারা জীবজগতে সমান অসমান মান পরিমাণ এক করে দিয়ে বিশ্বরূপ গড়ে নিলে প্রতিমা-কারক। তারপরে আবার গাছ পালা ফুল পাতা নিয়ে—কল্পতরু পারিজাত এমনি নানা রূপের সৃষ্টি চলল, তারপর জড়জগৎ—সেখানে শালগ্রাম শিবলিঙ্গ ইত্যাদি পাই,—এরা সবাই ধর্মপ্রচারের কাজে এসে গেল। এই যে প্রতিমা গড়ার মান পরিমাণ এর

ভিত্তি হল মর্তরূপের ব্যতিক্রমের উপরে। মর্তরূপ তাদের সুনির্দিষ্ট ও নিজস্ব ও পরস্ব মান পরিমাণ, ডৌল ইত্যাদি স্বভাবের দেওয়া—সেখানে নর সে নর—বানরও নয় দেবতাও নয়, মাদার গাছ সেখানে মাদার গাছই—আম নয় জাম নয় স্বর্গের মন্দারও নয়। হিন্দুধর্ম চাইলে দিব্যমূর্তি, কিন্তু যে মূর্তি গড়বে না তার কাছে, যে প্রতিমা-লক্ষণ লিখবে না তার কাছে দিব্য রূপটি আপনার মান পরিমাণ নিয়ে বর্তমান রয়েছে, কাজেই অদিব্য মান পরিমাণ ভেঙে গড়া চলতি হল।

প্রতিমা দেওয়ার বেলায় শাস্ত্রকার বলেন,

"প্রতিমাকারকো মর্ত্ত্যো যথা ধ্যানরতো ভবেৎ।
তথা নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু॥"

প্রত্যেক রূপ ও তার মান পরিমাণ আদি একেবারে বর্জন করা কেমন করে হয় মানুষের দ্বারা! লিখলেন বটে শাস্ত্রকার 'নান্যেন মার্গেণ', শুধু ধ্যান ধরে আপনাতে আপনি ডুবে থাকা চলল কই! অরূপের অব্যক্তের ধ্যান অলৌকিক আধ্যাত্মিকের ধ্যান সন্ন্যাসী সে করতে করতে একটা তুরীয় অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছে আনন্দে ভোঁ হয়ে বসে থাকে কিন্তু সেই রকম ধ্যানের পথ ধরে রূপরচনা অসম্ভব কোন কিছুর। সকালে উঠে প্রাতঃসূর্যের ধ্যান শুরু করলেম স্থির হয়ে চোখ বুজে, পাঠশালের ছেলেরা পড়তে যেতে দেখলে—ঋষি মশায় বসেন ধ্যানে, কিন্তু ঋষি আফিঙের গুলির ধ্যান করছেন, না আলোর গোলার ধ্যান করছেন, না মাখম মিছরির ধ্যান করছেন—কেউ কিছু বুঝলে না যতক্ষণ না ঋষি ধ্যানকে ভাষা দিলেন—"জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং," কিংবা ভৈরবীতে ঋষি তান ধরলেন সূর্যস্তবের, কিংবা তুলি ধরলেন ঋষি—লিখলেন। জবাফুলে সূর্য মিলিয়ে দিব্যাদিব্য মূর্তি। এইভাবে একের ধ্যান সপ্রমাণ করলে আপনাকে অন্যের কাছে। প্রতিমা সে প্রতিম হল, আর্টিস্টের ধ্যানের গোছর রূপের উপরে নির্ভর করে তবে পেলেম অরূপের রূপ। এখানে দুই অসমান—রূপ ও অরূপ মিলে হল এক।

কল দিতে পারে একটার প্রতিরূপ ঠিক আর একটি তেমনি, আর্টিস্ট তা দিতে পারে না; আর্টিস্টদের প্রতিমা অপরিমেয় রসকে পরিমিতির মধ্যে ধরে দিচ্ছে রসরূপ একটি একটি। রসকে ধরতে হলে রসের আলম্বনটির মান পরিমাণ কেমনটি হওয়া চাই তা আর্টিস্টেরই ভাববার বিষয়, যেমন প্রাতঃকালের বর্ণন দিতে হলে বড় ছন্দে বা ছোট ছন্দে লিখব, কি কি কথা কেমন করে কোথায় বসাবো—এসবের হিসেব কবির হাতে ছেড়ে দেওয়া রইল। আর্টিস্টের মনোগত তাকে রূপ দিতে হলে আর্টিস্টের মনোগত মান পরিমাণ প্রয়োগ করা চাই। এই ভাবে অনেকগুলো মনোমতো মান পরিমাণ দিয়ে মনোগত অনেক যখন সৃষ্টি করলেন রূপসাধকেরা—তখন সেগুলো বিচার করে পরীক্ষা করে হল শিল্পশাস্ত্রের প্রতিমা-লক্ষণ মান পরিমাণ ইত্যাদি লেখা।

আর্টিস্টের মনোগত জনে জনে বিভিন্ন সুতরাং মনোগত মান পরিমাণ সেও ব্যক্তিগত এবং বিভিন্ন হতে বাধ্য। স্থির প্রতিমা নিয়ে ধর্মের কারবার, মান পরিমাণের অস্থিরতা রাখলে সেখানে কাজ চলেই না সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবের উপরে প্রতিমা-লক্ষণ ছেড়ে রাখা চলল না, এই মাপ এই লক্ষণ এই দেবতা এমনি বাঁধাবাঁধির কথা উঠল এবং শাসন হল—'নান্যেন মার্গেণ'। এই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাপজোখ তার সঙ্গে রীতিমত শাস্ত্রীয় শাসন যা প্রতিমার চোখের তারা ঠোঁটের হাসি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি ইত্যাদিকে একটু এদিক ওদিক হতে দিলে না, তাতে করে চুল তফাত হল না মূর্তিটির প্রথম সংস্করণে ও দ্বিতীয় এবং পর পর তার অসংখ্য সংস্করণে, এতে করে পূজারীর কাজ ঠিকমত হল কিন্তু আর্টের কাজে ব্যাঘাত এল। শাসনের জোরে মানুষের ক্রিয়া হয়ে

উঠল কল তবে চলল যেমন যুদ্ধের কাজ, তেমনি ধর্মটা প্রচার করতে শিল্পজগতে কতকগুলি আর্টিস্ট ফৌজ সৃষ্টি করলেন শিল্পশাস্ত্রকার। বন্দুকের টোটা একটার মতো যেমন দশ হাজারটা, ঠিক তেমনিভাবে একটি প্রতিমার দশ হাজার রকম প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করলে কি গ্রিস কি ভারত কি বা চীন কি বা ঈজিপ্টের কারিগরেরা যতদিন তারা শাস্ত্র মেনে প্রতিমা গঠন করলে; এর অন্যথা হল বুদ্ধমূর্তি গঠনের বেলায় যিশুর ছবি আঁকার বেলায়। এমনি থেকে থেকে শাস্ত্রছাড়া প্রতিমা ও মান পরিমাণ আবিষ্কার করতে হল এক এক আর্টিস্টকে, তখন সেই মূর্তি হল আদর্শ এবং তাই থেকে এল আবার শাস্ত্রীয় মাপ—বুদ্ধের যিশুর রামেসিসের। এইসব দেখেই শিল্পশাস্ত্রকার বলেছেন যে পূজার জন্য যেসব মূর্তি তারি কেবল লক্ষণ ও মাপ লেখা গেল, অন্য সকল মূর্তি যথেচ্ছা গড়তে পারেন শিল্পী মনোমতো মাপজোখ দিয়ে।

এই যথেচ্ছা গড়ার ছাড়পত্র নিয়ে মান পরিমাণ ডৌল বর্ণ ইত্যাদি সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার করা যে চলল তা নয়। শাস্ত্রের মতানুযায়ী মান পরিমাণ ধরে চলতে না চাই তো প্রকৃতিগত স্বাভাবিক মান পরিমাণ এবং নিজের মনোগত মান পরিমাণ ধরে চলতেই হল। পরিমাণকে অতিক্রম করে যদি একটা মনুমেন্ট খাড়া করি বস্তুর ভার ও ডৌলের সামঞ্জস্য রক্ষা না করে—তবে পরিশ্রম ব্যর্থ হয় এবং কীর্তিস্তম্ভটি উঠতে উঠতে ভেঙে পড়ে আপনার ভারে আপনি। প্রমাণকে না মেনে ক্রোশব্যাপী একখানা ছাদ চারখানা দেওয়ালে চাপানো চললই না, প্রথমেই ঠেকল কড়ি বরগার মাপে জোখে—যত বড় ছাদ তত বড় কড়ির জন্য কাঠ পাওয়া দুষ্কর হল, ছাদের ভরাণ দিতে মাপে কুলোয় না কাঠ বাঁশ কোনোটা,—এইভাবে স্বভাবের কাছ থেকে নানা বাধা; তারপর ছাদটার কাছ থেকেই বাধা এল, ছাদ বলতে থাকল—আরো চারশোখানা এত খাড়াই এত মোটা দেওয়ালের ঠেকো দাও নচেৎ রক্ষে নেই। শাস্ত্রমতে না গড়লেও বস্তুগত সহজ মান পরিমাণ ছেড়ে গড়া সম্ভব হল না। যে রেখা দিয়ে ছবিতে রূপ বাঁধি তার যথেচ্ছা ব্যবহার করা চলল না। বাঁকা সোজা সরু মোটা রেখা সমস্ত তাদের কোনোটা এর সঙ্গে মেলে কোনোটা ওর সঙ্গে মেলে না, কেউ জানায় সে ভারি, কেউ জানায় সে হাল্কা, এদের নিয়ে প্রমাণসই ভাবে সাজালেম তবেই তো হল গড়া রূপটি পাকা, না হলে হল হিজিবিজি ব্যাপার। রেখা সমস্তের সামঞ্জস্য এই মান পরিমাণের দ্বারা সুনির্দিষ্ট হয় তবে ফোটে রূপটি পরিষ্কার। এইসব অলিখিত মান পরিমাণ যদি না থাকে আর্টিস্টের কাছে তবে ভুল হয় তার প্রতি পদে।

আমাদের উপর প্রায়ই হুকুম হয় ক্রেতার দিক থেকে—মুখটা একটু হাসি হাসি কর। এই যে হাসির পরিমাণ সে হাসা ঘোড়ার হাসি থেকে মুচকি হাসি চাপা হাসি পর্যন্ত রয়েছে। কি পরিমাণ হাসি কোন ডৌলের মুখে মানাবে তা না ভেবে যদি কাজ শুরু করি তো হয়তো ঘোড়ার হাসি দিয়ে বসলেম নদীয়ার গোরার মুখে! হাসির ধ্যান হল ওষ্ঠের বিস্তার ও দন্তের বিকাশ, কিন্তু কি পরিমাণ ওষ্ঠের বিস্তার ও কতখানি দন্তের বিকাশ দরকার এ যার মান পরিমাণ ও সৌসামঞ্জস্য জ্ঞান আছে কেবল তাকে দিয়েই হয়।

কিমাকৃতি যখন দিচ্ছি রূপে তখন বসাচ্ছি মানুষের মুখে ঘোড়ার হাসি কিন্তু সেই ঘোড়ার হাসির সঙ্গে সঙ্গে মানুষটির নাক মুখ চোখ এবং সারা মুখমণ্ডলের রেখাগুলো আপনাদের মান পরিমাণ মিলিয়ে তবে হয় কিমাকার একটা রাক্ষুসে চেহারা! যেমন যখন কিম্‌পুরুষ দিতে হল তখন মানুষ আর পাখির মান পরিমাণ মেলাতে হল সৌষ্ঠব দিয়ে যাতে করে কখনো মানুষের মাথার মাপে পাখির দেহের মাপ হল, কখনো এর উল্টোটা হল, ও সেই সঙ্গে কমল বাড়ল বাঁকল চুরল ডৌল রেখা ইত্যাদি সবই।

এখন লক্ষ্মী সরস্বতী কিংবা উমা দেবী—কিমাকৃতির মান পরিমাণ হিসেব কেতাব কিছুই খাটল না এখানে, মানুষের স্বাভাবিক মান ধরা চলল না হুবহু। ভাটের বর্ণনায় বলা গেল বর্ধমানের বিদ্যাকে 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী', হিন্দুমতে ঘরের গিন্নীকে গৃহলক্ষ্মী বলাও চলল, কিন্তু এদের একটি একটি প্রমাণসই মর্মর মূর্তি কি ফটো প্রতিষ্ঠা করে লক্ষ্মী সরস্বতী পুজো করার কাজ চলানো গেল না। দেবপ্রতিম মানুষ হলে হল না দোষের, কিন্তু মানুষপ্রতিম দেবতা হলেই গোল বাধল কাজের বেলায়। রামায়ণের হনুমান সাধারণ মুখপোড়ার মাপে গড়লে ভুল হয়—অসাধারণ মাপ চাই অনন্যসাধারণ হনুমানের জন্যও।

করকমলেষু চরণকমলেষু এই হাত এই পা-কেই বলা চলল চিঠিতে, কিন্তু আঁকার বেলায় গড়ার বেলায় সাধারণ হস্ত ও পায়ের মাপটাতে অদল বদল ঘটাতেই হল, না হলে ঠিক রূপ পেলে না ঐ দুটি জিনিস। এইভাবে পেলেম কলে ছাঁটা রূপের বেলায় শাস্ত্রমতে সমান মাপজোখ যা ধরে এককে হাজারবার আবৃত্তি করা চলল। শাস্ত্রলিখিত রাক্ষসী-প্রতিমার মান পরিমাণ সেটি ধরে কৌমার কি বামন মূর্তি গড়া চলল না, এইজন্য স্বতন্ত্র গোটাকতক মাপ রইল—দশতল দ্বাদশতাল নবতাল অষ্টতাল প্রভৃতি—যেমন কবিতার ত্রিপদী চৌপদী ইত্যাদি নানা ছাঁদ, যেমন সঙ্গীতে একতালা চৌতালা তেতালা নানা ঠেকা, এরা রূপ সমস্তকে ঠেকিয়ে রাখলে সুনির্দিষ্টতার মধ্যে—বাড়তে দিলে না কমতে দিলে না দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কোন দিকেই।

দ্বাদশতাল মানুষের পক্ষে অসাধারণ, কিন্তু যে রাক্ষসের কল্পনা করছি তার পক্ষে দ্বাদশ কিংবা তার বেশিও খাটে মাপ। সাধারণ মানুষ স্বভাবের নিয়মে একটা ছোট মাপ পেলে—অষ্টতাল সপ্ততাল নবতালের মাঝামাঝি একটা মাপ—একে অতিক্রম করা মানে অস্বাভাবিক করা। একটা পাহাড় প্রমাণ পাথরেই গড়ি বা এগারো ইঞ্চি ইটেতেই গড়ি, মানুষের স্বাভাবিক তালটি বজায় না রাখলে বেতালা মানুষ করা হল। এই তাল বেতালকে মানিয়ে গড়তে পারলে যে সেই হল রসিক ও আর্টিস্ট এবং এইজন্যই রসরূপটিকে বলা হল নিয়তিকৃত নিয়মরহিত হ্লাদময় ইত্যাদি।

স্বভাবের নিয়ম সেখানে নিয়মে এক পক্ষে বাঁধা এক পক্ষে ছাড়া সব রূপই; একটি গাছ বৃক্ষরূপের কঠোর নিয়মে বাঁধা কিন্তু স্বয়ংরূপের দিক দিয়ে সে সম্পূর্ণ ছাড়া দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়তে কমতে। মানবরূপ সেও এক হিসেবে বাঁধা কিন্তু হিসেবে প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্ররূপ।

শাস্ত্রের নিয়ম সে নিয়তির চেয়েও কঠোর নিয়ম, তার চারিদিক এমুখ ওমুখ সেমুখ করে বাঁধা—ধ্যান লক্ষণ মুদ্রা মান পরিমাণ সব দিয়ে; না হলে পুরুত ঠাকুরের কাজ চলে না, লক্ষ্মীতে আর গৃহলক্ষ্মীতে সব দিক দিয়ে স্বতন্ত্র করে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

পুতুলওয়ালা যে খেলনা গড়েছে সে না মানলে নিয়তি, না মানলে শাস্ত্র, অথচ অদ্ভুত কৌশলে সে রূপ সমস্ত দিয়ে চলল। রসের অনির্বচনীয়তাকে স্বীকার করে রূপ পেলে পুতুলওয়ালার হাতের পুতুল। রূপ দেবার দক্ষতা হিসেবে দেখতে পেলে পুতুলওয়ালাকে তারিফ দিতেই হয়, কেননা তার সৃষ্টিতে অপরিমেয়তা গুণটি পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান।

এক আত্মা থেকে আর একটি আত্মার রস পৌঁছে দেওয়া শাস্ত্রমান ধরে চলল না। আমাদের কাছে যা দেবতা সাহেবদের কাছে তা দৈত্য হয়ে রইল, স্বাভাবিক মান পরিমাণ ধরেও এ কাজ চলল না,—আমার কাছে যার চেহারা ঠেকল রূপে লক্ষ্মী তুমি তাকে বললে লক্ষ্মীপেঁচাটি! আমার মানুষ—তোমার ঘরে তার মর্মর মূর্তির স্থান দিতে ব্যস্ত হও না কেউ, কিন্তু পুতুলের বেলা স্বতন্ত্র কথা। মেলার পুতুল সোনার খেলনা

সর্বদেশে সব ঘরেই তার স্থান হল—বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ-সিংহাসনে পুতুল, খেলাঘরের কুলুঙ্গিতে পুতুল, হাটে পুতুল, বাটে পুতুল—যেখানে রাখ তাকে সব জায়গাতেই তার আদর আছে দেখবে। পুত্তলিকা-শিল্প—শিল্পের মূল সেখানে রসের মধ্যে শিকড় গাড়লে; প্রতিমা-শিল্প—ধর্মের মধ্যে শিকড় তার; তথাকথিত স্বভাব-শিল্প প্রতিবিম্বকে আঁকড়ে ধরতে চলেছে তার শিকড়। বিশ্বকর্মার মানস মান পরিমাণ দিলে বিশ্বরূপ সমস্তের, খেলনাওয়ালার মানস মান পরিমাণ দিলে খেলাঘরের রূপ সমস্তকে—এই দিক দিয়ে এ ওর হল সমান এবং অসমানও।

ভাব

"ভাবয়তি পদার্থান্ ইতি ভাবঃ"।

ভাবযুক্ত পদার্থ নিয়ে কথা, শুধু রূপটা আর তার মান পরিমাণ দিয়ে খালাস নয় আর্টিস্ট। ছুতোরে কুঁদে দিলে লাটিমের ডৌল, কামারে পরালে তাতে আল, তাঁতি পাকিয়ে দিলে দড়া। পেশা বিভিন্ন হলেও এরা তিন জনেই কারিগর,—কেউ ডৌল দিতে পাকা, কেউ সূচ বেঁধাতে পাকা, কেউ সুতো জড়াতে পাকা, কিন্তু লাটিমকে বিয়ের কনেটির মতো অলকা-তিলকা দিয়ে সাত রঙের বরণডালাটি মাথায় সাজিয়ে ভাবযুক্ত করলে আর্টিস্ট,—ভুলল তবে ছেলে। একটু বড় হলে ঘুড়ির সঙ্গে এইভাবে ভাব হল, আরো বড় হলে হল ছবির সঙ্গে ভাব, পরে হল রঙীন কাপড়ের সঙ্গে ভাব, এইভাবে কেউ ভাব করে ফেললে কবিতার সঙ্গে, কেউ বা আর কিছুর সঙ্গে। বণিকের ঘরে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ধরা থাকে স্তূপাকারে—কিন্তু এতে করে বুঝতে হবে না যে বণিকের সঙ্গে অলঙ্কারগুলোর ভাব হয়ে গেছে। ভাবুক সে নিজে ভালবাসে সাজ, অপরকে ভালবাসে সাজাতে, ভাব হল তার যেখানে যা কিছু অলঙ্কৃত এবং যা কিছু অলঙ্কারক আছে তার সঙ্গে। একজন যে সংসারের তেল-নুন চাল-ডালের ভাবনা নিয়ে বসে আছে কিংবা যে গট্ হয়ে বসে মস্ত অফিসের ফাইল আর হিসেবের ভাবনা ভাবছে—তাদের বলতে হল ভাবনাগ্রস্ত। পরকালের ভাবনা ভেবেই আকুল, হরিনামের মালা জপছি, শাস্ত্রমতো ত্রিবিধ ভাবনাই ভাবছি, কিন্তু ভাবুক নয় একেবারেই। মালাও জপছি না হরিসভাতেও যাচ্ছি না খাচ্ছি-দাচ্ছি আফিস করছি আর খাতায় মিষ্টি মিষ্টি পদাবলী গীতা ছড়া নাটক লিখছি যা শুনে লোকের ভাব লেগে যাচ্ছে, তখন আমাকে ভাবনাগ্রস্ত নয় ভাবুকই বলবে লোকে। মালি রয়েছে ফুলগাছের ভাবনা নিয়ে কিন্তু পুষ্পলতার ভাবের সে তো ভাবুক হল না এতে করে। মালাকার গাছের ভাবনা ভাবে না, অথচ সে পড়ল ভাবুকের দলে— তার ভাবনাগুলি ফুলের হার ফুলের সিঁথি ফুলের তোড়া কত কি রূপ ধরে প্রকাশ হল। উকিল ভেবেচিন্তে পাকা দলিল লিখে ফেললে—যথেষ্ট গুণপনা প্রকাশ হল তার, কিন্তু ভাবুকতা প্রকাশ করলে দলিল লিখতে উকিল এ বললে তার ওকালতী বুদ্ধিকে খাটো করা হয়; তেমনি 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—সেখানে বঙ্কিমবাবু তাঁর ওকালতী বুদ্ধি খাটিয়েছেন ভাবুকতা নয় বললে মুশকিল। কুবেরের ছিল হিসেবি বুদ্ধি, তিনি ভাবতেন ধনের হিসেব, আর কুবেরের অনুচর যক্ষরাজের ছিল রসবোধ, হিসেবি বুদ্ধি একটুও নয়, সে বসে হিসেবের খাতায় অঙ্ক না কষে এঁকেই চলল প্রিয়ার ছবি—এ ওর ভাব বুঝলে না, এক বছরের জন্য সস্‌পেন্ড হলেন যক্ষরাজ। এই এক বছরে বুদ্ধির জোরে তহবিলের ফাঁক পূর্ণ হল ধনপতির, আর বিরহী যক্ষের বুক ভাবসম্পদে ভরে উঠল দিনে দিনে। যক্ষ যদি বুদ্ধি খাটাতে চলত তো মেঘকে দিয়ে ডাক-পেয়াদার কাজ করাতে চলত না, সে ভাবুক ছিল তাই নির্ভাবনায় মেঘকে দূতের পদে বরণ করে নিয়েছিল। মেট্রোলজির রিপোর্ট বুদ্ধিমানে লেখে, আর ভাবুকে লেখে 'মেঘদূতম্'।

কেল্লায় তোপ পড়ল—রাত নটা বাজল এই জ্ঞান জন্মে দিয়ে চুল তার কাজ, রাত্রির যে ভাবটি সেটি মনে পৌঁছে দেওয়া হল না তোপের শব্দে, তোপ জানান দিলে মাত্র প্রহর। সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টাধ্বনি—সে শুধু জানালে না আরতির বেলা হয়েছে, গির্জের ঘণ্টা সে শুধু জানালে না এত প্রহর হয়েছে, বিয়ের বাঁশি—সে শুধু জানালে না লগ্ন আর সময়টা; ভাবযুক্ত ধ্বনি এরা, রসের সংবাদ দিয়ে গেল সবাই ভাবের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে। শাস্ত্রকার বলেছেন, রস ছেড়ে ভাব নেই, ভাব ছেড়ে রস নেই। ধর সখ্যরস— ভাব হল দুই ছেলেতে তবে রস জাগল মনে মনে। এমনি ছেলেতে ছেলেতে ঝগড়া—সেখানে দুই বিপরীতমুখী ভাবের ধাক্কা জাগালে আর এক রকম রস। আবার কোথাও কিছু নেই হঠাৎ মনে একটা ভাব জাগল, রসও বিঁধল প্রাণে সেই সঙ্গে। অহেতুক ভাবের উদয়ে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একটা সুর মনের মধ্যে গুণগুণিয়ে ওঠে, একটা ছন্দ দোলা খেতে লাগে প্রাণের দোলায়, রঙের একটা নেশা উপস্থিত হয় চোখে—কারণ সন্ধান করে পাইনে খোঁজ।

কোকিল ডাকল বলেই বসন্ত এল, না বসন্ত এল বলেই কোকিল ডাকল? ভাব হল বলে রস হল, না রস জাগল বলে ভাব হল? এর মীমাংসা করা নৈয়ায়িকদের কাজ, তবে এটা নিজে নিজে আমরা সবাই অনুভব করেছি যে শীতকালের বর-কনে দু'জনের কাছেই কোকিল দিলে না সাড়া বাইরে, কিন্তু বুকের ভিতরে পড়ে গেল তাদের তাড়া ভাবের ফুল ফোটাবার; কিন্তু ফুল রইল ঘুমিয়ে শীতের রাত্রে বনে বনে, হঠাৎ মনে মনে বসন্তবাহার রাগিণীতে মনোবীণা বেজে উঠল আপনা হতে, লেগে গেল সেখানে বসন্ত উৎসব।

মানুষের ভাব প্রকাশ করে যে সমস্ত রসরচনা কবিতা গান ছবি ইত্যাদি ইত্যাদি—তারা কোনোটা সহেতুক কোনোটা এইভাবে অহেতুক বলে ধরতে পারি। দু'-তিন পাট কাপড় জুড়ে কাঁথা বোনা হচ্ছে। এই কাঁথা বোনা হল শীতের নিমিত্ত, শীত হেতু এখানে কাঁথার। যেখানে শীত নেই সেখানে কাঁথা বোনার কাজ হয় অকারণে কাজ। শীতের কাঁথার উপরে যে কাজটা করা যাচ্ছে সেটা কি শীত নিবারণের নিমিত্ত করা হচ্ছে? সুন্দর দেখাবে বলেই তো কাঁথার উপরটায় কাজ করছি, কাজেই শীত এবং সৌন্দর্য দুটো হেতু হল কাঁথা রচনার বলতে হয়।

যে রচনার হেতু মাত্র আপনা হতে রসের উদয়, তাকে বলতে পারি অহেতুক রচনা। না হলে হেতু নেই কারণ নেই কোনো কিছুর নিমিত্তও নয় অথচ রচনা হল কিছু—এমনটা হয় না। ছেলেটা কোথাও কিছু নেই খেলতে খেলতে হঠাৎ কান্না ধরলে কি গেয়ে উঠল কি নাচ শুরু করলে, ছেলের মনের ভিতরটাতে কি হচ্ছে ধরা গেল না, কাজেই বললেম—ছেলে অকারণে হাসে কাঁদে কেন দেখতো।

শিল্পকাজ সমস্তের মধ্যে একটা দিক থাকে যেটা রস ও ভাবের দিক। সেখানে ভাব উদয় হল, কবিতা লিখলেম, ছবি লিখলেম, গান গাইলেম, নৃত্য করলেম; ভাবের বশে কলম চলল তুলি চুলল হাত চলল পা চলল। শীতের জন্য যে কাঁথা সেটা সুন্দর না হলেও কাজের ব্যাঘাত হয় না কিন্তু তাকে যদি শুধু শীত-নিবারণকারী না রেখে চিত্তহারীও করে দিতে চাই তবে খানিক সুন্দর কারুকার্য দিয়ে ভাবযুক্ত করা চাই, তবেই সেটা একটা স্থান পেলে শিল্পজগতে, না হলে সে রইল কাজের জগতে খুব কাজের জিনিস হয়ে পড়ে।

একটা দিক শিল্পকাজের যেটা হচ্ছে প্রকরণের বা টেকনিকের দিক, সেখানে নৃত্যের আঙ্গিক ব্যাপার গানের বাচিক ব্যাপার ও কৌশল—এককথায় রূপ দেবার ও ভাব প্রকাশ করার কৌশল—সমস্ত রয়েছে। ভাল করে লিখতে হবে তাই ভাল করে কলম বাড়ছি, রুল টানছি,—ভাল করে বাজাব বাঁশি ফুটোফাটা বেছে কারিগরি করছি সরল বাঁশে;— নাচতে হবে ভাল করে তাই পায়ের নানা কায়দা শিখছি। ভাব নেই, ভাষাতে দখল নেই

—ছন্দ ছাড়া হল সব। পাগলের প্রলাপ আর ওস্তাদের আলাপ দুয়েরই মূল হল ভাব, তবু যে দুয়ে ভেদ করি তার কি কোনো কারণ নেই?

লেখার বেলায় দেখি যে চেক লিখছে আর যে ছবি লিখছে—দুয়ের কাজে ভেদ হচ্ছে সব দিক দিয়ে। তামাক আনতে দেরি হওয়াতে রেগে চাকরের নামে ঘুসি বসালেম, আর অভিনয় করে স্টেজের উপরে উঠে একজন কারু বুকে ছুরি দিলেম—ভাবের বশে দুই ক্রিয়াই হল—কিন্তু দুই কাজকেই এক শ্রেণীর কাজ বলে ধরা চলল না। চাকরকে মারলেম রাগের হেতু, নাটকের জগৎসিংহ হয়ে ওসমানকে মারলেম রসের খাতিরে, রাগের হেতু মোটেই নয়। রূপের কারণে নয় রসের কারণে যে মার তাই হল স্টেজের মার বা মারের ভান মাত্র। এখন রস ও ভাব সৃষ্টির জন্য সকারণ মার বা সত্যিই মার যদি রঙ্গমঞ্চে গিয়ে দেওয়া যায় তবে রসের আগেই এসে হাজির হয় পুলিশ এবং লোকটিকে অকারণে প্রহারের জন্যে পড়ে হাতে হাতকড়ি; ভাবের দোহাই চলে না তখন, কেননা সত্যি সত্যি মার রস দেয় না বেদনা দেয়। মানচিত্র—ভাব জাগাবার কালে তাকে কাজে লাগানো চলল না, কোনো একটা জায়গার স্মৃতি তাও জাগিয়ে দিতে কাজে এল না মানচিত্র। চিত্রপট দিয়ে ভাব জাগানো চলল, রস জাগানো চলল। এমনি তারাপীঠ শ্রীপাট প্রভৃতি প্রতীক চিত্র তন্ত্রমন্ত্রের কাজে এল কিন্তু ভাব জাগাবার কাজে এল না, আবার নীলাম্বরের নীরস চিত্র প্রতীক নয় কিন্তু আকাশের ভাবটার প্রতিম। নীলাম্বরী শাড়ি তাকে আকাশের প্রতীক বলে এক হিসেবে ধরা চলে আবার চলেও না—সে প্রতীক হয়েও প্রতিমা, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের একটা যন্ত্রচিহ্ন সে কেবলমাত্র প্রতীক—বিশেষ নামে অভিহিত কতকগুলো রং ও রেখার সমাবেশ—নিজে সে কিছুর প্রতিমা নয় ভাবও জাগায় না, ভক্তেরই কাজে লাগে। প্রতিমাশিল্পের কৌশলই হচ্ছে রূপটাকে ভাবের প্রতিম করে তোলাতে। একটা পোড়ামাটির পুতুল—তার সঙ্গে ভাব হয় কেননা সেটা ভাবের প্রতীক করে গড়া হয়েছে বলেই, কিন্তু বেশ করে পোড়ানো একখানা এগারো ইঞ্চি ইট বা টালি তার সঙ্গে ভাব হওয়া শক্ত—সেটা ভাবের বস্তু নয় বলেই। আকাশ থেকে ঝরে-পড়া এক পশলা জল, চোখের কোণ থেকে গড়িয়ে-পড়া এক বিন্দু অশ্রু—ভাবের বস্তু এরা, কিন্তু নোনা-ধরা দেয়াল থেকে খসে-পড়া এক চাংড়া বালি ভাবের বস্তু নয়, অথচ নদীর বালুচর—সেখানে বালি একটা ভাবের সৃজন করলে। বর্ষার শেষে আকাশে ভাসছে এক টুকরো মেঘ—সারা বর্ষার ভাবটা তাকে তখনো রাখলে মনোহর করে; পুরোনো শালের চমৎকার টুকরো পুরোনো ছবি মূর্তি চীনের বাসনের টুকরো যেভাবে মনোহর তার চেয়েও ভাবসম্পদে মনোহর ঐ ছেঁড়া মেঘের একটি খণ্ড। কাজেই বলি ভাবের প্রতিম যেটি হল সে অখণ্ড ভাবেও যেমন খণ্ড ভাবেও তেমনি রস ও ভাবের বস্তু হয়ে রইল। একটি ইটের পাঁজা—সে জাগাচ্ছে ভাব, একটা পাথরের স্তূপ পিরমিড বা পাহাড়—তারা জাগাচ্ছে ভাব, একটা ভাঙা বাড়ি—সে জাগাচ্ছে ভাব, কিন্তু একটা ভাঙা টালি বা ইট সে ঝরা ফুলের পাপড়ি একটি যেমন ভাবের বস্তু বলে চলতে পারলে না। পুরো মানুষটা কি বাঁচা কি মরা দুই অবস্থাতেই ভাবের সঙ্গে এক হয়ে আছে। শুধু মানুষ কেন সব জানোয়ারের বেলাতেই এই কথা। কিন্তু মরা মানুষের কি বনমানুষের হাড়—তার সঙ্গে ডাক্তারেরও পুরোপুরি ভাব হয় কি না সন্দেহ, অথচ কঙ্কালমালিনী তাঁকে প্রতিমাতে ধরেছে আর্টিস্ট ভাব দিয়ে কত বার কত ভাবে কত ছাঁদে তার ঠিক নেই। জাদুকরের সঙ্গে জড়িয়ে বনমানুষের হাড় জাগায় একটা ভাব। ভাবের ইতর-বিশেষের কথা ছেড়ে দিয়ে দেখ—এক থলি টাকা দেখে যে ভাব হয়, এক থলি মোহর কি একখানা কোম্পানীর কাগজ দেখে ভাবটা সেই একই রকম হয়, কেবল মাত্রাটা বেশি হয় মাত্র। যে রস দেয় খাদ্য সে রস দেয় না অর্থ, এক থাল

মোয়া সম্পূর্ণ অন্য ভাব দেয় এক থলি মোহর থেকে। যেসব জিনিস নিয়ে মানুষ খেললে যাদের সঙ্গী করে পেলে লীলায় এবং কাজেও বটে, এমনকি যাদের চিবিয়ে খেয়ে ফেললে পর্যন্ত, তাদের সঙ্গেই ভাব হয়ে গেল মানুষের—একটা কোনো-না-কোনো রকমের ভাব। ধুলো নিয়ে খেলে, ধুলো তুলে মুখে পোরে ছেলে—ধুলো-কাদার সঙ্গে তার রকম রকম দিক দিয়ে ভাব, এমনি টাকার সঙ্গে ভাব হল কারু জুয়োখেলার দিক দিয়ে, কারু খাওয়া-পরার গাড়ি-ঘোড়ার স্বপ্নের দিক দিয়ে। খুঁটিনাটি তারতম্য নিয়ে দেখতে গেলে দেখি রসের রকম ভাবের রকম অনেকগুলো,— রস কেবল নয়টা নয়, রস অনন্ত, ভাবও গোটাকতক নয়, ভাব অনন্ত।

রূপের বেলায় শাস্ত্রকার বললেন 'রূপভেদাঃ'—লক্ষ্য রইল রূপে রূপে ভেদ নির্দেশ করা। মান পরিমাণের বেলায় তেমনি বললেন 'প্রমাণানি'— বহুবচন দিয়ে নির্দেশ করা হল ভিন্ন ভিন্ন রূপের জন্য বহু প্রমাণ। ভাবের বেলায় বললেন 'ভাবযোজনম্'—রূপকে ভাবের সঙ্গে যুক্ত করা চাই, ভাব যোজনা করতে হবে রূপে। এতে করে বোঝাচ্ছে যেভাবে রূপের সঙ্গে তার মান পরিমাণকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেভাবে ভাবকে পাচ্ছি না—বস্তুরূপ রয়েছে একঠাঁই, ভাব রয়েছে অন্যঠাঁই। বলে থাকি ভাবযুক্ত কথা, ভাবযুক্ত রূপ, ভাবযুক্ত লেখা, ভাবযুক্ত সুর সার ছবি মূর্তি, কাজের সময় কিছু একটা দেখে বলিও আমরা এটা ভাবযুক্ত অন্য কিছু সেটি ভাবযুক্ত নয়। সকালের ভাব সন্ধ্যার ভাব দিনের ভাব রাতের ভাব এসব বুঝতে দেরি হয় না আমাদের, জীনটা দিন রাতের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে ওদের সঙ্গে খানিক ভাব করে নিয়েছে। এমনি আরো জগৎসুদ্ধ জিনিস কারু সঙ্গে কাজের সম্পর্ক কারু সঙ্গে বা বাজে একটা সম্বন্ধ নিয়ে চেনাশোনা ও পরিচয় করে যাচ্ছি আমরা, চেনা পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যাদের কাছে পাই তাদের ভাবের খানিকটা পেয়ে যাই সেই সূত্র ধরে ক্রমে বন্ধুতা থেকে আত্মীয়তা পর্যন্ত ঠেকে গিয়ে ভাব হয় উভয় পক্ষে। অবসরের অভাব ভাব বোঝার ব্যাঘাত ঘটায় অনেক ক্ষেত্রে—কেরানীর অবসর নেই সকাল সন্ধ্যা অন্তরে অন্তর মিলিয়ে ভাব করে নেওয়া, কবির সে অবসর আছে। সামান্য অবসর সেখানে দু' একদিক দিয়ে অল্প ভাব, অনেকখানি অবসর সেখানে বহু দিক দিয়ে অনেকখানি ভাব। সহজে ভাব করতে চট্ করে ভাব ধরতে পাকা থাকে এক একজন—তারাই ভাবুক। পুজোর কন্‌সেশন পেয়ে যেন আমরা সবাই ছুটেছি নতুন নতুন দৃশ্য ও দেশের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন জিনিস দেখতে দেখতে, সবাই কিছু আমরা ভাবুক নয়, সুতরাং ভাব হয়েও হল না আমাদের যা দেখছি যা শুনছি যা নাগালের মধ্যে আসছে চোখের হাতের মনের তাদের সঙ্গে। ভাবুকের বেলায় এমনটা হয় না, সে ভাব কুড়োতে কুড়োতে চলে যাত্রার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত, সে যখন ছুটির শেষে দেশে ফেরে ফেরার পথেও ভাব করে নিতে আসে সবার সঙ্গে, ফিরে এসেও সে চলে নতুন থেকে নতুনের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে। আর আমি যে ভাবুক নয় আমি আসি মাত্র নতুন দেশ দেখে বেশ খেয়ে মোটা হয়ে শীত কি গ্রীষ্ম বেশ ভোগ করে জলে স্থলে ঘুরে অনেকখানি স্বাস্থ্য নিয়ে,—অনেকখানি ভাব নিয়ে নয়। একটা কিছুর তত্ত্ব জানা এক, আর ভাব জানা অন্য। বিশ্বের শিল্পকার্যের পুরাতত্ত্ব জানলেম এবং তাদের ভাবটা জেনে নিলেম—এই নিয়ে তফাত তত্ত্ববিদে আর ভাবুকে।

কোনো কিছুর হৃদ্‌গত ভাব বাইরের কতকগুলো ভঙ্গি দিয়ে ধরা পড়ে। রচনার ভঙ্গিতে কথার ভঙ্গিতে সুরের ভঙ্গিতে ওঠা বসা চলাফেরার ভঙ্গিতে ধরা পড়ল ভাব তবেই তো পেলেম মনের সঙ্গে মিলিয়ে বস্তুটির আসল রসটা। শাস্ত্রকার বলেছেন, "যাহা গ্রীবা তির্যকরণ ও ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারী তথা ভাব হইতে কিঞ্চিৎ প্রকাশক তাহাকে 'হাব' কহা যায়।" অন্তরের মধ্যে কুলুপ দেওয়া থাকে তো ভাব হয় না, কুলুপ খুলল তো

ভাব হয়ে গেল এতে ওতে তাতে। হাবভাব দিয়ে সহজে জানা গেল এবং জানান দেওয়া চলল মনে কি আছে। চোখের ইশারা হাতের ভঙ্গি ইত্যাদি সব ব্যাপার এবং গলার স্বর ইত্যাদি—এরা হল ভাব প্রকাশের ভাষা। সকালের আকাশ সন্ধ্যার আকাশ জানাচ্ছে রঙের ভাষায় নানা ভাব, একমাত্র ভাবুক জানে এই ভাষা যা দিয়ে মেঘ যাচ্ছে জানিয়ে ভাব-ফুল ফুটছে এবং ঝরছেও জানিয়ে ভাব। যখন কবি একটি গাছকে সবুজপরী বলে বর্ণনা করলেন তখন এটা হতে পারে যে কবি নিজের মনের ভাবটা গাছেতে আরোপ করে গাছকে দেখছেন পরীরূপ, আবার এও হতে পারে যে গাছটি সত্য সত্যই আপনাকে ধরেছে কবির সামনে পরী সেজে। যাত্রার অধিকারী যখন যাত্রার পালার জন্য গেল কবির কাছে তখন কবি নিজের কল্পনার সাহায্যে মনোমতো করে পাত্রপাত্রীদের সাজিয়ে ছেড়ে দিলেন। সেখানে রূপ সমস্ত কবির কল্পনার কবির ভাবের দ্বারা মণ্ডিত হল—যেমন ভীমের কল্পনা রাবণের কল্পনা। ভীম ও রাবণ চাক্ষুষ হল না কবির কাছে কিন্তু কবির দেওয়া সাজ ধরলো এক একটা ভাব ও রস ভীষণ মূর্তিতে। ধর, কবি যখন বললেন উপমা দিয়ে 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'—এখানে ভাবটা তিনি মন থেকে আরোপ করছেন এও বলতে পার, আবার লতার মতো অনেক রূপসী ও রূপসীর মতো অনেক লতা প্রত্যক্ষ দেখে এই কথাগুলি কবি বলছেন এও বলতে পার। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ রুদ্রের ভাব ভঙ্গি আকৃতি প্রকৃতি কিছুই নেই তাতে, অথচ শিবত্ব সম্পূর্ণ আরোপ করে দেখলেন ভক্ত, কিন্তু পূর্ণচন্দ্র তাতে দেখলেম সোনার থালের ভাবটা, ফুলে দেখলেম ফুলকুমারীকে,—সেখানে নিজের মনোভাব বা কল্পনা করে দেখতে হল না, ভাবটা বস্তু থেকেই পেয়ে গেলেম। এইভাবে বলতে পারি আরোপিত ভাব এবং আহরিত ভাব এই দুই রাস্তায় চলাচলি ভাবুকের মনের। কেন যে একটা ভাবে একটা কিছুকে দেখি আমরা তার সঠিক হিসেব সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। পেঁচাটা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করে, চিৎকারটা বিকট পেঁচার, সুতরাং নিশাচর বলে একটা ভয়ের ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে দেখার অর্থ বুঝি, কিন্তু কাক সে দিব্যি দিনের আলোতে দেখা দেয়, রঙটাও তার কালো কৃষ্ণের মতোই সুন্দর চিকণ কালো, কেন যে যমদূত ভেবে ভয় খেলে মানুষ তাকে তার অর্থই পাইনে। যার ভাবটা ঠিক বোঝা যায় না তাকে ভয়ের ভাবে দেখি আমরা, আবার যা ভাল বুঝি না এমন গভীর রহস্যে ঘেরা কিছু সেও ভাব নিয়ে মনকে টানে। চাঁদনী রাত সেখানে ভাবুকের আনন্দ, হয়তো যে ভাবুক নয় তারও আনন্দ, সুতরাং দু'জনেই না হয় জ্যোৎস্নারাতকে একটা ফুটন্ত ফুলের মতো আনন্দরূপ বললে, কিন্তু রাত্রির ভাব বুঝিনে সবাই যেখানে অন্ধকারে, যে ভাবুক নয় সে ভয়ে চুপ রইল কিন্তু ভাবুক সে গভীর রাতের স্তব্ধ ভাব দেখে বিভোর হয়ে কত কথাই বলে চলল দেখি।

দিনে বোধ করি চারিদিকে জাগ্রত ভাব, রাতে বোধ করি সুপ্তির ভাব এবং এই দুই ভারেতে করে সত্যিই আমাদের ঘুম ভাঙায় ঘুম পাড়ায়ও। উৎসবের রাত আলোতে আলো হল, নাচে গানে আনন্দে পরিপূর্ণ হল, ঘুম এল না তখন, রাত পোহাল জেগে জেগে কোথা দিয়ে, কিন্তু যেমনি উৎসব বন্ধ হল অমনি আলস্যের ভাব এসে ধরল চেপে, ঘুম এল, মনমরা হয়ে থাকলেম শুয়ে যদিও জানি তখন বেলা দুপুরের জাগরণে সবাই জেগে বিশ্বে। বিচিত্র রকমে হয় ভাবের ক্রিয়া চরাচরের যা কিছু তার উপরে। একটা গাছ এক মনোভাব নিয়ে দেখলেম একরকম, পর মুহূর্তেই অন্য ভাব নিয়ে দেখলেম সে অন্যরূপ। একই বস্তুকে আমি দেখি একভাবে, তুমি দেখ অন্যভাবে। ফুল-পাতায় সেজে এই দেখা দিলে গাছ একভাবে, ফুল পাতা ঝরিয়ে দেখা দিলে সেই গাছই আবার অন্যভাবে। আমরা কখনো নিজের ভাবে চরাচরকে বিভাবিত দেখি কখনো বা নিজের অন্তরকে

বিভাবিত দেখি চরাচরের ভাবের দ্বারা। ভাবুকের রচনা থেকে এবং আমরা নিজের নিজের কাছ থেকেও এর প্রমাণ পাই।

সূর্যের আলোয় রুদ্র তেজস্বিতা ইত্যাদি অনেক ভাব, চাঁদের আলোয় শীতল কান্ত নানা ভাব। সূর্যের একরকম ভাব, জলের একরকম, আকাশের অন্য রকম ভাব। ঋতুতে ঋতুতে চরাচরের ভাবপরিবর্তন এসব চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভাবের ক্রিয়ার। অবস্থাভেদে ভাবভঙ্গির ভেদ, ভাবের ভেদে নানা অবস্থাভেদ দেখতে পাই আমরা;— শয়ন, উপবেশন, গমন, গমনের ইচ্ছা, হাত মুখ চোখ ইত্যাদি নেড়ে বলা কওয়া, সভাতে গম্ভীর হয়ে বসা, পাতে বসে যাওয়া ভোজে, বর সেজে আগমন, তালঠুকে মারামারি করতে যাওয়া, খেলা করতে এগোনো, কোমর বেঁধে কাজ করতে চলা, নৃত্য করা ঘুরে ফিরে তালে তালে, যেন নাচব এইভাবে নড়ে-চড়ে ওঠা আনন্দে, —ক্রীড়া কৌতুক নিদ্রা সব অবস্থাতেই ভাব এক এক রকম, ভঙ্গিও এক এক রকম; ভাব থেকে ভাবান্তর, অবস্থা থেকে অবস্থান্তর—এই হল চরাচরের গতিবিধির নিয়ম।

হাবভাব দিয়ে আসল ভাবটা ব্যক্ত করা হয় যেমন তেমনি আবার হাবভাব দিয়ে আসল ভাবটা—যেটাকে বলতে পারি স্বভাব অভিপ্রায় (intention)—তাকে গোপন করাও হয়; যে চাবি খুললে তালা সেই চাবিই বন্ধ করলে তালা। অভিনেতাকে নিজের ভাবটা ধরে চললে তো চলে না, কেননা নিজের মনোভাব যাই থাকুক সেটা গোপন রেখে নায়কের ভাবটা অভিনয় করে দেখাতে হয়। হয়তো বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনার চিন্তায় মুহ্যমান অভিনেতা, কিন্তু দেখাতে হচ্ছে অভিনয়ক্ষেত্রে তাকে বেশ স্ফূর্তিবাজ নায়কের ভাব। চোর তার মনে মনে কুভাব, কিন্তু বাইরে দেখাচ্ছে সাধুর ভাব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। ছবিতে কবিতায় ভাব একেবারে গোপন রাখলে রচনার উদ্দেশ্য মাটি হয়, কাজেই নানা ব্যঞ্জনা নানা ভঙ্গি দিয়ে কোথাও ভাবকে সুপরিস্ফুট কোথাও অপরিস্ফুট করে দিয়ে কাজ চালাতে হয়। ভাব ভাবাভাস ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবসরলতা এমনি ভাবের নানা দিকের কথা অলঙ্কারশাস্ত্রে বলা হয়েছে, এসবই কাজে আসে আর্টিস্টের রকম রকম কাজের বেলায়। বিষয়টা এক কিন্তু কিভাবে তাকে প্রকাশ করা হল লেখায় বা চিত্রে—এই নিয়ে প্রভেদ এক রচনাতে অন্য রচনাতে। চন্দ্রোদয় জলের ধারে সে এক ভাব, চন্দ্রোদয় বনের শিয়রে সে আর এক ভাব 'চন্দ্রোদয়ারম্ভেমিবাম্বুরাশিঃ'—এ এক ভাবের ছবি জলের ঢেউয়ের গুটিকতক টান আর পূর্ণচন্দ্রটির আভা—জাপানের আঁকা ছবির ভাব। আবার 'শারদ চন্দ্র পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ'—এখানে আর এক ছবি আর এক ভাব যেন কাংড়ার কোনো শিল্পীর আঁকা ছবিখানি, হুবহু সেই ভাব। এখন কবি কালিদাসের চন্দ্রোদয়ের ছবি থেকে পাচ্ছি জলরাশির স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত ভাব—এপার ওপার নেই কেবল ফুলে ফুলে উঠছে জল আর জল, চাঁদ উঠি-উঠি করছে—এই ভাব এই ভঙ্গি এই অবস্থা। আবার ছেলেভুলোনো ছড়ার অজানা কোন এক কবি—তাঁর চন্দ্রোদয়—"দুলতে দুলতে বান এসেছে, জলে কত চাঁদ ভেসেছে, সোনার বরণ সোনার চাঁদ!" চাঁদের আলোয় কোনো নদী বইছিল গাঁয়ের ধারে সেই দেখে ভাব জাগল গেঁয়ো কবির কিন্তু কাজটা হল আর্ট হিসেবে কালিদাসের চন্দ্রোদয়ের সমানই ভাবের জিনিস। যে ভাবুক সেসব জিনিসেই ভাব যোজনা করে দিতে পারে, ভাব জাগাতেও পারে সামান্য অসামান্য সব জিনিস দিয়েই; এক আঁজলা ফুল এক মুঠো পুঁতি বা মোতি এগুলোকে ভাবযুক্ত করে দেওয়া সহজ কর্ম নয়।

প্রথম রাত্রে সুভদ্রার অভিসার অর্জুনের কাছে নির্মল হয়েছিল, তারপর আর্টিস্ট সত্যভামার হাতের একটু পরশ যখন সুভদ্রাকে ভাবময়ী করে ছেড়ে দিলে তখন ভাব হয়ে গেল অর্জুনে সুভদ্রায়। মালিনী সে যে হার

গেঁথে দিলে সুন্দরকে, তা তো শুধু ফুলহার হল না, ভাবের বেড়িও হল। শ্বেতপাথর গেঁথে গেঁথে ইমারত সাহেব-কোম্পানীও করেছে, কিন্তু কী পাথরের গাঁথনিই গাঁথলে তাজের নির্মাতা যা দেখে ভাবে বিভোর হতে হয় আজও কবি অকবি সবাইকে। ঈজিপ্টের পিরামিড তাকে কোনো অলঙ্কার দিয়ে সাজালে না আর্টিস্ট, কেবল ভাবযুক্ত করে ছেড়ে দিলে; একগোছা শুকনো পাতা—শীতের বাতাস তার রং ঢং সব হরণ করে মাটির উপরে ছড়িয়ে দিয়ে গেল শুধু একটু ভাবযুক্ত করে; এক পাট সাদা কাপড় তাতে সকালের শিশির—ভাব দিয়ে বুনে গেল আর্টিস্ট। বস্তু সামান্য ঘটনা সামান্য কিন্তু ভাবযোজনাতে অমূল্য অসামান্য অরূপ হয়ে উঠল সবাই —এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের ঘরে বাইরে যথেষ্ট ধরা রয়েছে। ভাব দিয়ে ধুলো-মুঠোকে সোনা-মুঠো করে দিচ্ছে আর্টিস্ট,—এ রোজই ঘটছে চোখের সামনে আমাদের। ভাবুকের হাতে এক তাল কাদা, একখানা পাথর, একটা কাঠ যেমন ভাব পায়, রূপ পায়, তেমনি কথাগুলো তেমনি সুরগুলোও ভাব পেয়ে যায় রূপ পেয়ে যায় যখন তখন বলতে পারি বস্তু ভাষা ও সুর এরা পাষাণী অহল্যার মতো জেগে উঠল ভাবের স্পর্শে।

ছবি যে লিখছে তার হাতে গোটাকতক রেখা আর তাদের গোটাকতক ভঙ্গি,—দাঁড়ি কষি ইত্যাদি বোঝাতে রইল উন্নত আনত অবনত এমনি গোটাকতক অবস্থা, এই নিয়ে ভাবুক সে কখন একটান কখন দু'টান মিলিয়ে এক একটা ভাবযুক্ত রূপ লিখছে, রেখার ভঙ্গি দিয়ে জানাচ্ছে—বক দাঁড়াল, বক উড়ল। বক ঘুমোল, উড়ি-উড়ি করছে বক, চলি-চলি করছে বক—এমনি নানা ভাব নানা ভঙ্গি গোটাকতক রেখায় রেখায়। ঝরনা ঝরছে, সমুদ্র গর্জন করে ফুলছে—সবার ভাব রেখার ফাঁদে ধরে নিচ্ছে ভাবুক ও আর্টিস্ট। দপ্তরী তো রেখা বিষয়ে পাকা কিন্তু কই তার দ্বারা তো ভাবযুক্ত রেখা টানা। কোনো কালেই হয় না। রূপের আর বস্তুর মূল্য তার ভাবসম্পদে না হলে একটুকরো পাথর ছেঁড়া কাগজ দুটো-একটা রং বা রেখা তার মূল্য কি?

রূপকথায় শুনেছি—পাতায় ঠোঙায় কোন এক রাজকন্যার একগাছি চিকণ কেশ তাই দেখে বিভোর হল ভাবে রাজপুত্র। এটা রূপকথা সুতরাং কথার কথা বলতেও পারো, কিন্তু আকাশের প্রান্তে কাজল মেঘের সরু একটি টান সেটা দেখে যে কবির ভাব জাগে তার কি! শুনেছি চীন দেশে তারা একটা তুলির টান দেখে রস পায়। সাদা কাগজে একটি টান, অন্ধকারে একটি আলোর রেখা—এসব ভাব জাগায় কিনা পরীক্ষা করে দেখলেই পারো।

জোর করে কারু সঙ্গে ভাব হয় না, জোর করে রচনাতে ভাব ঢোকানো চলে না। অভিনেতা কিংবা গায়ক যখন একেবারে চোখ আকাশে তুলে কতকগুলো কৃত্রিম হাবভাব করে তখন ধরা পড়ে যায় তার চেষ্টা আপনা হতে, এমনি ছবিতেও একটা যেমন-তেমন কিছুকে খানিকটা ভঙ্গি দিয়ে ছবির নীচে বড় কবির একটা কবিতা জুড়ে টেনেবুনে ভাবযুক্ত ছবি করতে চললে রচয়িতার ও রচনার ভাবের অভাবই অনেকখানি ব্যক্ত করা হয়। আর্টিস্ট নানা উপায়ে ভাবযোজনা করে থাকে রূপরচনাতে। প্রথমত ডৌল দিয়ে ভাবটা প্রকাশ হল, তারপরে সাজসজ্জা দিয়ে ভাব প্রকাশ হল, অঙ্গভঙ্গি ও সাজগোজ এই দুই দিয়ে ছবিতে মূর্তিতে ভাবটা ধরা পড়ল।

কুটির আর রাজবাড়ি দুটোর ভাব—ডৌল ও সাজ দুই মিলিয়ে একটা। সিংহদ্বারে আর খিড়কির দরজায় আঙ্গিক ভেদ এবং সাজসজ্জাতেও ভেদ। এমনি অনেক সাজসজ্জা বোঝায় উৎসবের ভাব, সাজসজ্জার অভাব বোঝায় উৎসবের অভাব দীনতা কত কি! অভিনয়ের সময়ে পরীকে দৈত্যকে খালি সাজ ও ডৌল দিয়ে প্রকাশ করি যেমন তেমনি ছবি মূর্তির বেলাতেও সাজের আর ডৌলের তারতম্য দিয়ে বোঝাই রূপের ভিন্নতা এবং ভাবেরও ভিন্নতা। পৈতের দিনে হঠাৎ ছেলেটা মাথা কামিয়ে গেরুয়া বসন পরে দণ্ড কমণ্ডলু ধরে যে হুবহু দণ্ডী

বনে যায় তার মূলে সাজ আর ডৌল ফেরানোর কায়দা। বিয়ের দিনে বরবধূর ভাবযুক্ত রূপ এই কৌশলেই প্রকাশ হয় চোখের সামনে। এগুলো হল সহজ উপায় আর্টিস্টদের হাতে, ভাব ফোটাতে চলে তারা নানা রং-চং ইত্যাদি দিয়ে। এখন একটা দোকানঘরের ভাব আছে, বসতঘরের ভাব আছে,—দোকানীর তৈজসপত্র দিয়ে বোঝানো গেল দোকানটা, বসতবাড়ির নানা জিনিস দিয়ে বোঝালেম এটা বসতবাড়ি, কিন্তু সাহেব কোম্পানীর দোকান সেখানে বাড়ির ডৌল রাজবাড়ির মতো, ভিতরের সাজও যেন একটা ড্রয়িংরুম বৈঠকখানা কি দোকান বোঝাবারই জো নেই—এখানে দোকানী আসবাব খানিক জুড়ে তবে বোঝাতে হল এটা দোকান। কাজেই দেখতে পাচ্ছি কি বাইরের দৃশ্যটার ভাব কি নিজের অন্তরের ভাব দুই কাজেই আর্টিস্টকে ভাবোপযোগী রেখা রূপ প্রভৃতি জুড়ে দিতে হয় রচনাতে—একেবারে পরিকল্পনা বাদ দিয়ে কাজ হয়ই না। খেতাবে রাজা মহারাজা—সত্যিও হয়তো বা একটা রাজ্যেশ্বর, কিন্তু তার স্বাভাবিক ভাবখানা সাধারণ রকম, সুতরাং রাজা বলে তাকে চালানোই চলল না খালি ফটো দিয়ে, কাজেই তার ডৌল মান পরিমাণ ভাব ভঙ্গি সব ফেরালেম তবে পেলেম রাজরূপটি রাজভাবটি।

কথাই আছে—'কামালে জোমালে বর আর নিকোলে জুকোলে ঘর।' ডৌল ও সাজ ফেরানোর সঙ্গে ভাবের হেরফের ঘটে ছবিতে মূর্তিতে এটা জানা কথা। শুধু সাজ ফিরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের অনেকগুলি দেবতার রচনা হয়েছে—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবদেবী, কেবল মুদ্রা আর সাজের পার্থক্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রকম হল। আবার ডৌলের ভিন্নতা নিয়েও অনেক মূর্তি রয়েছে, যেমন—গণেশ কৃষ্ণ নটরাজ বুদ্ধ ইত্যাদি সমভঙ্গ ত্রিভঙ্গ অতিভঙ্গ মূর্তি সব। বিষ্ণুমূর্তি আর সূর্যমূর্তি দুয়ের ভিন্নতা ভাব দিয়ে হল না কিন্তু সাজসজ্জার একটু-আধটু অদল-বদল নিয়ে হল, আবার গণেশ আর বংশীধারী কিংবা নটরাজ ও বুদ্ধ সবাই আলাদা আলাদা ভোল নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দেখা দিলে। এখন দেখি যে কোনো কিছুর ভাবটি নানা উপাদান নানা উপায় ধরে প্রকাশ করা চলল। একটা ঝরনার ভাব কোনো আর্টিস্ট ফোটায় সেটি ঝরনা পাহাড় আকাশ ইত্যাদি নানা সামগ্রী জুড়ে একটা ছবি করে, আবার কোনো আটিস্ট শুধু মস্ত পটখানায় গোটাকতক জলের ধারা মাত্র টেনে বুঝিয়ে দিলে ভাবখানা। কিন্তু দুই আর্টিস্টের কেউ ঝরনাকে বাদ দিয়ে কিছু করলে না; শুধু একজন ঝরনার সঙ্গে তার আশপাশকে জুড়ে দেখালে, অন্যজন জলধারাটুকু মাত্র পৃথক করে নিয়ে ধরলে পটে—ঝরনা বাদ গেল না কোনো ছবিতেই। এইবার যাকে নিয়ে কথা—যার রূপ ও ভাব ফোটানো—তার নিজ মূর্তিটা বাদ দিয়ে স্বতন্ত্র উপাদান দিয়ে তাকেই প্রকাশ কেমন করে হয় দেখ। একটি সন্ধ্যা ভাব দুখানা মাণিক আর একটি পিদুম দিয়ে ফুটল, যথা—

"সায়মণির কোলে
রতন মণি দোলে
দুর্গাপিদিম ঝলে।"

শুধু কবিতাতেই যে এইভাবে তাকে ফোটানো চলল তা নয়। সঙ্গীতে উপাদান উল্টে-পাল্টে ভাবের প্রকাশ হয়,—যেমন সকালের ভৈরবী সন্ধ্যার পূরবী; কিংবা গড়ের বাদ্যির মার্চ সুর দিয়ে সকাল। সুর দিয়ে সন্ধ্যা, সুর নিয়ে যুদ্ধ। মূর্তি গড়ে এমনটা করা সহজ নয় তবু তাজমহলটা অনেককে বাড়ি না হয়ে নারী হয়ে দেখা দিয়েছে! অলঙ্কারশিল্পে এর প্রমাণ জলতরঙ্গ চুড়ি ও শাড়ি, গঙ্গাজলি কাপড়—এমনি কত কি জিনিসে বর্তমান। প্রতীক চিত্রেও এর নিদর্শন দেখি, যেমন পদ্মপত্রে জলবিন্দু জগৎ-সংসারের ভাবটা বোঝালে।

এককে ভাব ভঙ্গি সব দিক দিয়ে অন্যের প্রতিম করা—এই হল সোজা রাস্তা ভাবরাজত্বের, আর একটি রাস্তা হল প্রতীকের রাস্তা—কাক দিয়ে বক বোঝানোর মতো একটা রাস্তা—যাকে বলতে পারো ঘুরুনে রাস্তা। বাধা নেই কারু এই দুই পথেই চলার কিন্তু আর্টিস্ট না হলে চলতে গিয়ে পদে পদে ঠকতে হয় এবং অপ্রযুক্ততা নিহতার্থতা প্রতিকূলবর্ণতা প্রসিদ্ধিত্যাগ দূরান্বয় প্রকাশিতবিরুদ্ধতা প্রভৃতি নানা অলঙ্কারদোষে ঠেকতেও হয়।

ভাবের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ নিয়ে মিললেম রূপ সমস্তের সঙ্গে তবেই হল যথাভাবে পাওয়া—আপনার করে পাওয়া কোনো কিছুকে, এইজন্য অনেকে বলেছেন Art is love—আর্টের মূলে ভালবাসা। ভাব বুঝলেম তো ভাব হল এবং তা থেকে ভালবাসাও জন্মাল, তখন তাকে নিয়ে ছবিই আঁকি, মূর্তিই গড়ি, কবিতা গান যাই করি—সেটি ভাল এবং ভাবের জিনিস হল এবং অন্যের কাছেও আদর পেলে রচনাটি। প্রথম আপন করে নেওয়া ভাব করে, তারপর সেটিকে সকলের আপন করে দেওয়া ভাবযুক্ত করে—এই হল কৌশল আর্টিস্টের। আমার আপন যে হল তোমারো আপন সে হল—এই কৌশল আর্টের।

মায়া পড়ে যায় আমাদের অনেক জিনিসে কিন্তু যথার্থ ভাব হয় না। তাতে করে অনেক দিন যেখানে বাস যাদের সঙ্গে ঘরকন্না মায়া পড়ে তাদের উপর—ভাব থাক বা নাই থাক কিছু আসে যায় না। অনেক বন্দীর কারাগারের উপরে একটা মায়া পড়ে যায় অনেক দিন সেখানে বন্ধ থেকে, পোষা পায়রার মায়া পড়ে যায় বিশ্রী খাঁচাটার উপর, কিন্তু এতে করে খাঁচার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে পায়রার তা জোর করে বলতে পারিনে, কেননা ‘অঘটনপটীয়সী মায়া’। ঈশ্বর গুপ্তের মায়া পড়েছিল পাঁঠার উপরে এবং তিনি পাঁঠার উপরে কবিতাও লিখেছেন, কিন্তু সেটাকে কোনো দিন ভাবযুক্ত পদার্থ বলে ভ্রম হয় কারু? থেলো হুঁকোর উপরে মায়া পড়েছে শতসহস্রের কিন্তু থেলো হুঁকো কোনো দিন ভাবের প্রতিম বলে চলতে পারে এ বিশ্বাস কর কেউ? মায়া দিয়ে একটা বস্তু যুক্ত হতে পারে কেবল আমারই সঙ্গে কিন্তু অন্যের সঙ্গে তার মিলন ঘটে না। দেশটার উপরে মায়া আছে কিন্তু তাই বলে দেশটার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে একথা বলা চলে না। ভাবের জিনিস সে মায়ার অতীত জিনিস, কেননা সত্যভাবে তাকে লাভ করি আমরা এবং সেই কারণেই সত্য হয়ে ওঠে সে অন্যের কাছেও।

লাবণ্য

লাবণ্য সম্বন্ধে ‘উজ্জ্বলনীলমণিকার’ বললেন, “মুক্তাকলাপের অন্তর হইতে যে ছটা বহির্গত হয় এবং স্বচ্ছতাপ্রযুক্ত অঙ্গ সকলে যে চাকচিক্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে তাহাকেই লাবণ্য বলে।” শ্রীধারার অঙ্গদ্যুতির সঙ্গে মণিময় মুকুর এবং শ্রীকৃষ্ণের বক্ষদেশের সঙ্গে মরকত-মুকুরের তুলনা দিয়ে এটা বোঝালেন রসশাস্ত্রকার। বৈষ্ণব কবিতায় লাবণি শব্দ অনেকবার ব্যবহার হচ্ছে দেখি—‘ঢল ঢল কাঁচা সোনার লাবণি’। বৈষ্ণব কবিদের মতে লাবণ্য হল—প্রভা, দীপ্তি, স্বচ্ছতাবশতঃ ঔজ্জ্বল্য, চলতি কথায় পালিশ বা চেকনাই। অভিধানের মানের সঙ্গে মিলছে না—লবণস্য ভাবঃ অর্থাৎ লবণিমা কথাটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে স্বাদের, যাকে ইংরিজিতে বলে taste তাই। রূপ দিয়ে প্রমাণ দিয়ে ভাবভঙ্গি দিয়ে যা রচনা করা হল তা tasteful বা লাবণ্যযুক্ত করা হল তো হল ভাল। ‘ভাবলাবণ্যযোজনম্’—ভাবযোজনা এবং লাবণ্যযোজনার কথা বলা হয়েছে চিত্রের ষড়ঙ্গে। যাতে যেটা নেই তাতে সেইটি মেলালেম যখন তখন বললেম—এটি যোজনা করা গেল। রূপকে বা রূপরেখাকে ভযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই লাবণ্যযুক্ত করার কথা উঠল। রন্ধনশিল্পে লবণিমা ও লাবণ্যের যোজনা একটা বড় রকম ওস্তাদি, সেখানে বেশি লবণ কম লবণ দুয়েতেই বিপদ আছে। রান্নাতে যখন নুন মিশল তখন সমস্ত জিনিসের স্বাদটি ফিরিয়ে দিলে লবণ-সংযোগ, লবণ জিনিসটাও তখন পৃথক নেই, সবার সঙ্গে মিলে একটা চমৎকার স্বাদে পরিণত হয়ে গেছে। তেমনি সকল রচনার বেলাতেই সূপকারের মতো রূপকারও একটুখানি লাবণ্য যোগ করে, যাতে করে স্বাদু হয়ে ওঠে রচনাটি।

রসশাস্ত্রকার বলেছেন,—“মুক্তাকলাপের অন্তর হইতে যে ছটা বহির্গত হয় তাহাকে লাবণ্য বলি।” এতে করে বোঝাচ্ছে রূপের প্রমাণের ভাবের অন্তর্নিহিত হয়ে বর্তমান থাকে লাবণ্য, শুধু শিল্পীর অপেক্ষা রচনার কৌশলে সেটিকে প্রকাশ করা। খনির মধ্যে সোনা যখন আছে তখন লাবণ্য তার থেকেও নেই, কারিগরের হাতে পড়ল তো লাবণ্য দেখা দিলে সোনায়—‘ঢল ঢল কাঁচা সোনার লাবণি’; মুক্তার বেলাতেও এই কথা,—আর্টিস্টের স্পর্শসাপেক্ষ হল লাবণ্য। যিশুখ্রিস্ট বলেছিলেন, 'Ye are the salts of Earth' এ কথার দুটো অর্থ হয়—মাটির নিমকে তোমরা মানুষ, কিংবা ধরাতলের লাবণ্যই তোমরা, মর্ত্যজীবনে স্বাদ দিতে তোমরা। আজকের বায়োকেমিক মতে মানুষ নানা প্রকার লবণের সমষ্টি—এটা খ্রিস্টের আমলে জানা ছিল কি ছিল না জানা যায় না,— কিন্তু বহু পূর্ব থেকে মানুষ লবণ নিমক লবণিমা নানা অর্থে নানা ভাবে প্রয়োগ করছে দেখা যায়। এককথায় বলতে হলে বলতে হয়—স্বাদ ফিরে যায় যার দ্বারা এবং স্বাদু করে তোলে যে বস্তুকে কিংবা রচনাকে সেই হয় লাবণ্য।

মুক্তাফলের লাবণ্য একরকম, হীরকের লাবণ্য অন্য, পাকা কাঁচা আমের লাবণ্য, মানুষের কালো চামড়ার লাবণ্য, সাদা চামড়ার লাবণ্য, মাথাঘষা দিয়ে মাজা চুলের লাবণ্য, গন্ধ তৈলে চিক্কণ-চুলের পাকা-চুলের কাঁচা-চুলের লাবণ্য—সবই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রকমের। কড়ি দিয়ে মাজা সুতোর কাপড়ে যে লাবণ্য সিল্কের কাপড়ে সে

লাবণ্য নেই, পাথরবাটির লাবণ্য আর চীনের বাটি কি সোনা রূপোর বাটির লাবণ্য সমান নয়। লাবণ্য প্রচ্ছন্ন রইল এবং লাবণ্য প্রকাশ পেল এটা বলা চলল, লাবণ্য হারাল বস্তুটি এও বলা গেল। নতুন টুকটুকে মলাটের বইটি, নিভাঁজ ধোয়া কাপড়খানি, হাতে হাতে চটকা চটকিতে হারিয়ে ফেললে লাবণ্য,—রং জ্বলে গেল, ধোপ মরে গেল, অপছন্দ করলে সাধারণ লোকে, কিন্তু আর্টিস্ট দেখলে দুটির মধ্যেই আর একটুকু নতুন ধরনের লাবণ্য পুরাতনের স্বাদ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। অলঙ্কারশিল্পে ওল্ড গোল্ড (old gold) বাদ গেল না,—উজ্জ্বল সোনা ম্যাড়মেড়ে সোনা দুই ধরনের লাবণ্য দেখাল। পাথরের লাবণ্য সে পাথরের আছে, সোনার লাবণ্য সোনাতেই, জলের একটুখানি লাবণ্য আছে সেটা সমুদ্রে এক, নদীতে অন্যভাবে প্রকাশ পায়, মাটিতে জলের লাবণ্য নেই মোটেই,—এখন নদীজল আঁকতে সমুদ্র-জলের লাবণ্য দিলে যেমন বিস্বাদ হয় ছবিটা তেমনি মাটিকে জল করে লিখলেও ভুল হয়ে যায় জলে স্থলে। তবেই দেখা গেল এক-এক বস্তুর ধাত বুঝে তবে ছবিতে লাবণ্য যোজনা করাই হল কাজ।

স্বভাবের নিয়মে গাছ পাতা ফুল স্বাভাবিক লাবণ্য পেয়েছে; ধুলো পড়লো, রোদে তাতল,—লাবণ্যটুকু ঢাকা পড়ল; বৃষ্টিজলে ধোয়া হয়ে গেল গাছপালা—প্রকাশ হল পূর্ব লাবণ্য তাদের। জলভরা মেঘ সে এক লাবণ্য এক সোয়াদ দিলে চোখে ও মনে, জলঝরা মেঘ সে আর এক লাবণ্য আর এক সোয়াদ ধরলে সামনে।

লবণের সংযোগে বস্তুর স্বাভাবিক তারের সঙ্গে সুস্বাদ যেমন মিলছে দেখি রন্ধনশিল্পে তেমনি লাবণ্যের যোগে অন্যান্য শিল্পেও রূপ প্রমাণ ভাব সমস্তই চোখের এবং মনেরও তৃপ্তিদায়ক হয়ে উঠছে এবং তখন দর্শকের শ্রোতার পাঠকের ভাল লাগছে রচনাটি। লাবণ্য তো অনুভব করি এবং চোখেও দেখি একসঙ্গে, অথচ জিনিসটা এমনই যে পাকাপাকি একটা ব্যাখ্যার মধ্যে ধরাছোঁয়া দিতেই চায় না। কথায় বলে মণিকাঞ্চন যোগ—পিত্তল ও মণি, কিংবা তাম্র ও মণি, দন্ত ও মণি, রজত ও মণি অজস্র শিল্পকাজে ব্যবহার হচ্ছে দেখি। মণি সোনায় বাঁধা হয়ে একটি লাবণ্য দেয়, পিত্তলে তামায় রৌপ্যে ও গজদন্তে বাঁধা হয়ে আর এক রকমের লাবণ্য পায় দেখি, এমনি শিল্প-রচনাটি ভাবভঙ্গির দিক দিয়ে মান-পরিমাণের দিক দিয়ে এবং রূপের দিক দিয়ে লাবণ্যের সংস্পর্শ পেয়ে গেল তবেই সুন্দর তার দিলে আমাদের। রূপ সমস্ত বিভিন্ন, প্রমাণ তারাও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, ভাব সমুদয় নানা ভঙ্গিতে বিভক্ত, লাবণ্যের ঘেরে এরা এক হয়ে বাঁধা পড়ে যখন তখনই হয় মনোহর। সোনাতে সোহাগার কাজ করার মতো কাজ হল লাবণ্যের। "মুক্তাফলেষু ছায়ায়া স্তরলত্বমিব"। তরঙ্গায়মাণ হচ্ছে লাবণ্য এই বললেন রসশাস্ত্রকার। রূপে প্রমাণে ভাবে একটা তরলতা দেয় লাবণ্য এই হল ভাবটা। যেসব রেখা রূপ দিতে আছে, মান পরিমাণের বাঁধুনি শক্ত করে বেঁধে দিতে আছে, ভাবভঙ্গি বাঁধা রকমে প্রকাশ করতে আছে—সেই সব দস্তুরমতো টানা রেখা রুল কম্পাসের শক্ত রেখা, তারি মধ্যে লাবণ্য যোজনা করা চাই তবে তারা আর্টের কাজে আসে—না হলে আফিসের দপ্তরখানার মিস্ত্রীখানার মধ্যেই বদ্ধ থেকে যায়। সাদা কথায় বলা গেল—উত্তরের আকাশে মেঘ লেগেছে। ঘটনাটা বোঝালে কাটা কাটা কথাগুলো, কিন্তু নড়ে না চড়ে না যতটুকু বলবার বলে চুকল এক আঁচড়ে। এই কথাগুলোকে একটু গুছিয়ে বলা গেল—উত্তরেতে মেঘ লেগেছে;—কাটা কাটা কথা বেশ একটু দোলন পেলে লাবণ্যের স্পর্শ হতেই। আরো সুন্দর হল যখন বললেন কবি—'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্' ইত্যাদি। লাবণ্যের ছন্দে ধরে লেখা যায় না বলেই গদ্য অনেক সময় কানে খটোমটো ঠেকে।

কবিতাতে ছন্দ গতি দেয় কথাগুলোকে, নানা লয়ে বিলয়ে পা ফেলে চলে কথাগুলো ছন্দের বশে। কথার লাবণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা গেল না কিন্তু ছন্দে গাঁথা গেল কথাগুলো, তাতে করে কাজ হল না—দু'এক ছত্র কবিতা থেকে বোঝাতে চেষ্টা করি। মা সরস্বতীর পাদপদ্মে যেন ভক্তি থাকে—এ হল নিছক কেজো কথা; এইটেই শুধু ছন্দে গেঁথে ফেললেম লাবণ্যের দিকে নজর না রেখেই—

"হে মা ভারতি। দিলাম প্রণতি
তোমারি সরোজ চরণে।"

আবার আর এক কবি ঐ কথাই কথার এবং ছন্দের লাবণ্য বজায় রেখে বললেন—

"নমি নমি ভারতি—
তব কমল চরণে।"

শুধু ছন্দে গতিমান হয়েও কথা বেশিক্ষণ চলতে পারে না, লাবণ্য দিয়ে ছন্দে গাঁথা হল কথা, তবে হল রচনাটি উত্তম। এমনি ছবির বেলাতেও রূপ-রেখাগুলি লাবণ্য দিয়ে বাঁধা হল তবে হল কাজ।

গাড়ির চাকা মিস্ত্রী ঠিক ছন্দে বাঁধলে কিন্তু কারখানার বড় মিস্ত্রী দু'চার পোঁচ চর্বি। মাখিয়ে দিলে তবে নিখির্কিচ্ চাকা ঘুরল। আনাড়ির হাতের রান্নায় কিংবা তার প্রস্তুত করা জিনিসে লাবণ্যের অতিরেক কিংবা ব্যতিরেক ঘটেই,—হয় বেশি নুন নয় কম নুন। পাউডার মাখলে তো এমন মাখলে যে একটা রাক্ষুসী সেজে দাঁড়াল মেয়েটা, ছেলেটা চুল বাগালে তা এমন ছাঁটন দিলে যে তার চেয়ে মাথাটা মুড়িয়ে এলে ভাল দেখাত। লবণিমার ওজন বোঝা সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার,—সূপকারের পক্ষে এই কথা রূপকারের পক্ষেও ঐ কথা। এটা তো রোজই দেখা যায় যে, মাসিক পত্রের হাফটোন ও ত্রিবর্ণের ছবিতে আসলের লাবণ্যটি ভেস্তে যায় এবং কাগজওয়ালা সেইগুলো দেখেই আর্টিস্ট ও আর্ট-শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক সমালোচনা করে বসে। আসল ছবির বিচিত্র বর্ণচ্ছটাকে তিন বর্ণের কাটছাঁটের মধ্যে ধরাতে জিনিসটার লাবণ্য আরবি থেকে বাংলাতে তর্জমা করার চেয়েও বেশি পরিমাণে ভেস্তে যায়, অথচ গম্ভীরভাবে সমালোচক বসে যায় চিত্র-সমালোচনায়, যথা 'হরপার্বতী' তিন বর্ণের, শিল্পী (অমুক)—নিতান্ত কাঁচা; 'মুসাফির' তিন বর্ণের, শিল্পী (অমুক)—ভাল; 'বিরহী যক্ষ' তিন বর্ণের, শিল্পী (অমুক)—বেচারা যক্ষের অবস্থা শোচনীয়; 'পদ্মাবতী' তিন বর্ণের, শিল্পী (অমুক)—গোড়াতেই রঞ্জনের অভাব, প্রস্ফুটিত না হইলেই ভালো হইত; 'ওমর খৈয়ামের ছবি' শিল্পী (অমুক),—পণ্ডশ্রম; 'আড়িপাতা' তিন বর্ণের, শিল্পী (অমুক)—তুলি ছাড়িয়া পেন্সিল ধরা আবশ্যক; ইত্যাদি ইত্যাদি। তিন বর্ণের রঙের টিনগুলোর উপরে বসে মাছি যদি চিত্র-সমালোচনা করতে চলে তবে সে চিত্রের লাবণ্য বাদ দিয়ে রূপ বাদ দিয়ে রং বাদ দিয়েই বকে চলে যা-তা নিশ্চয়ই। চটকানো পদ্মে বসে ফুলের লাবণ্য সম্বন্ধে বলতে পারি যে লাবণ্য অনেকখানি হারিয়েছে ফুল চটকানোর দরুন, কিন্তু ফুলের রচয়িতাকে উপদেশ দিইনে ফুলসৃষ্টি ছেড়ে মাসিক পত্রিকা লিখতে। এই লাবণ্য আছে বলেই সুকুমার শিল্পের নকল দেখে আসলটাকে বোঝাই শক্ত হয় এবং সেজন্য অনেক সময়ে শিল্পীকে অযথা দায়-দোষে পড়তেও হয় কাগজওয়ালার কাছে।

আলো মাখা হয়ে ফুল একটি লাবণ্য পাচ্ছে, ছায়াতে ফুল আর এক লাবণ্য পাচ্ছে, শিশিরে ধোয়া ফুল, বৃষ্টিজর্জর ফুল—লাবণ্য সবটাতেই রয়েছে শুধু অবস্থাভেদে লাবণ্যের বিভিন্নতা ঘটছে মাত্র। কবি কালিদাস বিরহী যক্ষকে একটি চমৎকার লাবণ্য দিলেন 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ'। এটা ম্যালেরিয়া রোগীর লাবণ্য বলে ধরা চলে না—অবস্থা বিশেষে ক্ষীণ-চন্দ্রকলার মতো লাবণ্যময় রূপটি দিয়েছেন যক্ষকে কবি; আবার যক্ষ

যখন ফিরেছিল অলকায় তখনকার তার লাবণ্য যদি দিতেন কালিদাস তবে সেটা স্বতন্ত্র রকমের নিশ্চয়ই হত। এমনি সকল দিকেই দেখব লাবণ্যের প্রকার-ভেদ হচ্ছে অবস্থা ও পাত্র ভেদে। অনেক জিনিসের সঙ্গে তুলনা দিয়ে লাবণ্যের প্রকার-ভেদ বোঝাতে চলেছেন প্রচীন কবিরা, যেমন 'চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু লাবণীরে', কিংবা 'তপত কাঞ্চন কান্তি কলেবর', অথবা 'অখিল ভুবন উজারকারি কুন্দ কনক কাঁতিয়া', 'অপরূপ হেমমণি-ভাস অখিল ভুবনে পরকাশ' এই হল গৌরাঙ্গের লাবণ্য বোঝাতে অনেকগুলো ধাতু এবং ফুলের অবতারণা। তারপর শ্যামলাবণ্য বোঝাতে বলা হল, যথা—'জনু জলধর রুচির অঙ্গ'; রাধাকৃষ্ণ দু'জনের লাবণ্য বোঝাতে বলা হল—"ও নব জলধর অঙ্গ, ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ; ও বর মরকত ঠাম, ইহ কাঞ্চন দশবাণ", আবার যেমন—"ও তনু তরুণ তমাল, ইহ হেম যুথী রসাল, ও নব পদুমিনী সাজ, ইহ মত্ত মধুকর রাজ, ও মুখ চাঁদ উজোর" ইত্যাদি। মানুষের লাবণ্য তারপর কাপড়ের লাবণ্য, তার বেলাতেও বললেন কবি—"বিজুরী বিলাসিত বাস", গলার হারের লাবণ্য—"হার কি তারক দৌতিক ছন্দ", হাসির লাবণ্য—"হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ",পদতলের লাবণ্য—"পদতলে থলকি কমল ঘনরাগ", করতলের লাবণ্য—"করকিসলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ"। শুধু রং বোঝাতেই নানা তুলনা তা নয় লাবণ্যটি বোঝনোর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে বৈষ্ণব কবিরা একটি একটি বস্তুর উপমা দিয়ে চলেছেন; যেমন—"কুবলয় নীলরতন দলিতাঞ্জন মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ"—বর্ণের ও লাবণ্যের ছন্দ একসঙ্গে পাই এখানে। আবার—"মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল", কিংবা "কুবলয় কন্দর কুসুম কলেবর, কালিম কান্তি কলোল"—লাবণ্যের কল্লোল পাচ্ছি। ভাবের লাবণ্য বোঝাতে নানা ভঙ্গি বা ভঙ্গের অবতারণা করেছেন কবিরা; যেমন—"হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ",—যেমন তেমন করে তেড়া বাঁকা নয় ভঙ্গিটি। ভুরুর ভঙ্গি "কামের কামাল জিনি ভাঙ বিভঙ্গ" আবার যেমন—"ও মুখচাঁদ উজোর, ইহ দিঠি লুবধ চকোর", কিংবা "অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ, গোবিন্দ দাস রহু ধন্দ"—লাবণ্যের পরিসীমা না পেয়ে কবির বিভ্রম ঘটল। বিশেষণ হিসেবে শুধু যে কথাগুলো নানা পদাবলীতে বসালেন কবিরা তা তো নয়, বিশেষ করে লাবণ্যটি বোঝাতে চেষ্টা পেলেন তাঁরা।

ভাবের ভঙ্গিমার সঙ্গে লাবণ্যের যোগাযোগ দেখলেম, এখন মান পরিমাণের সঙ্গে তার যোগের দু'একটা দৃষ্টান্ত কবিদের কাছে থেকে দেব, যেমন—"বিষদ বারণ বাহু বৈভব", "কনক লতায় তমালহুঁ কত কত দুহুঁ দুহুঁ তনু বাঁধ", "মাঝুহি মাঝ মহা-মরকত সম শ্যামের নটরাজ", "অবনি বিলম্বিতবলি বনমাল", "বনি বনমাল আজানুলম্বিত", "কামিনী কোটী নয়ননীল উতপল পরিপূরিত মুখচন্দ",—মুখচন্দ্রে লাবণ্য সৌন্দর্য মাপজোখ একসঙ্গে পেয়ে গেলেম। রাধিকার রূপের লাবণ্য জানাচ্ছেন কবি—"পঞ্চম রাগিণী রূপিণী রে"—,সুরে লয়ে বিশুদ্ধ রূপের লাবণ্যটি পাই এখানে, আবার "তনু তনু অতনু অযুত শত সেবিত, লাবণী বরণি না যাই"। চুল বাঁধার ছাঁদ ও লাবণ্য দেখাচ্ছেন কবি—"ধনি কানড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে" কিংবা "দলিতাঞ্জন গঞ্জ কালো কবরী, বাঁধে" কিংবা "দলিতাঞ্জন গঞ্জ কালো কবরী, ক্ষণ উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী"। হাতপায়ের নখের লাবণ্য —"নখচন্দ্র ছটা ঝলকে অনুপম, হেরি গোবিন্দ দাস তঁহি পরিণাম"।

লাবণ্য যেখানে তরঙ্গিত হচ্ছে মুক্তাফলের কান্তির মতো তারি বর্ণন দিচ্ছেন কবি—

"যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতি
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকয় হোতি।
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই

তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই।

*　　*　　*

যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙ বিলোল
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল।
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল কন ভরই।
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ।"

—গোবিন্দদাস

লাবণ্যের ঠিক প্রতিশব্দ ইংরাজি ভাষায় নেই, Grace বললে সবটা বুঝায় না, Beauty তাও বলা গেল না। লাবণ্য স্বাদ পৌঁছে দেয় সেইজন্য তাকে বলতে পারি Taste, লাবণ্য চমৎকার সামঞ্জস্য দেয় ভাবে ভঙ্গিতে মানে পরিমাণে ও রূপের বিভিন্ন অংশে সেজন্য তাকে বলা চলে Unity, এইভাবে Quality এবং Balance তাও এসে পড়ে লাবণ্যের কোঠায়। Taste সম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসি শিল্পী Rodin বলেছেন, "It is the human soul's smile on the house and its belongings." লাবণ্য-যোজন ছাড়া এ আর কি বোঝাচ্ছে?—অন্তরের লাবণ্যচ্ছটা বাহিরকে লাবণ্য দিচ্ছে, "যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস, তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ"। Quality বা গুণ তার বেলাতেও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা লাবণ্যের ইঙ্গিত করলেন—"We say a line, a tone, a colour, an action has quality—when the artist has succeeded in endowing it with such beauty within itself (লাবণ্য-যোজন) that gives an interest quite beyond its purpose as storytelling machinery."

এইভাবে লাবণ্য বলতে অনেকগুলো হিসেব বোঝায় দেখতে পাচ্ছি—কালে কালে নানা গজদন্ত নানা রূপ ধরে, পিতলের জিনিসের উপরে মৃদু লাবণ্য আপনা হতে দেখা দেয়, পুরোনো শানের রঙে একটি চমৎকার লাবণ্য আসে সেটা নতুনে থাকে না, প্রাচীন অয়েল-পেন্টিংগুলোও এইভাবে একটি স্বতন্ত্র লাবণ্যযুক্ত হয় কালবশে। কাজেই নতুনের লাবণ্য এবং পুরাতনের লাবণ্য দুই প্রকার হল। এমনি আকাশ জল হল এদের লাবণ্য ঋতুতে ঋতুতে বদল হচ্ছে—নবজলধরের লাবণ্য, শরতের মেঘের লাবণ্য, এমনি নানাপ্রকার ভেদ দেখি লাবণ্যে এবং এই লাবণ্য ভেদ দিয়ে বস্তু তাকেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাই আমরা। বর্ষার আকাশ এক ভাব দিচ্ছে এক স্পর্শ দিচ্ছে মনে, শীতের আকাশ অন্য ভাব ধরছে মনে, দিনের আকাশ, রাতের আকাশ, সকালের আকাশ, সন্ধ্যার আকাশ বিচিত্র বিভিন্ন লাবণ্যে ভরে উঠছে দেখি এবং সেই সঙ্গে মনের ভাবেরও বদল হচ্ছে আমাদের।

জাপানি চিত্রকরেরা যে রেশমের পটের উপর আঁকে অপরূপ তার একটুখানি লাবণ্য আছে। যেমন-তেমন একটা পটে তারা আঁকেই না। আমাদের দেশে মোগল শিল্পীরা যে কাগজে আঁকত তার লাবণ্য এখনকার কোনো কাগজেই নেই। আমি অনেককে বলতে শুনেছি যে মোগল পেন্টি-এর মতো এখনকার ছবি হতেই পারে না। এইটির প্রধান কারণ হচ্ছে লাবণ্যে মাজা এক টুকরো কাগজের অভাব, আর্টিস্টের ক্ষমতার অভাব নয়। 'যেমন পাটা তেমন পট'—এ তো জানা কথা, দেওয়ালে আঁকা ছবি আর গজদন্তের পাটায় আঁকা ছবিতে

লাবণ্যের তফাত অনেকটা হয়ে যায়। ছাপাখানায় কিছু ছাপাতে দিলে প্রুফ আসে এক কাগজে, ছাপা শেষ হয় গিয়ে অন্য কাগজে। এখন দুই কাগজের quality বা গুণ দুই রকমের লাবণ্য দেয়, প্রুফকপির আকাট লাবণ্য এবং প্রকাশিত বইটার কাটছাঁট লাবণ্য সুস্পষ্ট দুটো স্বাদ দেয় চোখে ও মনে। এমনি ছবির বেলাতেও আসল ছবি আর তার নকল এবং তিনবর্ণ প্রতিপিলি এক লাবণ্য দেয় না, দিতে পারেও না। এই লাবণ্যের ছোঁয়াচ নিয়ে শিল্পকাজের উচ্চ-নীচ ভেদ স্থির করা চলে। একটা মোমের পুতুলের লাবণ্যে আর আসল মানুষটির লাবণ্যে এইভাবে ভেদাভেদ লক্ষ্য করি আমরা এবং বলে থাকি—আহা মেয়েটি যেন মোমের পুতুল! সেকালের গিন্নিদের মনে ননীর পুতলী বলে একটা বিশেষ রকম লাবণ্যের বাটখারা ধরা ছিল,—এখনো সুন্দর কিছু বলতে ঐ বিশেষণটা চলছে ভাষায়। আর্টের জগতে কিন্তু নিছক ননীর পুতুলের লাবণ্যের মূল্য বড় বেশি নেই। সংসারে ননীর পুতুল বৌ এনে গিন্নি নিশ্চিন্ত, বৌটি ননী খেয়ে খেয়ে ক্রমে ননীর তাল হয়ে গিন্নি-জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করতে চললে খুশিই হত সেকালে সবাই, কিন্তু ছবিতে মূর্তিতে এরূপ ঘটনা লাবণ্যে ঘটতে দিলে বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে। এই অতিলাবণ্যের নিদর্শন বাঙলার নধরমূর্তি মহাদেবের অঙ্গে সুস্পষ্ট বিদ্যমান—জার্মান প্রিন্ট তাতেও পাবে। বিবাহের সময় মেয়েরা 'শ্রী' বা ছিরী বলে একটা মাখনের তাল গড়ে তোলে সেইটেই পুরাকালের লাবণ্যময়ীর আদর্শ ছিল হয়তো! এই ননীর পুতুলে যেমন অতিলাবণ্য দেখি তেমনি পিটুলির পুতুলে আর একরকম অতির দেখা পাই, কাজেই আর্টের দিক থেকে লাবণ্যযোজনের বেলাতেও বলা চলল—'অতিশয় কিছু নয়'।

বিশ্বকর্মা লাবণ্য দিচ্ছেন সকল রূপে সকল ভাবে নানা উপায়ে—আলো ছায়া দিয়ে রংবেরং মিলিয়ে, কঠোরে কোমলে একত্র বেঁধে। নিছক কড়ি নিছক কোমল সুর নিয়ে সঙ্গীতে যেমন কাজ হয় না বিশ্ব জগতেও সৌন্দর্যসৃষ্টি রসসৃষ্টির কাজে আসে না নিছকের নিয়ম; সেখানে দেখি—একেবারে ভয়ঙ্কর শক্ত পাথর, তার উপর দিয়ে বইছে একেবারে তরল ঝরনা, নয়তো সবুজ শেওলাতে কোমল হয়েছে পাথরগুলো। পাহাড় শক্ত ঠেকে তখনই যখন তাকে বিচ্ছিন্নভাবে নিয়ে হাতুড়ি পিটে দেখি, কিন্তু আকাশের আলো যখন তাকে নানা লাবণ্যে বিভূষিত করেছে তখন কতখানি কমনীয় হয়ে গেছে পাহাড় তা তো দেখতেই পাই। জলের মধ্যে সবটা তরল বস্তু, মেঘ সবটাই বাষ্প, কিন্তু আশ্চর্য উপায়ে বিশ্বশিল্পী তিনি জলেতে মেঘেতেও কড়ি এবং কোমল দুই সুরই ধরেছেন, বাতাসেও কখনো ঘন কখনো ফুরফুরে কখনো তীব্র কখনও ক্ষুরধার নানা লাবণ্য দিয়ে পাঠাচ্ছেন শিল্পী। জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীটাই কেবলি বাজছে না বিশ্ববীণাতে, সেখানে জীবন-মরণ হাসি-কান্না আলো-অন্ধকার সবই বাজছে একসঙ্গে সুরে বেসুরে চমৎকার, এবং সমস্ত ব্যাপারটি দেখি একটি লাবণ্যের পরিপূর্ণতার ঘেরে ধরা পড়ে যাচ্ছে,—একেই আর্টের ভাষায় বলা হয় Unity। লাবণ্যের ঘেরের মধ্যে বিচিত্র রূপ প্রমাণ ভাব ভঙ্গি সবই একটি অপূর্ব একতা পাচ্ছে কি না এইটেই লক্ষ্য করবার বিষয় ছবিতে মূর্তিতে। হাড়ে-মাসে জড়িত দিব্য লাবণ্যযুক্ত শরীর—তার স্থানে আছে আর্ট, কিন্তু শুধু মাস শুধু হাড় বা কঙ্কাল রূপসৃষ্টির বেলাতে অদেয়। পৃথক ভাবটা ঘুচিয়ে না দিলে কিছু কিছু লবণ সংযোগ না করে উপায় নেই। পাখির পালকে প্রজাপতির ডানাতে কিংখাব মখমলের কাপড়ে যে লাবণ্য তা শুধু কোমল সুর দিয়ে তৈরি হয় না—শক্ত সোনার তার, শক্ত কাঁটা, আঁষ, বিচিত্র বিভিন্ন রকমের কত কী দিয়ে এই লাবণ্যের সৃষ্টি করে আর্টিস্ট তবে চোখে লাগে মনে ধরে রচনাটি। লাবণ্য-যোজনের কৌশল শেখা-বিদ্যের বাইরের জিনিস,

শিল্প-বিদ্যাপীঠে পাঁচ টাকা মাইনে দিয়ে ডিগ্রী নিয়ে সেটা দখল করা যায় না। ওটি আপনাতে রইল তো ফুটল, আপনার কাজে লাগল ছোঁয়াচ ওর, তবে সুন্দর হল নিজের ঘরের সাজ ও বাইরের সজ্জা।

সাদৃশ

একপাটি জুতো দু'পাটি জুতো, একটা ফুল দুটো ফুল, অমুক মানুষ, ঐ জানোয়ার— এই হিসেবে যতক্ষণ খালি রূপ চেনা চলেছে ততক্ষণ সাদৃশ্য উপমা ইত্যাদি ব্যাপারের কথাই উঠছে না। নিত্যকার দেখা, সাধারণ দেখা, কাজ-চলা হিসেবে দেখা—এর মধ্যে ভেবে দেখা ফলিয়ে বলা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কমিয়ে বাড়িয়ে বলার অবসরই নেই—যেটা যা তারই জ্ঞান এই পর্যন্ত হল। ভাবরাজত্বে যখন পৌঁছে গেল রূপ, তখন সাদৃশ্য উপমা ধরে রূপ পাল্টাপাল্টি ভাব পাল্টাপাল্টি চললো। ইংরেজিতে যাকে বলে Likeness বা একটার মতো আর একটা, তার দেখা পাই কৃষ্ণনগরের পুতুলে, পোট্রেট পেন্টিং-এ। একজোড়া কানের দুল হাতের বালা পায়ের নূপুর এ ওর সদৃশ, এবং অনুরূপ সাদৃশ্য। কিন্তু একটা সোনার ঝুম্‌কো সে গাছের ঝুম্‌কো ফুলের অনুরূপ না হয়েও ফুলের সদৃশ শোভা পেলে। এমনি আবার মুক্তার হার কি হীরার কণ্ঠীতে নানা বিসদৃশ জিনিস গাঁথা পড়ে হল একটা একটা ফুল কি ফুলের মালা, কিংবা আকাশের তারকাপুঞ্জের সদৃশ। মুক্তার দুল জানালে, রত্নের টুকরো জানালে—তারা কেউ ইন্দ্রধনুর থেকে ঝরে পড়া ফুলের রেণু, কেউ বা চোখের জল এমনি কত কী উপমা ও সাদৃশ্য মনে পড়ালে। অলঙ্কারশিল্পের মূলে হল সদৃশকরণের নানা কৌশল।

যখন আমরা দেখি ছবিটা এমন হল যে, ভ্রম হল ঠিক মানষটি দেখছি, তখনই বলে ফেলি—বাঃ চমৎকার সাদৃশ্য হয়েছে! আবার মানুষকেও দেখে বলি—বাঃ চেহারাটি যেন ছবিখানি!

"করিতেছি ছায়া দরশন
যেন কোন মায়ার রচন,
কাচেতে কনক কান্তি
চিত্ররূপে হয় ভ্রান্তি—
মোহিনী মূরতি বিমোহন।"

এখানে আসল মানুষকে যেমনি ভুল হচ্ছে ছবি বলে অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভুল ভেঙ্গেও যাচ্ছে। চোখের পলক ইত্যাদি দেখে নিজের ভুলটা কেবল মনে বিস্ময় ও সন্দেহ দিচ্ছে। এমনি ছবি্র বেলাতেও ছবিকে চকিতে মানুষ বলে ভ্রম হল, আবার চকিতে ভ্রম দূরও হল। এই ধরনের সদৃশকরণ নিশ্চয়ান্ত সন্দেহালঙ্কার বলে ভ্রান্তিম অলঙ্কারের কোঠায় রাখা চলল।

সদৃশ কাকে বলব, তার বেলায় পণ্ডিতেরা বললেন—"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদগতভূয়োধর্মবত্তম্।" আকারগত সাদৃশ্য বজায় রাখা না-রাখার স্বাধীনতা রইল কবির, কাজেই সহজে 'মুখচন্দ্র' এই উপমা দিয়ে বসলেন, এখানে চন্দ্রের গোলাকৃতি মুখের সঙ্গে মিলল কি না সে কথাই উঠল না—দুই বিভিন্ন বস্তুও সহজে মিলে গেল। এমনি বাঙলাতে এই শ্রেণীর আর একটি চমৎকার উপমা হল 'সোনামুখী'। এখানে চাঁদমুখের সঙ্গে চন্দ্রমণ্ডলের যে একটু বা যোগ তাও নেই—সম্পূর্ণ দুই বিভিন্ন বস্তু সোনা আর মুখ।

ছবি মূর্তি সবই গোড়া থেকে আকৃতির বাঁধনে ধরা; কাজেই চিত্রকরকে উপমা দেবার বেলায় অন্য পথ দেখাতে হয়েছে। আকৃতির মান এবং প্রকৃতির সম্মান দুই বজায় রেখে উপমা। হাতের উপমা হল হাতির শুঁড়, চোখের হল খঞ্জন, মাছ, পদ্মপলাশ কত কী। এর মধ্যে কতক উপমা ছবিতেও যেমন কবিতাতেও তেমন খেটে গেল। সঙ্গীতকলা পুরোপুরি সাদৃশ্য দেবার পথে সবার চেয়ে এগোল—বসন্তবাহার রাগিণী বীণাতে বাঁশিতে বাজলে, শুধু ভাবের দিক দিয়ে বসন্ত-শ্রীর সাদৃশ্য পেয়ে চলল সুর অথচ কোকিলের কুহুধ্বনি ইত্যাদির প্রতিধ্বনি একটুও দিলে না।

এই রূপভরা জগৎ এখানে সব কিছু যা দেখছি জলে স্থলে আকাশে তারা যেমন নিজ নিজ রূপটা দেখাচ্ছে তেমনি ভাবও জানাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে এবং নানা ভঙ্গি ও ভাবের দ্বারা এ ওর উপমা হয়ে নানা সাদৃশ্য লাভ করছে। সূর্যকে তো সূর্য বললেই যথেষ্ট এবং সূর্যকে সেই তার নিজ মূর্তিতে দেখেই কাজও চলে সত্য, কিন্তু ওই যে বর্ণন করলেন ‘জবাকুসুমসঙ্কাশং’ করে সূর্য—এতে করেই জানি যে, গ্রহাধিপতি একটি ফুলের সাদৃশ্য ও সাযুজ্য পেতে ব্যাকুল হয়ে কোনো এক কবিকে বেদনা জানিয়েছিল কোনো সময়ে। সাদা মেঘ শরতের হাওয়ায় ভেসে এল, —সে কি মেঘ বলেই দেখল নিজেকে? কবিতায় বলা হল ছবিতে লেখা হল—‘অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া’, এটার মানে এই যে এই সাদৃশ্য ধরে সত্যই দেখা দিলে মেঘ। কত কী রূপ, তারা বিচিত্রভাবে কখন কাকে কিসে সদৃশ হয়ে দেখা দেয়, তারই পরিচয় ছবির রূপে কবিতার রূপে গীতের রূপে ধরা দেয়।

অজন্তা গুহায় যারা অপ্সরার চিত্র লিখেছিল অপ্সরার কাঁধে দু'খানা করে ডানা বেঁধে দেবার দরকারই তারা বোধ করেনি, মেঘকেই তারা ডানা সদৃশ্য করে লিখে গেল! কী চমৎকার উপমা দিয়ে বললে তারা—মেঘ-পাখনা অপ্সরা! কবিতায় এ উপমা হয়তো এখনো চলেনি, কিন্তু চলবার বাধাও দেখিনে।

তাজবিবির রৌজা—পাথরে গাঁথা মস্ত একটা কবরের ঢাকন মাত্র, কিন্তু সেটি অনেক কিছু উপমা পেলে। ধর, আমরা কেউ উপমা দিলেম তাজের—যেন স্ফটিক পেয়ালায় বাদশাহী মদের শেষ গাঁজলা, কিংবা তাজমহলটি দেখাচ্ছে যেন চার-চারটে বাণবিদ্ধ মরুঞ্চে চাঁদের শ্বেত হরিণী কি বড়দিনের চিনিমোড়া কেক অথবা ময়রার দোকানের মুণ্ডি সন্দেশ। তবে অবশ্য সাদৃশ্য টানা হিসেবে এরূপভাবে নিজের নিজের মনোমতো উপমা দেওয়াতে বাধা দেবার কথা উঠতে পারে না, কিন্তু উপমার যোগ্যতা অযোগ্যতা নিয়ে তর্ক উঠবে সভাস্থলে। উত্তমাধম সব উপমাই যাচাই হয়ে তবে স্থান পাচ্ছে কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে। এই যাচাই হবার দুটো জায়গা—তার একটা হল রসিকের সভা আর একটা হল মহাকালের বিচারালয়। এই কারণে কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অলঙ্কার উপমা ও সাদৃশ্য দেবার ব্যবস্থা দিলেন পণ্ডিতেরা। প্রাচীন অনেক সাদৃশ্য ও উপমা কালে কালে কবিপ্রৌঢ়োক্তির ছাড়পত্র পেয়ে গেছে, তেমনি নতুন উপমাও অনেক সৃষ্টি হয়েছে যা শুরু থেকেই জানিয়ে দিচ্ছে যে কালে কালে চলবে তারা। দিল্লীর লাড্ডু ঘোড়ার ডিম এরা কেউ প্রাচীন উপমা নয়, কিন্তু সাদৃশ্য দেবার হিসেবে এমন দুটো আধুনিক উপমা আর চমৎকার উপমা নেই বললেও চলে ভাষায়। ‘গোমাতা’ অতি প্রাচীন সাদৃশ্য পৃথিবীকে বোঝাতে, কিন্তু গ্লোবকে গোরুর আকৃতি দেওয়া হল না, কিংবা এই প্রাচীন কবিপ্রৌঢ়োক্তি একে নিয়ে কাজ চলল না আর্টে, ও কেবল গো-রক্ষিণী সভার বিজ্ঞাপনে আর গো-ফল ব্রতে কাজ দিলে। মেলিন্‌স্ ফুডওয়ালার কাছেও গোমাতার সাদৃশ্য আদর পেতে চলল, কিন্তু আর্টিস্টের কাছে এই সাদৃশ্য আদর পেলে না, —নটরাজের পায়ের তলায় প্রলয়ের দিনে পৃথিবী টলমল করছে এটা একটা গোরু

দিয়ে বোঝাতে চলল না আর্টিস্ট, সহস্রদল পদ্মের সঙ্গে সাদৃশ্য দিয়ে বসল! বসুন্ধরা ব্রত করছে গাঁয়ের মেয়েরা। সেখানেও বসুমাতাকে গোমাতা সদৃশ্য করে আলপনা দিলে না, একটি পদ্মপাতায় একটি মাত্র জলবুদ্‌বুদ্ এরি সাদৃশ্য দিলে ব্রতচারিণী কুমারী শিল্পী।

বিয়ের বেলায় নানা দিকে উপযোগিতা নিয়ে কথা ওঠে; উপমা দেবার বেলাতেও তাই। সাদৃশ্যসূত্রে দুই বিভিন্ন এক হয়ে মিলতে চলল কি না তাই উঠল লাখো কথা। আর্টিস্ট হল ঘটক, সে উপমা উপমেয় দুয়ে মিলিয়ে দেওয়ার কাজ করে। নরগণে রাক্ষসগণে যে মিলতে বাধা এটা যেমন ঘটক জানে, তেমনি কোন রূপে কোন রূপে মিশতে বাধা নেই বা বাধা আছে তা জেনেই কাজ করে আর্টিস্ট। অনেক বস্তু সহজে এ ওর উপমা হয়ে উঠল দেখছি, অনেক বস্তু টেনেবুনে দড়া-দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে এক হতে চলল কোনো রকমে খুঁড়িয়ে, আবার অনেক বস্তু ভাবের বাঁধন পরলে কিন্তু রূপে রূপে সাদৃশ্যের বাঁধন মানতেই চাইলে না কিংবা হয়তো স্থান কাল পাত্র হিসেবে মিলল পাঁচপাঁচি রকমে। লুচির সঙ্গে চন্দ্রের উপমা বদরসিকতার চূড়ান্ত বলেই বলি, কিন্তু এরূপ সাদৃশ্য ছবিতে চলল কেননা আকাশে লুচি ধরে দিলেও ছবি চাঁদই বোঝাচ্ছে, স্থান কাল পাত্র হিসেবে এই বিশ্রী উপমাও কথায় কথায় বেশ একটু রসের সৃজন করেছে দেখা গেছে। আমার এক রসিক বন্ধু তিনি হলেন একাধারে ভোজনরসিক এবং কলারসিক দুই-ই। একবার মাঘী পূর্ণিমাতে বন্ধুটি কোনো এক অজ পাড়াগেঁয়ে বিয়ের ভোজে বসেছিলেন। পাতে লুচি ওধারে খোলা ছাদের উপরে পূর্ণচন্দ্র—বলে বসলেন, "এ যে দেখি এখানেও পূর্ণচন্দ্র, ওখানেও পূর্ণচন্দ্র।" স্থান কাল পাত্র বুঝে সেক্ষেত্রে লুচি ও চাঁদের উপমাটা উপযুক্ত হলেও ঐ ভোজের সভা ও হাসির কোঠাতেই মানাল। তা বৈরূপ দেবার দরকার হলে বেঢপ উপমা কাজে লাগে। গাল দু'খানা যেন পাঁউরুটি—এ একটা বিরূপ সাদৃশ্য দিলে, গোলাপফুলের মতো টুকটুকে গাল, আপেলের মতো গাল—ও সব সাদৃশ্য অপরূপ রূপসৃষ্টির সময়ে এবং কনে সাজানোর বেলায় বড় দরকারি হয়ে পড়ল। এমনি দেখি সহজ ও স্বাভাবিক উপমা তার সঙ্গে বিকট ও বেঢপ উপমা, দুই-ই কাজে আসছে আর্টিস্টের—কুলোকানি, মূলোদাঁতি এসব উপমা হাজির হল রাক্ষসী দানবী এমনি নানা বিরূপ চিত্র দেবার বেলায়। সুরূপ দেবার বেলাতেও এই ভাবের বিরূপ সাদৃশ্য খানিকটা কাজে লাগল, যেমন—বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু, হয়গ্রীব, সহস্রবাহু ইত্যাদি ইত্যাদি। রূপের আতিশয্য দিয়ে ভাবের বিরাটত্ব দেখানো চলতি ভাষাতেও চলল, যেমন—শখের প্রাণ গড়ের মাঠ, দিল দরিয়া। রূপগুণের অভাব বোঝাতেও এই রকমের আর এক প্রস্থ উপমা রয়েছে—ঠুঁটো-জগন্নাথ নড়েভোলা, এসব উপমা অকর্মণ্য, নড়তে চড়তে যার ভুল হয় —তাকে বোঝালে। সহজ কথায় সাদৃশ্য কাকে বলি যদি বলতে হয়তো বলব 'যেমন দেবা তেমনি দেবী' হওয়া চাই তবে মিলল ঠিক সাদৃশ্য।

সেই বৈদিক আমল থেকে এ পর্যন্ত উপমা ধরেই তাবৎ রূপসৃষ্টি হয়ে চলেছে, উপম হয়ে দেখা দেওয়া বিচিত্র রূপে ও ভাবে—এই হল নিয়ম, এই বিশ্বজগৎ এও একটা বিরাটরূপ সৃষ্টি যা ভাবের উপম হয়ে বিচিত্র হয়ে দেখা দিলে। মানুষের মন সেই বিশ্ব-রচয়িতাকেও উপমার মধ্যে দিয়ে দেখে নিয়ে বলে গেছে—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ" এটি হল রূপের দিক দিয়ে বিশ্ব-নিয়ন্তার সুন্দর উপমা। আবার ভাবটা কেমন জানবার বেলায় উপমাই কাজে এল—"রসো বৈ সঃ"। কাজেই দেখব, রূপ-রচনার বেলায় সাদৃশ্য উপমা ইত্যাদি কখনই বাদ দেওয়া চলে না। উত্তমের জন্য উত্তম উপমা অধমের জন্য অধম উপমা বড়র জন্য বড় উপমা ছোটর জন্য ছোট,—এই হচ্ছে নিয়ম। নিরুপম নিরুপমা দুটি নাম ঘরে ঘরে চলতি; কিন্তু এই দুইটি উপমা

নাম রূপেই রইল এবং কথা-সাহিত্যেও বদ্ধ থাকল বিশেষণের কোঠায়, যারা গড়বে আঁকবে তাদের কাজে এল না বড় একটা। উপমা দিতে অনন্তকেও টান দিলেন কবি, কেননা অনন্তকে গড়ে দেখাতে হল না এঁকে দেখাতে হল না তাঁর; কিন্তু যে বেচারা ছবি মূর্তি করে, এ সাদৃশ্য দেওয়া তার পক্ষে দুর্ঘট হল—বড় জোর অনন্তশয্যা পর্যন্ত পৌঁছল সে। কবিরা এইভাবে উপমা দেবার বেলায়, সুমেরু-শিখর তাও এনে বুকের উপর সহজে বসিয়ে দিলেন, কিন্তু মূর্তিকার দেখলে এরূপ উপমা দিলে তার গড়া মূর্তি পাথর চাপা পড়ে মারা যায়, কাজেই উপমা দেবার সময় সে কনক-কটোরা পর্যন্ত এগোল। রূপের বাধা মানতে হয় রূপকারকে, কাজেই উপমার সাদৃশ্য ইত্যাদির বেলায় এক গঙ্গাজল এক গষের মধ্যে ধরার কৌশল আবিষ্কার করে নিতে হয় বেচারাকে। এখন এই সদৃশকরণের নানা উপায়ের মধ্যে প্রধান উপায়গুলোর একটু হিসেব নিই।

একটা মোটামুটি বাইরের সাদৃশ্য মানুষে মানুষে মানুষে এবং বানরেও আছে, আবার এও দেখি নাক মুখ চোখের বিসদৃশ ভাব ও রূপ নিয়ে এতে ওতে ভিন্নতাও রয়েছে। কোনো বাঙ্গালী দেখতে হল যেন সাহেব, কেউ হল কালো কাফ্রী, যে আছে নাদুস নুদুস গণেশ ঠাকুর, বয়সে কিংবা ম্যালেরিয়ায় সে হয়ে গেল পোড়া-কাঠের সদৃশ। চাল-চলনের দিক দিয়েও রকম রকম সাদৃশ্য আর উপমার আবির্ভাব হচ্ছে দেখি; যেমন—অতিগজগামিনী কিংবা 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'! আঁকা মানুষটি হল দেখা মানুষের সদৃশ। এই রূপটা রইল প্রথম মহলে আকৃতিগত সাদৃশ্যের কোঠায়, তারপর হল ছবির মানুষটি বসে আছে যেন সিংহ কি গরুড় পক্ষী—এ হল ভাবভঙ্গিগত সাদৃশ্যের নমুনা। প্রথমে সাদৃশ্য—পুরোপুরি নকলের দ্বারা সম্পাদন করা চলল, দ্বিতীয় বারে সাদৃশ্য দেবার সময়ে মানুষের ভাবে আর ইতর জীবের ভাবভঙ্গিতে মেলানোর কথা উঠল।

এই দুই প্রকারের সাদৃশ্যতেই চিত্রকরের পূর্ব-দৃষ্ট রূপের জ্ঞানটি কাজ করছে। এতে করে ছবি কোথাও করে চলল দেখা মানুষের ভাবভঙ্গি নকল ও প্রতিকৃতি, কোথাও দেখা মানুষ দেখা জীবে ভাবভঙ্গি মিলিত হয়ে দিলে একটি ভাবের প্রতিকাশ। বুদ্ধের নিজের মূর্তিটা কেমন ছিল না দেখা থাকলেও এই দ্বিতীয় উপায়ে নানা লক্ষণাক্রান্ত নাক মুখ চোখের টানটোন দিয়ে পাথরের মূর্তিতে বুদ্ধত্বটুকু পরিষ্কার ধরে ফেলা চলল।

তাজবিবির রৌজা সেখানে সদৃশকরণের স্বতন্ত্র কৌশল ধরলে আর্টিস্ট, নারীভাব ফুটল সেখানে তাজবিবির ভৌতিক দেহভঙ্গি ইত্যাদি বাদ দিয়েও। এই হল উপমা দেবার বাহাদরির চরম নিদর্শন স্থাপত্যশিল্পে, এমনি নিদর্শন আরও আছে দেশে বিদেশে নানা শিল্পকলার মধ্যে। সেদিন একখানা তলোয়ার দেখলেম, সেটি গ্রিক ভিনাস মূর্তির মতোই সুন্দরী বোধ হল; আর্টিস্ট যর্থাথই অস্ত্রখানিকে বীরের বামারূপে গড়ে গেছে—তন্বী শ্যামা ঝকঝকে মূর্তিখানি। মন্দিরের চূড়াগুলো যদি ভাল করে দেখা যায় তবে পর্বতের সাদৃশ্য চমৎকার পাই তাতে,—কোনো গোপুরম্ দেবতা মানুষ পশু পক্ষী ইত্যাদি নিয়ে বিরাট যেন বিন্ধ্যাচলম্ কি সীমাচলম্, কোনোটা বা বরফ-ঢাকা পাহাড়ের মতো সাদাসিধে রূপখানি,—মন্দিরচূড়া কি প্রাসাদচূড়াকে পর্বতের সঙ্গে টেনেবুনে মিলিয়ে দেখতে হয় না, সহজেই দেখি আমরা। দৃশ্য বস্তুর মর্যাদা বুঝে যে উপমা দিতে পারে সেই হল সুকৌশলী। কবি কালিদাস উপমার ওস্তাদ ছিলেন, তাইতো বলে থাকি—'উপমা কালিদাসস্য'। এখন বলতে পারি, কালিদাস থেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপমা না দিয়ে কালিদাসকেই চিরকাল সব কবিই উপমা টানার বেলায় অনুসরণ করবে কেন? পুরাকালে নতুন নতুন উপমা সৃষ্টি করার স্বাধীনতা কালিদাসেরও ছিল, এখানকার মানুষদেরও আছে একালে, এটা সত্য কথা। কিন্তু এখানেও কবিপ্রৌঢ়োক্তির কাজ আছে, সীমা টানা চাই কবিতে অকবিতে উপমার দিক থেকে, অকবি শুধু নতুন এই জোরে তো যা-তা উপমা দিয়ে খালাস পেয়ে

যেতে পারে না। এই কারণে পণ্ডিতেরা বলেন যে, কিছু উপমা বা অলঙ্কার তা কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ হল তো চলল কাজ; কবির উক্তি পুরোনো কি নতুন একথা নয়। যে কবি নয় সে ফস করে যদি উপমা দেয় যে তাজমহলটি দেখেছি যেন মুণ্ডি সন্দেশ, কি তাজের গম্বুজটা যেন দেখাচ্ছে চার-চারটে বাণবিদ্ধ মরুঞ্চে চাঁদের শ্বেতহরিণীর নিটোল স্তনটি, তবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে যে সাদৃশ্যকরণের শিল্প তার কিছুই ঠিক থাকে না, এবং ভুল উপমা দোষদুষ্ট উপমা ক্লিষ্ট উপমা অপকৃষ্ট উপমা নির্ভুল উপমা উৎকৃষ্ট উপমা বেরসিকের উপমা সুরসিকের উপমা,—এসব কিছুর কোনো মূল্য থাকে না, কানাকড়িও মোলকড়ার সমান ধারাতে চলে।

একই রকম দেখতে বলেই যোড়শকলায় পূর্ণ চাঁদের সঙ্গে চাঁদা মাছের সাদৃশ্যও উপমা দিলে ভাল বলতে পারিনে। ভেকের মকমকী তাকে মনোমতো করে দিতে হলে যে সদৃশকরণের কৌশল ও রসজ্ঞান থাকা দরকার তা তো সবার থাকে না; কাজেই সোজা রাস্তা হচ্ছে মহাজনের অনুসরণ। বৈষ্ণব কবিতার ব্যাঙের ডাক কোকিলের ডাকের তুল্যমূল্য হল, সে কেবল কবির হাতে কলম ছিল বলেই—রসবিদ্ধ ও রসেতে প্রৌঢ় কবি! ঋগ্বেদের মণ্ডুকস্তোত্র, বৈষ্ণব কবির মত্ত দাদুরির সুর, ভারতচন্দ্রের বর্ষাবর্ণন, তিনেরই মধ্যে ব্যাঙ চমৎকার ভাবসাদৃশ্য পেয়ে বসেছে দেখি। বিরুদ্ধ রূপ দিয়ে যে উপমা ও সাদৃশ্য, তা থেকে উৎপত্তি হল বৈরূপকলার নানা আদর্শ;—যেমন হাতি ও মানুষে মিলে গণপতি, নাগনাগিনী কিন্নর কিন্নরী যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব ছেলেভুলোনো ছড়ার হিট্টিমাটিম পাখি শেয়াল রাজা মায় অতি আধুনিক কালে ব্যঙ্গচিত্রের নানা অবতার। এই বৈরূপ্য কথায় কথায় রোজ রোজ ব্যবহার করছি আমরা—যেমন, 'ছেলে নয় পিলে'। সঙ্গীতে হাসির গানের ইংরাজি বাংলা সুরের বিরুদ্ধতা ইত্যাদি এই বৈরূপ্য সৃষ্টির সহায়তা করছে। এক শ্রেণীর কবিতা এক শ্রেণীর ছবি এক শ্রেণীর গল্প এক শ্রেণীর গান—এ যেমন বৈরূপের ফলে হল, তেমনি বাড়িঘরের সাজসজ্জার এই বিরুদ্ধ রূপ এক হয়ে সাদৃশ্য পেলে। হ্যারিসন রোডের বাড়িগুলো নানা বিরোধী অলঙ্কারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নিদর্শন। ওকে দেখলেই বলব মাড়োয়ারি ঢং মাড়োয়ারিদের সাজসজ্জা; কিন্তু বিরুদ্ধ বেঢপ রকম মোটেই নয়। এই সাজের বৈরূপ্য সৃজনে বাঙালী আমরা ঢের পাকা—বিলিতি দেশীতে, খদ্দরে কাশ্মীরে, পঞ্চনদে পঞ্চাননতলায় অদ্ভুত রকমের খিচুড়ি পাকিয়ে বিরূপ সাদৃশ্য রচনা করতে পাকা। এমনটি বাঙলা ছাড়া কোথাও মিলবে না, এ বিষয়ে নিরুপম-নিরুপমার কোঠাতে পড়ে গেছি আমরা। গণেশ হলেন বিশ্বের দেবতা। আকারে অমিল নিয়েই তাঁর সৃষ্টি করলে আর্টিস্ট। এও হতে পারে যে, প্রথমে আর্টিস্ট গণেশকে নরমুণ্ড দিয়েই গড়েছিল, হঠাৎ বিঘ্ন পড়ল কিছু একটা, অমনি তাড়াতাড়ি হাতির সাদৃশ্য দিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে বিঘ্ন-বিনাশন দেবতার সৃষ্টি করে পূজার জন্য প্রস্তুত হল আর্টিস্ট—বিঘ্নকে বিঘ্নবিনাশন করে তোলা হল চরম কৌশল বিরুদ্ধ উপমা দিয়ে চলার, বিভিন্ন রূপে ঠোকাঠুকি লেগে রসভোগের বিঘ্ন না জন্মায় এই চেষ্টা।

পরীতে আর মানুষের ঘরে সুন্দরী মেয়েতে বিরোধ বাধল ডানা নিয়ে, এরি মীমাংসা হয়ে সৃষ্টি হল সুন্দর অবিরোধী উপমা বাঙলায়—'ডানা-কাটা পরী'। কার্তিক ঠাকুরে আর ঘরের ছেলেতে বিরোধ বাধল ময়ূরটাকে নিয়ে, যেমনি ময়ূর পালাল তাড়া খেয়ে অমনি উপমা এল এগিয়ে 'ময়ূর ছাড়া নব-কার্তিক'। খিড়কি পুকুরের পদ্মফুল আর মানস-কমল দুয়ের মধ্যে নানা দিক দিয়ে বিরোধ মিটে গেল, তবে এল আর্টের কাজ।

আকারে আকারে ঠোকাঠুকি বিরোধ হল স্বাভাবিক। তারা বরাবরই বলে চলেছে আমি ও থেকে স্বতন্ত্র। ভাব তা বলে না, সে বিরোধ মিটিয়ে ভাবই করতে চলে। ভাব এসে আকৃতির বিরোধ যখন ভঙ্গ করে তখন রূপ এক-একটা ভঙ্গি পেয়ে সদৃশ হয়ে ওঠে অন্য একটা রূপের। ভাবুকের চোখে নায়িকা চলেছে দেখছি

'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'। অথচ সাদা চোখে ঠেকল লতা সে লতা, মানুষটি মানুষ। যতক্ষণ কাজের জগতে আছি। ততক্ষণ এটা ওটা দেখছি এটা ওটাই, কিন্তু যেমনই ভাব উদয় অমনি—এ যেন ওর মতো ও যেন এর মতো এইরূপ দেখা শুরু হল।

অবস্থাভেদে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন সাদৃশ্য পেয়ে যায়; একই অগ্নি হোমকুণ্ডে একভাবে দেখা দিলে, রান্নাঘরে অন্যভাবে, দীপদানে অন্য সাদৃশ্য পেয়ে। ঋষিরা যেভাবে অগ্নিদেবের নানা উপমা ও সাদৃশ্য দিয়ে একটা রূপ খাড়া করলেন, তাকে উনুনের আগুন চিতার আগুন কি সন্ন্যাসীর ধুনির আগুনের সদৃশ বলে বলাই চলল না, ক্রিয়াভেদে স্থান কাল পাত্র ভেদে অগ্নি নানা জিনিসের নানা ভাবের সদৃশ হয়ে উঠল দেখি। একটি ইংরেজি গল্পে এই অবস্থাভেদে সাদৃশ্যভেদের একটি বর্ণন পেলেম, যেমন—

"Kristin sat and watched (the fire); it seemed to her the fire was glad that it was out, there (in the open fields) and free, and could play and frisk. It was otherwise than when, at home, it sat upon the hearth and must work at cooking food and giving light to the folks in the room."

SIGRID UNDSET: *The Garland*

একই আগুন অথচ যখন মাঠের মধ্যে জ্বলল তখন তাকে দেখাল যেন চঞ্চল স্ফূর্তিবাজ একটি শিশু ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে, যখন উনুনে কি প্রদীপে হল ধরা তখন সে যেন কর্মরতা গৃহিণী। ঊষা দেবতাকে ঋষিরা জোর করে টেনেবুনে ঘরের মেয়েটি বলে বর্ণনা করে গেলেন তো উষা নিশ্চয় ঐ মেয়েটির সাদৃশ্য ধরে রোজই আসত তাঁদের কাছে। কাজেই বলি সাদৃশ্য উপমা এসবই একটা একটা মনগড়া কিছু নয়, রূপ সমস্ত আপনা হতেই ভাবুককে দেখা দেয়—এ ওর সদৃশ এবং উপম হয়ে।

অলঙ্কারশাস্ত্রে ভ্রান্তিম অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে। এই ভ্রান্তি দিতে হলে আসলের অভ্রান্ত নকল দিতে হয়। সোনা আর মিনাকারি দিয়ে এমন অভ্রান্ত আকৃতি দিলে স্বর্ণকার সোনার প্রজাপতিকে যে ভুল হল আসল বলে; এটা খুব কৌশলের পরিচয় দিলে, কিন্তু শিল্পীর শিল্পজ্ঞানের খুব বড় পরিচয় দিলে না এ ভাবের সদৃশকরণ। ঢাকা ও কটকের ভাল কারিগর সোনার তারে যখন চমৎকার প্রজাপতি ফুল খোঁপার জন্য গড়লে তখন তাকে বাহবা দিতেই হল ওস্তাদ বলে। ইন্দ্রপ্রস্থের স্ফটিকের দেওয়াল ভ্রান্তি দিয়েছিল দুর্যোধনকে, দেওয়ালকে দ্বার বলে জেনেছিল বেচারা—

> "স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন।
> দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্যোধন॥
> ললাটে প্রাচীর লাগি পড়িল ভূতলে।
> হেরিয়া হাসিল পুন সভাস্থ সকলে॥"

এই হল নিম্ন শ্রেণীর ভ্রান্তিমৎ সাদৃশ্যের উদাহরণ। এ শুধু বরঠকানো খাবারের জিনিসের মতো জিনিস দিয়ে ক্ষান্ত হল, ঠিক ঐ মিনেকরা প্রজাপতি যা করলে তাই।

আবার আর এক রকমের সাদৃশ্য, সেও অন্য রকমে ভ্রান্তি দিলে; কিন্তু প্রতারণা করলে না দর্শককে, যেমন —

> "রথ-চুড়া পরে শোভিল পতাকা

অচঞ্চল যেন বিদ্যুতের রেখা।"

যেমন সবুজ মখমলের মসনদ মনে পড়ালে তৃণভূমি, সেখানে প্রতারণা নেই, কিন্তু মাটির আম সে নিছক ভ্রান্তিই জন্মালে রসালো আমের—চিবোতে গিয়ে দাঁত পড়ল। প্রতারণা কৌতুক ইত্যাদি নানা ব্যাপার কাজ করলে সে রকম সাদৃশ্য দেবার বেলায়।

এখন দেখি যে বহুরূপী যে ভাবের সাদৃশ্য দিলে তাকে ভানের কৌশল বলা গেল— মানুষ দিলে বাঘের চেহারার এবং হাঁক-ডাকের এমন নকল যে হঠাৎ ডরিয়ে উঠল সবাই। কোকিল-ডাক এমন ডেকে চলল কলের পাখি যে, বনের কোকিলও মুগ্ধ হয়ে পালটা জবাব দিয়ে গেল। এই ভাবের সদৃশকরণ আর্টের জগতে অনুকরণ এবং সচকিত করণ,—এই দুটো পথ ধরে দিয়ে গেল ঠকাঠকি ব্যাপার। এর সম্পূর্ণ উল্টো রাস্তায় গেল সঙ্গীতকলা। শব্দ সেখানে কোকিল ডাকলে না কিন্তু সুর সমস্ত বসন্তবাহার দিয়ে ফুল ফুটিয়ে চলল হাওয়া বইয়ে চলল। উচ্চ স্তরের আর্টে এই ভাবের সত্য-সাদৃশ্য দেবার চেষ্টাই হয়েছে, ভ্রান্তি জাগানো সাদৃশ্য নিম্নস্তরে পড়ে রয়েছে আজও।

আর্ট যতই নিম্নস্তরে নামতে থাকে ততই বহুরূপীর হরবোলার কৌশলের দিকে ঝুঁকতে থাকে। তখন থিয়েটারে দৃশ্যপট হয়ে ওঠে একেবারে ঠিকঠাক—রাস্তা বাড়ি ঘর দুয়োর সব ঠিক, ঠিক মেঘ ডাকে, ঠিক বজ্রপাত হয়।

"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্মবত্তম্"— রূপের ধর্ম এক ভাবের, ধর্মরসের ধর্ম সে আর এক, সদৃশকরণ কখনো রূপের ধর্মকে কখনো রসের ও ভাবের ধর্মকে ধরে ধরে চলেছে দেখব।

আগুনের ধর্ম আর পুষ্পমঞ্জরীর ধর্ম এক বলে স্বীকার করা চলল না—এ দেয় জ্বালা ও দেয় মোহনমালা; কিন্তু আর্টিস্টের হাতে পড়ে এরা চমৎকার একটি ফুলঝুরির রচনা করলে যাকে ফুলও বলা চলল আগুনও বলা চলল। আসল পাখি ওড়ে, লোহার চাদর ঝুপ করে পড়ে; দুই বস্তুর দুই ধর্ম, কিন্তু আর্টিস্টের হাতে সাদৃশ্যের কৌশলে লোহার চাদর-মোড়া পাখনা মেলিয়ে উড়ো কলটা ঠিক পাখির সাদৃশ্য ধরে উড়ে চলল শূন্যভরে। দুই বিভিন্ন বস্তু মিলল এক হয়ে সাদৃশ্য দেবার কৌশলে, কখনো ভাবে ভাবে মিলল কখনো রূপে রূপে মিলল। এই সদৃশকরণের কৌশল দিয়ে মানুষ দেবতাও সৃষ্টি করেছে রাক্ষসও সৃষ্টি করেছে, সুন্দর নিরুপম রূপ ও রস রচনা করেছে। এই কৌশল-প্রয়োগের জ্ঞান যার নেই সেই মূর্খ অসুন্দর পদার্থের স্তূপ রচনা করে মাত্র।

অসাদৃশ্যমূলক ভ্রান্তির কথা পণ্ডিতেরা বলেছেন, না থেকেও আছে—এই প্রকারের সাদৃশ্য আর্টের একটা বড় দিক। বৈষ্ণবগ্রন্থে ঝড়িঝুড়ি উদাহরণ পাই যেমন—

"মহাপ্রভুর বিয়োগ মঙ্গল হয় মোর,
যেখানে যেখানে যাই প্রভুরে দেখিতে পাই
প্রেমরসে হইয়া বিভোর।"

ঐ যে বললেন কবি—

"সর্বদাই হু হু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন।"

থেকেও নেই কিছুই এই রকমটা ছবি দিয়ে প্রকাশ করা কঠিন। সাদা কাগজ দিয়ে তো নিশ্চিন্ত হতে পারিনে, কাজেই যে লোকটি বিশ্বটাকে মরু বলে দেখছে, হয় তার দৃষ্টির শূন্যতা দিয়ে নয়তো সে যে দিকটাতে দেখছে

সেই দিকের উদাস উদার মাঠখানা দিয়ে কোনো রকমে ব্যাপারটা বোঝাতে হল চিত্রে।

ধৌত বিঘট্টিত লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই চার অবস্থা হল চিত্রের। লাঞ্ছিত অবস্থা সাদৃশ্যে—ছবি রূপের ও ভাবের। এই যে সাদৃশ্য সেও আবার তিনটে আলাদা ধারা ধরে তিন শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেল দেখি।

প্রথম, ঘটনামূলক সাদৃশ্য—নিছক প্রতিরূপ পেলেম সেটি দিয়ে। বন গাছ আকাশ জল পর্বত ঘর বাড়ি শহর গ্রাম; বাজার বসেছে, লড়াই হচ্ছে, গরু লাফাচ্ছে, ঘোড়া দৌড়চ্ছে, ছেলে খেলছে, নৌকো চলেছে ইত্যাদি স্থানচিত্র ও দৈনিক ঘটনাবলীর ছবি; পোর্ট্রেট্ পেন্টিং পর্যন্ত এসে গেল। ঘটনা-সাদৃশ্যে দৃষ্টরূপ প্রধান স্থান পেল।

এর পর এল কল্পনামূলক সাদৃশ্য। এটি দিয়ে মনঃকল্পিত যা কিছু অবতারণা করা চলল। এখানে আর দেখা রূপের সীমা মেনে চলতে হল না। দেখা গাছ হল এখানে কল্পবৃক্ষ, ছাতা ছৈ ছতরী কত কী, এখানে দেখা রূপে না-দেখা রূপে বা কল্পিত রূপে মেলামেশাননার অবসর হল এবং তার ফলে নানা অদ্ভুত রূপ-সৃষ্টির দেখা পেলেম।

এর চেয়ে উচ্চ স্তরে উঠে পেলেম আর্টের মধ্যে ভাবনামূলক সাদৃশ্য। যা অন্তর্নিহিত ছিল, গোপনে ছিল, তা বাইরে প্রকাশিত হল অপূর্ব কৌশলে। এক্ষেত্রে রূপ ও কল্পনা দুই-ই ভাবব্যঞ্জনার কাজে লাগল, এবং ভাব ও বসই এখানে প্রাধান্য পেলে দৃষ্ট এবং কল্পিত দুয়ের উপরে।

শীতের সকালে একটা ভাবনা বিশ্ব জুড়ে আছে; বর্ষার দিনে আর একটা ভাবনা। এমনি ক্ষণে ক্ষণে কালে কালে একই দৃশ্য নানা ভাবনায় বিভাবিত হয়ে উঠছে দেখা যাচ্ছে। ছবিতে গাছ লিখি মানষ লিখি বা জন্তুই লিখি ভাবনাটি তার দ্বারা নিরূপিত হল যেমনি তেমনি ভাবনা-সাদৃশ্য পেলে হাতের কাজ আর্টিস্টের। নানা উপমা নানা সাদৃশ্য সূত্রে বাঁধা সমস্ত রূপ—এটা পাথর এটা গাছ ঐ মেঘ ওটি চাঁদ উনি সূর্য ওরা তারা, কেবলই এই পার্থক্য এবং ভিন্নতা নিয়েই তো বর্তে নেই বস্তুরূপ সমস্ত, ভাবের আদান-প্রদানবশত এতে ওতে গলাগলি মিলছে তারা—এ হচ্ছে ওর মতো ও হচ্ছে এর মতো; এ-যেন সাজঘরের নটনটী সবাই অফুরন্ত একটা লীলার অন্তর্গত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে ছাঁদ বদলে দেখা দিচ্ছে। উদয়বেলার সূর্য কী সাজেই সেজে দাঁড়াল প্রভাতে,—মনে হল যেন সদ্যফোটা এতটুকু একটি রক্তজবা। এই দেখেই উপমা দিলেন ঋষি—'জবাকুসুমসঙ্কাশং'। হিমগিরি সে মহেশ্বরের অট্টহাস্যের স্বরমূর্তিতে দেখা দিলে কবিকে, আকাশের তারা মাটির প্রদীপের মতো দেখাল, মাটির প্রদীপ দেখাল যেন অনিমিখ তারাগুলি,—এমনিই চলেছে কাজ রূপজগতে। জগৎ-সংসার জুড়ে সাদৃশ্যের যে সহজ নিয়ম কাজ করছে সেই নিয়মই স্বীকার করলে আর্টিস্টের রচনা 'তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্মবত্তম্'' জগতে কোথাও একটা সূর্যের অনুরূপ আর একটা সূর্য এমনতর ঘটনা হল না, একটা গাছের অনুরূপ আর একটা গাছ ও হল না, একটি মানুষের অনুরূপ আর একটি মানুষ এও হল না, কিন্তু দুখানি ডানা, ফুলের দুটি পাপড়ি, গাছের দুটি পাতা, চোখের দুটি তারা এ ওর অনুরূপ হল দেখি, তবুও সেখানে দুজনে সমান আসন পেলে না— এ রইল দক্ষিণে ও রইল বামে, একের অভিমুখী আর এক এই নিয়ে চলল কাজ বিশ্বরচনার।

যেমনটি গড়েছেন বিধাতা তেমনটি গড়তে চাইলে না মানুষ, দেখতেও চাইলে না মানুষ, এর প্রমাণ ইতিহাসের আদিমতম যুগের মানুষের রচনা থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। নিজের গায়ের চামড়া তাকে চামড়া বলে দেখেই তার আনন্দ হল না, উল্কির অলকা-তিলকা সাজনের সুচিত্রিত সাদৃশ্য দিয়ে সে জানাতে চলল কিসের

সদৃশ হতে চায় সে; কেবলমাত্র নর সে নারী সে এটুকু জ্ঞানেই তার আনন্দ হল না। প্রমাণ করতে চলল মানুষ ধর্মেকর্মে সাজেগোজে—হয় সে নরদেব নয় নরশার্দুল, নয়তো সীতা সাবিত্রী সুকুমারী নিরুপমা রাজমহিষী। কত কী বিশেষণ ও উপমা ধরে কত কী যে সৃষ্টি হল তার সংখ্যা নেই।

বর্ণিকাভঙ্গম

রঙে আর রূপে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রূপ যেখানে রং সেখানে, রং যেখানে রূপ সেখানে, এই হল স্বভাবের নিয়ম।

এক রঙা রূপ, পাঁচ রঙা রূপ এ রয়েছে, বদ-রং রূপ তাও আছে; কিন্তু রং ছাড়া রূপ তা কোথায়? রূপ ছাড়া রং তাও নেই! কচি পান পাকা পান শুকনো পান তিন অবস্থাতেই রূপ ও রং নিয়ে বর্তে আছে। নতুন পাতার অরুণিমা সবুজ থেকে ক্রমে শুকনো পাতার গেরুয়াতে গিয়ে পৌঁছোয়। পাতার রূপেরও অদল বদল হয়ে চলেছে কালে কালে। রূপে রঙে কোথায়ও বিচ্ছেদ নেই।

বিশ্বজগতে রচনার কাজ এই নিয়মেই চলেছে দেখি, মানুষের শিল্প রচনাতেও এই নিয়ম বলবৎ। খাতার সাদা পাতা সেটা খানিক সাদা রং মাত্র নয়, চতুষ্কোণ একটা রূপও আছে তার। কাগজের উপরে কালো পেন্সিলে ছবি দাগলেম—সাদা রং কালো রং, দুই রঙের মিলনে তবে রূপটি ফুটল। এমন কালো সেলেটে সাদা রূপ, নানা বর্ণের কাগজে নানা বর্ণ দিয়ে দাগা রূপ, এই হল ছবির পত্তন। লালে নীলে কালোয় সাদায় হলুদে মিলিয়ে নিছক রঙের কাজ করলেম রূপ না ফুটিয়ে, এমনটি হবার যো নেই একেবারেই। পাঁচ রঙের হিজিবিজি সেও পাঁচ রঙা একটা রূপ। আকাশ আর সমুদ্রের নীল রং কতকটা রূপ ছাড়া রঙের আভাস দিলেও ভাবরূপ দিয়ে পুরোপুরি ভর্তি, মরুভূমি—সেখানে রূপ রং ছাড়াছাড়ি ভাবে নেই। আকাশের নীল রূপের ভাবনা দিয়ে ভরা, সমুদ্রের জলে ও ধূ ধূ বালুচরেও এই রূপ ভর্তি রং। একটা চিত্র করি যদি মরুভূমির, তবে মরুভূমির রূপ এবং রং দুটোকেই টানতে হয়। মরুভূমির পারে আকাশের নীল এইটুকু দুই বর্ণের বিভিন্নতা দিয়ে ছবিতে বোঝাতে চললেম,—আকাশ থাকে উপরে মাটি থাকে নীচে, অতএব কাগজের উপরটা রঙালেম নীল আর নীচেটা করলেম বেলে রং। শুধু এইটুকু কাজ করে দিয়ে ছবিটাকে মরুপারের নীল মরীচিকাতে পরিণত করা চলল না, রঙের সঙ্গে রূপকে এনে মেলাতে হল তবে ধরল কাগজের একটা অংশ মরুরূপ অন্যভাগ আকাশরূপ, এবং দুয়ে মিলে দৃশ্যটা পরিপাটী রূপে বর্ণিত হল।

সুতরাং ছবির কোনখানে কি রং দেব সেটা যেমন ভাববার কথা, কোন রং কি কি ভাবে ফলাবো তাও জানা দরকার। আকাশ সমুদ্র ভাবরূপ দিয়ে ফলানো রং, ভাবরূপ চোখে দেখা যায় না কিন্তু রঙের রূপক দিয়ে ধরা থাকে জলে স্থলে আকাশে; চিত্র করার কৌশলই হচ্ছে এই ভাবরূপে গোলা রং সমস্তকে আয়ত্ত করা। নীল লাল ইত্যাদি রং এমনি লাগালেই হল না—জলের বেলায় পানসে-নীল, আকাশের বেলায় হাওয়াই-নীল, বালির জায়গায় বেলে রং, সন্ধ্যার আকাশে আকাশী-পাটল না দিলে রঙের কাজে ভুল রয়ে যায়, কাজেই চিত্র যড়ঙ্গের গোড়া যেমন আরম্ভ হল রূপের ভেদ ও ভাবভঙ্গি নিয়ে, তেমন সুড়ঙ্গের শেষ রইল শুদ্ধ বর্ণ মিশ্র বর্ণ সমস্ত নানা ভেদ ও ভঙ্গ নিয়ে।

সচরাচর আমরা আকাশটি নীল বলে থাকি, কিন্তু এইটুকু জ্ঞান নিয়ে বর্ণিকের কাজ চলে না। আকাশ পলকে পলকে রং ফিরিয়ে চলেছে, গেরুয়া ধূসর সাদা সবুজ হলুদ কালো কত কী। রাতের আকাশ দিনের আকাশ একটাও যে অবিমিশ্র নীল নয় তা ছবি আঁকতে গেলেই ধরা পড়ে। ইউনিয়ন জেক্ পতাকা কি স্বদেশী-পতাকা তার রং অবিমিশ্র নীল সবুজ সাদা লাল ইত্যাদি দিয়ে বাঁধা; রঙের বাক্সর রংও কতকটা অবিমিশ্র ভাবে সাজানো থাকে, কিন্তু ছবির পটে এসে মেলামেশা শুরু হয়—রঙে-রঙে রূপে-রঙে, বিশ্ব রচনাতে এই নিয়ম, মানুষের রচনাতেও এই নিয়মের বাঁধাবাঁধি—অমিশ্র রং ক্বচিৎ, মিশ্র রংই প্রচুর প্রয়োগ হচ্ছে।

রূপের বিভিন্নতার কথা পূর্বে বলে চুকেছি, এখন রঙের বিভেদগুলো একটু পরিষ্কার করে ধরার চেষ্টা করি। প্রথমত দেখি অমিশ্র ও মিশ্র এই দুই ভেদ, তারপর চিক্কণ ও রুক্ষ এই দুই ভেদ; মোটামুটি এই চার বিভাগে সব রংকেই রাখা চলল। অমিশ্র রং সে বাঁধা রং, মিশ্রণের দ্বারায় তার মুক্তি। খড়ির বাঁধা সাদা তার সঙ্গে মিশল একটুখানি পীত একটু লাল একটু নীল, তবে হল দন্তধবল বা দাঁতি-সাদা; এমনি অন্যান্য রঙের মিশ্রণে খল্লি-সাদা হল পাথুরে পানসে আবোর ফেনি এবং কত কী সাদা তার ঠিকঠিকানা নেই। শিউলি-সাদা আর শঙ্খ-সাদা একই সাদা নয়। মিশিকালো মোষেকালো নিকষ কালো চিকন কালো আলাদা আলাদ রং আলাদা আলাদা রূপ।

মিশ্রণের দ্বারায় এক বর্ণের বহুল বিস্তার ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করাই হল নিয়ম। দপ্তরীর টানা কালো রেখার একটা রূপ আছে বটে, কিন্তু ছবিতে শ্যামল রং দিয়ে যে দিগন্ত রেখাটি টানা গেল তার সঙ্গে খাতার টানা রেখার অনেক প্রভেদ। অলঙ্কারশিল্প— সেখানে নানা বর্ণের মণিমুক্তা সোনা রূপার একত্রীকরণ দিয়ে একটা রূপ গড়া হয়; ফুলের মালাতেও এই কৌশল; আলপনা ও কাশ্মেরী শাল সেখানেও এবং ইউরোপে মোজেইক চিত্রেও এই প্রথার প্রচলন দেখি। কাজেই ধরে নিতে পারি যে অলঙ্কারকলায় অমিশ্র বর্ণ সমস্তকে ভিন্নতা এবং অভিন্নতা দেওয়াই হল কৌশল, বহুরঙের বহুরূপ। প্রজাপতির ডানা নানা অমিশ্র রঙের আলপনা দিয়ে সাজানো, অপরাজিতার পাপড়িতে নীল আর সাদা দুই রং পাশাপাশি, আবার আকাশের ইন্দ্রধনু—সেখানে এক রং আর এক রঙে ঢলে পড়ে চমৎকার ভাবে মিলতে চলল!

দিনের আলো পাতার সবুজে ঘটালে বিকার—মাঠের ঘাস, রোদে-দেখানো সোনালি গাছের পাতা আলো অন্ধকারে নিজের রং হারিয়ে পেলে অপরূপ শ্যামবর্ণ যা আঁকতে গিয়ে কতবার হারতে হল কত আর্টিস্টকে! রাতের অন্ধকার যে বর্ণবিকার ঘটালে তা আরও সুস্পষ্ট—সবুজ হল কালো, হিমাচলে দিনের কুয়াশা সে সাদার পোঁচ দিয়ে কালো করে দিলে গাছের সবুজ রং! প্রথম দর্শনে দূরের পাহাড়কে মেঘ বলে কে না ভুল করেছে?—কবি কালিদাস অনেকবার মেঘকে গিরিচূড়া করে দেখেছেন, আর আমার জানত একটা বুড়ি সে প্রথম সমুদ্র দেখে সেটাকে জগন্নাথের মন্দিরের প্রাচীর বলে ভুল করে বসেছিল!

কাজেই রঙের একটা কাজ হল ভ্রান্তি জাগানো এও বলতে পারি। আবার এও বলতে পারি যে সঠিক রূপকে সম্পূর্ণ করে দেখানো সেও রঙের কাজ। ধর, পটে একটা ঘটের রূপটুকু মাত্র দাগা গেল পেন্‌সিলে, কিন্তু রংটুকু রইল বাদ—বস্তুটা পাথরের কি মাটির কি সোনা-রূপোর পিতল কাঁসার কিছুই বোঝা গেল না, চিকন কর্কশ ইত্যাদি রং দিতে হল তবে ধাতে এল রূপটা। আকাশের মেঘমণ্ডল জলভরা না জলঝরা শুধু মেঘের রূপটা লিখে কিছুতেই বোঝানো চলল না, প্রতিকৃতি-চিত্রণে গায়ের চোগা চাপকান সব ঠিকঠাক

পেন্‌সিলে দেগে চিত্রটা সম্পূর্ণ হল বলতে পারলেম না—সুতোর কাপড়, না সিল্কের কাপড়, না মখমল, এসব রং দিয়ে দেখিয়ে তবে নক্‌সা সম্পূর্ণ করতে হল।

সূর্যরশ্মি নানা ধাতের নানা বস্তুর রং কালো আর সাদায় বিভক্ত করে ফটোগ্রাফের কাগজের উপরে এমন চমৎকার করে ধরে দেয় যে সেখানে কালো সাদার ছন্দেই পাটের কাপড় সুতোর কাপড় বনাত মখমল চামড়া এ সবের তারতম্য সহজে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। একখানা ভাল 'ড্রয়িং তাতেও রামধনুকের সাত রং কালো সাদার ভাষায় তর্জমা হয়ে আসে, জল মেঘ পর্বত সবই সেখানে নানা নানা ছাঁদের কালো সাদা অর্থাৎ রঙিন কালো সাদা। আর্টিস্টের হাতের পেন কি পেন্‌সিল এইভাবে কালো সাদার ভাষায় রঙের নানা সুরের আভাসগুলি লেখাতে রেখে যায় তবেই না করি ড্রয়িংয়ের আদর!

কবিতার বই কালো সাদায় ছাপা হয়ে হয়ে বাজারে এল। সাদা কাগজে ছাপা অক্ষর ও বর্ণমালা নিছক সাদা আর কালো লাইনবন্দি করে সাজানো; এরি ফাঁকে ফাঁকে কবি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে রঙকে পেয়ে গেলেন। শরতের নীল, কাশ ফুলের সাদা, মেঘের শ্যাম, রৌদ্রের পাটল কিছুই বাদ গেল না, কেননা কবি রং দিয়ে কথা বলে গেলেন, শুধু খবরওয়ালার মতো খবরটার বিজ্ঞাপন সাদায় কালোয় দিয়ে চললেন না।

কবিতা লিখেই কিছু বলি, আর ছবি দিয়েই বা কিছু জানাতে চলি বর্ণা ছাড়া গতি নেই; নিছক রূপ নিয়ে রচক মানুষ কোথায় কারবার করলে তার উদারহণ হল— বিজ্ঞানের বই এবং তার পাতায় পাতায় নানা নক্‌স্যাগুলো, অঙ্কশাস্ত্রের পাতার ন-কড়া ছ-কড়া টানগুলো। কিন্তু মানুষ যেখানে রস দিয়ে কিছু বলতে গেল সেইখানেই রূপের সঙ্গে রংও এসে পড়ল।

নানা বর্ণ দিয়ে একটা রূপ ফোটাতে নিপুণ ছিলেন মহাকবি বাণভট্ট। রঙের প্রচুর ব্যবহার 'কাদম্বরী কথায়' যেমন দেখা যায় এমন আর কোথাও নেই। মহাশ্বেতার রূপ বর্ণন করলেন কবি। মহাশ্বেতা নামটাই যথেষ্ট বর্ণনা হতে পারত কিন্তু কবি সুনিপুণভাবে হাজারো রকমের সাদা রঙের অবতারণ করে বসলেন এক মহাশ্বেতাকে দেখাতে—সাদা রঙের ঝাঁক উড়ল যেন শ্বেত পদ্মের চারিদিকে, শ্বেত অলঙ্কারের ঝঙ্কারে বাঁধা শুভ্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠল মহাশ্বেতা। এমনি সন্ধ্যারাগটুকু পাতার পর পাতা রঙের হিসেবে বাঁধলেন কবি দেখতে পাই—"অস্তমুপগতে চ ভগবতি সহস্রদীধিতাবপরার্ণবতটাদুল্লসন্তী বিমলতেব পাটলা সন্ধ্যা সমদৃশ্যত"।[১] এমনি সকালেরও রাগবর্ণন শুরু হল দেখি— "একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলকমলিনীমধুরক্তপক্ষসম্পুটে বৃদ্ধহংস ইব, মন্দাকিনীপুলিনা পরুজলনিধিতলমবরতি চন্দ্রমসি"[২] ইত্যাদি ইত্যাদি কত রং, কত রঙের রকম। তার ঠিকানা নেই।

সুচীভ্যেদ অন্ধকার, এ বললে শক্ত রংটা স্পষ্ট হল, কোমল শ্যামল অন্ধকার এ অন্য কালোর কথা বলে চলল। এমনি নানা ধাতে রং কালো সাদা ইত্যাদি দিয়ে রচনা সম্পূর্ণ হতে চলে।

রাজনীতি উপদেশ করলেন বিষ্ণুশর্মা, —এখানকার টেক্‌স্ট বুকের মতো বেরঙা সাদা কালোয় লিখলে না উপদেশ—'চিত্রকর্ণ' পক্ষিরাজ 'মেঘবর্ণ' দূত পাখি এরা সব এসে গেল ঝাঁকে ঝাঁকে। পোলিটিকাল সায়ান্স রঙিন হয়ে এল রাজপুত্রদের সামনে!

একটা কথাই রয়েছে রঙ্গ-রস, রং হল তো রস হল জানলেম। সরস সুরঙ্গ রূপ রূপকারের কাছ থেকে পাই; রূপ রং একত্রে মিলিয়ে পাই সমস্ত রূপ রচনাতে; বিচ্ছিন্নভাবে রূপ বিচ্ছিন্নভাবে রং আর্টের কাজে আসে না। দু'-একটা নমুনা দেওয়া ছাড়া কথাটা পরিষ্কার হবে না।

এটা জানা কথা যে যে ভক্ত মাত্রেই নামরূপ জপ করে রস পেয়ে থাকেন। এখানে রূপটাই হল যথেষ্ট, রং না হলেও চলল। "সুন্দর সৎগুরুয়োঁ কহা সকল শিরোমণি নাম, তাকোঁ নিশি দিন সুষরিয়ে..." রাম নামটা হলেই যথেষ্ট হল ভক্তের পক্ষে, রামের নবদুর্বাদল শ্যামবর্ণ দরকার নেই নাম রসের উপভভাক্তার কাছে। "সুন্দর ভজিয়ে রামকো, তজিয়ে মায়া মোহ।" রাম একটা নাম মাত্র, রূপও নেই রঙও নেই। অবর্ণ অরূপ রামকে নিয়ে নামজপ চলে, ছবি লেখা চলে না কোনো কালেই!

—সুন্দর মছরী নীর মেঁ বিচরত আপনে খগল।
বগুলা লেত উঠাইকে তোহি প্রলয়োঁ কাল॥

উপদেশ হলেও এর মধ্যে ছবি রয়েছে মাছ জল বক; বেশির ভাগ এখানে পাচ্ছি রূপ, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু রঙও পেয়ে যাচ্ছি। বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ—সেখানেও কাক বক নিয়ে কথা, কিন্তু একেবারে বেরঙা কথা নয়, বেরঙা কাক বকও নয়। 'কর্পূর দ্বীপে পদ্মকলি নামে এক সরোবর সেখানে থাকে হিরণ্যগর্ভ নামে এক রাজহংস'— এখানে রূপ রং একত্রে মিলে গেল। খানিক পরেই আবার নাম রূপের দেখা পাই, যেমন —'একদিন সেই রাজহংস সুবিস্তৃত পদ্মময় পর্যঙ্কে সুখে বসিয়া আছেন এমন সময় দীর্ঘমুখ নামে এক বক কোন এক দেশ হইতে তথায় উপস্থিত হইল।' এখন বকের নাম দীর্ঘমুখই রাখি বা দীর্ঘচক্ষুই রাখি যেমনি বললেম কথায় 'বক' অমনি বকের রঙটাও এসে জোড়া লাগল শ্রোতার মনে। ধর যদি বলতেন—শঙ্খধবল বক, তো রঙের সঙ্গে বকের রূপটা এসে জোড়া লাগত—সরু পা লম্বা চোঁচ কিছুই বাদ যেত না বক রূপটির। কিন্তু শুধু শঙ্খধবল বললে কি যে বোঝায় বা কি যে না বোঝায় তা বলা মুশকিল—সাপ ব্যাঙ সবই হতে পারে!

রূপে রঙে মিলিয়ে দেখা হল সহজ ও স্বাভাবিক দেখা। তবে সময়ে সময়ে এমনো হয়ে থাকে যে রঙের আকর্ষণ রূপের চেয়ে কি রূপের আকর্ষণ রঙের চেয়ে কম-বেশ কাজ করলে। দুই দল মেয়ের কথা হচ্ছে রথের সময়। প্রথম দল বললে,—'ও পারেতে ময়রা বুড়ো রথ দিয়েছে তেরো চুড়ো, বানরে ধরেছে ধ্বজা, দিদি গো দেখতে মজা'— শুধু এখানে রূপের কথা হল। দ্বিতীয় দল এর জবাব দিলে—'তোদের হলুদ মাখা গা, তোরা রথ দেখতে যা, আমরা হলুদ কোথায় পাবো, উল্টো রথে যাবো।' রূপ-দেখার দল আর রং-দেখার দল—একদল রঙ্গিণী উল্টো রথের সওয়ারী, আর একদল রূপসী সোজা রথের যাত্রী!

যখন দূরে থেকে হিমগিরি দেখি তখন রূপ সমভাবে মনের উপরে কাজ করে। রঙের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে রূপ দেখা সম্পূর্ণ হয় না এবং সে দেখার রসও পাওয়া যায় না—নিরর্থক দৃষ্টি বদল হয় মাত্র বস্তুর সঙ্গে। যেমন,—তাজমহলটা গিয়ে দেখলেম না কিন্তু চীফ ইঞ্জিনিয়ারের নক্‌সার সাহায্যে দেখলেম, ভাল ফটোগ্রাফ আর একটু বিস্তার করে আলো ছায়া ফেলে দেখালে, কিন্তু তাতেও দেখা সম্পূর্ণ হল না; ই.আই. রেলওয়ের টাইমটেবেলের মলাটখানা তাজমহলটি বদরং দিয়ে দেখালে তাতে করে ভুল ধারণা জন্মাল বস্তুটির, পাকা শিল্পী রূপ রং মিলিয়ে লিখলে তাজমহলের ছবি কি কবিতা, সত্য তাজমহলের দেখা পেয়ে গেলেম তখনই!

রূপের চেয়ে রং যেখানে জোর করছে মনে, তার দু'-একটা উদাহরণ দেখা যাক। যেমন—

"নিরুপম হেম জ্যোতি জিনি বরণ,
সঙ্গীতে রঞ্জিত রঙ্গিত চরণ,

নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া—”

এখানে কেবলি রং আর রং চোখে পড়ছে! আবার—

“নাথবান কনক কষিত কলেবর।
মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠাম—”

এখানে রঙের ছাঁদ রূপের ছাঁদ পরে পরে আসা যাওয়া করলে। কিন্তু—

“নমো নিরঞ্জন নিরাকার অবিগত পুরুষ অলেখ
জিন সন্তকে হিত ধরো যুগ যুগ নানা ভেখ!”

এখানে রং ছাড়া রূপ ছাড়া ধ্যানটাই পাচ্ছি পরমপুরুষের।

ঠিক এই কথাই উপনিষদে—“য একো বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধীতি”।[৩] জল এবং আকাশ অবর্ণের কাছাকাছি, কিন্তু জল আকাশ দুয়েরই রঙের অন্ত নেই। বায়ুস্তরের রূপও নেই রঙও নেই, কিন্তু রং ধরবার শক্তি ওতে আছে। বাতাসে ডোবা দূরের গাছ পর্বত ঘর বাড়ি রং ফেরায়, এটা জানতে সায়ান্স পড়তে হয় না, চোখ থাকলেই দেখা যায়। প্রকৃতির নিয়মে কোনো কিছুর রং অবিমিশ্রভাবে বর্তে থাকতে পায় না, বিকার ঘটে যায়, আলো পড়ে ছায়া পড়ে,—তৃণভূমি, সে গাছের তলাটায় নীলাভ রং, গাছের ছায়া যেখানে পড়লে না সেখানে পীতাভ সবুজ রং ধরলে। স্ববর্ণে বর্তে আছে এমন কোনো কিছু নেই বললেও চলে; জগতে এ ওর রঙে রাঙিয়ে উঠছে দিনরাত!

এই যে রঙের মিশ্রণ ও আদান-প্রদান এ যেমন দেখছি বিশ্ব ছবিতে, তেমনি আবার পাশাপাশি দুই বস্তুর রঙে রঙে কঠিন ব্যবধান তাও দেখছি। কালোর পাশে আলো, একই জাতের দুই গাছ একটির পাশে আর একটি রূপ ও রঙের তারতম্য নিয়ে সুন্দর ফুটল, সবুজের কোলে রঙিন ফুল, অন্ধকারের বুকে তারাফুলের বাহার, ঘন মেঘের গায়ে সাদা বকের সারি, আলোর গায়ে কালো কাকের দল,—রঙের এসব হিসেবে শিখতে আর্টস্কুলে যেতে হয় না। কত বার দেখেছি রঙে রং মিশিয়ে পাখির ছানা কুকুর বেড়াল বাঘ মানুষ দিব্যি গা ঢাকা দিলে, তেলাকুচো ফল বর্ণচোরা আম রং দিয়ে রসের অপদার্থতা লুকিয়ে চলল!

ফুলের রংটাই পৌঁছে দেয় মধুর সংবাদ মৌমাছিকে, এটা জানা কথা। উৎসবের রং শোকের রং এসবই ধার করে নিয়েছে মানুষ প্রকৃতির কাছে কোন আদিকালে তার ঠিকানা নেই।

সরল রূপ বাঁকা রূপ এমনি নানা রূপ-রেখা যেমন ভাবের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, তেমনি রংও প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রকার বললেন— “শ্যামো ভবতি শৃঙ্গারঃ, সিতো হাস্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ, কাপোতঃ করুণশ্চৈব, রক্তো রৌদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ গৌরো বীরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণশ্চৈব ভয়নাকঃ নীলবর্ণস্তু বীভৎসঃ পীতশ্চৈবাদ্ভুতঃ মৃতঃ॥”[৪]

ঠিক এই ভাবে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে রঙের নানা প্রতীক ও হিসেব দেখতে পাই, যেমন—

কালো রং হল—শোকের নিরাশার, মেটে এবং ধুসর রং বোঝায়—শুষ্কতা মৃত্যু ইত্যাদি, পীত নীল রক্ত—পরিণতি শক্তি ঐশ্বর্য ইত্যাদি, সবুজ রং তারুণ্য আশা ইত্যাদি, শুভ্রবর্ণ বোঝায়—শান্ত সুন্দর ভাবটুকু, ঊষার নির্মলতা শুচিতা ইত্যাদি। আদিম যুগের মানুষ হলেও এই সব জাতি রূপ ও রঙের অচ্ছেদ্য মিলন বিষয়ে অজ্ঞ রইল না।

বাদলের দিনে হঠাৎ সূর্যালোক তাদেরও মনে রস জাগিয়ে দিলে এবং আদিম আর্টিস্ট কালো রঙের উপরে লাল রঙে ডোরা দিয়ে সেকালের বর্ষামঙ্গলের উৎসবমণ্ডপ সাজাবার নিয়ম করে গেল। বাদলের সন্ধ্যায় তাদের মেয়েরা পীতডোরা কালো কষির আলপনা দিয়ে বসুধারা ব্রত করে গেল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কি আদিম যুগে, কি আজকের যুগে, রং আর রূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধাই রইল—এ থেকে ওকে স্বতন্ত্র করার সামর্থ্য নেই কোনো আর্টিস্টের।

বলবার বেলায় রূপ রং ভাব ইত্যাদিকে পৃথক করে দেখি, কিন্তু ছবি রচনার বেলায় এদের আর আলাদা করে রাখা চলে না, এ ওর সঙ্গে মিলে দেয় পরিপূর্ণ রূপটির ছন্দ। এই যে বিচিত্র সব রূপে রঙে মিলিয়ে মায়াজাল বিস্তৃত হয়েছে বিশ্বে, তারি রহস্য ভেদে হল বর্ণিকাভঙ্গের শিক্ষার লক্ষ্য।

রাগ আর রং এক করে দেখেছেন পণ্ডিতেরা,—নানা রঙের অনুরাগ তারি লক্ষণ দিচ্ছেন,—যেমন— নীলিরাগ অর্থাৎ নীল অনুরাগ, যে ভালবাসার রং বদলায় না তাকেই বলা হয় নীলিরাগ। এমনি বাইরে বাইরে কপট ভালবাসা একটুতে উপে যায় রং, এমন ভালবাসার নাম দিলেন কবিরা কুসুম্ভরাগ; মঞ্জিষ্ঠারাগ হল পাকা রঙের ভালবাসা বা অনুরক্তি যাই বল। সবল দুর্বল কাঁচা পাকা নানা রঙের নানা হিসেব শাস্ত্রে দেখি এবং চারিদিকে চোখেও পড়ে।

রঙিন রূপ নিয়ে রঙ্গী মানুষের হল কারবার, রঙিন ছবি দিয়েই পাঠশালের বর্ণপরিচয় শুরু করে দিয়েছে অমৃতের পুত্র মানুষ, অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাদের টেক্স্ট বক কমিটি রংছুট বর্ণপরিচয় দিয়ে আমাদের ছেলেদের শিক্ষা শুরু করতে বলছে! আনা কতকের বর্ণপরিচয় বিদ্যেসাগরের আমলেও যে-বেরঙা আজকের আমলেও তাই। কাক লিখে তার পাশে কালো ছবি, বক লিখে কালো ছবি, আম লিখে কালো ছবি, জাম লিখে কালো ছবি, কিন্তু সবটাই বেরঙা কালো। এই পর্যন্ত এগিয়েছে আমাদের নতুন বাংলার বর্ণপরিচয়। কিন্তু এটাকে অগ্রসর হওয়া বলা ভুল কেননা দেখতেই পাচ্ছি, রূপ রং ওখানে মিললই না, রসও পেলে না ছেলেগুলো; কিন্তু অর্থ পেলেন যথেষ্ট একালে সেকালে অনেকেই। ঐ লাল কালিতে ছাপা টুকটুকে বইয়ের যা কিছু রং ঐখানেই শেষ। বিলিতি বর্ণপরিচয় ঠিক আমাদের উল্টো রাস্তা এবং স্বাভাবিক শিক্ষার পথ ধরলে; রূপে রঙে মিলিয়ে বর্ণপরিচয় আরম্ভ হল সেখানে। কাজেই ওরা এগিয়ে গেল, আর আমরা বেরঙা বর্ণপরিচয় পড়ে পড়ে হয়রান হতে থাকলেন। কলেজ স্কোয়ারে ছেলে ভোলাবার বাংলা বই ভালরকম একখানা আছে বলে তো মনে হয় না। বইয়ের দোকান যথেষ্ট, দামও বেশ চড়া, কিন্তু যত রং মলাটেই, অনেকটা মাকাল ফলের অনুরূপ। বইগুলো চোখ ভোলায় কিন্তু ছেলের কাজে আসে না। বিলিতি দোকানে যাই, শিশু-শিক্ষাকে দেখি তারা রঙের ছক্কা পাঞ্জা খেলার মতো আনন্দদায়ক করে তুলেছে।

রঙের উৎসবে ছেলেমেয়েদের ডাক দেওয়া যে দরকার, না হলে জীবনটাই যে তাদের বিশ্রী হয়ে যায় এটা জানতে কারু বাকি নেই, কিন্তু তবু আজও বাজারে বেরঙ ছাড়া সুরঙ বাংলা হিন্দী বর্ণপরিচয় পাওয়াই যায় না। এর কারণ এখনো রস ধরেনি বর্ণপরিচয় লিখিয়েদের মনে, কাজেই রংও ধরছে না বর্ণমালায় আমাদের।

মহাদেব যখন পার্বতীকে বর্ণমালার পাঠ দিয়েছিলেন তখন রূপের সঙ্গে রঙেরও আমদানি করেছিলেন তিনি। যথা, অ হল—শরচ্চন্দ্র প্রতীকাশং, আ হল— শঙ্খজ্যোতির্ম্মরম্, ই হল— পরমানন্দসুগন্ধকুসুমচ্ছবিম্, উ হল—পীতচম্পকসঙ্কাশং, ঋ হল—রক্তবিদ্যুল্লতাকারম্, ৯ হল—চঞ্চলাপাঙ্গী

কুণ্ডলী পীতবিদ্যুল্লতা। এমনি সত্যিকার ফুল বিদ্যুৎ কুণ্ডল এই সব দিয়ে পার্বতীর বর্ণপরিচয় আরম্ভ করে দিয়েছিলেন শিব, রূপে রঙে মিলিয়ে শিক্ষা।

রূপ ও রং বাক্য এবং অর্থের মতো মিলে আছে এটা পুরোনো কথা, কিন্তু নতুন যুগেও আর্টিস্টদের একথাটা বুঝে না চললে যে বিপদ আছে সেটা বলাই বাহুল্য।

টীকা

১. কাদম্বরী (পূর্বভাগ), বাণভট্ট (এম. আর. কালে সম্পাদিত)
২. ঐ
৩. ৪।১ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
৪. ৬।৪৭-৪৮ নাট্যশাস্ত্র—ভরতমুনি (মানবল্লী রামকৃষ্ণকবি সম্পাদিত)

গ্রন্থ-পরিচয়

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী গ্রন্থটি প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। (১৯৪১ সাল)। পরের সংস্করণগুলি প্রকাশ করেন রূপা অ্যান্ড কোম্পানি। বিভিন্ন সংস্করণের পরিচয় এখানে দেওয়া হল।

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী [১৯২১-১৯২৯]। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম সংস্করণ, ১৯৪১। পৃ [৬]+৩৯৫।

গ্রন্থারম্ভে প্রকাশকের শিরোনামবিহীন নিবেদন:

পূজ্যপাদ স্যর আশুতোষের প্রযত্নে ও খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের বদান্যতায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পাঁচটি নূতন অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি হয়, ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাপনা-সম্পর্কে ‘রাণী বাগেশ্বরী অধ্যাপক’-পদ তন্মধ্যে একটি।

মনে পড়িতেছে, ইহার অব্যবহিত কাল পূর্বে, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘রসের কথা’ নামে এক প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছিলেন, “এ দেশের অলঙ্কারের সূত্রগুলো যে ছত্রে-ছত্রে Art-এর ব্যাখা করে চলেছে, সেটা কোন পণ্ডিতকে তো এ পর্যন্ত বলতে শুনলেম না।” কিন্তু দরদীর মন লইয়া এ কথা বলিবার— Art-এর প্রকৃত ব্যাখ্যা করিবার—অবনীন্দ্রনাথই যে যোগ্যতম পণ্ডিত, ইহা স্যর আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন। ইহা বুঝিয়াই সেই সময়ে তিনি অবনীন্দ্রনাথকেই ‘রাণী বাগেশ্বরী অধ্যাপকে’র পদে বরণ করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি প্রায় ত্রিশটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই সকল বক্তৃতা তখনকার দিনে ‘বঙ্গবাণী’ ও ‘প্রবাসী’ পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহার পর প্রায় এক যুগ অতীত হইয়াছে। শিল্পচর্চার আদর দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয়-তালিকায় ‘শিল্পরসবোধ’ পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এ সময়ে অবনীন্দ্রনাথের উক্ত বক্তৃতাসমূহ পুনঃ-প্রচারিত হইলে অনেকের উপকার হইবে বিবেচনায় সেগুলি ‘বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

সূচী॥ শিল্পে অনধিকার; শিল্পে অধিকার; দৃষ্টি ও সৃষ্টি; শিল্প ও ভাষা; শিল্পের সচলতা ও অচলতা; সৌন্দর্যের সন্ধান; শিল্প ও দেহতত্ত্ব; অন্তর বাহির; মত ও মন্ত্র; সন্ধ্যার উৎসব; শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড; শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড; শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালমন্দ; শিল্পবৃত্তি; সুন্দর; অসুন্দর; জাতি ও শিল্প; অরূপ না রূপ; রূপবিদ্যা; রূপ দেখা; স্মৃতি ও শক্তি; আর্য ও অনার্য শিল্প; আর্য-শিল্পের ক্রম; রূপা; খেলার পুতুল; রূপের মান ও পরিমাণ; ভাব; লাবণ্য; সাদৃশ্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম 'রূপা' সংস্করণ রূপে রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত, বৈশাখ ১৩৬৯, এপ্রিল ১৯৬২।

রূপা কোম্পানি থেকে বইটির পরের সংস্করণগুলি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ফাল্গুন ১৩৭৫, মার্চ ১৯৬৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৌষ ১৩৮৯, জানুয়ারি ১৯৮৩ (তৃতীয় সংস্করণ), শ্রাবণ ১৩৯৫, আগস্ট ১৯৮৮ (চতুর্থ সংস্করণ) এবং পৌষ ১৪০১, জানুয়ারি ১৯৯৫ (পঞ্চম সংস্করণ) তারিখে। পঞ্চম সংস্করণের পরিচয় নিম্নরূপ:

পঞ্চম 'রূপা' সংস্করণ, পৌষ ১৪০১, জানুয়ারি ১৯৯৫। পৃ ১৮+৩৬৮। মূল্য পঁচানব্বই টাকা।

"শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা, রূপকলার আলোচনার ক্ষেত্রে যুগান্তরকারী গ্রন্থ, এবং এ যুগে আমাদের মধ্যে রসবোধের উন্মেষসাধনে অতুলনীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গসাহিত্যের এটি এক অমূল্য সম্পদ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ বহুদিন হল নিঃশেষিত। এটির পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে জেনে রূপরসিক সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই যারপরনাই আনন্দিত হবেন। আমিও এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি এবং এই প্রকাশ বিষয়ে উদযোগী হওয়ায় 'রূপা কোম্পানীকে' অভিনন্দন জানাই।"

—ভূমিকা: নন্দলাল বসু

গ্রন্থের শুরুতে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত "পূর্বাভাষ" শীর্ষক আলোচনা, অবনীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থটি সম্পর্কে পরিচয়, যুগান্তর, দেশ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, চতুরঙ্গ, অমৃতবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি, লেখকের একটি আলোকচিত্র এবং গ্রন্থশেষে "গ্রন্থ-নির্দেশিকা" মুদ্রিত।

'রূপা' সংস্করণে 'সন্ধ্যার উৎসব' ও 'খেলার পুতুল' নামক প্রবন্ধ দুটি বাদ দেওয়া হয় এবং 'বর্ণিকাভঙ্গম' এবং 'রস ও রচনার ধারা' প্রবন্ধ দুটি সংযোজিত হয়। প্রথম 'রূপা' সংস্করণে অবশ্য 'রস ও রচনার ধারা' প্রবন্ধটি যুক্ত ছিল না।

'পূর্বাভাষ' অংশটি উদ্ধৃত হল।

পূর্বাভাষ

ইহলোকে অবনীন্দ্রনাথ আজ নেই। কিন্তু, শিল্প ও সাহিত্য জগতে তাঁর অমূল্য কীর্তি অমরত্বের দাবি রাখে। এই রচনাবলী তারই প্রমাণ দেয়।

আধুনিক কালের পাঠক এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে গুরু অবনীন্দ্রনাথের জ্ঞানের গভীরতা, শিল্পীর রসিক চিত্তের প্রসারতা ও শিল্পাদর্শের অপূর্ব ব্যাখ্যানের পরিচয় পাবেন, সন্দেহ নেই। আর এক দিকে, সেকালে অবনীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এই বক্তৃতাগুলি শোনবার ও বক্তার অননুকরণীয় বলার ভঙ্গী দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের

হয়, তাঁদের মনে এই লেখাগুলি আনন্দময় স্মৃতির স্বর্ণোজ্জ্বল এক দ্বারও উদ্‌ঘাটন করে। সৌভাগ্যবান সেই শ্রোতাদেরই একজনের সেই আনন্দ-অনুভূতির সামান্য আভাস এখানে দিই।

কিন্তু তারও পিছনের পটভূমিকা আছে।

এককালে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শুধু পরীক্ষা কেন্দ্র, ভারতের শিক্ষাগগনে দেখা দিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—তেজোদীপ্ত সূর্যের মতো। জ্ঞানের পূজারী। সুদূরপ্রসারী তাঁর দৃষ্টি। বিরাট পরিকল্পনা। অসীম কর্মক্ষমতা। দুর্জয় সাহস। বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে তোলেন স্নাতকোত্তর বিভাগগুলি।

পরাধীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রবর্তন হয় উচ্চশিক্ষার পঠন-পাঠনের। ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে, এমন কি সুদূর ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, পারস্য, তিব্বত, সিংহল, জাপান—নানান দেশ-বিদেশ থেকে স্যার আশুতোষ খুঁজে খুঁজে আমন্ত্রণ করে আনেন—জ্ঞানী, গুণী অধ্যাপকদের। বহুবিধ রত্ন সম্ভারে সরস্বতীর বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলে। দিকে দিকে সাদর আহ্বান পাঠান। জাতিভেদ নেই, ধর্মভেদ নেই, স্বদেশী বিদেশী কোনো ভেদাভেদই নেই। বাণীর প্রতিমা নির্মাণে, দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার পুণ্য কর্মে সেই বিরাট পুরুষ সহকর্মীদের নিয়ে আত্মনিয়োগ করেন।

অর্থের প্রয়োজন। বিদেশী শাসক। সাহায্যদানে স্বভাবতঃই কার্পণ্য দেখায়। নানান বাধার সৃষ্টি হয়। স্যার আশুতোষ স্বদেশবাসী দানবীরদের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তার্থদানও আসে। খয়রার রাজাও বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মহৎ কাজে তাঁর বিপুল সম্পত্তির অংশ দান করেন। সেখানেও বিপত্তি জাগে। খয়রার রানী বাগীশ্বরী দেবী ও কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের মধ্যে সম্পত্তি সম্পর্কে হাইকোর্টে মামলা চলে। অবশেষে হাইকোর্টের ডিক্রীতে সিদ্ধান্ত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দান-লব্ধ অর্থের কিভাবে ব্যয় ও ব্যবহার হবে সে-বিষয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নির্ধারণ ও স্কীম অনুযায়ী স্থিরীকৃত হবে—"Under the direction of and according to a scheme to be framed by Sir Asutosh Mookerjee."

এইভাবে খয়রার রাজার বদান্যতায় ও স্যার আশুতোষের প্রচেষ্টায় ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি নতুন অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। তারই মধ্যে ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাপনা সম্পর্কে 'রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' পদ অন্যতম।

এরই অল্পকাল আগে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর এক প্রবন্ধের একস্থানে বলেন, 'এ দেশের অলঙ্কারের সূত্রগুলো যে ছত্রে ছত্রে আর্ট-এর ব্যাখ্যা করে চলেছে, সেটা কোনো পণ্ডিতকে তো এ পর্যন্ত বলতে শুনলেম না।'

দরদীর মন নিয়ে এ কথা বলবার ও ভারতীয় শিল্পকলার প্রকৃত ব্যাখ্যা করবার যোগ্যতম পণ্ডিত শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং, সে-কথা স্যার আশুতোষ বুঝেছিলেন এবং তিনিই তাঁকে 'রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক'-এর পদে প্রথম অধ্যাপকরূপে বরণ করেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি ঊনত্রিশটি বক্তৃতা দেন। তাঁর সেই সকল বক্তৃতা তখনকার 'বঙ্গবাণী' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক অবনীন্দ্রনাথকে ডক্‌ট্‌র অফ্ লিটারেচার (ডি. লিট্) উপাধিতে ভূষিত করে সম্মান দেখান। এই হোল লিখিত ইতিহাস। এবার বক্তৃতা কালের কথা বলি।

শিল্পী আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে—শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে।

শিল্পীর মুক্ত মন। বাধা বন্ধনহীন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম। স্বাধীনভাবে মনের আনন্দে পাখা মেলে অসীম নীল আকাশে তার বিচরণ। বাঁধা নিয়মের নিষেধ মানে না। সোনার খাঁচার মাঝেও ধরা দেয় না। স্যার আশুতোষকে

সে-কথা জানান। তার ব্যবস্থা হয়— অবনীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলি—'আমি ক'বছর নির্বিবাদে আর্ট সম্বন্ধে যা খুশি যখন খুশি যেমন করে খুশি যা-তা—অবিশ্যি যা জানি তা—বকে যেতে পারব এই ভরসা পেয়েছি।'

সেই স্বাধীন-চেতা শিল্পী এলেন বক্তৃতা দিতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং। দোতলায় উঠে সামনে প্রকাণ্ড হল্। যখন শুন্য থাকে খাঁ খাঁ করে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বক্তৃতা। শ্রোতার ভারে ভরে ওঠে। তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। দুপাশের 'করিডর্'-এও লোকের ভিড়। বিকেলবেলা। ল' কলেজের ঘণ্টা বাজে। দলে দলে ছেলেরা চলে ক্লাস করতে। থমকে দাঁড়ায় 'করিডর্'-এ। ভুলে যায় ক্লাসের কথা। স্তব্ধ ও তন্ময় হয়ে শোনে শিল্পীর বক্তৃতা।

বক্তৃতা তো নয়। সে-ও এক ছবি দেখা।

দীর্ঘদেহ বক্তা। পরনে আলখাল্লার মতো পোশাক। যেন বাংলার বাউল। সুপ্রশস্ত ললাট। মাথার সুমুখপানে বিরল কেশ। পাশে ও পিছনে কুঞ্চিত কেশের গুচ্ছ। যেন নদীতটে স্তব্ধ ঢেউয়ের সারি। চোখের চাহনি, মুখের ভঙ্গী, অঙ্গচালনা, দেহভঙ্গিমা—সব কিছুর মাঝে কেমন যেন এক অদ্ভুত ভাব। মনে হয়, কৌতুকময়, ব্যঙ্গসূচক অভিব্যক্তি, আপনভোলা মন। এত লোকের মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন। যেন ভিন্ন কোন্ এক জগতের মানুষ। ভাবের আকাশে ভেসে আসে। কণ্ঠে স্বর ফোটে, যেন হিমগিরির গুহা ভেদ করে নির্ঝরিণী নেমে আসে। সুনির্মল স্বচ্ছ জলধারা। সুস্পষ্ট, মধুর অথচ উচ্চকণ্ঠ বাণী। ভাব ও ভাষার অপূর্ব তরঙ্গমালা। গতানুগতিক বাক্য রচনা নয়। শব্দের বিচিত্র বিন্যাস। অপরূপ বলার ভঙ্গী। জনাকীর্ণ নিস্তব্ধ ভবনে সুরময় ধ্বনির তরঙ্গায়িত কম্পন। শ্রোতার কানে মনে ছন্দের ঝঙ্কার ওঠে। বক্তৃতা শোনা নয়,—এ যেন শব্দ-ও-কথা-দিয়ে-আঁকা ছবির পর ছবি দেখা। আনন্দের স্রোতে মন ভেসে চলে কোন্ অজানা অসীম নীল সাগরে। আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে শ্রোতার অন্তর।

চমক ভাঙে বক্তৃতা শেষে। মনে হয়, স্বপ্নলোক থেকে আবার ফিরে আসি মর্তলোকে।

আজ ছাপার হরফে বন্দী সেই ভাষণ। স্তব্ধ সেই স্বর। তবুও পড়তে গিয়ে সেদিনের সেই ছবি মানসপটে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেই সুর আবার কানে বাজে।

বক্তৃতাকালে এক সময়ে তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তুর উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি ছবি আলোকচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়। সেই ছবিগুলি এখন কোথায়, জানা নেই। কিন্তু, অবনীন্দ্রনাথের হাতে-লেখা 'চিত্র-পরিচয়'-এর পাণ্ডুলিপি এখনও আমার কাছে আছে। ছবিগুলি না থাকলেও শিল্পীর প্রাণবন্ত ভাষার রঙে ও রেখায় ছবিগুলি কেমন ফুটে ওঠে, তাই দেখাই:

চিত্র-পরিচয়

ছবি—

॥১॥ এই জল-জীয়ন্ত মানুষ তার অন্তরের বিকাশ আর বাইরের প্রকাশ দুটি নিয়ে সুন্দর—শৈশবে সুন্দর যৌবনে সুন্দর বার্ধক্যে সুন্দর। অতএব সে-মানুষের ফটো ঘরের দেওয়ালে খাটালে আমাদের ভাল লাগা উচিত

কিন্তু তা তো হয় না—মানুষের স্থূল এবং অ্যানাটমি দোরস্ত শরীরটাতে এমন কিছু নেই যা সবার মন ভুলিয়ে নিতে পারে।

॥২॥ এই ফিজিওলজির নিয়ম অনুসারে গড়া বুড়ো ঘর সাজাবার কাজে এটা আসে। না গৃহস্থের, কিন্তু দশ দশার যারা বই লিখছে তাদের লাগবে ভাল। আর আর্টের নিয়ম ধরে গড়া এই পিতলের পুতুল—একে ঠাকুর ঘরেই রাখ বা খেলাঘরেই থোও কিংবা আফিসের টেবেলে কাগজ চাপার কাজেই লাগাও—সব জায়গাতেই এটা মানিয়ে যাবে—এ একটি গোলগাল নুড়ির মতো শুধু আপনার সুন্দর গড়নটি দিয়েই মানিয়ে নেবে আপনাকে ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ সবার মনের সঙ্গে, কেননা এটি কালের এবং ব্যক্তিত্বের ছাপ এড়িয়ে একটুখানি রেখার ছন্দ নিয়ে রূপমুক্তি লাভ করে নানা ঘরে নানা মনে চলাচলের সুবিধা করে নিয়েছে।

॥৩॥ ভিতরের মানুষ যতক্ষণ রইল—ততক্ষণ ঘরটার ভিতর-বাহির সে ভরে রইল, মানুষ পালালো ঘর বাড়ি সমস্তই বিশ্রী হয়ে উঠলো ইটকাঠ দড়িদড়া বাঁশের কুৎসিত রূপটাই দেখা দিলে তখন ঠিক তার নিজের কঙ্কালের মতো।

॥৪॥ কঙ্কাল-এর ভিতর নেই বাইরে নেই, বাইরের শোভা খসে গেছে ভিতরের রস শুকিয়ে গেছে। ছবি বলে একে ভ্রম করে কে? এ শুধু অস্থি সংস্থান হাড়ের স্তূপ একে নিয়ে ঘর করবে ছবির জায়গায় বসিয়ে দিয়ে কে এমন আছে? এর না আছে গতি যে চলবে মনের মধ্যে, না আছে মুক্তি যে রূপমুক্ত পুতুলটিরও অধিকার পাবে মানুষের খেলাঘরে।

॥৫॥ এই পুরন্ত গাছ-এর পাতায় পাতায় শাখায় শাখায় শিরায় উপশিরায় এর ভিতরে ছন্দ ধরা পড়েছে তাই এ মনোহর।

॥৬॥ এই শুকনো গাছের কঙ্কাল এরও হাড়ে হাড়ে এখনও সেই পুরাতন ছন্দ বিঁধে রয়েছে তাই এ সুন্দর।

॥৭॥ মহা ঝড়ে মহারণ্য চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলে ছন্দ ভেঙে গেল বিশ্রী হয়ে দেখা দিলে সারা বন!

॥৮॥ কত বিষাক্ত আরক দিয়ে চেষ্টা করা হল কিন্তু অ্যানাটমি দোরস্ত মানুষের স্থূল শরীরের ফটোগ্রাফটায় রস ফোটানো এ পর্যন্ত গেল না। ফুল কিন্তু তার অ্যানাটমি ঠেলে সুন্দর হল—ফুটলো বাইরে—ভিতরের রসে রং-এ ছন্দে মনোহর।

॥৯॥ ফুলকে ধুলোতেই ফেল বা জলেই ভাসাও সে মনোহরণ রূপ ধরবেই, কেননা অ্যানাটমির শুষ্কতা সে চিরকালের মতো অতিক্রম করেছে রসের ও রং-এর রূপের মুক্তি পেয়ে গেছে এবং সে ফুটেছে।

॥১০॥ রস ছবিতেই ফুটুক পাথরেই ফুটুক ফুটলো তো সে আর্ট হল মনোহর হল।

॥১১॥ রসের স্পর্শ পেয়ে রূপ মুক্ত হল ফুটে উঠলো, ভেঙে টুকরো টুকরো হলেও সে সুন্দরই রইল।

॥১২॥ শুধু অ্যানাটমির বশে রূপ রইল বাঁধা মানুষের ফটোগ্রাফের মতো সে সবাব হতে পারলে না।

॥১৩॥ মরা মানুষের মাথাটার মতো বিশ্রী দেখালো! মানুষের কাঁচা মাথা যে রস দেয় ঠিক সে রস দেয় না সুন্দর মূর্তির ভাঙা অংশ।

॥১৪॥ অকূল এ রূপ রসের ঢেউ মানুষের এতটুকু অ্যানাটমি নিয়ে তাকে অতিক্রম করা চলে না।

॥১৫॥ অ্যানাটমি দোরস্ত সুন্দরী একে স্থাপন করা গেল মেঘে এর ঘর বাড়ি সমস্তই উঠিয়ে নেওয়া গেল আকাশে—বিরোধ বাধলো স্বর্গে মর্তে—এই মানুষ এই ঘর বাড়ি কি করে উড়োজাহাজ বা ডানা না পেলে এক দণ্ড তিষ্ঠোবে শূন্যে? অলঙ্কারের পণ্ডিত এ ছবিটার দোষ ধরলেন এটা প্ররূঢ় বিরোধ হল বলে। এই মানুষের স্থূল দেহ একে প্রমাণ করতে হবে যে এর অ্যানাটমি ঠিক মানুষের মতো নয় কাজেই এর ওড়ার শক্তি আছে! তবেই বিরোধ অপ্ররূঢ় হবে এবং ছবিটাও অলঙ্কারের দিক থেকে পাস হবে ভাল ছবি বলে।

॥১৬॥ এই অপ্সরাদের মূর্তি এদের দেহ অ্যানাটমিক্যাল নয় সুতরাং মেঘের ছন্দ ধরে এদের দেহের অস্থিসন্ধি এঁকেবেঁকে চললো উড়ে, স্বপ্নে দেখা রূপের মতো শূন্যে ভর দিয়ে। পণ্ডিত এর সম্বন্ধে তর্ক তুলতে পারলেন না—নিয়তির নিয়মও একে ছাড়পত্র দিলে উড়তে।

॥১৭॥ অ্যানাটমি ভাঙলো তো ভাল করেই ভাঙবে না কেন? স্থূল শরীরের সবখানির ব্যতিক্রম হল এই অবলোকিতেশ্বরে। অসংখ্য শির অসংখ্য বাহু অনেক চোখ—বিরাট দৃষ্টি বিরাট জ্ঞান বিরাট শক্তি প্রসারিত করলেন ইনি দিকে দিকে। রসের ও রূপের দুই ডানা বিস্তৃত হল এঁর দুই দিকে কিরণচ্ছটার মতো। লঘুভার সমুন্নত দেবশরীর দাঁড়ালো ক্ষণিকের মতো বিশ্রাম করতে আমাদের মানস কমলে।

॥১৮॥ গুটিপোকা যেমন মোটা গুটি ছেড়ে লঘুভার ও সুন্দর হয়ে বার হয় জগতে তেমনি স্থূল রূপের বন্ধন কেটে বেরিয়ে আসে আর্টের জগতে রূপমুক্ত নতুন আকার প্রকার নিয়ে রস ও ভাব সমস্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ভাব রস ও রঙ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের জীবনের প্রতি মুহূর্তটি পরিব্যাপ্ত করে রাখে। তাই তাঁর পত্র পাই:

Gol Koti

Kurseong

প্রিয়বরেষু

আমি পূজার পূর্বেই তোমাদের কাউকে না খবর দিয়ে পাহাড়ে পালিয়ে এসেছি। এখানে গাছপালা মেঘ পাথর আলো অন্ধকারের সঙ্গে বসে বসে পরিচয় করছি। সৃষ্টির মধ্যে চোখ মন ডুবে রইলো, রচনার প্রেমে পড়েই দিন যাচ্ছে, রচয়িতার সঙ্গে প্রেম কবে হবে তাই ভাবছি! —ছবি যে আঁকছে সে তার ছবি দেখিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখলে নিজে ধরা দিলে না এরি বেদন থেকে থেকে মনে জাগছে। এইখানে এসে মনে ভেবেছিলেম গোটাকতক লেকচার লিখবো কিন্তু কিছুই হচ্ছে না—মন নিরুদ্দিষ্ট যে তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"আমি সুদূরের পিয়াসী"

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ ভাবি, সেই সুদূর সুন্দরেরই বার্তা আনে এই বক্তৃতাবলী।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী • অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

|| ই-বুকটি সমাপ্ত হল ||

www.anandapub.in